

pathfinder



মারিয়ো পুজোর

গডফাদার

রূপান্তর: শেখ আবদুল হাকিম



ANIK



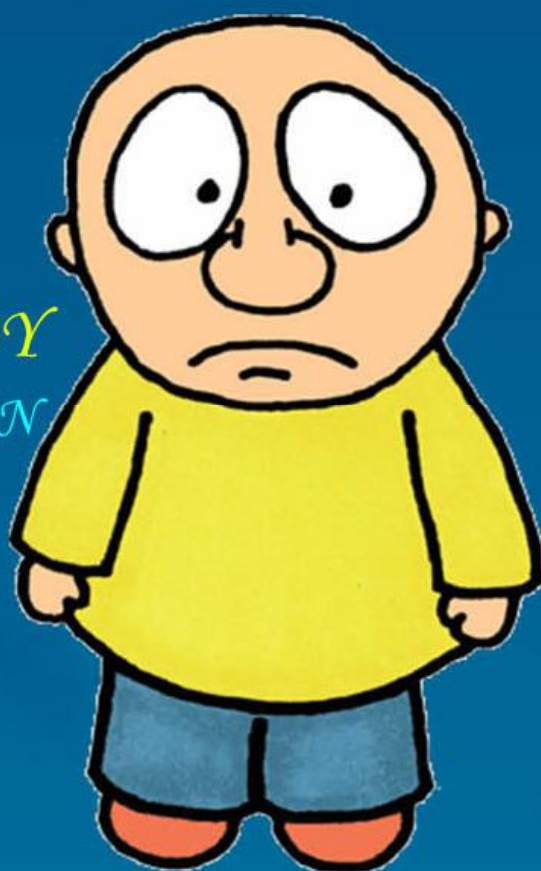
Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some
Credit When You Share
Our Books!

Don't Remove
This Page!

SCANNED BY
KAMRUL AHSAN

EDITED BY
ANIK
FUAD



Visit Us at
Banglapdf.net

If You Don't Give Us
Any Credits, Soon There'll
Nothing Left To Be Shared!

গাডফাদার

ভলিউম ২

[তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব]

মারিয়ো পুজো

রূপান্তর : শেখ আবদুল হাকিম

Scanned By : Kamrul Ahsan

Edited By : Anik & Fuad

Website : www.banglapdf.net

Facebook : www.facebook.com/Banglapdf.net

মারিয়ো পুজোর
গড ফাদার

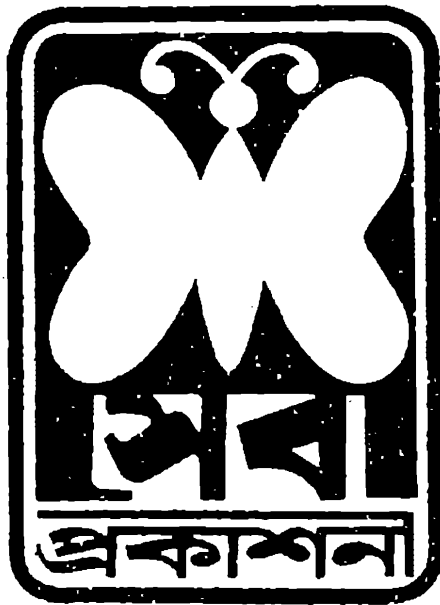
[ভলিউম ২: তৃতীয় ও শেষ পর্ব একত্রে]

রূপান্তর

শেখ আবদুল হাকিম



সেবা প্রকাশনী



পঁয়তাল্লিশ টাকা

ISBN 984-16-3143-1

প্রকাশক

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮০

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেগুনবাগান প্রেস

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

দূরালোপন: ৮৩১ ৪১৮৪

মোবাইল: ০১১-৮০৭৪০৮ (M-M)

জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০

E-mail: Sebakprok@citechco.net

Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক

প্রজাপতি প্রকাশন

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম

সেবা প্রকাশনী

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রজাপতি প্রকাশন

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

GOD FATHER

Volume-2

Trans. & Ed. By: Sk. Abdul Haki

গড ফাদার

তৃতীয় পর্ব ৫—১২৫

শেষ পর্ব ১২৬—২৬৪



সেবা প্রকাশনীর

আরও ক'টি অনুবাদ

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড : শী, রিটার্ন অভ শী, নেশা,
অ্যালান কোয়াটারমেইন, স্টেলা
হেনরি শ্যারিয়ান : প্যাপিলন
ওয়াল্ট ডিজনি : পিনোকিও
হ্যানস অ্যাণ্ডারসন : কুচ্ছিত হাঁসের ছানা
ড্যাফনে দু মরিয়ে : রেবেকা
জেমস কেনিমোর কুপার : দি প্রেইরি
স্যার আর্থার কোনান ডয়েল : বাস্কারভিলের হাউও,
দ্য সাইন অভ ফোর
চার্লস নর্ডহক ও জেমস নরম্যান হল : পিটকেয়ার্ন'স আইল্যান্ড
জেরোম কে. জেরোম : ত্রিভুজের নৌ-বিহার
এব্রিক মারিয়া রেমার্ক : অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট,
স্বপ্নমৃত্যু ভালোবাসা, শ্রী কমরেডস, দ্য রোড ব্যাক
ডিট্র হুগো : হাঞ্চব্যাক অভ নটর ডেম
ভিক্টোরিয়া হল্ট : স্বপ্নসখা
আর্নস্ট হেমিংওয়ে : আ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস
পি. জি. ওডহাউস : থ্যাংক ইউ, জীভস; ক্যারি অন, জীভস
আলবেয়ার কামু : দ্য প্লেগ
জ্যাক লগন : হোয়াইট ফ্যাং
গাই মালদুন : মৃত্যুদীন আতঙ্ক
অ্যান্ড্রু গীয়ার : দি আয়রন মিস্ট্রেস
অ্যালান মার্কস : তিমির রাত্রি
পিয়েরে বুলে : দ্য ব্রিজ অন দ্য রিভার কওয়াই
কর্নেল জে. এ. প্যাটারসন : সাত্তোর মানুষথেকো
আইজাক আসিমভ ফাউন্ডেশন

বিতরণের শর্ত : এই বইটি ভাড়া দেয়া বা কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং
স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

তৃতীয় পর্ব

এক

গ্রামের নাম নিউ হ্যাম্পশায়ার। এই গ্রামের বৈশিষ্ট্য হলো নতুন কিছু একটা ঘটলেই সমস্ত ব্যাপারটা খুঁটিয়ে লক্ষ করার জন্যে জানালা দিয়ে উঁকি মারে মেয়েরা আর দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ায় দোকানীরা। অ্যাডামসদের বাড়ির সামনে নিউ ইয়র্কের নম্বর প্লেট লাগানো কালো মোটর গাড়িটা এসে থামতে না থামতেই গ্রামের সবাই জেনে গেল ব্যাপারটা।

কলেজে পড়া মেয়ে হলেও এখনও একটু গৌরো টাইপের রয়ে গেছে কে অ্যাডামস, সে-ও তার শোবার ঘরের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখছে ব্যাপারটা কি।

পরীক্ষার পড়া বন্ধ করে নিচে নেমে এসে লাঞ্চ খাবার তোড়জোড় করছে, এই সময় চোখে পড়ল একটা গাড়ি আসছে। সেটা যখন ওদেরই বাড়ির সামনে ঘাস-জমির পাশে থামল, একটুও বিস্মিত হলো না কে। লম্বা-চওড়া দুইজন লোক নামল গাড়িটা থেকে, দুইজনেরই বলিষ্ঠ গড়ন, সিনেমার ভিলেনের মত চেহারা। একছুটে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল কে, ওদের আগেই পৌঁছে গেল সদর দরজায়। ওরা নিশ্চয় মাইকেল অথবা তার বাড়ির কারও কাছ থেকে এসেছে বলে অনুমান করছে সে। আনুষ্ঠানিকভাবে আলাপ করিয়ে দেবার আগেই ওরা বাড়ির ভিতর ঢুকে তার মা-বাবার সাথে কথা বলতে শুরু করবে, তা সে চাইছে না। মাইকেলের বন্ধু-বান্ধব সম্পর্কে ও যে লজ্জিত, ব্যাপারটা তা নয়। মা বাবা আসলে নিউ ইংল্যান্ডবাসী সেকেলে ইয়াক্সি, এ-ধরনের লোকজনের সাথে মেয়ের পরিচয় হয় কি করে, সেটা তারা আদৌ বুঝতে চেষ্টা করবেন না।

কলিং বেল বাজতে শুরু করেছে, এই সময় দরজার সামনে পৌঁছল কে। ‘আমি খুলছি,’ চিৎকার করে কথাটা জানাল মাকে। তারপর দরজা খুলল।

কাছ থেকে আরও বিশালদেহী দেখাচ্ছে লোক দু’জনকে। সিনেমার ভিলেনরা যেভাবে বুক পকেটে হাত ঢুকিয়ে পিস্তল বের করে ঠিক সেভাবে ওদের একজন পকেটে হাত ঢোকাতে যাচ্ছে দেখে চমকে উঠল কে, দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে শব্দ করে একটু নিঃশ্বাস বেরিয়ে পড়ল তার। পিস্তল নয়, ছোট্ট একটা চামড়ার কেস বের করল লোকটা, সেটা কে-র মুখের সামনে খুলে ধরল সে। একটা আইডেনটিটি কার্ড। ‘নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের একজন ডিটেকটিভ আমি, জন ফিলিপস,’ ইঙ্গিতে সংঙ্গীকে দেখাল সে, ‘আমার সহকারী, ডিটেকটিভ সিরিয়ানি। আপনিই কি মিস অ্যাডামস?’

উপর-নিচে একবারমাত্র মাথা ঝাঁকাল কে।

‘ভিতরে ঢুকে আপনার সাথে কথা বলতে পারি?’ বলল ফিলিপস। ‘মাইকেল

কর্লিয়নি সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন আছে আমাদের।’

একপাশে সরে এসে ওদেরকে ভিতরে ঢোকান জায়গা করে দিল কে। পথ দেখিয়ে পড়ার ঘরের দিকে যাচ্ছে, ছোট হলঘর থেকে ওদেরকে দেখে ফেললেন বাবা। ‘কি হয়েছে রে, কে?’ জানতে চাইলেন তিনি।

মাথার চুল সব পেকে গেছে, মেদহীন গড়ন, ভদ্রলোকের চেহারায় নিখুঁত অভিজাত্যের ছাপ। এই এলাকার ব্যাপটিস্ট গির্জার একজন পাদ্রী তিনি, ধার্মিকদের মধ্যে তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রচুর খ্যাতি। কে আসলে তার বাবাকে ঠিক মত বুঝে উঠতে পারে না, বাবার কথা ভাবতে বসলে তাঁর ব্যক্তিত্বের গভীরতা সম্পর্কে কেমন যেন ধাঁধা লাগে, তাঁর মধ্যে আশ্চর্য্য একটা উদাস আর রহস্যময় কিছু আছে বলে মনে হয়। কিন্তু একটা ব্যাপারে মনে কোন সন্দেহ নেই ওর, বাবা ওকে যথেষ্ট ভালবাসেন। তবে বাপ হিসেবে মেয়ের দিকে তেমন খেয়াল রাখেন না। পরস্পরের মধ্যে খুব একটা ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা না থাকলেও বাবার উপর আস্থা রাখে সে। তাই কথাটা বলার সময় কোন সঙ্কোচ বোধ করল না, সহজভাবেই বলতে পারল, ‘নিউ ইয়র্ক ডিটেকটিভ ব্রাঙ্কের লোক এরা। আমার পরিচিত একটা ছেলে সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করতে এসেছেন।’

ব্যাপারটাকে স্বাভাবিকভাবেই নিলেন মি. অ্যাডামস, একটুও অবাক হননি। বললেন, ‘আমার পড়ার ঘরে গিয়ে বসতে পারি, নাকি?’

‘আমরা কথা বলার সময় আপনার মেয়ে একা থাকলে ভাল হয়,’ মৃদু গলায় বলল ডিটেকটিভ ফিলিপস।

‘দেখুন,’ অত্যন্ত ভদ্রভাবেই বললেন মি. অ্যাডামস, ‘সেটা বোধহয় কে-র ইচ্ছার ওপরই নির্ভর করছে।’ মেয়ের দিকে তাকালেন তিনি। ‘কি, মা? সাথে আমি থাকলে ভাল হয়, নাকি ওদের সাথে একা একা কথা বলবি? আমি, অথবা তোর মা?’

দ্রুত মাথা নেড়ে বলল কে, ‘একাই বলব।’

ডিটেকটিভ ফিলিপসের দিকে তাকালেন মি. অ্যাডামস। ‘আপনারা আমার পড়ার ঘরে বসতে পারেন,’ মৃদু হেসে বললেন তিনি। তারপর জানতে চাইলেন, ‘আপনারা কি লাঞ্চ খাবার সময় পর্যন্ত থাকবেন?’

না—মাথা নেড়ে জানাল ডিটেকটিভ দু’জন। পড়ার ঘরে ওদেরকে নিয়ে গিয়ে বসাল কে। নিজে সে বাবার চামড়া দিয়ে বাঁধানো প্রকাণ্ড চেয়ারটায় বসল। সোফার কিনারায় একটু আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসেছে ওরা দু’জন।

‘মিস অ্যাডামস,’ শুরু করল ডিটেকটিভ ফিলিপস, ‘মাইকেল কর্লিয়নির সাথে শেষ কবে দেখা হয়েছে আপনার, বা তার কাছ থেকে শেষ কবে খবর পেয়েছেন? গত তিন হপ্তার মধ্যে?’

কে-কে সতর্ক করে দেবার জন্যে এই একটা প্রশ্নই যথেষ্ট। আজ থেকে তিন হপ্তা আগে বোস্টনের একটা খবরের কাগজ পড়ছিল সে, তাতে বিরাট হেডিং দিয়ে একটা খবর ছাপা হয়েছিল। নিউ ইয়র্কের একজন পুলিশ ক্যাপটেন আর একজন ড্রাগ স্মাগলার ডার্সিল সলোযো খুন হয়েছে। রিপোর্টারের মন্তব্য ছিল, এই হত্যাকাণ্ড কর্লিয়নি পরিবারের সাথে অন্যান্য মাফিয়া পরিবারের দলীয় যুদ্ধের

পরিণতি ।

এদিকে-ওদিকে মাথা দোলান কে । ‘গত তিন হপ্তার মধ্যে? না । হাসপাতালে ওর বাবাকে দেখতে যাচ্ছে, সেই আমার সাথে ওর শেষ দেখা । সেটা বোধহয় হপ্তা তিনেকের আগের ঘটনা ।’

‘তা আমরা জানি,’ সহকারী ডিটেকটিভ গম্ভীর, কর্কশ কণ্ঠে বলল । ‘তারপর আবার কবে দেখা হয়েছে?’

‘হয়নি,’ বলল কে ।

ডিটেকটিভ ফিলিপস নরম সুরে বলল, ‘ওর সাথে যোগাযোগ হলে বা ওর কোন খবর পেলে আমাদেরকে যদি জানান, খুব উপকার হয় । মাইকেল কর্নিয়নিকে খুঁজছি আমরা, গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা আদায় করার ব্যাপারে । শুধু কর্তব্যের খাতিরে আপনাকে সাবধান করতে চাই—ওর সাথে কোন রকম যোগাযোগ রাখলে বিপদে জড়িয়ে পড়তে হবে আপনাকে । আর, কোন ব্যাপারে, কোন ভাবে ওকে যদি সাহায্য করেন, জেনেওনে নিজের সর্বনাশই শুধু করা হবে ।’

শিরদাঁড়া খাড়া করে সোজা হয়ে বসল কে, জানতে চাইল, ‘দরকার মনে করলে কেন ওকে সাহায্য করতে পারব না আমি? আমাদের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, ওকে সাহায্য করব না তো করব কাকে?’

জবাব দিল সহকারী ডিটেকটিভ সিরিয়ানি, ‘সে আপনার ইচ্ছা । কিন্তু ওকে সাহায্য করলে খুন করতে সহায়তা করেছেন, এই অভিযোগ আনা হতে পারে আপনার বিরুদ্ধে । আপনার হবু স্বামীকে আমরা কেন খুঁজছি, জানেন? নিউ ইয়র্কের একজন পুলিশ ক্যাপটেনকে খুন করেছে সে । শুধু তাই নয়, একই সাথে খুন করেছে একজন ইনফর্মারকে । ক্যাপটেন সেই ইনফর্মারের সাথে বসে কথা বলছিল, এই সময় ওদেরকে গুলি করা হয় । গুলি যে মাইকেল কর্নিয়ন করেছে তা আমরা ভাল করেই জানি ।’

নিঃশব্দে হাসছে কে । এমন অকৃত্রিম অবিশ্বাসের হাসি, দেখে দু’জন ডিটেকটিভই কেমন যেন দমে গেল । ‘পাগল নাকি?’ বলল কে । ‘এ-ধরনের কাজ মাইক কখনও করতেই পারে না । বাড়ির কোন বিষয় বা লোকদের সাথে ওর তো কোন সম্পর্কই নেই । ওর বোনের বিয়ের দিন আমাকে নিয়ে গিয়েছিল, নিজের চোখেই তো দেখলাম, বাড়ির লোকেরা অনাস্থীয়, পরের মত আচরণ করে ওর সাথে । আপনারা ভাবছেন তাহলে ও লুকিয়ে আছে কেন? এর সোজা কারণ আমি জানি । যা ঘটে গেছে তার সাথে জড়াবার কোন ইচ্ছা নেই ওর । সেজন্যেই চোখে পড়তে চাইছে না ।’ আবার সেই অকৃত্রিম অবিশ্বাসের হাসিটা দেখা গেল কে-র মুখে । ‘মাইকেল ওগা বলে মনে করলে মস্ত ডুল করবেন আপনারা ।...হাসি পাচ্ছে আমার । আপনাদের বা অন্য সবার চেয়ে ওকে ভাল করে চিনি আমি । মাইক যে কি ধরনের ভাল ছেলে তা আপনারা ওকে চেনেন না বলে বুঝতে পারবেন না । খুনের মত জঘন্য কাজ করা তো দূরের কথা, চিন্তা পর্যন্ত করা সম্ভব নয় ওর পক্ষে । আমি যত লোককে চিনি তাদের মধ্যে ও-ই সবচেয়ে বেশি আইন মেনে চলতে অভ্যস্ত । ওকে একটা মিথ্যে কথা প্রর্যস্ত বলতে শুনিনি কখনও ।’

‘কত দিনের পরিচয় আপনাদের?’ মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল ফিলিপস ।

গড ফাদার ৩

‘এক বছরের বেশি।’

কথাটা শুনে ডিটেকটিভ দু’জন মুচকি হাসল দেখে অবাক হলো কে।

‘কয়েকটা কথা আপনাকে জানানো দরকার,’ বলল ফিলিপস। ‘হ্যাঁ, সেরাতে আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওর বাবাকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিল ও। কি মনে করে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, তখন একজন পুলিশ ক্যাপটেনের সাথে তর্ক হয় ওর। ক্যাপটেন ওখানে তাঁর একটা অফিশিয়াল কাজে গিয়েছিলেন। কথা কাটাকাটির মধ্যে মাইকেল তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ফলে বেদম মার খেতে হয় ওকে। কয়েকটা দাঁত তো হারিয়েছেই, চোয়ালটাও ভেঙে গেছে। ওর বন্ধুরা ওকে কর্নিয়নিদের বাড়িতে পৌঁছে দেয়। পরদিন রাত্রে মার খাওয়ার প্রতিশোধ নেবার জন্যে পুলিশ ক্যাপটেনকে গুলি করে ও, ক্যাপটেন সেখানেই মারা যান। খুন করেই গা ঢাকা দিয়েছে মাইকেল, একেবারে মিলিয়ে গেছে বাতাসে। অসংখ্য ইনফর্মার আছে আমাদের, অগুনতি গোয়েন্দা আছে, তারা সবাই খবরাখবর সংগ্রহ করে একবাক্যে জানাচ্ছে, এই হত্যাকাণ্ডের একমাত্র নায়ক মাইকেল কর্নিয়নি। তবে, স্বীকার করছি, আদালত গ্রাহ্য করবে এমন কোন নিশ্চিত প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। যখন গুলি করা হয়, সেখানে একজন ওয়েটার উপস্থিত ছিল কিন্তু মাইকের ছবি দেখে চিনতে পারেনি সে। হয়তো সামনে থেকে দেখলে চিনতে পারবে। সলোয়ার গাড়ির ড্রাইভারও কাছেপিঠে ছিল, কিন্তু সে ব্যাটার মুখ খোলানো যাচ্ছে না। তবে মাইকেল কর্নিয়নি অ্যারেস্ট হয়েছে ওনলেই সে হয়তো মুখ খুলবে। আমাদের ডিপার্টমেন্ট, এফ-বি-আই, আরও নানা প্রতিষ্ঠানের সব লোক গুরুত্বোজ্ঞা করছে ওকে। এখন পর্যন্ত ওর কোন হদিসই করতে পারিনি আমরা, তাই ভাবলাম আপনি কিছু জানালেও জানাতে পারেন।’

‘আপনাদের একটা কথাও বিশ্বাস করি না,’ নিস্তেজ গলায় বলল কে। মনটা খারাপ হয়ে গেছে তার। বুঝতে পারছে, মাইকের চোয়াল ভাঙার কথাটা মিথ্যে হতে পারে না। কিন্তু তাই বলে...খুন? কখনও না! অসম্ভব!

‘মাইকেল কর্নিয়নি যদি আপনার সাথে যোগাযোগ করে,’ জানতে চাইল ফিলিপস, ‘আপনি আমাদেরকে জানাবেন কি?’

দ্রুত এবং একরোখা ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কে—জানাবে না।

‘আপনারা একই কামরায় থাকতেন,’ রুচ, কর্কশ গলায় বলে উঠল সহকারী ডিটেকটিভ সিরিয়ানি, ‘সে-খবর জানা আছে আমাদের। কাগজ-পত্র, সাক্ষী ইত্যাদি সব আছে হোটেলে। কথাটা যদি খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিই, আপনার মা-বাবার কেমন লাগবে? ভদ্র পরিবারের মেয়ে আপনি, একজন গুণ্ডার সাথে রাত কাটিয়েছেন, শুনে কারোরই ভাল ধারণা হবে না আপনার সম্পর্কে। নিজের সম্মান যদি বাঁচাতে চান, সব কথা আমাদেরকে খুলে বলুন, তা না হলে এফুগি আপনার বুড়ো বাপকে ডেকে সব কথা বলে দেব।’

অবাক বিশ্বয়ে তাকিয়ে আছে কে। এ-ধরনের ভূমিকা শুনে হবে তা সৈবীভাবেও কল্পনা করেনি। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে। দরজার দিকে এগোচ্ছে।

এক ঝটকায় খুলে ফেলল দরজাটা কে। দেখল, বৈঠকখানার জানালার সামনে দাঁড়িয়ে পাইপ টানছেন বাবা। ‘বাবা, এখানে একবার আসবে তুমি?’

ঘাড় ফিরিয়ে মেয়ের দিকে তাকালেন মি. অ্যাডামস, মিষ্টি করে হাসলেন, তারপর স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হেঁটে পড়ার ঘরে চলে এলেন। দরজার চৌকাঠ উপক্কেই একটা হাত দিয়ে মেয়ের পিঠটা জড়িয়ে ধরলেন তিনি, তাকিয়ে আছেন ডিটেকটিভদের দিকে। বললেন, 'হ্যাঁ, বলুন।'

কে-র আচরণ দেখে দু'জন ডিটেকটিভই থ' হয়ে গেছে। ওরা কেউ কথাই বলতে পারছে না।

'দিন!' সিরিয়ানির দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঠাণ্ডা ঝাঁঝের সাথে বলল কে। 'সব কথা বলে দিন!'

চেহারা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে সিরিয়ানির। বলল, 'মি. অ্যাডামস, কথাগুলো আমি আপনার মেয়ের ভালর জন্যেই বলছি। আপনার মেয়ে একটা গুণ্ডার সাথে মেলামেশা করেন। আমাদের বিশ্বাস, এই লোকটা একজন পুলিশ অফিসারকে খুন করেছে—আমি মিস কে-কে বলছি লোকটাকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে তিনি যদি আমাদের সাথে সহযোগিতা না করেন, তাহলে হয়তো বিপদে জড়িয়ে পড়তে পারেন। কিন্তু মুশকিল হলো, ব্যাপারটার গুরুত্ব উনি কিছুতেই বুঝতে চাইছেন না। আপনি কি ওকে একটু বোঝাবার চেষ্টা করে দেখবেন?'

'আপনাদের বক্তব্য আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না,' নরম গলায় বললেন মি. অ্যাডামস।

চিবুক উঁচু করে সিরিয়ানি বলল, 'আপনার মেয়ে আর ওই গুণ্ডা মাইকেল আজ এক বছর ধরে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও খোলামেলাভাবে মেলামেশা করছেন। আপনি চাইলে আমরা প্রমাণ দেখাতে পারব, স্বামী-স্ত্রী হিসেবে হোটেল থেকেছে ওরা। আবার বলছি আমি, মাইকেল কর্নিয়ানিকে খোঁজা হচ্ছে একজন পুলিশ অফিসারকে খুনের সন্দেহে। খোঁজার ব্যাপারে আপনার মেয়ে আমাদেরকে সাহায্য করতে রাজী হচ্ছেন না। এই হলো ব্যাপার। আপনি অবিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু যা বলছি তা আমরা প্রমাণ করতে পারি।'

'আপনার সব কথা আমি অবিশ্বাস করছি না,' মৃদু গলায় মি. অ্যাডামস বললেন, 'আমার মেয়ে যা করেছে তার জন্য গুরুতর বিপদ হতে পারে, আপনার এই কথাটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।'

অবাক হয়ে বাবার দিকে চেয়ে আছে কে। সমস্ত ব্যাপারটা বাবা এত হালকা ভাবে নিতে পারছেন দেখে অবাক হয়ে গেছে সে।

'যাই হোক, একটা বিষয়ে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন,' দৃঢ়কণ্ঠে মি. অ্যাডামস বললেন, 'ছোকরা যদি এখানে তার চেহারা দেখায় সাথে সাথে এখানকার কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেব আমি। আমার মেয়েও তাই করবে। কিছু যদি মনে না করেন, এখন আমাদের মাফ করতে হবে, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

প্রচুর সৌজন্য দেখিয়ে ওদেরকে বিদায় করলেন তিনি। তারপর আস্তে কিন্তু দৃঢ়তার সাথে বন্ধ করে দিলেন দরজাটা। মেয়ের হাত ধরে বাড়িটার একেবারে পিছনে রান্নাঘরের দিকে তাকে নিয়ে চললেন। 'চল, মা, খাবার নিয়ে বসে আছে তোর মা।'

রান্নাঘরে পৌঁছুবার আগেই নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করেছে কে। কারণ আর

কিছু নয়, দুর্ভাবনা থেকে নিষ্কৃতি, বাবার এমন নিঃশর্ত ভালবাসা।

রান্নাঘরে ঢুকল ওরা। মা যেন ওর কাগ্না দেখতেই পেলেন না, তাতে কে বুঝতে পারল বাবা নিশ্চয় তাঁকে ওই দুই গোয়েন্দার কথা আগেই বলে রেখেছেন। নিজের জায়গায় বসে পড়ল সে। কোন কথা না বলে খাবার পরিবেশন করছেন মা। খেতে শুরু করার আগে মাথা নিচু করে একটু প্রার্থনা করলেন বাবা।

মিসেস অ্যাডামস একটু বেঁটে। মোটাসোটা মানুষ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড় পরেন। পরিপাটি করে চুল আঁচড়ান। মাকে কখনও বিস্মস্ত বেশবাসে দেখেনি কে। কিন্তু মেয়ের সাথে মায়ের ব্যবহারে সব সময়ই একটু কৌতূহলের অভাব দেখা যায়, কেমন যেন একটু দূরত্ব বজায় রাখেন। এখনও তাই করছেন। 'দেখ, কে, এত নাটক করিস না। কিসের এত ভাবনা, শুনি? ছেলেটা তো ডার্টমাথ থেকে পাস করেছে, এ ধরনের কোন নোংরামির মধ্যে ও যেতেই পারে না। অসম্ভব।'

চমকে উঠে মুখ তুলে তাকাল কে। 'তুমি কি করে জানলে?'

নির্বিকারভাবে মা বললেন, 'এখনও ছেলেমানুষ যারা তারা একটা ধোঁয়াটে ভাব সৃষ্টি করে নিজেদের ভারি চালাক মনে করে। মাইকেলের কথা আমরা অনেক দিন থেকেই জানি, কিন্তু তুই কিছু না বললে আমরা কথাটা তুলি কি করে?'

কে জানতে চাইল, 'কিন্তু জানলে কি করে?' বাবার দিকে এখনও তাকাতে পারছে না সে। বাবা যে জেনে গেছেন মাইকের সঙ্গে রাত কাটিয়েছে ও। তাই কথাটার উত্তর দেবার সময়, বাবার মুখের হাসিটা দেখতে পেল না সে।

'বুঝতেই পারছ, ওর চিঠি খুলেছিলাম আমরা।'

স্তম্ভিত হয়ে গেল কে, তারপর রেগেমেগে ঝট করে এবার বাবার দিকে তাকাল সে। ভাবছে, বাবা যা করেছেন সে তো ওর নিজের অপরাধের চাইতেও জঘন্য। কিন্তু কথাটা তার বিশ্বাস হচ্ছে না। 'না, বাবা! তুমি চিঠি খোলোনি, খুলতে পারো না।'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন বাবা। 'প্রথমে অনেক ভাবলাম, কোনটা বেশি মন্দ কাজ—তোমার চিঠি খোলা, নাকি আমাদের একমাত্র সন্তান কোথায় কোন বিপদে পড়ছে সে-বিষয়ে অজ্ঞ থাকা। উত্তরটা সহজ এবং সৎ।'

সেদ্ধ মূর্খগিতে দুটো কামড় বসিয়ে মা বললেন, 'বয়সের তুলনায় তুই খুব কাঁচা। আমাদের জানা দরকার, অথচ ওর কথা নিজে থেকে কিছুতেই তুই বলবি না।'

মাইকেল তার চিঠিতে কখনও ভালবাসার কথা লেখেনি ভেবে কৃতজ্ঞ বোধ করল কে। ওর নিজের লেখা কোন চিঠি মা-বাবা দেখেননি ভেবে একটা হাঁফও ছাড়ল। 'ওর কথা, ওদের বাড়ির কথা শুনে তোমরা আঁতকে উঠবে ভেবে ভয়ে বলিনি...'

প্রফুল্ল কণ্ঠে বললেন মি. অ্যাডামস, 'আঁতকেই উঠেছিলাম। ভাল কথা, তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি তো মাইকেল?'

মাথা নেড়ে কে বলল, 'ও কোন অপরাধ করতে পারে না।'

লক্ষ করল কে, মা-বাবা দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

নরম গলায় মি. অ্যাডামস বললেন, 'যদি অপরাধ করে না থাকে, অথচ কোন খোঁজ নেই, তার মানে হয়তো ওর আর কিছু হয়েছে।'

কথাটা প্রথমে বুঝতে পারল না কে। তারপর টেবিল থেকে উঠে দু'হাতে মুখ ঢেকে ছুটতে শুরু করল। নিজের ঘরে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা। বিছানায় আছড়ে পড়ে ফুপিয়ে কাঁদছে।

তিনদিন পর। লং বীচে কর্লিয়নিদের উঠানের সামনে একটা ট্যাক্সি এসে থামল। সেটা থেকে নামল কে অ্যাডামস। ফোন করে এসেছে, ওরা জানে আসছে ও। টম হেগেনকে দরজার কাছে এগিয়ে আসতে দেখে একটু নিরাশ হলো কে। ও জানে, টম কিছু প্রকাশ করবে না।

বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে ওর হাতে এক গ্লাস শ্যাম্পেন দিল টম। কয়েকজন লোক এ-ঘর ও-ঘর করছে, কিন্তু তাদের মধ্যে সনি নেই।

'মাইক কোথায়, জানেন?' সরাসরি প্রশ্ন করল কে। 'ওর সাথে কোথায় যোগাযোগ করতে পারি জানাতে পারেন আমাকে?'

'ও ভাল আছে, এটুকু জানি,' মোলায়েম সুরে হেগেন বলল, 'তবে ঠিক এই মুহূর্তে কোথায় আছে তা বলতে পারি না। ক্যাপটেনের গুলি খাওয়ার কথা শুনে ওর ভয় হলো, ব্যাপারটার সাথে ওকে জড়িয়ে ফেলা হতে পারে। তাই ঠিক করল, নিখোঁজ হয়ে যাবে। মাস কয়েক পর যোগাযোগ করবে, এর বেশি কিছু বলে যায়নি আমাকে।'

কথাগুলো সত্যি নয়, এবং বলাও হলো এমন ভাবে যেন কে সেটা ধরতে পারে।

'ওই ক্যাপটেন কি সত্যি ওর চোয়াল ভেঙে দিয়েছিল?' জানতে চাইল কে।

'দুঃখের বিষয়,' বলল টম, 'কথাটা সত্যি। তবে মাইক কোন দিনই প্রতিহিংসাপরায়ণ নয়। পরের ঘটনাটার সাথে ওর কোন সম্পর্ক নেই, এটুকু নিশ্চয়তা আমি দিতে পারি।'

ব্যাগ খুলে একটা চিঠি বের করে কে বলল, 'ও যদি আপনাদের সাথে যোগাযোগ করে, এই চিঠিটা ওকে দেবেন।'

এদিকে-ওদিকে মাথা নাড়ল হেগেন। 'পরে আপনি যদি আদালতে বলেন আমি চিঠি নিয়েছিলাম, তার মানে করা হবে, মাইক কোথায় আছে তা আমি জানতাম। আরেকটু অপেক্ষা করুন না কেন? মাইকই আপনার সাথে যোগাযোগ করবে।'

পানীয়টুকু শেষ করে, বাড়ি যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল কে। হেগেন তাকে হল অবধি নিয়ে এল। কিন্তু দরজা খুলতেই, বাইরে থেকে একজন মহিলা এসে ঢুকলেন। মোটা, বেঁটে, পরনে কালো পোশাক। চিনতে পারল কে, মাইকেরের মা। 'কেমন আছেন, মিসেস কর্লিয়নি?' হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল সে।

'ও হো, তুমি তো মাইকের বান্ধবী,' কথায় কড়া ইতালীয় টান, কে প্রায় বুঝতেই পারছে না কি বলছেন। মিষ্টি, ছোট্ট করে হাসলেন, তারপর জানতে চাইলেন, 'কিছু খাবে?'

কে বলল, 'না।' খাবার ইচ্ছা নেই ওর।

কিন্তু মিসেস কর্লিয়নি রেগেমেগে টম হেগেনের দিকে ফিরে তাকে ইতালীয় ভাষায় খানিকটা বকাবকি করলেন, বললেন, 'বেচারি মেয়েটাকে কিছু খেতে পর্যন্ত দাওনি, এ কেমন আক্কেল তোমার!' কে-র হাত ধরে তাকে রান্নাঘরে নিয়ে এলেন তিনি।

'একটু কফি আর তার সাথে কিছু খাও, তারপর কেউ তোমাকে গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দেবে। তোমার মত একটা ভাল মেয়ে ট্রেনে করে একা ফিরবে, তা আমার পছন্দ নয়।' কে-কে চেয়ারে বসিয়ে ব্যস্তভাবে রান্নাঘরের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। নিজের টুপি আর কোট খুলে একটা চেয়ারের ওপর ঝুলিয়ে রাখলেন। স্টোভের ওপর কফি ফুটছে।

'মাইকের খোঁজ নিতে এসেছিলাম,' ভয়ে ভয়ে কে বলল, 'ওর কোন খবর পাইনি। মি. হেগেন বলছেন, ও কোথায় আছে কেউ জানে না। কিছু দিন পর নাকি নিজেই ফিরে আসবে।'

'এর বেশি ওকে কিছু বলা যায় না, মা,' হেগেন তাড়াতাড়ি বলল।

মিসেস কর্লিয়নি তাম্বিল্যপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে টমকে প্রায় ভষ্ম করে দিয়ে বললেন, 'কি করতে হবে না হবে, সে কি তুমি আমাকে শিখাবি? আমার স্বামী পর্যন্ত সে-সুযোগ পায় না। যীশু তার ওপর দয়া করুন।' বৃকের ওপর ক্রুশ আঁকলেন তিনি।

'মি. কর্লিয়নি এখন কেমন আছেন?' জানতে চাইল কে।

'খুব ভাল আছেন,' মিসেস কর্লিয়নি বললেন। 'বুড়ো হয়েছেন তো, বুদ্ধিও সবার লোপ পেয়েছে। নইলে অমন ঘটনা ঘটতে দেন কখনও!' হতাশ ভঙ্গিতে নিজের মাথায় টোকা দিলেন তিনি। তারপর কফি খাওয়া শেষ করে নিজের মেটে রঙের হাত দিয়ে কে-র একটা হাত ধরলেন, ধীরে ধীরে বললেন, 'মাইক তোমাকে চিঠি লিখবে না। তুমি তার কাছ থেকে কোন খবর আশা কোরো না। দু-তিন বছর তাকে লুকিয়ে থাকতে হবে। হয়তো তারও বেশি। তুমি ফিরে যাও, তারপর একটা ভাল ছেলে দেখে বিয়ে করো, মা।'

ব্যাগ থেকে চিঠিটা বের করে কে বলল, 'এটা তাকে পাঠিয়ে দিতে পারবেন?'

বুড়ি ভদ্রমহিলা চিঠিটা নিয়ে কে-র গালে একটা আনতো চাপড় মেরে বললেন, 'নিশ্চয় পারব।'

হেগেন আপত্তি করতে যাচ্ছে, কিন্তু ভদ্রমহিলা ইতালীয় ভাষায় চ্যাচাতে শুরু করলেন। তারপর কে-কে দোরগোড়া অবধি পৌঁছে দিয়ে চট করে গালে একটা চুমো খেয়ে বললেন, 'মাইকের কথা ভুলে যেও। সে আর তোমার উপযুক্ত নয়।'

বাইরে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে গাড়ি। সামনের সীটে বসে আছে দু'জন লোক। কোন কথা না বলে ওকে একেবারে নিউ ইয়র্কে পৌঁছে দিয়ে গেল তারা। কে-ও কোন কথা বলল না। সে এখন একটা কথা মনের মধ্যে বসাবার চেষ্টা করছে: তার ভালবাসার মানুষটি একজন নৃশংস হত্যাকারী। যার মুখ থেকে এ-কথা বেরিয়েছে তার কথা অবিশ্বাস করা যায় না। কারণ, সে হলো মাইকের আপন মা।

দুই

গোটা দুনিয়ার উপর রেগে আগুন হয়ে আছে কার্লো রিটসি। কর্লিয়নি পরিবারে বিয়ে করলে কি হবে, ম্যানহ্যাটনের আপার ইস্ট সাইডের একটা ব্যবসা গছিয়ে দিয়ে দূরে একপাশে সরিয়ে রাখা হয়েছে ওকে। মনে আশা ছিল, লং বীচের উঠানে একটা বাড়ি দেয়া হবে ওকে। জানে, ইচ্ছা করলেই বাড়িগুলো থেকে তাঁর অনুচরদের পরিবারগুলোকে সরিয়ে দিতে পারেন ডন। একটামাত্র বাড়ি খালি করে দিলেই তো জায়গা পেয়ে যায় সে, সেই সাথে কর্লিয়নি পরিবারের সমস্ত লাভজনক ব্যাপারের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা যায়। কিন্তু ডন তা করেননি।

অবজ্ঞা আর ঘৃণার সাথে তাই ভাবছে কার্লো, ভারি তো ছাই মহামান্য ডন! নিধিরাম সর্দার। ফালতু একটা খুদে গুণ্ডা। তা না হলে রাস্তার মাঝখানে গুলি খেয়ে মুখ খুবড়ে পড়ে? বুড়ো শালা মরল না, সেটাই দুঃখের বিষয়। এক সময় বন্ধু ছিল সনি, এখন যদি পরিবারের মাথা হয়, হয়তো কিছুটা সুযোগ-সুবিধে পাবে সে। একটু সুযোগ পেলেই হয়, কর্লিয়নি পরিবারের গহীন গভীরে নাক ডুবিয়ে দেবে সে।

কফি ঢালছে কনি, তার দিকে তাকাল কার্লো। ইস্, কি ছিরির বউই না জুটেছে তার কপালে! বিয়ে হয়েছে এই তো পাঁচ মাস, এবই মধ্যে মেদ জমিয়ে কেমন হস্তিনী হয়ে উঠেছে দেখো! ইস্টসাইডের মাগীগুলো এই রকম বিপ্রী হয়, মনে পড়ে গেল তার।

হাত বাড়িয়ে কনির নরম চর্বিসর্বস্ব নিতম্ব একটু টিপে দিল কার্লো। মুখ তুলে স্বামীর দিকে তাকিয়ে হাসল কনি। তাম্বিল্যের সুরে বলল কার্লো, 'একটা গুয়োরের চেয়েও "হ্যাম" তোমার গায়ে বেশি।' কনির মুখে আহত ভাব আর চোখ ছল ছল করেছে দেখে কার্লোর খুশি লাগছে। হতে পারে মহামান্য ডনের মেয়ে, কিন্তু ওর স্ত্রী তো বটে। যেভাবে ইচ্ছা ওড়াতে পারে সে কনির টাকা, যেমন খুশি আচরণ করতে পারে। কর্লিয়নিদের একজন অন্তত তার পাপোশ, কথাটা ভেবেও সুখ। নিজেকে খুব প্রতাপশালী বলেও মনে হচ্ছে তার।

বিবাহিত জীবনটা একেবারে জঘন্যভাবে শুরু করেছে কার্লো। শুরুতেই বিয়েতে উপহার পাওয়া টাকার ব্যাগটা কনির কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। কনি সেটা হাতছাড়া করতে চায়নি বলে তাকে ঘৃষি পর্যন্ত মেরেছে সে। চোখের নিচে কালসিটে দাগ নিয়ে কান্নাকাটি করেছে কনি।

টাকা তো নিয়েইছে, কি করেছে সেগুলো দিয়ে তাও সে জানায়নি কাউকে। ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়লে সত্যি সত্যি একটা ঋণগোলের সৃষ্টি হবে। এখনও একটু একটু বিবেকের দংশন অনুভব করে সে। ইস্, প্রায় পনেরো হাজার ডলার রেস আর থিয়েটারের মেয়েমানুষদের পিছনে স্নেফ উড়ে গেল।

টের পাচ্ছে কার্লো, ওর চওড়া পিঠের দিকে তাকিয়ে আছে কনি। হাতটাকে লম্বা করে দিয়ে টেবিলের ওদিক থেকে এক প্লেট মিষ্টি 'বান' তুলে নৈবার সময় পেশীগুলোকে তাই একটু ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে খেলিয়ে নিল সে। এই মাত্র হ্যাম আর

ডিম গিলেছে, তবে লম্বা-চওড়া মানুষ কিনা, সকালের খাবার একটু বেশিই দরকার হয়। স্ত্রী ওর দিকে তাকিয়ে আছে, সেজন্যে রীতিমত গর্ব অনুভব করছে সে। ওদের চোদ্দ পুরুষ যেমন দেখে এসেছে, সেরকম তেল চকচকে কালোভূত স্বামী তো আর নয় সে। চুল তার সোনালী, ক্রুকাট। সোনালী লোমে ঢাকা বাহু। মস্ত দুই কাঁধ। কোমরটা সরু ঝাড়ের শক্তি নিয়ে যে-সব গুণ্ডারা ওদের হয়ে কাজ করে তাদের চেয়ে অনেক, অনেক বেশি জোর তার গায়ে। ক্রেমেঞ্জা, টেসিও, রকো ল্যাম্পনি—এদেরকে সে থোড়াই কেয়ার করে। আর পলি গাটো নামে ওই ছোকরা...তাকে তো কে যেন খতমই করে দিয়েছে কেন, কে মারল তাকে? এর ভিতরের আসল ব্যাপারটা কি... কে জানে! কেন যেন, এর পরপরই সনির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে তার। হাতাহাতি মারামারিতে সনির সাথে টিকে যাবে সে, তবে সনি তার চেয়ে একটু লম্বা, একটু বেশি ভারি। সনি সম্পর্কে যে কুখ্যাতিটা রয়েছে সেটাকেই আসলে ভয় করে সে। সাম্প্রতিক রাগ ওর, কিন্তু রাগী হোক আর যাই হোক, ওকে তো সব সময় হাসিখুশি মুখে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে বেড়াতেই দেখে সে। অন্তত তার সাথে হেসে ছাড়া কথা বলে না। নাহ্, সনিকে ভয় নেই। ও তো বন্ধুই তার। এখন শুধু বুড়ো শালা মরলেই হয় সনির যুগ শুরু হলেই কপাল খুলে যাবে তার।

প্রচুর সময় নিয়ে, ধীরেসুস্থে চুমুক দিয়ে কফিটুকু শেষ করছে সে। এই ফ্ল্যাটে থাকতে হচ্ছে তাকে, কথাটা মনে পড়লেই রাগে আর ক্ষোভে মাথায় রক্ত চড়ে যায় তার। পশ্চিমে বিশাল আকারের বাড়িতে থেকে মানুষ হয়েছে সে, সেগুলোর তুলনায় এটা একটা কবুতরের খোপ ছাড়া কিছু নয়। জায়গাটাও শহরের উল্টোদিকে, দুপুরবেলার বাজির কাজ শুরু করার জন্যে এখন তাকে লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে। আজ আবার রোববার, হপ্তার অন্যান্য দিনের চেয়ে কাজের চাপ অনেক বেশি আজ। বেসবল তো একদিকে চলছেই, ওদিকে বাস্কেটবলের মরশুম এখনও শেষ হয়নি, তারপর রাতের রেস খেলাও শুরু হলো বলে। হঠাৎ খেয়াল করল কার্লো, ওর পিছন দিকে ঘুরঘুর করছে কনি। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল সে। সাজগোজ করছে। সেই শহরে ঢংয়ে, রঙ মেখে ভূত সাজছে আর কি, মনে মনে চটে উঠে ভাবল। নিউ ইয়র্কের এই চকমকে ফ্যাশন একদম পছন্দ করে না সে। গাউনটা পরেছে কনি রেশমের, সেটায় আবার ফুলের নকশা রয়েছে বেল্ট দিয়ে বেঁধে নিয়েছে আটো করে। জমকালো কার্ফ কাজ করা, চকচকে পাথর বসানো ব্রেসলেট, কানের দুল, শার্টের আস্তিনে কত রকমের কুঁচি আর ভাঁজ। তাকিয়ে থাকতে থাকতে কার্লোর মনে হচ্ছে, বিশ বছর বেড়ে গেছে ওর বউয়ের বয়স।

‘কোন চুলোয় যাওয়া হচ্ছে শুনি?’ বেসুরো গলায় জানতে চাইল সে।

‘লং বীচে,’ ম্লান মুখে বলল কনি। ‘বাবাকে দেখতে যাচ্ছি। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছেন না এখনও, কেউ দেখতে গেলে খুশি হন।’

হঠাৎ কৌতূহল বোধ করল কার্লো। অকৃত্রিম আগ্রহের সাথে জানতে চাইল এবার, ‘খেল তাহলে সনিই চালিয়ে যাচ্ছে?’

ভাবলেশহীন দেখাচ্ছে কনিকে। ‘কিসের খেল?’

হঠাৎ মাথায় রক্ত চড়ে গেল কার্লোর। ‘আই, ছেনাল মাগী, তোর বাপ-ভাই কি খেল চালায় জানিস না তুই? আমার সাথে ন্যাকামি করবি তো! অ্যায়াস মার মারব, পেটের ছেলে বেরিয়ে আসবে তোর।’ স্বামীর অগ্নিমূর্তি দেখে ঘাবড়ে গেছে কনি। সেটা লক্ষ করে রাগ আরও বেড়ে গেল কার্লোর। লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল সে, চটাস করে চড় মারল কনির মুখে। নাকের পাশে পাঁচ আঙুলের দাগ ফুটে উঠল। গুণে গুণে আরও তিনটে চড় মারল কার্লো। কনির উপরের ঠোট ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে, বেচপভাবে ফুলে উঠেছে নিচের ঠোট। দেখতে পেয়ে নিজেকে সামলে নিল কার্লো। একটু ভয় ভয় লাগছে। মুখে দাগ ফুটে উঠবে তা সে ভাবেনি, চড়গুলো জোরে মারা হয়ে গেছে।

স্বামী থামতেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে ছুটেতে শুরু করল কনি। শোবার ঘরে ঢুকে দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজাটা। তালায় চাবি ঘোরাচ্ছে সে, শব্দটা কানে এল কার্লোর। আপনমনে একটু হাসল সে। কনি মনে করেছে আরও মার খেতে হবে তাকে, ‘কথাটা ভেবে নিজেকে খুব কঠোর আর জাঁদরেল মনে হচ্ছে কার্লোর। আরাম করে বসল চেয়ারে। কফির প্লেয়ালাটা তুলে নিয়ে আয়েশের সাথে চুমুক দিচ্ছে তাতে।

একটা সিগারেট শেষ করে উঠে দাঁড়াল কার্লো। বেকুব্বার সময় হয়েছে, কাপড় পরে তৈরি হতে হয় এবার। এগিয়ে গিয়ে দরজার গায়ে টোকা মারল। কিন্তু দরজা খুলছে না কনি, সাড়াও দিচ্ছে না।

‘আই মাগী, দরজা খুলবি তো খোল, তা না হলে লাখি মেরে ভাঙব।’

সাড়া নেই কনির।

‘এই শেষবার বলছি। খোল। কাপড় বদলাতে হবে আমাকে।’ প্রচণ্ড রাগে চৈচাচ্ছে কার্লো। কনির পায়ের শব্দ পাচ্ছে সে। তালায় চাবি ঘুরছে।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল কার্লো। কনি ওর দিকে পিছন ফিরে রয়েছে। ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে আবার বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ল ও, দেয়ালের দিকে মুখ করে।

সময় কম, দ্রুত পোশাক পাল্টাচ্ছে কার্লো। শুধু স্নেমিজ গায়ে শুয়ে রয়েছে কনি, এতক্ষণে লক্ষ করল ব্যাপারটা। তবে কি মাগী বাপকে দেখতে যাচ্ছে না? ভাবছে সে। গেলে ভালই হয়, নতুন কোন খবর হয়তো পাওয়া যাবে ফিরে এলে।

‘কি হলো?’ রাগ নয়, এখন ঠাট্টার সুরে, প্রায় আদর করার ঢংয়ে কথা বলছে কার্লো। ‘নাহ, আমার মত পুরুষসিংহের বউ হবার উপযুক্ত নও তুমি। দু’একটা চড়-চাপড় খেয়েই যদি তোমার দম বেরিয়ে যায়, চলে কি করে?’ মনে মনে ভাবছে, এক নম্বরের হারামী মাগী, দুনিয়ার কুঁড়ে।

‘যাব না আমি,’ ফুঁপিয়ে উঠে বলল কনি, শব্দগুলো কেমন ভোঁতা আর জড়ানো লাগল কার্লোর কানে। আবার তার মেজাজ বিগড়ে যেতে বসেছে। ঝট করে একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে, কনির কাঁধ খামচে ধরে টান মারল নিজের দিকে। মুখ ঘোরাল কনি। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দমে গেল কার্লো। বুঝতে পারছে, কেন যেতে চাইছে না কনি। নিজেও ভাবছে, না গেলেই ভাল হয়। সত্যি খুব জোরে মারা হয়ে গেছে। ঠোটের ক্ষতগুলো এখন আরও কুৎসিত ভাবে ফুলে উঠেছে, মুখের বাঁ দিকে পাঁচ আঙুলের দাগগুলোও কদর্য দেখাচ্ছে। ‘ঠিক আছে।

যেতে হবে না তোমাকে,' বলল সে। 'আজ রোববার, ফিরতে দেরি হবে আমার।'

ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এল কার্লো। পার্কিং এরিয়ায় গাড়ি রেখে যায়নি, পুলিশ তাই জরিমানার টিকেট লাগিয়ে রেখে গেছে। আরও গোছাখানেক টিকেটের সাথে গ্রাভ কমপার্টমেন্টে রেখে দিল সেটাও। মেজাজের অবস্থা ভালই এখন। বউকে ধরে পিটুনি দিলেই মনটা খুশি হয়ে ওঠে তার। থাকে বলে জামাই আদর, জামাই হওয়া সত্ত্বেও কর্নিয়নিদের কাছ থেকে সেটা পাচ্ছে না সে, সেজন্যে রাগ আর ক্ষোভ জমা হয়ে থাকে তার মনে—বউকে মারধোর করলে মনের খেদ খানিকটা কমে যায়, কিছুটা ঝাল মেটে।

প্রথমবার মারধোর করে একটু দৃষ্টিভ্রান্ত পড়ে গিয়েছিল কার্লো। কারণ চোখের কালসিতে দেখিয়ে নালিশ জানাবার জন্যে সোজা লং বীচে, মা-বাবার কাছে ছুটে গিয়েছিল কনি। সত্যি ভয় সৈধিয়ে গিয়েছিল মনে। কিন্তু ঘটল না কিছুই, বরং একেবারে লক্ষ্মী, সুবোধ বালিকা হয়ে ফিরে এল কনি। যেন ওর মত স্বামী-অন্ত-প্রাণ, কর্তব্যপরায়াণা ইতালীয় বউ আর হয় না। এই ঘটনাটার পরে, বেশ কয়েক হপ্তা কার্লোও আদর্শ, সুবোধ স্বামীর অভিনয় চালিয়ে গেছে। সেবা করল বউয়ের, খুব যত্ন নিল, কত রকম বিচিত্র ভঙ্গিতে জানাল কনিকে সে ভালবাসে—এমন কি দিনে দু'বার করে, সকালে একবার বিকেলে আরেকবার, বউকে নিয়ে গুলো। তার মত তো আর চালাক নয় কনি, এত খাতির যত্নের আসল উদ্দেশ্যটা টের পায়নি। শেষ পর্যন্ত নালিশ জানাতে গিয়ে বাপের বাড়িতে কি কি ঘটেছে, সবই সে বলে ফেলল। স্বামীর আশ্চর্য পরিবর্তন দেখে তার ধারণা হয়েছিল, যা করার করেছে, আর কখনও গায়ে হাত তুলবে না কার্লো।

নালিশ জানাতে গিয়ে মা-বাপের কাছ থেকে এতটুকু সহানুভূতি পায়নি কনি। সব কথা শুনে মা একটু বিচলিত বোধ করেছেন বটে, কার্লোকে ডেকে পাঠিয়ে একটু বোঝাবার জন্যে অনুরোধ করেছেন স্বামীকে। কিন্তু সে-অনুরোধ রক্ষা করতে রাজী হননি ডন।

বলেছেন, 'হ্যাঁ, তুমি আমার মেয়ে, কিন্তু এখন তো স্বামীর হেফাজতে রয়েছ। তোমার ভালমন্দ সে বুঝবে। ইটালীর রাজার কথাই ধরো না, তিনি পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর নিজেদের ব্যাপারে নাক গলাতে সাহস পাননি। বাড়িতে ফিরে যাও, মা, ভাল ব্যবহার করো স্বামীর সাথে। ভাল স্ত্রীর গায়ে কোন স্বামী হাত ছোলে না, তুমি ভাল হয়ে চললে কার্লোও তোমার গায়ে হাত তুলবে না আর।'

রেগে গেছে কনি, বাপকে বলেছে, 'তুমি কখনও মার গায়ে হাত তুলেছ?' ছেলেমেয়েদের মধ্যে কনিকেই বেশি আদর করেন ডন, সেজন্যেই এতটা বেয়াদপি করার সাহস পেল সে।

উত্তরে তিনি বললেন, 'তোমার মা কখনও আমার কথার অবাধ্য হয়নি।'

স্বামীর কথায় সায় দিয়ে, একটু গর্বিত ভঙ্গিতে মাকেও মাথা দুলিয়ে হাসতে দেখল কনি।

বিয়ের উপহার পাওয়া টাকাগুলো কেড়ে নেবার সময় কার্লো কি রকম মারধোর করেছে তারও বর্ণনা দিল কনি। বলল, টাকাগুলো নিয়ে কি করেছে না করেছে তা পর্যন্ত বলছে না কার্লো।

মৃদু কাঁধ ঝাঁকিয়ে ডন বললেন, 'তোমার মত বেয়াড়া স্ত্রী হলে সব স্বামী যা করে কার্লোও তাই করেছে। আমি হলেও তাই করতাম।'

মা-বাবার হাবভাব দেখে বোকা মনে গেছে কনি, মনে বেশ একটু ভয় নিয়েই ফিরে এসেছে বাড়িতে। মা-বাবার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি আদর পেয়ে মানুষ হয়েছে সে, বিয়ের পর পরই হঠাৎ তাদের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, এর কোন কারণই খুঁজে পায়নি কনি।

ভাবভঙ্গিতে যতটা দেখিয়েছেন, ততটা সহানুভূতিহীন নন ডন কর্লিয়নি। কনির অভিযোগ শোনার পরই তিনি খোঁজ খবর নিতে শুরু করেন। বিয়ের উপহার পাওয়া কনির টাকাগুলো নিয়ে কি করেছে কার্লো সে খবর জানতে পেরেছেন তিনি। চিন্তা-ভাবনা করে কিছু লোক নিযুক্ত করলেন, যারা কার্লোর বুক মেকারের ব্যবসার উপর নজর রাখবে। কার্লো কিভাবে চলাফেরা করছে, ব্যবসাটাকে কিভাবে চালাচ্ছে এইসব ব্যাপারে যাবতীয় তথ্য তারা হেগেনকে জানিয়ে দেয়। গোটা ব্যাপারটা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন ডন। এসব ব্যাপারে তিনি কোন ভূমিকা নিতে পছন্দ করেন না। তাঁর কথা হলো, জামাই যদি শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে ভয় করে, তাহলে স্বামীর কর্তব্য পালন করবে কিভাবে?

এরপর যখন কনির পেটে বাচ্চা এল, ডন ভাবলেন, ন্যায্য সিদ্ধান্তই নিয়েছেন তিনি। ওদের ব্যাপারে নাক না গলানোটাই ঠিক কাজ হয়েছে। এর মাঝখানে অবশ্য আরও কয়েকবার স্বামীর নামে নালিশ করে গেছে কনি তার মায়ের কাছে, এবং মা অতিষ্ঠ হয়ে উঠে শেষ পর্যন্ত স্বামীর কানেও সে কথা তুলেছেন। মাকে আভাসে জানিয়ে দিয়েছিল কনি, স্বামীকে ত্যাগ করার কথা ভাবছে সে।

কথাটা কানে যেতে এই প্রথম মেয়ের উপর চটে গেলেন ডন। বললেন, 'তুমি কি ভুলে যাচ্ছ, কনি, সে তোমার সন্তানের জন্মদাতা? বাপ নেই এমন একটা শিশুর জন্মে কি লাভ এ-দুনিয়ায়?'

এসব কথা স্ত্রীর মুখ থেকেই শুনেছে কার্লো। শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে তার মনে যথেষ্ট ভয় ছিল, কিন্তু এখন ভয়-ডর থেকে মুক্ত সে। কনির সাথে ওদের আচরণের নমুনা শুনে সাহস আরও লাগামছাড়া হয়ে উঠেছে তার। ব্যবসা কেন্দ্রে তার দু'জন কর্মী আছে, স্যালি ব্যাগস আর কোচ, এদেরকে সে গর্বের সাথে শোনায়ে, বউ তার সাথে বাড়িবাড়ি করতে চেষ্টা করলে অ্যায়াসা উত্তম-মধ্যম দেয় যে বাপের নাম পর্যন্ত ভুলতে বসে। কর্মীরা অবাক বিস্ময়ে শোনে ওর কথা। ডন ভিটো কর্লিয়নির মেয়ের গায়ে হাত তোলে, ভাবতে গেলেও গায়ের রোম খাড়া হয়ে যায় তাদের। সেই সাথে কার্লোর উপর ভক্তি-শ্রদ্ধা বেড়ে যায়।

কিন্তু একটা তথ্য কনির কাছ থেকে পায়নি কার্লো। পেনে নিজেকে আর এতটা নিরাপদ বলে মনে হত না কখনোই। সে যে কনিকে মারধোর করে, কথাটা সনির কানেও গেছে। শুনে তো মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল সনির, সেই মুহূর্তে ও যদি কার্লোকে হাতের কাছে পেত, কি হত বলা যায় না। বোধহয় শুধু খুন করেই ক্ষান্ত হত না, লাথি মারতে মারতে লাশের হাড়গুলোর গা থেকে মাংসের শেষ কণাটাও খসিয়ে ফেলত। কিন্তু মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন ডন নিজে। তিনি তাঁর বড় ছেলেকে এ-ব্যাপারে নাক না গলাবার জন্যে কঠোর নির্দেশ দিলেন। শুধু

বাবার প্রতি শ্রদ্ধা আছে বলে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়েছিল সনি। ডনের হুমুক অমান্য করার সাহস এবং স্পর্ধা তারও নেই। সেই ঘটনার পর থেকে তাই কার্লোকে পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে সনি। নিজেকেই বিশ্বাস নেই তার। কার্লোকে সামনে পেলে সে হয়তো রাগ সামলাতে পারবে না, হয়তো খুনই করে ফেলবে।

এসব কিছুই জানা নেই কার্লোর, তাই আজকের এই রোববারের সকালে স্ত্রীকে উত্তম-মধ্যম দিয়েও তার মনে আত্মবিশ্বাস আর নিরাপত্তাবোধের কোন অভাব নেই। গাড়ি নিয়ে নাইনটি-সিক্স স্ট্রীট ধরে শহরের উল্টো দিকে ইস্ট সাইডে যাচ্ছে সে। আরেক দিক থেকে এসে ওদের বাড়ির সামনে থামল সনির গাড়িটা, কিন্তু তা চোখেই পড়ল না কার্লোর।

উঠানের নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা থেকে বেরিয়ে এসে গত রাতটা শহরে লুসি ম্যানচিনির সাথে কাটিয়েছে সনি। মেয়েটাকে ভাল লাগে ওর যৌন-কামনায় এমন অধীর হয়ে থাকতে আর কোন মেয়েকে নেখেনি সনি। অথচ মেয়েটার মধ্যে রান্ধুসী ভাব বলতে কিছুই নেই। যাকে বলে পুরুষখেকো মেয়ে, লুসি ম্যানচিনি মোটেও তা নয়। যৌন-সঙ্গমের গোটা ব্যাপারটাকে আশ্চর্য একটা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে লুসি। তার হৃদয়ের সমস্ত কোমল অনুভূতি সনিকে পাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে। সনি যেন ওর পরম পুরুষ, ওকে যেন যাদু করেছে, নিজেকে তার কাছে উজাড় করে দেবার মধ্যেই যেন ওর জীবন আর যৌবনের সার্থকতা। সনিই ওকে কামুকী করে তোলে, আর কোন পুরুষের দিকে ফিরে তাকাতেও ইচ্ছা করে না তার।

সনি এখন বাড়ি ফিরছে। চারজন বডিগার্ড রয়েছে সাথে। দু'জন সামনে, দু'জন পিছনে। নিজের গাড়িতে কাউকে নেয়নি সনি। কখনও নেয়ও না। পাশে বডিগার্ড বসিয়ে রাখার কোন প্রয়োজন দেখে না সে, কেউ যদি সরাসরি আক্রমণ করে তাকে ও নিজেকেই ঠেকাতে পারবে। নিজেদের দুটো গাড়িতে আসা-যাওয়া করি বডিগার্ডরা। লুসি ম্যানচিনির ফ্ল্যাটের দু'পাশে দুটো ফ্ল্যাটে থাকে তারা। মাঝখানের ফ্ল্যাটের উপর সজাগ নজর রাখার ব্যবস্থাও আছে। লুসির সাথে দেখা করতে যাওয়ার মধ্যে বিপদের তেমন কোন ঝুঁকি নেই, খুব বেশি না গেলেই চলে। শহরে ঢুকে সনি ভাবল যাবার পথে ছোট বোন কনিটাকে গাড়িতে তুলে লং বীচে নিয়ে গেলে মন্দ হয় না। ইতিমধ্যে কাজে বেরিয়ে যাবার কথা কার্লোর, শয়তানটা তো আর কনিকে গাড়ি কিনে দেবে না!

কনিদের বাড়িরস্কাছাকাছি এসে সনি দেখল কার্লো গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ভালই হলো, ভাবল সে, ছুঁচোটোর সাথে দেখা হয়ে গেলে আবার হয়তো মাথায় রক্ত চড়ে যেত তার।

বাড়িটার সামনে একটু অপেক্ষা করতে হলো সনিকে। সামনের বডিগার্ড দু'জন ভিতরে ঢুকল প্রথমে। তাদের কাছ থেকে ইস্তিত পেয়ে তারপর ঢুকল সনি। ঢোকার সময় ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের বডিগার্ডদেরকে দেখে নিল একবার। ওর গাড়ির ঠিক পিছনে গাড়ি দাঁড় করিয়েছে তারা। নিচে নেমে সম্পূর্ণ সজাগ সতর্ক ভঙ্গিতে পাহারা দিচ্ছে রাস্তাটাকে।

নিজেও চোখকান খোলা রেখেছে সনি। ও যে শহরে এসেছে তা জানার কথা নয় শত্রুদের। জানার সম্ভাবনা একেবারে যে নেই তা নয়, দশ লাখ ভাগের এক

ভাগ সম্ভাবনা, তার বেশি নয়। তবু জানে সনি, সাবধানের মার নেই কখনও। এই শিক্ষাটা পেয়েছে ও উনিশশো ত্রিশ সালের লড়াইয়ে।

কখনও, ভুলক্রমেও, লিফট বা এলিভেটরে চড়ে না সনি। জানে, এগুলো মৃত্যু-ফাঁদ। প্রায় এক ছুটে আট প্রস্থ সিঁড়ি টপকে কনিদের ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়ান ও। কার্লো বেরিয়ে গেছে, তার মানে নিশ্চয়ই একা আছে কনি। কিন্তু নক করছে ও, ভিতর থেকে সাড়া দিচ্ছে না কেন কনি?

আবার নক করল সনি।

এবার সাড়া দিল বটে কনি, কিন্তু গলার আওয়াজটা কেমন যেন অস্থির, কাঁপা কাঁপা ঠেকল সনির কানে।

‘কে?’ জানতে চাইল কনি।

বোনের গলার সুরে স্পষ্ট আতঙ্ক রয়েছে, বুঝতে পেরে স্তম্ভিত হয়ে গেল সনি। তার বোনটি তো চিরকালই ভারি চালবাজ, ভারি দেমাকী, কেয়ার করে না কাউকে—বাড়ির আর সবার মতই বেপরোয়া আর শক্ত, তার আবার কি হলো?

‘আমি সনি,’ বলল ও।

ছিটকিনি খোলার শব্দ হলো। এক ঝটকায় দরজার কপাট খুলে লাফ দিয়ে বড় ভাইয়ের বুকের উপর পড়ল কনি। তাকে জড়িয়ে ধরে অদম্য কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

একচুল নড়ছে না সনি। স্তব্ধ, পাথর হয়ে গেছে। খানিক পর বোনকে ধরে একটু সরাতেই তার মুখের উপর ফুলে ওঠা ক্ষতগুলো দেখতে পেল ও। মুহূর্তে বুঝে ফেলল কি হয়েছে।

মাথায় আগুন ধরে গেল সনির। এতক্ষণ স্থির পাথরের মত হয়ে ছিল, এখন থরথর করে কাঁপছে শরীরটা। অদম্য একটা ইচ্ছা জাগছে, এই মুহূর্তে নিচে নেমে ধাওয়া করে কার্লোকে, প্রতিশোধ নেয়।

বড় ভাইয়ের মুখের চেহারা হিংস্র, বিকৃত হয়ে উঠেছে দেখে তাকে আরও শক্ত করে ধরে থাকল কনি, কোনমতে ছাড়ল না, জোর করে টেনে নিয়ে এল ঘরের ভিতর। এখনও কাঁদছে সে, কিন্তু অভিমান বা দুঃখে নয়—এখন কাঁদছে স্নেহ ভয়ে। বড় ভাই কেমন রাগী মানুষ, জানা আছে তার। আদরের একমাত্র বোন সে, সে-ও ওকে ভয় করে যমের মত। আর সবার কাছে কার্লোর নামে নালিশ করলেও বড় ভাইয়ের কানে একটা কথাও তোলেনি সে কখনও।

এখনও সনিকে ঠাণ্ডা করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে কনি। জোর করে ঘরে টেনে নিয়ে এসে বোঝাচ্ছে। ‘বিশ্বাস করো, আমারই দোষ। শুধু শুধু মেজাজ খারাপ করেছিলাম, কোমর বেঁধে ঝগড়া শুরু করে দিয়েছিলাম—তবু কিছু বলেনি কার্লো। কিন্তু মাথায় ভূত চাপল আমার, ওর গায়ে হাত তুললাম—হাজার হোক পুরুষ মানুষ, আর সহ্য করতে পারল না, তাই একটু মারধোর করেছে। এত জোরে মারত না, কিন্তু আমি তো আর ছেড়ে দিইনি ওকে—জানোই তো, কারও চেয়ে রাগ আমার কম নয়।’

প্রকাণ্ড কিউপিডের মত মুখটা থমথম করছে সনির। কিন্তু চেহারায় সেই হিংস্র ভাবটা এখন আর নেই। জানতে চাইল, ‘বাবাকে আজ তুমি দেখতে যাবে নাকি?’

চুপ করে আছে কনি, উত্তর দিতে পারছে না।

‘এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম বাবাকে হয়তো দেখতে যেতে চাইবে তুমি, তাই এসেছিলাম আর কি।’

দ্রুত এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল কনি। ‘আজ নয়। ওঁরা...ওঁরা আমাকে এই অবস্থায় দেখেন তা আমি চাই না। আরেকদিন...আগামী হুণ্ডায় যাব।’

‘ঠিক আছে,’ বলে উঠে দাঁড়াল সনি। রান্নাঘরে ঢুকে ফোন করল একটা। তাম্বপর আবার কনির কাছে ফিরে এসে বলল, ‘ডাক্তার আসছে, দেখে যাক একবার তোমাকে। এই সময়ে... এখন তোমার সাবধানে থাকা একান্ত দরকার। আর ক’মাস বাকী ছেলে হতে?’

‘দু’মাস,’ বলল কনি। তার দু’চোখে ব্যাকুল আবেদন ফুটে উঠল। ‘সনি, তোমার দুটো পায়ে পড়ি—কিছু কোরো না। লক্ষ্মী দাদা, আমার মাথা খাবে, এত বড় সর্বনাশ কোরো না আমার!’ সনি মুখে কিছু না বললেও ওর চিন্তা-ভাবনা কোন্ খাতে বইছে তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে কনি। আতঙ্কে বুকের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে তার।

নিঃশব্দে হাসছে সনি। চোখের স্থির দৃষ্টিতে অদ্ভুত একটা নিষ্ঠুরতা উপচে পড়ছে। ‘ভেব না,’ বোনকে আশ্বাস দিল ও। ‘তোমার ছেলে দুনিয়াতে আসার আগেই তার বাপকে দুনিয়া থেকে বিদায় করব—অত বড় পাশও আমি নই।’

সামনে একটু ঝুঁকে পড়ল সনি, বোনের মুখের অক্ষত দিকটায় আলতোভাবে চুমো খেলো একটা। তারপর সিঁধে হয়ে দাঁড়াল। ঘুরে, লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

ঈস্টসাইড, একশো বারো নম্বর স্ট্রীট। একটা মিষ্টির দোকান। দোকানটার দু’পাশে লম্বা লাইন ধরে দুই সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এই দোকানটাই কার্লোর বুক-মেকিং ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র।

দোকানের সামনে চওড়া ফুটপাথ, সেখানে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের সাথে তাদের বাবারা বল লোফালুফি খেলছে—রোববার, ছুটির দিন, দোকানে বাজি ধরার জন্যে এসেছে বাবারা, সাথে করে বেড়াতে নিয়ে এসেছে ছেলেমেয়েদের। কার্লো আসছে দেখে, খেলা ভেঙে দিল বাবারা। ছেলেমেয়েদের চোঁচামেঁচি থামাবার জন্যে তাদেরকে আইসক্রীম কিনে দিল। নিজেদের সামনে প্রায় সবাই এরপর খবরের কাগজ মেলে ধরল, কাগজে ছাপা রয়েছে খেলা শুরু করবে যারা সেই সব ‘পিচারদের’ তালিকা। দুনিয়াদারির কথা বেমানুম ভুলে গিয়ে আজকের বেসবল খেলায় কে জিতবে না জিতবে, কার উপর বাজি ধরা যায় এই সব চিন্তায় মশগুল হয়ে পড়েছে সবাই।

দোকানে ঢুকে পিছনের বড় কামরাটায় চলে এল কার্লো।

কর্মীদেরকে ‘রাইটার’ বলা হয়। সংখ্যায় তারা দু’জন। স্যালি ব্যাগস্, পাকানো দড়ির মত চেহারা। আর প্রকাণ্ডেহী কোচ। কাজ শুরু হবে, সেজন্যে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে ওরা। লম্বা লাইন টানা প্যাড রয়েছে ওদের সামনে। এগুলোয় বাজির হিসাব লেখা হবে। কাঠের স্ট্যাণ্ডের মাথায় রয়েছে একটা

ব্ল্যাকবোর্ড, তাতে সুপার লীগের ষোলোটা বেসবল দলের নাম লেখা হয়েছে চক দিয়ে। কোন্ দলের সাথে কোন্ দল খেলছে তাও দেখানো হয়েছে পাশাপাশি নাম লিখে। প্রত্যেক একজোড়া নামের পাশে একটা করে খোপ আঁকা আছে। আজকের বাজির অসম সংখ্যা, যাকে বলা হয় ‘অডস’, ওই খোপে লেখা হবে।

‘দোকানের ফোন “ট্যাপ” করা আছে?’ কোচকে জিজ্ঞেস করল কার্লো।

মাথা নাড়ল কোচ। ‘না, এখনও বন্ধ ট্যাপ।’

এগিয়ে গিয়ে ওয়াল টেলিফোনের সামনে দাঁড়াল কার্লো। ডায়াল করল একটা নাম্বারে। অপরপ্রান্ত থেকে শুনে দ্রুত আজকের খেলার সব ‘অডস’ নোট করছে সে। চুপচাপ, গম্ভীরভাবে তাকে লক্ষ্য করছে কোচ আর স্যালি ব্যাগস। রিসিভার যথাস্থানে রেখে দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে এসে দাঁড়াল কার্লো। নোটবই দেখে সব ক’টা খোপে এক এক করে ‘অডস’ লিখে রাখছে। নিঃশব্দে এখনও তাকিয়ে আছে কর্মীরা কার্লোর দিকে। কার্লো জানে না, কিন্তু সংখ্যাগুলো আগেই পেয়ে গেছে তারা। কার্লোর লেখা সংখ্যাগুলোর সাথে নিজেদের জানা সংখ্যাগুলো মিলছে কিনা দেখে নিচ্ছে মনোযোগের সাথে।

এই ব্যবসায় ঢোকার পর প্রথম হুগাতেই ব্ল্যাকবোর্ডে সংখ্যা লিখতে গিয়ে মারাত্মক একটা ভুল করে ফেলেছিল কার্লো। এর ফলে, সব জুয়াড়ীদের যা চিরকালের স্বপ্ন, সেই রকম একটা ‘মিডল’ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। একজনের কাছে বোর্ডে লেখা ‘অডস’ দেখে বাজি ধরা, আরেকজন বুক-মেকারের কাছে আসল ‘অডস’ অনুসারে বাজি ধরা—এর অর্থ ‘মিডল’। এভাবে বাজি ধরতে পারলে জুয়াড়ীর কখনও লোকসান হয় না। লোকসান যা হবার তা শুধু কার্লোর খাতার বা বুকের হয়। কার্লোর ওই একটা ভুলের জন্যে সেই হুগায় ছয় হাজার ডলার লোকসান খেতে হয়, তাতে জামাই সম্পর্কে, ডনের ধারণাই সমর্থন পায়। যাই হোক এরপর তাঁর তরফ থেকে হুকুম এল, কার্লোর সব কাজ আরেকবার করে যাচাই করে তার নির্ভুলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে।

এমনিতে কর্লিয়নি পরিবারের কর্তারা দৈনন্দিন কাজকর্মের এইসব ছোটখাটো বিষয় নিয়ে কখনোই মাথা ঘামান না। এসব বিষয়ের কোন খবর ওদের কানে কেউ যদি পৌছেও দিতে চায় তাকে কমপক্ষে পাঁচটা স্তর এক এক করে টপকে যেতে হবে। কিন্তু ‘বুক-মেকার’ ব্যবসাটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে নতুন জামাইয়ের যোগ্যতা পরিমাপের জন্যে, তাই গোটা ব্যাপারটা রাখা হয়েছে টম হেগেনের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণে। কার্লোর কাজের ধরন-ধারণ সম্পর্কে রোজই একটা করে রিপোর্ট পায় হেগেন।

খোপগুলো ভরার কাজ শেষ হতেই জুয়াড়ীরা সবাই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল পিছন দিকের বড় হলঘরটায়। যে যার খবরের কাগজ, খেলার তথ্যের পাশে লিখে নিচ্ছে ‘অডস’গুলো। ব্ল্যাকবোর্ড দেখার জন্যে অনেকেই তাদের ছেলেমেয়েদেরকে হাত ধরে নিয়ে এসেছে। খুব বড় বড় বাজি ধরছে এক লোক, সে তার ছোট মেয়েটার হাত ধরে নাড়া দিল, জানতে চাইছে, ‘বলো তো, লক্ষী মা, আজ তোমার কাকে পছন্দ? জায়েন্ট, নাকি পাইরেটদের?’

এ ধরনের রোমাঞ্চকর নাম শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠল বাচ্চা মেয়েটা। বাপকে

প্রশ্ন করল, ‘আচ্ছা, বাবা, কাদের গায়ে জোর বেশি? জায়েন্টদের না পাইরেটদের?’

মেয়ের প্রশ্ন শুনে হেসে ফেলল বাবা।

এরপর একদল লোক লাইন দিয়ে দাঁড়াল দুই ‘রাইটার’ এর সামনে। এক পৃষ্ঠা লেখা শেষ হলেই রাইটার সেটা ছিঁড়ে সংগ্রহ করা টাকাগুলো মুড়ে ফেলছে সেটা দিয়ে, তারপর ভুলে দিচ্ছে কার্লোর হাতে। কাগজে মোড়া সমস্ত টাকা নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল কার্লো, সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল। দোকানের মালিক আর তার পরিবারের জন্যে একটা কামরা আলাদা করা আছে, সেখানে ঢুকল সে। ফোন করে সেন্টার এক্সচেঞ্জে বাজির তথ্য জানিয়ে দিল আগে, তারপর ওয়ালসেফের ভিতর রেখে দিল টাকাগুলো। পাশেই একটা জানালা; সেটার পর্দা আরেকটু টেনে দিলেই চোখের আড়ালে পড়ে যায় ওয়াল-সেফটা। মিষ্টির দোকানে আবার নেমে আসার আগে বাজির কাগজ পুড়িয়ে ফেলল সে, বাথরুমের ড্রেনে ছাইগুলো ফেলে চেনটা টেনে দিল।

বু ল, মানে খেলা নিয়ন্ত্রণ করার আইন বহাল থাকায় রবিবার দিন বেলা দুটোর আগে কোন খেলা শুরু হয় না। প্রথমদিকের বাজিগুলো ধরতে আসে অধিকাংশ বিবাহিত লোকেরা, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যেতে হবে এদেরকে, তা না হলে স্ত্রী আর বাচ্চাকাচ্চাদের নিয়ে সাগরসৈকতে বেড়াতে যাওয়া হবে না। এর পরের দলে অবিবাহিত লোকই বেশি থাকে, তবে কিছু দায়িত্বহীন বিবাহিত লোকও এই দলে থাকে, যারা স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদেরকে গরম ফ্ল্যাটে ফেলে স্বার্থপরের মত একা বেরিয়ে আসে। এই অবিবাহিত বাজি ধরার দলটা পাক্কা জুয়াড়ী, এরা বাজিও ধরে মোটা টাকার। প্রথমবার বাজি ধরে সন্তুষ্ট হবার পাত্র নয় এরা, ঘুরেফিরে আবার চারটের দিকে ফিরে আসে, দ্বিতীয়বার বাজি ধরে। রবিবারে অতিরিক্ত খাটুনিটা এদের জন্যেই দিতে হয় কার্লোকে। তবে বিবাহিত কিছু লোকও সাগরসৈকত থেকে ফেনের সাহায্যে বাজি ধরে, প্রথমবার লোকসান হয়ে থাকলে দ্বিতীয়বার চেষ্টা করে দেখে সেটা পূরণ করা যায় কিনা।

বেলা দেড়টা। ভিড় পাতলা হয়ে গেছে জুয়াড়ীদের। একটু দম নেবার জন্যে স্যালি র্যাগস্কে সাথে নিয়ে দোকানের রাইরে বেরিয়ে এল কার্লো। দোকানের পাশেই উঁচু একটা বারান্দা, সেটার সিঁড়ির ধাপে বসল ওরা। একপাল উঠতি বয়সের ছেলে ডাংগুলি খেলছে রাস্তায়, সেদিকে তাকিয়ে আছে দু’জন। খানিক পর ওদের সামনে দিয়ে একটা পুলিশের গাড়ি চলে গেল। সেটাকে দেখেও দেখল না ওরা। পুলিশের হেডকোয়ার্টার থেকে এই জুয়ার আস্তানাটাকে উদার প্রশয় দেয়া হয়, এরা যাতে সম্পূর্ণ নিরাপদে কাজ চালিয়ে যেতে পারে সেদিকে পুলিশের বড়কর্তাদের কড়া নজর আছে, তাই স্থানীয় পুলিশরা এদের ধারে কাছে ঘেষতে সাহস পায় না। দোকানে হানা দিয়ে যদি কখনও খানা-তল্লাশি করা হয়ও, পুলিশ ডিপার্টমেন্টের প্রথম সারির কর্তাদের তরফ থেকে আসতে হবে হুকুমটাকে। কিন্তু হুকুম নিয়ে পুলিশের গাড়ি পৌঁছুবার আগেই খবর পেয়ে যায় এরা, ফলে সাবধান হবার সময় পায়। শেষ পর্যন্ত আপত্তিকর কিছু না পেয়ে খালি হাতে ফিরে যেতে হয় পুলিশকে।

একটু পর দোকান থেকে কোচও বেরিয়ে এল, সিঁড়ির ধাপে বসল ওদের

সাথে। বেস বল আর মেয়েমানুষ সম্পর্কে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করল ওরা। হাসছে কার্লো। বলল, ‘আজও বৌটাকে একটু পিড়ি দিতে হলো। সংসারটা কার কথায় চলবে, সেটা ওকে শেখাচ্ছি আর কি।’

কথার পিঠে কথা বলার সুরে জানতে চাইল কোচ, ‘তাঁর না ছেলে হবার সময় হয়ে এসেছে?’

‘আরে না, তেমন কড়া ভোজ দিইনি,’ বলল কার্লো। ‘দু’গালে ক’টা চড়-চাপড়, তার বেশি কিছু না।’ একটু চুপ করে থেকে ভারি গলায় আবার বলল, ‘আমাকে ভেড়া ভেবেছে আর কি, নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে চায়—মেয়েমানুষের কথায় উঠব-বসব, আমি কি সেই পাত্র!’

দোকানের সামনে আর আশপাশে এখনও ঘুর ঘুর করছে জুয়াড়ীরা। গরম পড়েছে, শার্টের বোতাম খুলে বাতাস লাগাচ্ছে গায়ে। কয়েকজন হাঁটাহাঁটি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, কার্লো আর তার রাইটারদের ওপরের ধাপে এসে বসল তারা। আচমকা ডাঙুলি খেলা ছেড়ে উঠতি বয়সের ছেলেগুলো যে যেদিকে পারল ছুটে পালান, চোখের নিমেষে হাওয়া সব। বিকট শব্দে গোটা এলাকাটাকে সচকিত করে তুলে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এল একটা গাড়ি, ঘ্যাচ করে দোকানের সামনে ব্রেক কষল সেটা, টায়ারের সাথে রাস্তার ঘষা লেগে তীক্ষ্ণ কান ঝালাপালা করা শব্দ হলো। গাড়িটা এখনও পুরোপুরি থামেনি, ডাইভিং সীট থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল একজন লোক। দমকা বাতাসের মত ছুটে আসছে সে। ঘটনার আকস্মিকতায় স্তম্ভিত হয়ে গেছে সবাই। একচুল নড়ার শক্তি নেই কারও।

প্রকাণ্ড ক্রিউপিড মুখ আর বাঁকা ধনুক ঠোট প্রচণ্ড রাগে ঝুলে পড়েছে সনি কর্লিয়নির। বিকৃত, বীভৎস দেখাচ্ছে চেহারাটা। চোখের পলকে সিঁড়ির ধাপ ক’টা লাফ দিয়ে উপকে এল ও, লোহার মত কঠিন দুই হাত দিয়ে পৈঁচিয়ে ধরল কার্লোর গলা। দম বন্ধ হয়ে মারা যেতে বসেছে কার্লো, পাঁচ থেকে সাত সেকেন্ডের বেশি পেরোয়নি সময়। এতক্ষণে হুঁশ হলো আর সবার। সনিকে বাধা দেবার কথা কারও মনে উকিও দিল না, তবে কার্লোকে তারা ধরে রাখতে চেষ্টা করছে, তাও মাত্র কয়েকটা সেকেন্ডের জন্যে। আসলে নিজেদের এই আচরণের মধ্যে দিয়ে কার্লোকে মাফ করে দেবার সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছে তারা, কিন্তু মুখে কিছু বলার সম্পর্ক দেখাতে যাচ্ছে না। কার্লোকে টেনে-হিঁচড়ে রাস্তায় নামিয়ে আনার চেষ্টা করছে সনি। কোচ আর স্যালি র্যাগস্ বুকল, তাদের মৌন অনুরোধ রক্ষা করতে রাজী নয় সনি কর্লিয়নি। সময় ঝকতে থাকতেই কার্লোর কাছ থেকে এক পা করে পিছিয়ে এল দু’জন। প্রচণ্ড শক্তি দিয়েও কার্লোকে টেনে নামাতে পারছে না সনি, বারান্দার মোটা লোহার রডের রেলিং জড়িয়ে ধরে ঝুলে আছে সে। কুঁকড়ে গেছে তার শরীর, দুই বিশাল কাঁধের মাঝখানে মাথাটা ওজ্রে রেখেছে। তার গায়ের শার্টটা ফড় ফড় করে ছিঁড়ে এল সনির হাতে।

কার্লোকে টেনে নামাতে পারবে না বুঝতে পেরে আরও হিংস্র হয়ে উঠেছে সনি।

এরপর যা ঘটতে শুরু করল, চোখ মেলে দেখা যায় না। কোচ আর স্যালি র্যাগস অসুস্থ বোধ করছে, যে-কোন মুহূর্তে নমি করে ফেলতে পারে। জড়োসড়ো

হয়ে বসে থাকা কার্লোকে মেরে ফেলছে সনি, দেখে অন্তত তাই মনে হচ্ছে ওদের। দুই হাত এক করে প্রকাণ্ড একটা মুঠো পাকিয়ে কার্লোর কাঁধ, ঘাড় আর পিঠে দমাদম আঘাত করছে সনি। জোড়া হাতের প্রতিটি ঘুষি দূর থেকে ভেসে আসা তোপ দাগার মত দুম দুম আওয়াজ তুলছে। প্রতিটি আওয়াজের সাথে কেঁপে উঠছে কোচ আর স্যালির শরীর। গরিলার মত বিশাল শরীর কার্লোর, গায়ে অসুরের মত শক্তি, কিন্তু তবু সে বাধা দিচ্ছে না সনিকে, প্রতিবাদ করছে না, একটা শব্দ উচ্চারণ করে দয়া ভিক্ষা চাইছে না। নিঃশব্দে, নিজেদের অজান্তেই আরও এক পা করে পিছিয়ে গেল কোচ আর স্যালি। কিছু বলবে সে স্পর্ধা নেই তাদের। দেখেওনে বুঝতে পারছে সনি তার ভয়ীপতিকে বোধহয় খুনই করে ফেলবে। কার্লোর সাথে রক্তাক্ত লাশ হয়ে কবরে নামার ইচ্ছা নেই তাদের। ডাংগুলি খেলা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া ছেলেগুলো ফিরে এসেছে আবার, ইচ্ছা খেলা নষ্ট করার জন্যে গাড়ির ড্রাইভারের সাথে ঝগড়া করা। কিন্তু সে-সব ভুলে গিয়ে বিমূঢ় বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে তারা সনি আর কার্লোর দিকে। উঠতি বয়সের তাগড়া জোয়ান ছেলে ওরা, গায়ে শক্তি রাখে, কিন্তু তারা সবাই মিলেও সাহস পেল না এগিয়ে এসে বাধা দেয় সনিকে।

চারদিকে সচকিত করে দিয়ে ছুটে এল আরেকটা গাড়ি, ঘ্যাচ করে থামল স্নেটা সনির গাড়ির পিছনে। লাফ দিয়ে নিচে নামল সনির দু'জন বডিগার্ড। কিন্তু সনির বীভৎস আচরণ দেখে তারাও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল একচুল এগোবার সাহস পেল না। সতর্ক, সজাগ হয়ে রাস্তা আর ঘটনার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে দাঁড়িয়ে আছে তারা। নির্বোধ কোন পথিক বা আর কেউ যদি কার্লোকে সাহায্য করতে বা সনির ক্ষতি করতে এগিয়ে আসে, তাদেরকে বাধা দিতে হবে যা ঘটে ঘটুক, মনিবের নিরাপত্তার দিকটা আগে দেখবে তারা।

দৃশ্যটার সবচেয়ে রোমহর্ষক বিষয় হলো, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে আছে কার্লো। তবে সেজন্যেই বোধহয় এ-যাত্রা প্রাণে বেঁচে গেল সে। নোহার মোটা রেলিংটাকে দুই হাত দিয়ে এমন শক্তভাবে জড়িয়ে ধরে আছে, কোনমতে তাকে টেনে নামাতে পারল না সনি। সনির চেয়ে কম শক্তিশালী নয় সে, কিন্তু আশ্চর্য, পাল্টা আঘাত করতে রাজী হলো না। পড়ে পড়ে বেদম মার খাচ্ছে, নাক-মুখ দিয়ে বাতাসের সাথে বিদঘুটে শব্দ বেরিয়ে আসছে, কিন্তু কুখে দাঁড়বার কোন চেষ্টাই নেই তার মধ্যে। তার ঘাড়ের, মাথায়, পাজরে ঘুঘির পর ঘুঘি মারছে সনি, বেকে যাচ্ছে কার্লোর শরীর, মোচড় খাচ্ছে, কিন্তু রেলিং তবু ছাড়ছে না সে। পাল্টা আঘাত না দিলে কতক্ষণ একতরফা আঘাত করা যায় একজনকে, ধীরে ধীরে রাগ পড়তে শুরু করেছে সনির। থামল সে। বিশাল বুকটা দ্রুত ওঠানামা করছে তার। নিজের জায়গা থেকে নড়ছে না এখনও। বলল, 'কুত্তার বাচ্চা, সাহস থাকে তো ফের আমার বোনের গায়ে হাত তুলিস। খুন করব তোকে।'

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সবাই। সনির শাসানি শুনে বুঝে নিল, কার্লোকে মেরে ফেলার ইচ্ছা অন্তত এই মুহূর্তে নেই ওর। তার মানে, নতুন জীবন ফিরে পেল কার্লো। সন্দেহ নেই, এটা তার একটা পরম সৌভাগ্য। তবে সনির কণ্ঠস্বরে হতাশার সুরটা কারও কান এড়াল না। এ-থেকে এটাও বুঝে নিল সবাই, কার্লোকে

খুন করার ইচ্ছাই রয়েছে সনির, কিন্তু এই মুহূর্তে সেটাকে কাজে পরিণত করা যাচ্ছে না।

থর থর করে কাঁপছে কার্লোর শরীরটা। মুখ তুলে সনির দিকে একবার তাকাল না পর্যন্ত। এখনও সে দু'হাতে রেলিং জড়িয়ে ধরে মাথাটাকে ঘাড়ের মাঝখানে ঝুঁজে বসে আছে। স্টার্ট নিল গাড়ি দুটো, গর্জন তুলে ঝড়ের বেগে চলে গেল আবার। কিন্তু তবু একটু নড়ছে না কার্লো।

স্নেহময় বাবার মত অদ্ভুত কোমল স্বরে কোচ বলল, 'যা হবার হয়েছে, কার্লো, ওঠো এবার+ চলো, দোকানে যাই। সবাই দেখছে।'

এতক্ষণে রেলিং ছেড়ে দিয়ে, সিঁড়ির ধাপে হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকা শরীরটা নিয়ে উঠে দাঁড়াবার সাহস পেল কার্লো। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ান সে, দেখল, ছেলে আর লোকজনদের ভিড় জমে গেছে রাস্তার উপর, সবাই তার দিকে হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আরেকজন মানুষকে চরম অপমানিত হতে দেখলে প্রায় সব মানুষকেই এই রকম হতচকিত দেখায়। মাথা ঘুরছে কার্লোর। সেটা বিকট আতঙ্কের জন্যে, মার খেয়ে আহত হয়েছে বলে নয়। ধরে নিয়েছিল সে, সনি তাকে খুন করার জন্যেই এসেছে। প্রাণ রক্ষার একমাত্র খোলা পথটাই বেছে নিয়েছিল তাই। পাল্টা আঘাত করেনি, করলে সনি তাকে জীবিত রেখে ফিরে যেত না। ঘুষিগুলো গায়ের সবটুকু শক্তি দিয়ে মেরেছে সনি, কিন্তু তাতে খুব যে একটা জখম হয়েছে কার্লো তা নয়। শরীরের স্পর্শকাতর জায়গাগুলো নাগালের মধ্যে পায়নি সনি। নিরেট পেশীর উপর পড়েছে সবগুলো ঘুষি।

দোকানের পিছন দিকের কামরায় নিয়ে এল তাকে কোচ। ঘাড়, কাঁধ আর মুখে বরফ দিচ্ছে সে। মুঁখটা কোথাও কেটেকুটে যায়নি, রক্তের কোন ছাপ নেই সেখানে, শুধু এখানে সেখানে ফুলে ফেঁপে গেছে, কার্লো দাগ পড়ে গেছে। আতঙ্কটা কেটে গেছে এতক্ষণে, কাঁপুনিটাও থেমেছে। কিন্তু যে অপমান সহ্যেতে হয়েছে, তার কথা মনে পড়ে গেলেই গা গুলিয়ে উঠছে তার, গল গল করে বৈশ খানিকটা বমিও করল। ওর মাথাটা মুখ ধোবার একটা গাম্বলার উপর রেখে পানির কল ছেড়ে দিল কোচ। আর এক হাতে ধরে আছে ওকে, বমি করার সময় মাতালকে যেমন ঠেক দিয়ে রাখতে হয়। ধরে ধরে দোতলায় নিয়ে এসে একটা কামরায় ওকে শুইয়ে দিল সে। স্যালি ব্যাগস কখন এক ফাঁকে গায়েব হয়ে গেছে, জানতেই পারেনি কার্লো।

থার্ড এভিনিউয়ে চলে এসেছে স্যালি ব্যাগস। ফোন করে সমস্ত ঘটনার সবিস্তার বর্ণনা দিচ্ছে সে রকো ল্যাম্পনিকে। এতটুকু উত্তেজিত না হয়ে সব শুনল রকো ল্যাম্পনি। মাথা ঠাণ্ডা রেখে তখুনি সে ফোন করে গোটা ব্যাপারটা জানিয়ে দিল তার ক্যাপোরেজিমি পীট ক্রেমেঞ্জাকে।

'কি সর্বনাশ! এই সনি আর তার মেজাজকে নিয়ে আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল দেখছি।' আতঙ্কে উঠে বলল ক্রেমেঞ্জা। কিন্তু কথাটা বলার সময় ফোনের কানেকশন কেটে দিল সে, একটা শব্দও শুনতে পায়নি রকো ল্যাম্পনি।

দেরি না করে সাথে সাথে লং বীচের বাড়িতে ফোন করল ক্রেমেঞ্জা। টম হেগেনকে ধরল সে। সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল হেগেন, তারপর বলল,

‘তাড়াতাড়ি, পীট! এক সেকেন্ড দেরি না করে লং বীচের রাস্তায় তোমার ক’জন লোককে পাঠাও। ট্রাফিক জ্যাম বা কোন অ্যাক্সিডেন্টে পড়ে সনি যদি আটকা পড়ে যায়! ওর এই রাগ আমার চেনা আছে, মাথায় একবার রক্ত চড়ে গেলেন নিজের নিরাপত্তার কথা পর্যন্ত ভুলে যায়। কিছুই বলা যায় না, আমাদের বিরোধী-পক্ষরা হয়তো জানে শহরে গেছে সনি। যদি জেনে থাকে, এ-সুযোগ তারা হাতছাড়া নাও করতে পারে।’

একটু দ্বিধা করে বলল ক্লেমেঞ্জা, ‘আমার লোকেরা রাস্তায় গিয়ে পৌছবার আগেই সনি বাড়ি ফিরে যাবে। টাটাগ্লিয়ারাও তা জানে।’

ধৈর্য হারান না হেগেন, বুঝিয়ে দেবার সুরে বলল, ‘হ্যাঁ, তোমার কথাই হয়তো ঠিক। কিন্তু দুর্ঘটনার কথা তো কিছুই বলা যায় না, ঠিক কিনা? সনি আটকা পড়ে যেতে পারে। যতটা পারো করো, পীট।’

বিরক্তির সাথে রকো ল্যাম্পনিকে ফোন করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল ক্লেমেঞ্জা। তখুনি কয়েকজন লোক যোগাড় করে লং বীচের রাস্তার উপর নজর রাখার জন্যে বেরিয়ে পড়ল রকো ল্যাম্পনি।

ক্লেমেঞ্জাও তার প্রিয় ক্যাডিলাক গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ওর বাড়িতে সশস্ত্র একদল গার্ড আশ্রয় নিয়েছে, তাদের মধ্যে থেকে তিনজনকে বেছে সাথে নিল সে। আটলান্টিক রিজ পেরিয়ে এল ওরা, নিউ ইয়র্ক শহরের দিকে যাচ্ছে।

মিস্ট্রি দোকানের কাছেপিঠে ঘুর ঘুর করছে যারা তাদের মধ্যে খুদে একজন জুয়াড়ীও রয়েছে, তার কাজ টাকা খেয়ে টাটাগ্লিয়াদেরকে খবর যোগান দেয়া। কারো যখন মার খাচ্ছে, তাড়াতাড়ি ফোন করে টাটাগ্লিয়াদের সাথে যোগাযোগ করল সে। কিন্তু টাটাগ্লিয়ারা আনুষঙ্গিক হাজারটা ঝামেলা কাটিয়ে উঠে এখনও তৈরি হয়নি যুদ্ধ করার জন্যে। জুয়াড়ী লোকটাও নাছোড়বান্দা, কর্তা ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করতে চায় সে, মানে তাদের কানে এই সুবর্ণ সুযোগটার কথা তুলতে চায়। অনেকগুলো মাধ্যম আর নিরাপত্তা পর্যায় উপকে তবে একজন ক্যাপোরেজিমির সাথে যোগাযোগ করা যায়। ক্যাপোরেজিমির কানে কথাটা পৌঁছুল বটে, সে পরিবারের কর্তার সাথে বিষয়টা নিয়ে আলোচনাও করল, কিন্তু ততক্ষণে নিজেদের উঠানের নিরাপদ আশ্রয়ে, বাড়িতে পৌঁছে গেছে সনি কর্লিয়নি।

এবার তাকে বাবার প্রচণ্ড রাগের মুখোমুখি হতে হবে

তিন

পাঁচ পরিবার একজোট হয়ে যুদ্ধ করছে কর্লিয়নি পরিবারের বিরুদ্ধে। যুদ্ধের খেসারত কোন পক্ষকেই কম দিতে হচ্ছে না। পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছে পুলিশ বিভাগ। ক্যাপটেন ম্যাকক্লান্সি খুন হওয়ায় ক্ষেপে গেছে তারা, লাগাম টেনে ধরেও সামলানো যাচ্ছে না তাদেরকে। প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছে তারা, এই হত্যাকাণ্ডের একটা সুরাহা করে দিতে হবে। যা খুশি তাই বোঝালে চলবে না,

সমাধানটা গোটা পুলিশ বিভাগের মনঃপুত, পছন্দসই হতে হবে। এ-কথার একটাই মানে, ওদের হাতে তুলে দিতে হবে খুর্নীকে। এ-প্রসঙ্গে অবধারিত ভাবে এসে পড়ে দুর্নীতিপরায়ণ রাজনৈতিক নেতাদের কথা। এইসব নেতা সব ধরনের জুয়া-জোচ্চুরী আর বেআইনী ব্যবসাকে প্রশ্রয় দেয়, পৃষ্ঠপোষকতা করে। এদের রাজনৈতিক ক্ষমতা খুব বেশি। যদি ক্ষয়, পুলিশ বিভাগের কর্তাব্যক্তিদের চাকুরিও ঝেঁয়ে দিতে পারে। এরা যে-সব জুয়ার আড্ডা আর বেআইনী ব্যবসার পৃষ্ঠপোষকতা করে সে-সব জায়গায় হানা দেবার সাহস প্রথম সারির পুলিশ অফিসারদেরও নেই। কিন্তু খেপে ওঠা সিপাইদের মধ্যে লুটপাট, হত্যা আর ধর্ষণ প্রবণতা মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়লে তাদের বিভাগীয় কমান্ডিং অফিসাররা নিরুপায় হয়েই উপরওয়ালাদের হুকুম অমান্য করতে বাধ্য হয়, এবং সেক্ষেত্রে উপরওয়ালাদের অসহায় বোধ করা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না—এক্ষেত্রে, এই বিশেষ পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদেরও সেই রকম অবস্থা হয়েছে, অসহায় বোধ করা ছাড়া করার কিছু খুঁজে পাচ্ছে না তারা।

নেতাদের প্রশ্রয় আর পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে কর্নিয়নি পরিবারের ক্ষতি হচ্ছে বিস্তর, কিন্তু ওদের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছে প্রতিপক্ষদের। কর্নিয়নিদের সিংহভাগ আয়ের মূল উৎস জুয়া খেলা। খবরের কাগজে নানা ধরনের বিচিত্র বিজ্ঞাপন বের হয়, তাতে কি সব আবোলতাবোল সংখ্যা ছাপা থাকে, সেই সংখ্যার আসল রহস্য আর কেউ বুঝুক বা না বুঝুক, জুয়াড়ীরা ঠিকই বোঝে। তারা সেই সংখ্যা ধরে লটারী খেলে। অত্যন্ত লাভজনক একটা জুয়া খেলা এটা। এই খেলার নাম ‘নম্বর’। ‘পলিসি’ নামে আরেকটা খেলা আছে কর্নিয়নিদের। এই খেলা থেকেও বিস্তর টাকা রোজগার হয় তাদের। এটাও এক ধরনের লটারী খেলা, প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হয়। এই দুটো খেলাই প্রচণ্ড মার খাচ্ছে কর্নিয়নিদের। ওদের অসংখ্য কর্মী আর চর আছে, যারা এই খেলা দুটো পরিচালনা করে, তারা পুলিশের পাতা ফাঁদে ধরা পড়ে যাচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে। হাজতে পাঠাবার আগে কষে মারধোরও করা হচ্ছে এদেরকে। পুলিশ এদের কাছ থেকে একটা কথাই জানতে চায়—ক্যাপটেন ম্যাকক্লান্সিকে কে খুন করেছে? কিন্তু, শত মারধোর করেও কোন লাভ হচ্ছে না। কর্নিয়নি পরিবারের কর্মী আর চররা আর যাই করুক, পুলিশের কাছে কখনও মুখ খোলে না। লটারী পরিচালনার সাথে জড়িত ‘ব্যাংক’ বা জুয়ার আড্ডাগুলো খুঁজে বের করা ছাড়া সাধারণ পুলিশ অফিসাররা, সে সব জায়গায় হানা দিয়ে যাকে পাচ্ছে তাঁরই কোমরে দড়ি বেঁধে তুলে নিচ্ছে গাড়িতে, সাথে করে নিয়ে যাচ্ছে বস্তা ভর্তি টাকা। এক কথায়, চারদিক থেকে শুধু লোকসান আর হাঙ্গামার খবর এসে পৌছাচ্ছে কর্নিয়নি পরিবারের কানে।

অসংখ্য ‘ব্যাংকারের’ কাছ থেকে নালিশ আসছে ক্যাপোরেজিমিদের কাছে; তারা আবার কর্নিয়নি পরিবারের আলোচনা বৈঠকে উত্থাপন করেছে অভিযোগগুলো। কিন্তু করার আছেই বা কি? ব্যবসা বন্ধ করে দেবার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে ব্যাংকারদেরকে। সবচেয়ে বেশি টাকা আসে নিগ্রো পাড়া হার্লেম থেকে, আপাতত সেখানকার ক্ষতি-পা-ঝাড়া স্থানীয় লোকজনদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে ব্যবসার সমস্ত দায়-দায়িত্ব। এই লোকগুলো যেখানে সেখানে ইচ্ছা বারবার জায়গা

বদল করে কাজ করে, তাই মানামাল এবং প্রমাণসহ হাতেনাতে এদেরকে ধরা পুলিশের পক্ষে যথেষ্ট কঠিন কাজ।

ক্যাপটেন ম্যাকক্লান্সি খুন হবার পর পরই অনেকগুলো খবরের কাগজ সলোয়ার দুষ্কর্মের সাথে তাকে জড়িয়ে নানান বিবৃতি আর কাহিনী ছেপেছে। ওই সব কাহিনী থেকে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল মৃত্যুর অল্প ক'দিন আগে কোথাও থেকে বেশ মোটা অঙ্কের নগদ টাকা পেয়েছিল ক্যাপটেন। পুলিশ বিভাগের জানার কথা নয় ওই বিবৃতি আর কাহিনীগুলো টম হেগেন নিজেই তৈরি করেছে। কিন্তু কাহিনীর তথ্যগুলো মিথ্যে নয়, সবই সত্য—অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সেগুলো সংগ্রহ করতে হয়েছে কর্লিয়নি পরিবারের কনসিলিয়রিকে। পুলিশ বিভাগ এইসব কাহিনীর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ তোলেনি, আবার সায় বা সমর্থনও দেয়নি। তবে তাদের এই মৌনব্রত অবলম্বনেরও বিশেষ তাৎপর্য আছে।

যেসব ইনফর্মার আর পুলিশ কর্মচারী কর্লিয়নিদের টাকা খায় তারাও এই জটিল, গুরুতর পরিস্থিতিতে কাজ দিচ্ছে। তাদের রিপোর্টে তারা পুলিশ বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাচ্ছে ক্যাপটেন ম্যাকক্লান্সি একজন নীতিভ্রষ্ট অফিসার ছিল। টাকা খাওয়া অথবা সাফ ঘুস খাওয়া, এ তো খুবই সাধারণ আর স্বাভাবিক ব্যাপার, সেটা তেমন কোন অপরাধ বা নিন্দাযোগ্য কাজ বলে গণ্য করে না কেউ। ক্যাপটেন ম্যাকক্লান্সি আর সব অফিসারের মত এ-ধরনের অল্প নোংরা টাকা খেত, তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু কর্লিয়নিদের বেতনভুক ইনফর্মার আর পুলিশ কর্মচারীদের রিপোর্টে উল্লেখ করা হলো, নোংরা টাকার মধ্যে সবচেয়ে যেটা মলিন সেই টাকাটাও গোথাসে গিলে ফেলত ক্যাপটেন ম্যাকক্লান্সি। তার মানে খুনির কাছ থেকে টাকা খেয়ে হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে মিথ্যে রিপোর্ট লিখত সে, আর ড্রাগ ব্যবসায়ীদেরকে ব্যবসা চালাবার সুবিধে করে দেবার বিনিময়ে টাকা খেত। এ-দেশের গোটা পুলিশ জাত কয়েকটা ব্যাপারে কঠোর নীতি মেনে চলে, সেই নীতি অনুযায়ী খুনের বা ড্রাগ-ব্যবসার টাকা খাওয়া ভয়ঙ্কর অপরাধ, সে-অপরাধের কোন ক্ষমা নেই।

পুলিশের লোকেরা আশ্চর্য সরলতার সাথে আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলে। এটা জানা আছে টম হেগেনের। জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত ওরা, এবং জনসাধারণের চেয়ে অনেক বেশি আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলে। আইন-শৃঙ্খলা তো একটা যাদু, আর এই যাদুই তো ওদের সমস্ত ক্ষমতার উৎস। প্রত্যেকটি পুলিশ এই ক্ষমতাটাকে তার নিজের ব্যক্তিগত ক্ষমতা বলে মনে করে। কারণ ব্যক্তিগত ক্ষমতা দুনিয়ার প্রায় সব পুরুষ মানুষই কামনা করে।

অথচ, যাদের সেবায় নিয়োজিত ওরা, সেই জনসাধারণের উপর সব সময় ভূমির আগুনের মত একটা চাপা আক্রোশ রয়েছে ওদের মনে। ওরা মানুষের অধিকারের রক্ষক যেমন, তেমনি ভক্ষকও বটে। নাগরিকদেরকে রক্ষা করে ওরা, অথচ এতটুকু কৃতজ্ঞতাবোধ নেই তাদের, শুধু গাল দেয়, শুধু কুৎসা রটায়। বাপের চাকর বলে মনে করে ওদেরকে, শুধু ফরমাস করে, শুধু দাবি জানায়। কিন্তু একটু ছিলতে গেলে, একটু শোষণ করতে গেলে বা একটু শাস্তি দিতে গেলে ধরা দেবে না ওরা, পিছলে বেরিয়ে যাবে। সাজ্যাতিক চতুর আর বিপজ্জনক ওরা, কতরকম ছল-

চাতুরী যে জানে তার হিসেব নেই। যদি বা একজনকে নিজেদের খপ্পরে আনতে পারে পুলিশ, সাথে সাথে যে-সমাজকে তারা রক্ষা করে আসছে সেই সমাজই তার সমস্ত কৌশল আর ক্ষমতা প্রয়োগ করে এত কষ্টে ধরা শিকারটিকে তাদের হাত থেকে ছোঁ মেরে কেড়ে নিতে চায়। রাজনৈতিক নেতারা দুর্নীতিপরায়ণ বেআইনী ব্যবসায়ীকে বাঁচাবার জন্যে নিজেদের ক্ষমতা ব্যবহার করে। কুখ্যাত গুণা-বদমায়েশকে লঘু সাজা দেয় জজ সাহেবরা, তারপর সে-সাজাও আবার রদ করে দেয়। পুলিশদের বিশ্বাস, দুষ্কর্ম করার আগেই দুষ্কৃতকারীদেরকে খালাস করার ব্যবস্থা উকিল সাহেবরা যদি করতে না পারতেন, তাহলে গভর্নর মহোদয়রা আর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট স্বয়ং অপরাধীদের বিচার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ ঘোষণা করে স্নেহ মাফ করে দেবার আইন জারি করতেন।

সময় বয়ে যাবার সাথে সাথে পুলিশরাও বুঝতে শিখল, তাদেরও চোখ খুলতে শুরু করল। গুণা আর দুর্নীতিবাজরা টাকা সাথে, সে টাকা না নিয়ে কেন তারা ঠকতে যাবে? টাকার দরকার পুলিশদেরই তো সবচেয়ে বেশি। তারাই তো সেবা দেয়, বিনিময়ে কেন তাদের ছেলেমেয়েরা ভাল খেতে-পরতে পাবে না? কেন তাদের ছেলেমেয়েরা ভাল স্কুল-কলেজে গিয়ে লেখাপড়া শিখে মানুষ হবার সুযোগ পাবে না? তাদের স্ত্রীরা অভিজাত সুপারমার্কেটে গিয়ে কেন দামী দামী বিলাস আর শখের জিনিস কিনতে পারবে না? তারা নিজেরাই বা কেন ছুটিছাটার সময় ফ্লোরিডার সাগরসৈকতে গিয়ে মিষ্টি রোদ পোহাবে না? এসবের বিরুদ্ধে যে যাই বলুক, এ-কথা তো ঠিক যে ওরা নিজেদের প্রাণের উপর ঝুঁকি নিয়ে দায়িত্ব পালন করে। সেটা কি ছেলেখেলা ব্যাপার? চাট্রিখানি কথা? সুতরাং কেন তারা ঘুস না খেয়ে নিজেদের আর স্ত্রী-কন্যা-পুত্রদের বঞ্চিত করবে?

তবে, সাধারণভাবে প্রায় সব পুলিশই নোংরার মধ্যে সবচেয়ে মলিন টাকা খেতে আপত্তি করে। গোপন জুয়ার আড্ডাখানার মালিকদের কাছ থেকে টাকা খায় ওরা, বিনিময়ে তারা যাতে নির্বিঘ্নে ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারে সেদিকে নজর রাখে। ড্রাইভাররা পার্কিং এলাকার বাইরে কোথাও গাড়ি রেখে অথবা বেঁধে দেয়া স্পীড লিমিটের চেয়ে অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালিয়ে ধরা পড়লে টাকার বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দিতে আপত্তি নেই ওদের। পকেটে কিছু এলে খারাপ মেয়েমানুষ আর বেশ্যাদেরকেও ব্যবসা চালিয়ে যেতে দেয়। এ-ধরনের নগণ্য দুর্নীতি করা তো মানুষের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ড্রাগ-বিজনেস, সশস্ত্র ডাকাতি বা রাহাজানি, ধর্ষণ, খুন এবং এই জাতের বিকৃত-বীভৎস আর সব অপরাধকে নগণ্য অপরাধ বলে মনে করে না ওরা, এসব ক্ষেত্রে সাধারণত টাকা খেতে রাজী হয় না। তার কারণ, ওদের বিশ্বাস, এই জাতের সাংঘাতিক অপরাধগুলো ওদের ব্যক্তিগত ক্ষমতার একেবারে উৎসমূলে গিয়ে আঘাত হানে। এতলোকে মেনে নিলে ওদের ক্ষমতার উৎস ধ্বংস হয়ে যাবার ভয় রয়েছে, তাই এই ধরনের অপরাধ সহ্য করতে রাজী নয় ওরা।

পুলিশকে খুন করা আর সরকারপ্রধান বা রাজাকে খুন করা একই কথা। এই হত্যাকাণ্ডের নায়কের ক্ষমা নেই। কিন্তু যেই রটে গেল যে খুন হবার সময় ক্যাপটেন ম্যাকক্লান্সির সাথে তার বন্ধু হিসেবে পরিচিত কুখ্যাত ড্রাগ-ব্যবসায়ী

ছিল, তাছাড়া কাউকে কাউকে খুন করার ষড়যন্ত্রের সাথে সে-ও জড়িত ছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, অমনি প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছাটা ধীরে ধীরে কমে আসতে শুরু করল পুলিশের মন থেকে। তাছাড়া, এত কড়াকড়িভাবে আইন প্রয়োগ করে সব বেআইনী কাজ অচল করে দিলে তাদের নিজেদের উপায়টা কি হবে? যে-যাই বলুক, বাড়ি করার জন্যে বাংক থেকে লোন নিতে হয়েছে, প্রতি মাসে সুদসহ কিস্তির টাকাটা তো মেটাতে হবে। ছেলেমেয়েদের ভাল খাওয়া-পরার ব্যবস্থা তো করতে হবে, তাদেরকে পুঁজি দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ তো করে দিতে হবে। বেআইনী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে এতদিন নিয়মিত যে টাকাটা পেয়ে এসেছে তা হঠাৎ যদি অনির্দিষ্ট কালের জন্যে না পায়, পুলিশদের সংসারই বা চলে কি করে? যে-সব হকার আর ফেরিওয়ালাদের লাইসেন্স নেই তাদের কাছ থেকে দুপুরের খাওয়ার পয়সাটা জুটে যায়। অজায়গায় গাড়ি রাখে যারা তারা কয়েক ডলার জরিমানা দেয়া আর আনুষঙ্গিক ঝামেলা এড়াবার জন্যে খুচরো পাঁচ-দশ সেন্ট ওদের হাতে ভুঁজে দিয়ে রেহাই পেয়ে যায়। সমকাম, মারামারি বা কোন সন্দেহজনক আচরণের জন্যে যাদেরকে থানায় নিয়ে আসা হয় তাদের কাছ থেকেও বেশ কিছু আদায় হয়। কিন্তু ক্যাপটেন ম্যাকক্লান্সি খুন হবার পর থেকে এ ধরনের সব রোজগারের রাস্তা একেবারে বন্ধ। একজন বজ্জাত, নীতিচ্যুত অফিসারের জন্যে তারা সবাই কেন দুর্ভোগ পোহাবে? কেন বঞ্চিত হবে? একটা অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠছে ক্রমশ পুলিশদের মধ্যে।

শেষ পর্যন্ত উপরওয়ালাদের মন গলল। দয়া হলো। ঘুসের রেট বাড়িয়ে দিয়ে মাফিয়া পরিবারগুলোকে তাদের ব্যবসা চালাবার অনুমতি দিলেন তাঁরা।

থানায় তৈরি হলো আবার নতুন চাঁদা আদায়ের তালিকা, চাঁদার কত ভাগ কে পাবে তাও নির্দিষ্ট করে দেয়া হলো। এতে করে সবকিছু আগের মত স্বাভাবিক আর পরিবেশটা ঠাণ্ডা হয়ে এল, তা নয়। তবে সামাজিক শৃঙ্খলা বেশ খানিকটা ফিরে এল।

টম হেগেনের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনায় হাসপাতালে ডন কর্লিয়নি যে কামরাটিতে রয়েছেন সেটি পাহারা দিচ্ছে একটা প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থা। তবে শুধু এদের উপরই সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়নি ওরা। গোটা হাসপাতালটাকে কড়া প্রহরার মধ্যে রেখেছে টেসিওর দলের জবরদস্ত সৈনিকরা। কিন্তু এত কিছুর পরও সন্তুষ্ট হতে পারছে না সনি। তার ইচ্ছাতেই ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সম্পূর্ণ নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে আসা হলো ডনকে।

অ্যাম্বুলেন্সে চড়ে নিজের বাড়িতে এলেন ডন। ইতিমধ্যে কিছু সংস্কার করা হয়েছে বাড়িটার। হাসপাতালের একটা কামরার মত দেখতে হয়েছে তাঁর শোবার ঘরটা। তাঁর শরীরের অবস্থা হঠাৎ যদি আশঙ্কাজনক হয়ে ওঠে, তখন চিকিৎসা সংক্রান্ত যা কিছু দরকার হতে পারে তার সবই যোগাড় করে এই ঘরে রাখা হয়েছে। বাছাই করা কয়েকজন নার্সের উপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাঁর সেবা-ওক্ষ্যা করার, এদের জন্মের ইতিহাস থেকে শুরু করে জীবনের সমস্ত ঘটনার খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে তবে বহাল করা হয়েছে চাকরিতে। ডনের কখন কি দরকার

হয়, সেজন্যে রাতদিন চক্ষিণ ঘণ্টা তাঁর মাথার পিছনে এবং খাটের দু'পাশে পালা করে দাঁড়িয়ে থাকুক এরা। মোটা টাকা ফি দিয়ে এই ব্যক্তিগত হাসপাতাল-ঘরটার আবাসিক চিকিৎসক হতে রাজী করানো হয়েছে ড. কেনেডিকে।

নতুন কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের পর উঠানটা এখন একেবারে দুর্ভেদ্য একটা দুর্গ হয়ে উঠেছে। বাড়তি বাড়িগুলো এখন আর খালি নেই, সশস্ত্র সৈনিকদেরকে নিয়ে এসে রাখা হয়েছে সেগুলোয়। এই বাড়িগুলোয় এর আগে পর্যন্ত যারা বসবাস করছিল তাদেরকে সমস্ত খরচপত্র ছাড়াও আরও কিছু বেশি টাকা দিয়ে ইটালীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, তারা যে যার গ্রামে গিয়ে ছুটি কাটাচ্ছে এখন।

শরীর আর মন সুস্থ করার জন্যে লাস ভেগাসে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ফ্রেডিকে। সেখানে সৌখিন হোটেল আর জুয়া খেলার ক্যাসিনো তৈরি করছে কর্লিয়নি পরিবার। স্বাস্থ্য উদ্ধারের সাথে সাথে ব্যবসাও দেখাশোনা করবে ফ্রেডি। লাস ভেগাস পশ্চিম তীরের মাফিয়া সাম্রাজ্যের একটা অংশ, ওই সাম্রাজ্যের অধিপতিরা কেউ নিউ ইয়র্কের ছয় পরিবারের যুদ্ধে নাক গলায়নি। ওখানকার ডন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি জীবিত থাকতে ফ্রেডির কোন বিপদ হবে না।

নিউ ইয়র্কের পাঁচটা পরিবার ফ্রেডি কোথায় আছে জানার পরও তার দিকে হাত বাড়াল না। যুদ্ধে কর্লিয়নিদের পক্ষে ফ্রেডির কোন অবদান নেই, তাকে খতম করে কোনদিক থেকে কোন লাভ নেই, বরং লোকসান। কেননা ফ্রেডিকে যারা আশ্রয় দিয়েছে তারা পাঁচ পরিবারের নতুন শত্রু হিসেবে উদয় হবে। নিউ ইয়র্কের ঝামেলা সামলাতেই তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত, দূরে শত্রু সৃষ্টি করে ঝামেলা আর বাড়তে চায় না কেউ।

কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন ড. কেনেডি, ব্যবসা সংক্রান্ত কোনও আলোচনা ডনের সাথে বা তাঁর সামনে করা চলবে না। সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হচ্ছে সেই নিষেধ। সকলের আপত্তি কানে না তুলে নিজের ইচ্ছায় তাঁর কামরায় বৈঠক বসিয়েছেন ডন। হাসপাতাল থেকে প্রথম যেদিন বাড়ি ফিরলেন, সেই রাতেই সবাইকে ডেকে পাঠালেন তিনি। সনি, টম হেগেন, পীট ক্রেমেঞ্জা আর টেসিও তাঁর কামরায় এসে জড়ো হলো।

এখনও খুব দুর্বল ডন, বেশি কথা বলতে পারছেন না। কিন্তু তবু তাঁর একান্ত ইচ্ছা যা কিছু ঘটেছে সব তিনি ঊনবেন এবং চরম সিদ্ধান্ত তিনি নিজে নেনবেন। ক্যাসিনোর জুয়া খেলা ব্যবসা শেখার জন্যে লাস ভেগাসে পাঠানো হয়েছে ফ্রেডিকে, এ-কথা শুনে মাথা দুলিয়ে কাজটাকে সমর্থন এবং ওদের এই সিদ্ধান্তটাকে অনুমোদন করলেন ডন। তারপর তাঁকে জানানো হলো, কর্লিয়নিদের সৈনিকরা ক্রনো টাটাগ্লিয়াকে মেরে ফেলেছে। এদিক-ওদিক মাথা দুলিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি। সলোযো আর ক্যাপটেন ম্যাকক্লান্সিকে খুন করেছে মাইকেল, লুকিয়ে থাকার জন্যে তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে সিসিলিতে, কথাটা শোনারমাত্র আশ্চর্য একটা বিচলিত ভাব দেখা গেল ডনের চেহারায়, যা কেউ কখনও দেখেনি। স্ববরটা কানে ঢোকামাত্র ইশারায় সবাইকে তিনি তাঁর কামরা থেকে চলে যেতে বললেন।

নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ওরা সবাই। কোণার কামরাটা একটা লাইব্রেরী, এখানে

সব আইনের বই রাখা হয়, কথাবার্তা বলার জন্যে এই লাইব্রেরীতে এসে বসল ওরা। ডেস্কের পিছনে প্রকাণ্ড একটা রিভলভিং চেয়ার, লম্বা-চওড়া ব্লিরাট শরীর নিয়ে সেটায় হেলান দিয়ে বসল সনি, হাত দুটো রাখল হাতনে, লম্বা করে দিল পা দুটো।

বলল, ‘হুগা দুই বিগ্রাম করতে দেয়া উচিত বাবাকে। তার আগে ডাক্তার বোধহয় তাঁকে কাজ করার অনুমতি দেবে না।’

সনি আরও কিছু বলবে ধরে নিয়ে চুপ করে আছে সবাই।

‘আমি চাই,’ কয়েক সেকেন্ড পর আবার বলল সনি, ‘বাবা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার আগেই আবার কাজকর্ম শুরু করা হোক। পুলিশ তো ইঙ্গিতে জানিয়েই দিয়েছে আবার ব্যবসা শুরু করতে পারি আমরা। হারলেমের পলিসি ব্যাংকগুলোর কি হবে, এটা প্রথম প্রশ্ন। এতদিন চুটিয়ে মজা লুটেছে কানো ছোকরাগুলো, ওদেরকে হটিয়ে দিয়ে এবার আমরা নিজেদের জায়গা দখল করব। সমস্ত ব্যাপার যতটা পারা যায় অগোছাল করে রেখেছে ব্যাটারা, যে-কোন কাজে হাত দিলেই এই রকম বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দেয়াই স্বভাব ওদের। জুয়ায় যারা জেতে, ওদের চররা তাদেরকে টাকা দেয় না। ক্যাভিনাক গাড়িতে চেপে মক্কেলদের কাছে যায়, গিয়ে বলে জিৎ-এর টাকা পেতে হলে অপেক্ষা করতে হবে। নয়তো পাওনা টাকার অর্ধেক দেয়, বাকিটা মেরে খায়। চরেরা খুব পয়সাওয়ালা লোক, মক্কেলরা এটা টের পাক, তা আমি চাই না। চাই না পাওনাদাররা তাদের পাওনা থেকে এক বিন্দু বঞ্চিত হোক। চরেরা ঘন ঘন দামী স্যুট বদল করে ঘুরে বেড়াবে, বা নতুন মডেলের গাড়ি চেপে বেড়াবে, এসব আমি একেবারেই পছন্দ করি না। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের ব্যবসাতে ফ্রি-ল্যান্সারদের রাখতে চাই না আমি। ওদের কোন দায়-দায়িত্ববোধ নেই, ওদেরকে দিয়ে কাজ করালে বদনামের ভাগীদার হওয়া ছাড়া আর কোন লাভ নেই। টম, এর একটা বিহিত-ব্যবস্থা এখনি শুরু করে দাও তুমি। পুলিশের তরফ থেকে কড়াকড়ি শিথিল করা হয়েছে, এ-খবর তোমার কাছ থেকে পেলোই এবার আমরা কি করতে যাচ্ছি তা ওরা সাথে সাথে টের পেয়ে যাবে, লেজ তুলে কেটে পড়বে সবাই, রাতারাতি আবার সব ফিরে পাব আমরা।’

‘কিন্তু হারলেমে কিছু দুর্দান্ত টাইপের ছোকরা আছে,’ বলল টম হেগেন, ‘টাকার স্বাদ পেয়ে সাম্প্রতিক লোভী হয়ে উঠেছে তারা। এখন কি আর তারা চর অথবা সাব-ব্যাংকারের কম পয়সার কাজ করতে রাজী হবে?’

মস্ত কাঁধ ঝাঁকাল সনি। বলল, ‘রাজী না হলে ওদের নামগুলো জানিয়ে দিয়ে ক্রেমেঞ্জাকে। এসব সমস্যার সমাধান করা তো ওর দায়িত্ব।’

হেগেনের দিকে ফিরল ক্রেমেঞ্জা। আশ্বাস দিয়ে বলল, ‘চিন্তার কিছু নেই, ব্যাপারটা আমি মিটিয়ে ফেলব।’

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, জরুরী সমস্যার কথাটা তুলল টেসিও। ‘কিন্তু আমরা কাজ শুরু করলেই একসাথে হামলা আরম্ভ করবে পাঁচ পরিবার। হারলেমে আমাদের ব্যাংকারদের ওপর, ইস্ট সাইডে আমাদের বুক মেকারদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ওরা। আমাদের ব্যবস্থাপনায় রেডিমেড কাপড়ের ব্যবসাস্থানো চলছে, সেখানেও হানা দিতে ছাড়বে না শয়তানের বাচ্চারা। ওদেরকে ঠেকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে তবে ব্যবসায় হাত দিতে হবে আমাদেরকে, কিন্তু তাতে প্রচুর টাকা

বেরিয়ে যাবে।’

‘এতটা বাড়াবাড়ি করার সাহস বোধহয় হবে না ওদের,’ বলল সনি। ‘ওরা জানে, গায়ে আঁচড় লাগলে আমরাও ছেড়ে দেব না, উল্টো মার দেব। শান্তি-প্রস্তাব দিয়ে সবার কাছেই তো দূত পাঠিয়েছি আমি। আশা করছি, কোনো টাটাগ্লিয়ার জন্যে কিছু ক্ষতিপূরণ দিলে মিটমাট করে ফেলবে ওরা।’

‘না,’ বলল হেগেন। ‘আমার কাছে খবর এসেছে, তোমার প্রস্তাবকে ওরা আমলই দিচ্ছে না। গত ক’মাসে যে বিরাট অঙ্কের টাকা লোকসান দিতে হয়েছে ওদের, তার জন্যে আমাদেরকে দায়ী করেছে ওরা। আসল কথা, ওদের ড্রাগ ব্যবসায় আমাদের সহযোগিতা চাইছে। আমাদের রাজনৈতিক প্রভাব আছে, সেটা ওদের অনুকূলে খাটালেই নির্বিঘ্নে ব্যবসাটায় হাত দিতে পারে। তার মানে, ওরা চাইছে, সলোযো নেই ভালই হয়েছে, কিন্তু সলোযোর প্রস্তাবটা আমরা যেন মেনে নিই। কিন্তু আরও খানিক যুদ্ধ করে আগে আমাদেরকে আরও কিছুটা দুর্বল করে নিতে চাইছে, তারপর প্রস্তাবটা নতুন করে তুলবে। ওদের বিশ্বাস, লোকসান দিয়ে আর নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আমরা যখন নরম হব, তখন নিশ্চয়ই মেনে নেব প্রস্তাবটা।’

কঠিন সুরে বলল সনি, ‘অসম্ভব! ড্রাগ নিয়ে ব্যবসা হতে পারে না। বাবা “না” বলেছেন, সুতরাং তাঁর মতের পরিবর্তন না হলে জবাবটা “না”ই থাকল।’

দ্রুত বলল হেগেন, ‘একটা বাস্তব অসুবিধেও দেখতে পাচ্ছি আমি। বুকমেকিং অথবা পলিসি ব্যবসাতে খোলাখুলি খাটছে আমাদের টাকা। ওখানে আমাদের ক্ষতি করা মোটেও কঠিন নয়। কিন্তু টাটাগ্লিয়াদের এমন কোন ব্যবসা নেই যেখানে ওরা আমাদের মত খোলাখুলি টাকা খাটাচ্ছে। ডক ইউনিয়নগুলোর কাছ থেকে পয়সা খায় ওরা, পয়সা খায় বেশ্যা পাড়াগলো থেকে। ওদের এইসব রোজগারের ওপর কিভাবে মার দেয়া যায়? আর সব পরিবার কিছু কিছু জুয়া ব্যবসা চালায় বটে, তবে বাড়ি তৈরির ব্যবসাতে টাকা খাটানো, শ্রমিকদের সংঘ পরিচালনা করা, সরকারী কন্ট্রাস্ট যোগাড় করা—বেশিরভাগ এই সমস্ত ব্যাপারেই জড়িত ওরা। নিরীহ, সং লোকদের ওপর অন্যায়-অত্যাচার চালিয়েও বেশ কিছু রোজগার হয় ওদের। তার মানে, আমি বলতে চাইছি, ওদের টাকা রাস্তাঘাটে ছড়ানো থাকে না, কিন্তু আমাদের থাকে। হ্যাঁ, একটা নাইট ক্লাব আছে বটে টাটাগ্লিয়াদের, কিন্তু এত বেশি বিখ্যাত হয়ে উঠেছে সেটা যে ওটাকে ছুঁতে গেলে নিজেদের বোকামিই প্রমাণ করব আমরা, আমাদের দুর্নামে ছেয়ে যাবে দেশটা। মনে রাখতে হবে, ডন যতদিন দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে মাঠে নামতে না পারছেন ততদিন আমাদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ওদের চেয়ে বেশি নয়। তাই বলছি, এখানে একটা বড় সমস্যা রয়েছে আমাদের।’

‘সমস্যাটা আমার, টম,’ বলল সনি। ‘এর সমাধানও আমি খুঁজে বের করব। ওদের সাথে কথাবার্তা যেমন হচ্ছে হোক, সেই সাথে কাজের কাজগুলোও শুরু করে দাও। ব্যবসা আবার আমাদেরকে শুরু করতেই হবে, করবও তাই, তারপর দেখা যাবে কি হয় না হয়। আগে অবস্থাটা তো বুঝি। অবস্থা বুঝে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যাবে। ক্রেমেঞ্জা আর টেসিওর দলে সৈনিক তো আর কম নেই।

তাছাড়া, ওই পাঁচ পরিবারের হাতে মোট যত অস্ত্র আর গোলাবারুদ আছে, তার চেয়ে বেশি আছে আমাদের হাতে। সত্যি যদি বাড়াবাড়ি করেই, আমরাও না হয় তোশক নেব।’

স্বাধীনভাবে চলাফেরায় অভ্যস্ত হারলেমের নিগ্রো ব্যাংকারদের হটিয়ে দিতে কোন সমস্যাই পোহাতে হলো না। কর্লিয়নিরা কাউকে পাঠান না পর্যন্ত, শুধু একটা খবর পৌঁছে দিল পুলিশকে। পুলিশই হানা দিল আস্তানায়। প্রচণ্ড আঘাতে সব তছনছ করে দিল রাতারাতি। ব্যবসা টিকিয়ে রাখার জন্যে কোন পুলিশ কর্তাকে বা কোন রাজনৈতিক নেতাকে ঘুষ দেয়া এখনও যুক্তরাষ্ট্রে একজন নিগ্রো পক্ষে অসম্ভব কল্পনা। কারণ, নিগ্রোদের উপর গোটা জাতির বিদ্বেষ আর অনাস্থা রয়েছে, ওদেরকে কেউ সহ্যই করতে পারে না। তবে, কর্লিয়নিরা সব সময়ই ছোট্ট একটা সমস্যা বলে মনে করে এসেছে হারলেমকে সমাধানটা যে সহজেই হয়ে যাবে সে-ব্যাপারে কারও মনে কোন সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু পাঁচ পরিবার আঘাত করল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত আরেক দিক থেকে। রেডিমেড পোশাক কারখানার দুই প্রভাবশালী শ্রমিক নেতা খুন হয়ে গেল। এরা কর্লিয়নি পরিবারের লোক ছিল। কর্লিয়নিদের মহাজনুরা জাহাজ ঘাটে যাবার পথে বাধা পাচ্ছে, একই সমস্যায় পড়ছে ওদের বুক মেকাররা। জাহাজ ঘাটের ডক-শ্রমিকদের সংঘগুলো পরিচালনা করে কর্লিয়নিরা, তারা রাতারাতি দল ত্যাগ করে যোগ দিল পাঁচ পরিবারের সাথে। শহরের সব জায়গা থেকে প্রতি মুহূর্তে খবর এসে পৌঁচাচ্ছে নিজেদের দলে যোগ দিতে রাজী করাবার জন্যে পাঁচ পরিবারের গুণ্ডাপাণ্ডারা নানা ভাবে ভয় দেখাচ্ছে কর্লিয়নি বুকমেকারদের। কর্লিয়নিদের একজন পুরানো বন্ধু এবং সমর্থক আছে হারলেমে। বিখ্যাত ‘নাস্কার্স ব্যাংকার’ সে নিষ্ঠুরভাবে খুন করা হলো তাকে। তার মানে, সত্যি বাড়াবাড়ি করারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাঁচ পরিবার আর কোন উপায় নেই। ক্যাপোরেজিমিদের তোশক নিতে বলল সনি।

দুটো ফ্ল্যাটের দখল নেয়া হলো শহরে তোশক পেতে দেয়া হল সশস্ত্র সৈনিকদের শোবার জন্যে। খাবারদাবার রাখার জন্যে একটা করে রেফ্রিজারেটর নিয়ে আসা হয়েছে। প্রচুর পরিমাণে বুলেট, বিস্ফোরক আর আগ্নেয়াস্ত্র তো আছেই। ফ্ল্যাট দুটোয় ক্রেমেঞ্জা আর টেসিওর সৈনিকরা অস্ফাদা অস্ফাদা ভাবে রয়েছে। ওদিকে শহরের প্রত্যেক বুক-মেকারকে একজন করে বডিগার্ড দেয়া হয়েছে। কিন্তু হারলেমের পলিসি ব্যাংকাররা বিরোধী দলে যোগ দেয়ায় তাদের জন্যে কিছু করার দরকার পড়ছে না এখনই। এতসব দিক সামাল দিতে গিয়ে খরস্রোতা নদীর স্রোতের মত বেরিয়ে যাচ্ছে কর্লিয়নিদের টাকা, অথচ ঘরে একটা পয়সাও আসছে না।

আরও কয়েক মাস কেটে গেছে, এখন আরও কয়েকটা ব্যাপার পরিষ্কার পড়ছে স্ট্রুখে। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং আশঙ্কাজনক ব্যাপার—পাঁচ পরিবার কর্লিয়নিদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

এর পিছনে কারণও রয়েছে অনেক। ব্যবসা সংক্রান্ত কোন বিষয়ে অংশগ্রহণ করার মত শারীরিক সুস্থতা এখনও ফিরে পাননি ডন কর্লিয়নি। ফলে কর্লিয়নি

পরিবারের রাজনৈতিক ক্ষমতা পুরোপুরি কাজে লাগানো যাচ্ছে না, বেশিরভাগই অকর্মণ্য হয়ে আছে। আরেকটা কারণ, গত এক যুগ শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ায় দুই ক্যাপোরেজিমির আগের সেই যুদ্ধ করার শক্তিতে ঘুণ আর ক্ষয় ধরেছে। ঘাতক আর ব্যবস্থাপক হিসেবে এখনও সক্রিয় রয়েছে বটে ক্লেমেঞ্জা, কিন্তু সশস্ত্র সৈনিকদের নেতা হবার সেই প্রচণ্ড উৎসাহ বা অদম্য প্রাণশক্তি এখন আর নেই তার মধ্যে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে অনেক নরম হয়ে গেছে টেসিও-ও, যথেষ্ট নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেয়া তার পক্ষেও এখন সম্ভব নয়। নানা তাৎপর্যপূর্ণ ক্ষমতা হাতে থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধকালীন উপদেষ্টা হবার যোগ্যতা টম হেগেনেরও নেই। একজন সিসিলীয় নয়, এটাই ওর প্রধান দোষ।

যুদ্ধের জন্যে শক্তিবিন্যাস করার সময় পরিবারের এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি আর দুর্বলতা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠল সনি, কিন্তু এই সব দোষ-দুর্বলতা দূর করে পরিবারটিকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাবার কোন উপায় নেই ওর হাতে। পরিবারের কর্তা তো আর সে নয়, ক্যাপোরেজিমি বা কনসিলিয়রি বদল করার ক্ষমতা একমাত্র ডনেরই থাকে। তাছাড়া নতুন করে পদ ভাগ-বাঁটোয়ারা করলেই যে সব সমস্যা মিটে যাবে ব্যাপারটা তাও তো নয়, তাতে বরং কাউকে কাউকে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্যে প্ররোচনা দেয়া হয়ে যাবে। বিপদের উপর বিপদ ডেকে আনার কোন ইচ্ছা এই পরিস্থিতিতে সম্ভবত ডনেরও ইত না।

প্রথম দিকে মনে মনে ঠিক করেছিল সনি, ডন সুস্থ হয়ে আবার নেতৃত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত যেমন চলছে চলুক সব, চরম কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে বর্তমান পরিস্থিতির চেহারায়ে আমূল পরিবর্তন আনার চেষ্টা সে করবে না। কিন্তু কয়েকটা ব্যাপার নতুন করে ঘটতে শুরু করায় চিন্তিত হয়ে উঠেছে সে। পলিসি ব্যাংকাররা ঝাঁকে ঝাঁকে দল ছেড়ে চলে যাচ্ছে, গিয়ে হাত মেলাচ্ছে পাঁচ পরিবারের সাথে। শত্রুপক্ষ ভয় দেখাচ্ছে, জুলুম করছে বুক-মেকারদের। মানুষের চোখে হয়ে প্রতিপন্ন হচ্ছে কর্লিয়নি পরিবার। মান-মর্যাদা আর সম্মান কমে যাচ্ছে দিনে দিনে। সনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। পাল্টা আঘাত হানবে সে।

বুদ্ধিটা ভালই পাকাল সনি। ঠিক করল, পাঁচ পরিবারের একেবারে মূলে আঘাত করবে সে। মোক্ষম একটা মাত্র চাল চালবে, পাঁচ পরিবারের পাঁচ কর্তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবে।

উদ্দেশ্যটা ভয়ঙ্কর। তাই আঁটঘাট বেঁধে কাজটায় হাত দিল সনি। জটিল, অতি গোপনীয় একটা পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা ফেঁদে পাঁচ পরিবারের পাঁচ কর্তার গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে সে।

বুদ্ধিটা ভাল, কিন্তু ধোপে টিকল না। প্রাথমিক আয়োজন শুরু করেছে সনি, এক হুগাও কাটেনি, অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে পাঁচ পরিবারের পাঁচ কর্তা এমনভাবে গা ঢাকা দিলেন যে কোথাও তাঁদের ছায়া পর্যন্ত দেখা গেল না আর।

দুই পক্ষ এখন সমান সতর্ক। এটাই সামগ্রিক যুদ্ধ শুরু হবার পূর্ব-মূহূর্ত। পাঁচ পরিবার আর কর্লিয়নি সাম্রাজ্যের মধ্যে এবার চালমাৎ অবস্থা।

চার

আমেরিগো বনাসেরার ব্যবসা হলো মৃতদেহ সাজানো এবং সমাধিস্থ করা। সে একজন আগারটেকার। তার প্রতিষ্ঠানটা মালবেরী স্ট্রীটে, বাড়ি থেকে খুব বেশি দূরে নয়। তাই রোজই বৈকালিক নাস্তা খেতে বাড়ি আসে সে। তারপর আবার কাজের জায়গায় ফিরে যায়। সেখানে গভীর, বিষম পরিবেশে সাজিয়ে রাখা হয় লাশগুলো। তাদের আত্মীয়-বন্ধুরা শোক প্রকাশ করার জন্যে আসে, শোক-বিহ্বল মানুষগুলোকে সঙ্গ দেয় বনাসেরা।

ওর ব্যবসা সংক্রান্ত খুঁটিনাটি নানা অতি গুরুত্বপূর্ণ আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান সম্পর্কে কেউ ঠাট্টা তামাশা করলে সাজাতিক বিরক্ত হয় বনাসেরা। অবশ্য ওর বাড়ির কেউ, আত্মীয় বা প্রতিবেশীরা এ বিষয়ে কখনোই তামাশা করে না। শত শত বছর ধরে মাথার ঘায় পায়ে ফেলে পেটের রুটি যোগাড় করে যারা, তারা কোন পেশাকেই অশ্রদ্ধার চোখে দেখে না।

নিরেট, মজবুত আসবাব-পত্র দিয়ে সাজানো বনাসেরার বাড়িটা। স্ত্রীর সাথে সাপার খেতে বসেছে সে। পাশেই খাবার রাখার র্যাকে গিলটি করা কুমারী মেরীর মূর্তির সামনে লাল কাঁচের গম্বুজের ভিতর মোমবাতির শিখা কাঁপছে। একটা ক্যামেল সিগারেট ধরিয়ে, এক গ্লাস আমেরিকান হুইস্কি হাতে নিয়ে আরাম করে বসে আছে সে। দু'প্লেট ধুমায়িত গরম সুপ এনে টেবিলে রাখল স্ত্রী। বাড়িতে এখন ওরা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই। মেয়েকে বোস্টনে তার খালার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, যাতে সেই দুই দুর্বৃত্তের হাতে পড়ার ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা আর আঘাতের কথা ভুলতে পারে। বদমাশ দুটোকে অবশ্য ডন কর্লিয়নি উপযুক্ত সাজাই দিয়েছিলেন।

সুপ খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল স্ত্রী, 'আজ আবার কাজে যাচ্ছ নাকি গো?'

আমেরিগো বনাসেরা উপর-নিচে মাথা দোলাল। স্ত্রী ওর কাজকে শ্রদ্ধার চোখে দেখলেও, এই কাজের মাহাত্ম্য সে ঠিক বুঝে ওঠে না। স্বামীর কাজের কারিগরি দিকটার গুরুত্ব সব চাইতে কম, এটা তার মাথায় ঢোকে না। আর সব লোকের মত তারও ধারণা লোকে ওকে টাকা দেয়, কারণ ওর হাতের কৌশল এতটাই নিপুণ যে কফিনে শোয়া মৃতদেহগুলোকে একেবারে জ্যান্ত বলে মনে হয়। সন্দেহ নেই, এ-বিষয়ে ওর দক্ষতা অপরিমিত। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়েও জরুরী ব্যাপার, মৃতের জন্যে নিশিপালনে ওর ব্যক্তিগত উপস্থিতি। রাতে-প্রিয়জনের কফিনের পাশে আত্মীয়-বন্ধুদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য শোকাহত পরিবারটি এসে পৌছায়, তখন আমেরিগো বনাসেরাকে ছাড়া তাদের চলে না।

শোকাহত পরিবারের কাছে কর্তব্যনিষ্ঠ অভিভাবক সে। মুখ আশ্চর্য গাভীর, অথচ কত শক্তি যোগায়, কত সান্ত্বনা দেয়। কণ্ঠস্বর অবিচলিত, অথচ নিচু পর্দায় নামানো। শোক-প্রকাশ অনুষ্ঠানের সেই তো পরিচালক। অশোভন শোকোচ্ছ্বাস শান্ত করতে পারে সে, উন্মাদ ছেলেমেয়েদের শান্ত করতে মা-বাপের মনের জোরে

না কুলোলে বনাসেরা তাদের শাসন করে। সমবেদনা জানাতে গিয়ে কখনও সে বাড়াবাড়ি করে না, আবার কোন সময় অবহেলাও দেখায় না। একবার প্রিয়জনের শেষ-পরিচর্যার জন্যে যারী বনাসেরার কাছে এসেছে, বারবার তারা ফিরে আসে তার কাছে। বনাসেরাও পৃথিবীর মাটির উপর সেই শেষ ভয়ঙ্কর রাতে ওদের কাউকে পরিত্যাগ বা অনাদর করে না।

খাবার পর সাধারণত একটা ঘুম দেয় বনাসেরা। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে, আরেকবার দাড়ি কামিয়ে, প্রচুর পাউডার মেখে দাড়ির ঘন বাড় গোপন করে রাখে। সুগন্ধি ওষুধ দিয়ে কুলকুচি করা তার একটা অভ্যাস। শব্দা প্রকাশ করার জন্যে পরিষ্কার গেঞ্জি, ধবধবে সাদা শার্ট কালো টাই, গাঢ় রঙের নতুন ইস্ত্রি করা সুট, ঘান কালো জুতো, কালো মোজা পরে। তার এই বেশভূষা দর্শকদের মনে সান্ত্বনা এনে দেয়। কলপ দিয়ে চুল কালো করে রাখে বনাসেরা, যদিও ওর সমবয়সী ইতালীয় পুরুষদের কারও মধ্যে এগন চপলতা দেখা যায় না। তবে এটা কোন সৌখিনতা নয় বনাসেরার। এখানে-সেখানে পেকে গিয়ে বিচ্ছিরি কাঁচা-পাকা চেহারা হয়েছে ওর চুলের। ওর ধারণা, চুলের এই দু'রকম রঙ ওর পেশার জন্যে শোভন নয়।

সুপ খাওয়া শেষ হতে সামনে মাংসের ছোট একটা স্টেক এনে রাখল ওর স্ত্রী, সেই সাথে কয়েক চামচ সবুজ পালং শাক, তেল গড়াচ্ছে তা থেকে। অল্প খাওয়া-দাওয়া করে বনাসেরা। সবশেষে এক পেয়ালা গরম কফি হাতে নিয়ে একটা ক্যামেল সিগারেট ধরাল। অভাগিনী মেয়েটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আর কখনও আগের চেহারা ফিরে পাবে না বেচারী। বাইরের চেহারা মোটামুটি ফিরিয়ে আনা গেছে, কিন্তু চোখে আহত পশুর মত এমন একটা ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব এসে গেছে যে মেয়ের দিকে তাকাতে পারে না বনাসেরা। আপাতত তাকে বোস্টনে পাঠিয়ে দেবার সেটাও একটা কারণ। সমুদ্রে ক্ষতগুলো ঠিকই সেরে যাবে, ব্যথা আর ভয়ের চেহারা তো আর মৃত্যুর মত স্থায়ী নয়। মৃতদেহ নাড়াচাড়া করাই পেশা ওর, সেই অভিজ্ঞতা থেকে জানে, ভয় আর আঘাতের ধাক্কা ঠিকই কাটিয়ে উঠবে তার মেয়ে।

কফি খাওয়া সবে শেষ হয়েছে, এই সময় বৈঠকখানার টেলিফোনটা ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল। স্বামী বাড়িতে থাকলে স্ত্রী কখনও ফোন ধরে না, তাই উঠে দাঁড়াল বনাসেরা। ফোনের দিকে এগোচ্ছে সে, সেই সাথে টাই আর শার্টের বোতাম খুলছে। এবার একটু ঘুম দেব, ভাবছে সে। রিসিভার তুলে সবিনয়ে জানতে চাইল, 'হ্যালো?'

'আমি টম হেগেন,' অপরপ্রান্ত থেকে কর্কশ, বেসুরো কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'ডন কর্লিয়নির অনুরোধে তাঁর তরফ থেকে আপনার সাথে কথা বলছি।'

মাথাটা ঘুরে উঠল আমেরিগো বনাসেরার। পেটের ভিতর পাক খেয়ে উপর দিকে উঠে আসতে চাইছে কফিটা। অতি কষ্টে বমি বমি ভাবটা দমন করছে সে। তার মেয়ে যাদের হাতে সম্মান খুইয়েছিল তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে ডন তাকে ঝণী করে রেখেছেন, সে যে ঝণী হয়ে থাকল তা সে ডনের কাছে স্বীকারও করেছিল। বিনিময়ে, যদি কখনও প্রয়োজন হয়, সেই দেনার পরিবর্তে একটা

উপকার চাইতে পারেন বলে তাকে জানিয়ে রেখেছিলেন ডন। যারা তার মেয়ের সর্বনাশ করেছিল তাদের রক্তমাখা মুখ দেখে তখন বনাসেরার মনে হয়েছিল ডনের জনো পারে না এমন কোন কাজ নেই দুনিয়ায়। কিন্তু ডনের কাছে ঋণ স্বীকার করার পর এক বছরের বেশি পেরিয়ে গেছে। সময় বয়ে যাবার সাথে সাথে রূপের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষয় হয় কৃতজ্ঞতাবোধ। হঠাৎ সামনে সর্বনাশ দেখলে মানুষের মন যেমন বিষিয়ে ওঠে বনাসেরারও তাই হলো। একটা একটা করে শব্দ উচ্চারণ করে উত্তর দিল সে, কিন্তু গলার কম্পনটা তাতে চাপা দেয়া গেল না। 'হ্যাঁ। বুঝছি বলুন। শুনছি।'

হেগেনের কণ্ঠস্বরে ঠাণ্ডা হিম একটা ভাব লক্ষ করে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে বনাসেরা। কনসিলিয়রি ইতালীয় নয় বটে, কিন্তু তার ব্যবহারে ভদ্রতার অভাব কখনও দেখেনি সে। কি এমন হয়েছে যে এখন এমন চাচ্ছাছোলা, অমার্জিত ভঙ্গিতে কথা বলছে? কোন কারণই অনুমান করতে পারছে না বনাসেরা।

'আপনার কাছে একটা উপকার পাওনা আছে ডন কর্নিয়ানির। আপনি তাঁর কাছে ঋণী। আপনার সেই ঋণ শোধ করার সময় হয়েছে। আপনি তা শোধ করবেন। এ-বিষয়ে তাঁর মনে কোন সন্দেহ নেই। দেনা শোধ করার এই সুযোগটা পেয়ে আপনি খুশি হবেন, তাও তিনি জানেন। এখন থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে, তার আগে নয়, একটু দেরিও হতে পারে, তিনি আপনার প্রতিষ্ঠানে আসছেন। পাওনা উপকারটা নেবেন বন্ধে।' এত কথা বলছে হেগেন, অথচ কেমন যেন অপরিচিত লাগছে তার কণ্ঠস্বরে। এমন ঠাণ্ডা কিন্তু কঠিন ভঙ্গিতে তাকে কখনও কথা বলতে শোনেনি বনাসেরা। 'তাকে অভ্যর্থনা করার জন্যে আপনাকে উপস্থিত থাকতে হবে। কর্মচারীরা কেউ ওখানে থাকতে পারবে না। ছুটি দিয়ে সবাইকে বাড়ি পাঠিয়ে দিন। এতে যদি কোন আপত্তি বা অসুবিধে থাকে আপনার, এখুনি বলুন। আমি আপনার আপত্তির কথা তাঁকে জানিয়ে দিচ্ছি। আরও অনেক বন্ধু আছে তাঁর, এ-কাজটা করে দিতে পারবে তারা।'

বিষম ভয় পেয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল বনাসেরা, 'আপনি এ কি বলছেন? গড ফাদারের আদেশ মানব না, তা আপনি ভাবতে পারছেন কিভাবে? তাঁর যে-কোন হুকুম পালন করব আমি। তাঁর কাছে আমি ঋণী, সে-কথা কি করে ভুলে যাই? এখুনি আমি রওনা হয়ে যাচ্ছি আগার কাজের জায়গায়।'

আগের চেয়ে একটু কোমল শোনালা হেগেনের কণ্ঠ, 'ধন্যবাদ ও প্রশংসা আমার। আপনি যে ঋণ শোধ করবেন সে-ব্যাপারে কোন সন্দেহই নেই ডনের মনে। আজ তাঁর এই উপকারটা আপনি করুন, পরে যে-কোন বিপদে আমার কাছে এলে আমার ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব পাবেন আপনি।'

কথাটা শুনে আরও ঘাবড়ে গেল বনাসেরা। ভোতলাচ্ছে সে, 'আ-আজ রাতে ডন নি-নিজে আসবেন আ-আমার কাছে?'

'হ্যাঁ।'

'উনি যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন সেজন্যে তাহলে যীশুকে ধন্যবাদ দিই।' প্রশ্নের মত শোনালা বনাসেরার কথাটা।

ফোনের অপরপ্রান্তে কয়েক সেকেন্ড কোন শব্দ নেই, তারপর আশ্চর্য নিচু

গলায় বলল হেগেন, 'হ্যাঁ।' কট করে কেটে গেল ফোনের কানেকশন।

দর দর করে ঘামছে বনাসেরা। শোবার ঘরে এসে শার্ট বদলাল, চোখে-মুখে পানি ছিটাল, কুলকুচি করল। কিন্তু দাড়ি কামাল না, গলায় নতুন টাইও বাঁধল না। টেলিফোন করল সহকারীকে। জানান, সামনের সীটিংরুমে যে শোকবিশ্বল পরিবারটি রয়েছে তাদেরকে ছেড়ে কোন অবস্থাতেই কোথাও যেন না যায় সে। বনাসেরা মনে মনে ঠিক করেছে বাড়ির যে অংশে ল্যাবরেটরির কাজ হয় সেখানে থাকবে সে নিজে। সহকারীকে কোন প্রশ্ন করার অবকাশ না দিয়ে বলল তার নির্দেশ যেন অমান্য করা না হয়।

এখনও খাওয়া শেষ হয়নি ওর স্ত্রীর। গায়ে কোটটা চাপিয়ে এঘরে বনাসেরা আসতেই অবাক চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

'বাইরে আমার কাজ আছে,' বলল বনাসেরা। স্বামীর চেহারা দেখে কোন প্রশ্ন করতে সাহস পেল না স্ত্রী। দ্রুত বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এল বনাসেরা। ফিউনারেল পার্লারে পৌঁছল সে পায়ে হেঁটে।

বাড়িটা বিরাট, সাদা রেইলিং দিয়ে ঘেরা। বড় রাস্তা থেকে সরু একটা গলি চলে গেছে সেটার পিছন দিকে। গলিটা এতই সরু যে কোনরকমে একটা অ্যান্ডুলেস ঢুকতে পারে। গেট খুলল বনাসেরা, সেটাকে খোলা রেখেই সরু গলিটা ধরে বাড়ির পিছন দিকে চলে এল। পিছনের দরজাটা বেশ চওড়া। ভিতরে ঢোকার সময় দেখল শোকে মুগ্ধে পড়া আত্মীয়-স্বজনরা তাদের সদ্যমৃত প্রিয়জনকে শেষবারের মত দেখার জন্যে সামনের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকছে।

বেশ অনেক বছর আগে আরেকজন আগারটেকারের কাছ থেকে এই বাড়িটা কিনেছে বনাসেরা। তখন বাড়ির ভিতর ঢুকতে হলে দশ প্রস্থ সিঁড়ি ভাঙতে হত। বিকট একটা সমস্যা ছিল সেটা। বয়োবৃদ্ধ কিংবা শোকে মূহ্যমান আপনজনেরা তাদের প্রিয় মৃত ব্যক্তিকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসে আবিষ্কার করত দশটা সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার শক্তি এখন নেই তাদের। তখনকার মানিক অবশ্য এইসব লোককে মান তোলার একটি লিফট ব্যবহার করতে দিত। বাড়ির পাশেই ছিল সেটা, ছোট একটা মঞ্চের মত উপরে উঠে যেত। সাধারণত কফিন আর লাশ তোলার কাজেই ব্যবহার করা হত লিফটটাকে। মাটির নিচে নেমে যেত প্রথমে, তারপর উঠত গিয়ে একেবারে বৈঠকখানায়। কফিন রাখার জায়গার পাশেই চোরা একটা দরজা আছে, সেটা খুলতে হলে শোকে কাতর লোকজনদেরকে তাদের চেয়ার সরিয়ে নিতে হত। এই চোরা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকতে হত দুর্বল বুড়োদের।

ব্যাপারটা অশোভন আর কৃপণতার পরিচয় বলে মনে হয়েছিল বনাসেরার। তাই বাড়িটার সামনের দিকটা আমূল সংস্কার করেছে সে। প্রবেশ পথটা সিঁড়িসহ তুলে ফেলে দিয়ে সে-জায়গায় অল্প ঢালু একটা পথ তৈরি করে নিয়েছে, কফিন-বাক্স আর লাশ তোলার জন্যে লিফটটাও আছে।

বাড়ির একেবারে ভিতর দিকে, কয়েকটা বসার ঘরের পিছনে সাউণ্ডপ্রুফ কামরাটা আগারটেকারের সেরেস্টা, সেটা আবার কয়েক ভাগে ভাগ করা। মেডিসিন দিয়ে মৃতদেহ তাজা রাখার ব্যবস্থা করতে হয়, তার জন্যে আলাদা ঘর।

কফিন রাখার জন্যে আরেকটা কামরা, সেখানে বড় তালার গারা ছোট্ট একটা খুপরিতে রাখা হয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি আর বিদ্যুটে চেহারার নানা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। অফিস রুমে ঢুকে ডেস্কের পিছনে আরাম কেরারায় বসল বনাসেরা। এবাড়িতে যতক্ষণ থাকে, সিগারেট প্রায় খায় না বললেই চলে, কিন্তু নিজের অজান্তে একটা ক্যামেল সিগারেট ধরাল সে। এখন তার অপেক্ষার পালা। ভাগ্যে কি আছে, জানে না। মাথার ভিতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। তিনি আসছেন। ডন কর্লিয়নি।

অপেক্ষার প্রতিটি সেকেণ্ড অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে কাটছে তার। ভাগ্যে কি ঘটতে যাচ্ছে না জানলেও কি কাজ করতে বলা হবে তাকে সে ব্যাপারে কোন ভুল ধারণা বা এতটুকু সন্দেহ নেই তার মনে। নিউ ইয়র্কের পাঁচ পরিবার গত প্রায় এক বছর ধরে যুদ্ধ করেছে কর্লিয়নিদের সাথে। যুদ্ধে হতাহতের খবর প্রতিদিন ছাপা হচ্ছে খবরের কাগজে। শুধু ছাপা হচ্ছে বলে কিছুই বলা হয় না, প্রতিটি খবরের কাগজ ওদের খুন-খারাবির খবরেই ভরাট হয়ে থাকে। দু'পক্ষই অগুনতি লোকজন হারাচ্ছে। বনাসেরার ধারণা, কর্লিয়নিরা নিশ্চয়ই এখন এমন কাউকে খুন করেছে যার লাশ আবিষ্কার হতে দেয়া যায় না, নিশ্চয়ই সেই লোকটা প্রতিপক্ষের কর্তা ব্যক্তিদের একজন হবে। সেজন্যেই লাশটাকে গুম করতে চাইছে কর্লিয়নিরা, একেবারে 'নেই' করে দিতে চাইছে। তা করতে হলে একজন রেজিস্টার্ড সমাধি ব্যবসায়ীর সাহায্য একান্ত দরকার ওদের। সেই পারে আইন এবং বিধিতে একটা লাশকে কবর দিতে। এর চেয়ে উত্তম, উৎকৃষ্ট আর নিরাপদ উপায় আর কি হতে পারে?

এই কাজটা করতে গিয়ে নিজের জন্যে কি ধরনের বিপদ ডেকে আনছে সে-ব্যাপারেও কোন ভুল ধারণা নেই বনাসেরার। ডন কর্লিয়নির আদেশ মেনে নেয়ার অর্থ হবে খুন-গোপন করতে খুনীকে সাহায্য করা। খুনের সহায়তাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হবে তাকে। ব্যাপারটা অবশ্য জানাজানি হওয়া না হওয়ার উপর নির্ভর করবে। জানাজানি হয়ে গেলে বছরের পর বছর জেলের ঘানি টানতে হবে তাকে। ধুলোয় লুটাবে তার পারিবারিক সম্মান। তার মেয়ে আর স্ত্রীর দিকে লোকে আঙুল তুলে বলবে, ওদের বাড়ির কর্তা হত্যাকাণ্ডে সহায়তা করার জন্যে জেলে গেছে। শুধু তাই নয়, মাফিয়াদের একজন চর বলে মনে করা হবে তাকে। জীবনে যে কখনও অন্যায়ভাবে একটা পয়সা কামায়নি, যে সারাটা জীবন চেষ্টা করেছে সং থাকার, তাকে দেশের সবাই জানবে কুখ্যাত মাফিয়াদের লোক বলে।

শরীরটা ঢিল করে দিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরাল বনাসেরা। আরও অনেক বিপদের কক্ষ ভাবছে সে। কর্লিয়নিদেরকে সাহায্য করলে অন্য মাফিয়া পরিবারগুলো কি অবস্থা করবে তার? কথাটা যদি তাদের কানে যায়, তাকে শত্রু বলে ধরে নেবে ওরা। মাফিয়ারা শত্রুদের সাথে কি আচরণ করে জানা আছে বনাসেরার। ফোন সতর্কবাণী নয়, কিছু নয়, স্নেহ খুন করে ফেলবে তাকে। এখন ভাবছে, কি ভীমরতি ধরেছিল তাকে, কি কুক্ষণে সে গড ফাদারের কাছে মেয়ের সম্মান বাঁচাবার জন্যে প্রতিশোধ ভিক্ষা চাইতে গিয়েছিল। ওর স্ত্রীর সাথে ডন কর্লিয়নির স্ত্রীর পরিচয় হয়েছিল যেদিন সেই দিনটাকে অভিশাপ দিচ্ছে সে। অভিশাপ

দিচ্ছে নিজেকে, মেয়েকে, স্ত্রীকে। মনে মনে গালাগালি করছে আমেরিকাকে, নিজের সাফল্যকে। কিন্তু, খানিক পর আরেকটা কথা মনে পড়ে যেতে কিছুটা আশার আলো দেখতে পেল সে। ভাবছে, আসলে হয়তো সব নিরাপদেই চুকে বুকে যাবে, কোন বিপদ-আপদ ঘটবে না। ক্ষুরধার বুদ্ধি রাখেন ডন কর্লিয়নি, কাচা কাজ করার পাত্র তিনি নন, নিশ্চয়ই গোটা ব্যাপারটা গোপন করার পাকা ব্যবস্থা করবেন তিনি। বনাসেরা অনুভব করছে, যে কোন ভাবে হোক নিজের মাথাটা ঠাণ্ডা রাখতে হবে তাকে, এমন কিছু করা বা বলা চলবে না যাতে তার ভয়টা প্রকাশ হয়ে পড়ে। সবচেয়ে বড় বিপদ, কোন সন্দেহ নেই, ডন কর্লিয়নির তরফ থেকে আসারই সম্ভাবনা তার, তার স্ত্রীর, তার মেয়ের, এমন কি গোটা জগৎসংসারের চরম সর্বনাশ হয়ে গেলেও ডন কর্লিয়নি, গড ফাদারকে অসন্তুষ্ট করা চলবে না।

কাঁকর বিছানো রাস্তায় গাড়ির চাকার শব্দ। বুকটা ধড়াস করে উঠল বনাসেরার। ঢোক গিলে গলাটাকে স্বাভাবিক করে রাখার চেষ্টা করছে সে। ওদিকে কান দুটো সজাগ হয়ে আছে। সরু গলিটা দিয়ে এসে পিছনের উঠানে থেমেছে একটা গাড়ি। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে, পা দুটো কাঁপছে একটু একটু। দরজাটা খুলে দিল সে। প্রথমে ভিতরে ঢুকল প্রকাণ্ডেহী ভোঁতা চেহারার পাঁট ক্রেমেঞ্জা। তার পিছনে হিংস্র বুনো জানোয়ারের মত চেহারা নিয়ে দুই যুবক। তিনজনের মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না, পাথরের মূর্তির মত নিষ্প্রাণ, কিন্তু গম্ভীর থম থম করছে। তার দিকে ভাল করে তাকান না পর্যন্ত, একটা কথা বলল না। প্রত্যেকটা কামরা, বাথরুম, গলি-ঘুঁজি, স্টোররুম—বাড়ির প্রতিটি ইঞ্চি তন্ন-তন্ন করে সার্চ করল ওরা। সার্চ করা শেষ হতে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল ক্রেমেঞ্জা। বুনো চেহারার যুবকেরা রয়ে গেল বনাসেরার সাথে, তাকে যেন পাহারা দিচ্ছে।

অপেক্ষা করছে ওরা। কিন্তু কেউ কারও সাথে কথা বলছে না। ওদেরকে কোন প্রশ্ন করার কোন ইচ্ছা বা সাহস কোনটাই নেই বনাসেরার, তার ভয় ওরা না তাকে কিছু জিজ্ঞেস করে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। কয়েক মিনিট কেটে গেল। হঠাৎ সরু গলি থেকে ভেসে এল আবার একটা গাড়ি আসার শব্দ। শব্দটা ভারী, শুনেই বুঝতে পারল বনাসেরা, একটা অ্যাম্বুলেন্স আসছে।

আবার তার বিশাল শরীর নিয়ে উদয় হলো ক্রেমেঞ্জা। তার পিছনে দু'জন লোক। তারা একটা স্ট্রেচার বয়ে নিয়ে এল যে দুঃস্বপ্নটা এতক্ষণ ধরে দেখছিল বনাসেরা, সেটা এবার কঠোর বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে। ছাই রঙের কস্মল দিয়ে মোড়া একটা লাশ শোয়ানো রয়েছে স্ট্রেচারে। লাশের হলদেটে পা দুটো খালি, কস্মলের বাইরে একটু বেরিয়ে আছে।

নিঃশব্দে ইশারা করল ক্রেমেঞ্জা। স্ট্রেচারটাকে স্মেডিসিন রুমে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। উঠানে গাঢ় অন্ধকার, সেখান থেকে আরেকজন এসে ঢুকল আলোকিত অফিসরুমে। তিনি গড ফাদার। ডন কর্লিয়নি।

অসুস্থতার জন্যে আগের চেয়ে অনেক হালকা হয়ে গেছেন, হাঁটছেনও একটু আড়ষ্ট ভঙ্গিতে। টুপিটা হাতে ধরে রেখেছেন, প্রকাণ্ড কবোটির উপর চুলগুলোকে আশ্চর্য পাতলা লাগছে। মেয়ের বিয়ের দাওয়াত খেতে গিয়ে সেই শেষ দেখেছিল

তাকে বনাসেরা, তারপর আবার আজ দেখা। এক বছরের কিছু বেশি হয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে যেন বিশ বছর বয়স বেড়ে গেছে তাঁর। সেই লাভণ্যও নেই চেহারায়, শুধু একটা ভাব দেখা যাচ্ছে। নিজের বুকের উপর টুপিটা চেপে ধরলেন গড ফাদার। বনাসেরাকে বললেন, 'এই যে, পুরানো বন্ধু, উপকারটা করে দিতে তৈরি আছ তো?'

মুখে কথা যোগাল না বনাসেরার, শুধু উপর-নিচে মাথা দোলাল সে। স্ট্রেচারের পিছু পিছু মেডিসিন রুমে ঢুকছেন ডন, ধীর পায়ে তাঁকে অনুসরণ করছে বনাসেরা। প্রতিটি টেবিলের দু'পাশে নালি রয়েছে। একটা টেবিলে কম্বল মোড়া লাশটা নামানো হলো। টুপি নেড়ে ইঙ্গিত করলেন ডন। সাথে সাথে কামরা থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল সবাই।

'কি করতে হবে আমাকে?' ফিস ফিস করে জানতে চাইল বনাসেরা।

নির্নিমেষ দৃষ্টিতে টেবিলটার দিকে তাকিয়ে আছেন ডন কর্নিয়নি। 'তোমার সমস্ত সাধা, সমস্ত নিপুণতা, সারা জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করতে বলছি। ওর মা ওকে এভাবে দেখুন তা আমি চাই না।' ধীর পায়ে এগোচ্ছেন ডন। টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ালেন। হাত বাড়ালেন ছাই রঙের কম্বলটার দিকে। এক সেকেণ্ডে শূন্য স্থির হয়ে থাকল তাঁর হাতটা। তারপর আস্তে করে লাশের উপর থেকে সরিয়ে নিলেন কম্বলটা।

বহু বছরের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও শিজের অজান্তে আতঙ্কিত একটা শব্দ বেরিয়ে এল বনাসেরার গলা থেকে। প্রচণ্ড ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল তার শরীর। অবিশ্বাসে কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখের মণি দুটো।

বুলেটের আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে মুখটা। টেবিলে শুয়ে আছে সনি কর্নিয়নির লাশ। বাঁ চোখটা ভরাট হয়ে আছে রক্তে, মণিটা ফেটে চৌচির। নাকের সেতু ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে, বাঁ দিকের চোয়াল বিধ্বস্ত।

এক সেকেণ্ডের তিন ভাগের এক ভাগ সময়ের জন্যে বনাসেরার কাঁধে একটা হাত রেখে নিজেকে পড়ে যাওয়া থেকে সাংগলে নিলেন ডন কর্নিয়নি। 'দেখো, আমার ছেলেকে কি বিশেষ ভাবে মেরেছে ওরা

পাঁচ

কেন এমন হলো? সনির এই অকস্মাৎ মৃত্যুর জন্যে দায়ী কে? রহস্যের আঁচ পেতে হলে একটু পিছন দিকে তাকাতে হয়।

রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতি। শত্রুপক্ষ টের পেয়ে গেছে কর্নিয়নিদের উদ্দেশ্য। পাঁচ পরিবারের উপর মরণ আঘাত হানতে চায় সনি। এটাই হয়তো কাল হয়ে দেখা দিল ওর জন্যে। পাঁচ পরিবারের পাঁচ প্রধানকে খুন করার ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা করতে গিয়েই হয়তো নিজের মৃত্যুকে ডেকে আনল সে। অথবা, সম্ভবত, ওর ভিতর যে রক্ত লোলুপ হিংস্র পিশাচটা ঘুমিয়ে ছিল এতদিন সেটা হঠাৎ করে জেগে উঠে সমস্ত কিছু ধ্বংস করে দিতে গিয়েই ডেকে আনল নিজের সর্বনাশ। যে কারণেই হোক

বসন্ত আর গ্রীষ্মকালের পুরোটা সময় বিরোধীদের সমর্থকদের উপর অর্থহীন আঘাত হানতে শুরু করে দিল সনি কর্লিয়নি।

হারলেমে টাটাগিয়া পরিবারের বেশ্যা-ব্যবসা খুব জমজমাট, সেখানে ওদের দালালরা গুলি খেয়ে মারা যাচ্ছে। জাহাজঘাটগুলোয় নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্যে পাঁচ পরিবার গুণ্ডা-বাহিনী মোতায়েন করেছে, তারাও প্রতিদিন দু'একজন করে গুম হয়ে যাচ্ছে—বুকে আর মাথায় বুলেটসহ কারও কারও লাশও পাওয়া যাচ্ছে। শ্রমিকসংঘের কর্মীরা পাঁচ পরিবারের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে জানার পর সনি তাদেরকে সাবধান করে দিয়ে খবর পাঠান তারা যেন এই যুদ্ধে কোন পক্ষ অবলম্বন না করে। কিন্তু তাতে কোন ফল হলো না। কর্লিয়নিদের বুক-মেকার আর মহাজনরা জাহাজঘাটার দিকে ভিড়তেই পারে না। এ পরিস্থিতিতেও ক্রেমেঞ্জাকে তার দলবলসহ সেখানে পাঠান সনি। ক্রেমেঞ্জার সৈনিকরা অযথা শ্রমিকদের পাইকারীভাবে খুন করে যাচ্ছেতাই কাণ্ড শুরু করে দিল।

এই রোমহর্ষক হত্যাযজ্ঞের কোন মানে নেই, কারণ এর উপর পাঁচ পরিবারের সাথে ওদের যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করে না। যুদ্ধ-বিশেষজ্ঞ হিসেবে সনি কৌশলী এবং আশ্চর্য বিচক্ষণ, প্রতিটি খণ্ডযুদ্ধে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে সে। কিন্তু একটা জিনিসের অভাব রয়েছে এর মধ্যে, এই মুহূর্তে সেটার দরকার সবচেয়ে বেশি। সেটা হলো, নিখুঁতভাবে দক্ষতার সাথে পরিকল্পনা করার প্রতিভা। এই গুণটা ডন কর্লিয়নির রয়েছে, কিন্তু বাপের কাছ থেকে গুণটি তার বড় ছেলে পায়নি।

গোটা ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর একটা গেরিলা যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। ক্ষতি কোন পক্ষকেই কম স্বীকার করতে হচ্ছে না। নদীর স্রোতের মত টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে দু'পক্ষেরই, যোদ্ধারাও মারা যাচ্ছে অসংখ্য। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে অত্যন্ত লাভজনক কয়েকটা বুক-মেকার ঘাঁটি বন্ধ করে দিতে হলো কর্লিয়নিদের। এগুলোর মধ্যে একটা আবার কার্লো রিটসির। এই বুক-মেকার ব্যবসা থেকে যা আয় হয় তাই দিয়েই সংসার চলে তার। আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মদ ধরল কার্লো, থিয়েটারের নাচিয়ে গাইয়ে ছুকরী মেয়েগুলোর পিছু নিল সে। এদিকে বাড়িতে বেচারী কনির অশান্তি আর যন্ত্রণার সীমা-পরিসীমা নেই।

সনির হাতে উত্তমমধ্যম খাওয়ার পর থেকে কনিকে আর কখনও মারধোর করেনি কার্লো। কিন্তু তাই বলে প্রতিশোধ নিতেও ছাড়ছে না। সেই থেকে কনির সাথে শোয় না সে।

অনেকবার অনেক ভাবে স্বামীর মন গলাতে চেষ্টা করেছে কনি। শেষ পর্যন্ত কার্লোর পা জড়িয়ে ধরে কেঁদেছে। মন গলেনি কার্লোর। নিষ্ঠুর হেসে স্ত্রীকে প্রত্যাখ্যান করেছে সে। নিজের বিছানায় শুতে নেয়নি কনিকে। কার্লোর ধারণা, স্ত্রীকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে এক ধরনের অভিজ্ঞত গর্ব এবং আনন্দ আছে, রোমের সম্রাটরা যা উপভোগ করতেন। ঠোঁটের কোণ বাঁকা করে ব্যঙ্গের সুরে কনিকে সে বলে, 'যাও, তোমার বড় ভাইজানকে ডেকে আনো। ডেকে নিয়ে এসে বলো, তোমার সাথে আমি শুতে রাজী হচ্ছি না। শুনেই আমাকে পেটাতে শুরু করবে ও, মারের চোটে আমি হয়তো তখুনি তোমাকে নিয়ে গুয়ে পড়ব! যাও! ডাকো!'

কিন্তু মুখে যাই বলুক, দেখা হলে যতই নিরুত্তাপ ভদ্রতা দেখাক, কার্লো যমের চেয়েও বেশি ভয় করে সনিকে। বুদ্ধি দিয়ে এটুকু অন্তত পরিষ্কার বুঝতে পারে সে যে সনি তাকে অন্যায়সে মেরে ফেলতে পারে। মানুষ মারা সনির জন্যে কোন সমস্যাই নয়, ছেনে-পিলেদের কাছে যেমন কোন সমস্যা নয় পিঁপড়ে মারা। চিন্তা করতে হয় না সনিকে, মনটাকে শক্ত করে নিতে হয় না—ইচ্ছা হলেই দেয় শেষ করে—এবং তারপরই ভুলে যায়। কিন্তু কার্লোর পক্ষে ব্যাপারটা তা নয়। মানুষ সে খুন করতে পারবে, কিন্তু সেজন্যে তাকে মনের সবটুকু বল, শক্তি প্রয়োগ করতে হবে, সঙ্কল্পে থাকতে হবে অটল। তারপর কাজটা শেষ হলে নিজেকে সামলাবার জন্যে প্রচুর মদের সাহায্য দরকার হবে তার।

এখানেই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে সনি কর্নিয়নির চেয়ে মানুষ হিসেবে ভাল সে, অবশ্য এদের সম্পর্কে আদৌ যদি ভাল শব্দটা ব্যবহার করা যায়—সে যাই হোক, এ-কথাটা কিন্তু একবারও মনে হয়নি কার্লোর। সনির মধ্যে ভয়ঙ্কর পাশবিকতা লক্ষ করে মনে মনে হিংসা হয় তার। ইদানীং সনির এই পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার কথা লোকের মুখে মুখে ফেরে।

কর্নিয়নি পরিবারের কনসিলিয়রি হিসেবে সনির এই উন্মত্ত কীর্তিকলাপ অনুমোদন করে না টম হেগেন। কিন্তু তবু সিদ্ধান্ত নিয়েছে এ-বিষয়ে ড্রনের কাছে অভিযোগ করবে না সে। তার কারণ, পদ্ধতিটার খারাপ দিকগুলো যতই থাকুক, এতে কিছু কিছু কাজও হচ্ছে বৈকি। দেখেওনে তারও মনে হচ্ছে ধীরে ধীরে নরম হয়ে আসছে পাচ পরিবার, এ-ধরনের ধ্বংসাত্মক লড়াই আরও কিছু দিন চললে ওদের পাল্টা আঘাতগুলো ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়বে, তারপর হয়তো একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে।

শত্রুপক্ষের শান্ত হাবভাব এবং মার খেয়ে মার হজম করার প্রবণতা প্রথম দিকে সন্দেহের চোখেই দেখছিল হেগেন। কিন্তু সনি প্রথম থেকেই খুব আশাবাদী। রীতিমত উল্লাস লক্ষ করা যায় তার মধ্যে। হেগেনকে বলে, 'থামছি না আমি। চালিয়ে যাচ্ছি, যাবও তাই। বেজন্মারা তাহলে আপোস করার জন্যে কৈঁদে পড়বে পায়ে।'

শুধু যুদ্ধ নয়, সাংসারিক বিষয়েও অশান্তিতে ভুগছে সনি। ওর স্ত্রী সান্ড্রা বিগড়ে গেছে। কারণ এরই মধ্যে কারও জানতে বাকি নেই যে লুসি ম্যানচিনি প্রচণ্ড একটা নেশার মত হয়ে উঠেছে সনির কাছে। সবাই বলাবলি করে মেয়েটা নাকি যাদু করেছে সনিকে। সনির পুরুষাঙ্গ আর মিলনের ভঙ্গি ইত্যাদি নিয়ে প্রকাশ্যে ঠাট্টা-মস্কারা করলেও সান্ড্রা আসলে বিছানায় স্বামীর সান্নিধ্য প্রচণ্ডভাবে কামনা করে। কিন্তু দিনের পর দিন, হণ্ডার পর হণ্ডা সান্ড্রার সাথে এক বিছানায় ঘুমাচ্ছে না সনি। অবহেলা, অপমান আর যৌন তাড়নায় অস্থির সান্ড্রা খিটখিটে মেজাজের হয়ে উঠেছে, অতিষ্ঠ করে তুলেছে সনির জীবন।

এসব ছাড়াও, সনি জানে শত্রুপক্ষের লক্ষ্য-ভেদে অব্যর্থ হাজার হাজার খুনী এক সেকেণ্ডের একটা সুযোগের অপেক্ষায় আছে শুধু, সেই সুযোগটা পাওয়ামাত্র তাকে ওরা খুন করে ফেলবে। যে লোক এ-ধরনের এই সংখ্যক ঘাতকদের লক্ষ্য তার একটা মানসিক ক্লেশ থাকতেই হবে। প্রতিটি কাজে, প্রতিটি মুহূর্তে সতর্ক

থাকতে হয় ওকে। লুসি-ম্যানচিনির কাছে ওর যাওয়া-আসা শত্রুদের কাছে এখন আর গোপন কোন বিষয় নয়, এও জানে সনি। তবে এক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে সে। জানে, মানুষের ইতিহাস-খ্যাত দুর্বলতাটা ওখানেই, মেয়েমানুষ নিয়ে বেশি মাতামাতি ধ্বংস ডেকে আনে। সেজন্যেই এমন ব্যবস্থা করেছে যে এদিক থেকে বিপদ ঘটানোর প্রায় কোন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ঘৃণাক্ষরেও জানে না লুসি যে সান্তিনোর বিশ্বাসী লোকেরা রাতদিন চক্ষিণ ঘণ্টা নজর রেখেছে তার উপর। তারপর, লুসির পাশের ফ্ল্যাটটা খালি হয়ে যেতেই কর্নিয়নিদের সবচেয়ে বিশ্বাসী লোকদের একজন সাথে সাথে সেটা ভাড়া নিয়ে নিল।

ধীরে ধীরে হলেও সেরে উঠছেন ডন কর্নিয়নি পরিবারের নেতৃত্ব কাঁধে নিতে খুব বেশি দেরি করবেন না তিনি। সবাই জানে, ডন চাঙা হয়ে উঠে হাল ধরলেই যুদ্ধের মোড় ঘুরে পরিস্থিতি কর্নিয়নিদের অনুকূলে চলে আসতে বাধ্য। এ ব্যাপারে সনির মনেও কোন সন্দেহ নেই। তাই মনে মনে স্থির করেছে যতদিন না সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতে পারছেন বাবা, ততদিন নিজের পদ্ধতিতেই সে তাদের পারিবারিক সাম্রাজ্য রক্ষা করে যাবে, অর্জন করবে বাপের প্রশংসা—এবং, ডন-এর সর্বোচ্চ পদটা যেহেতু কংশপরম্পরায় নিশ্চিতভাবে পাবার মত নয়, তাই কর্নিয়নি সাম্রাজ্যের ওয়ারিশ হবার দাবিটা পাকা করে রাখতে চাইছে সনি।

ওদিকে ওদের শত্রু পাঁচ পরিবারও চুপ করে বসে নেই, তারাও মতলব ভাঁজছে। সমস্ত পরিস্থিতিটা বিবেচনা বিশ্লেষণ করে তারা একটামাত্র সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে: সমূহ পরাজয় এড়িয়ে যাবার একমাত্র উপায় সনি কর্নিয়নিকে সরিয়ে দেয়া। সনির পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড দেখে এতদিনে চোখ খুলেছে ওদের, এখন ওরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে ডন কর্নিয়নির সাথে বোঝাপড়া বা কারবার করা তবু সম্ভব হতে পারে, কারণ সবাই জানে তিনি যুক্তি বোঝেন, মেনেও চলেন। কিন্তু সনির কাছে যুক্তি চলে না। রক্তপাত ঘটানোতেই যত আনন্দ তার। তার ধারণা সীমাহীন খুন-খারাবি করতে পারলেই সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে, শত্রুরা নতি স্বীকার করবে। শুধু এই একটা কারণেই পাঁচ পরিবারের চোখের বিষ হয়ে উঠেছে সনি। সনি বোঝে না, সে যা করছে তাতে ব্যবসা-বুদ্ধির এতটুকু পরিচয় নেই। একবারও ভেবে দেখেনি সে যে আগেকার সেই দিন আর আজকের দিনের মধ্যে অনেক পার্থক্য। হত্যাযজ্ঞে কেউ মেতে উঠতে চায় না আজ, তাতে ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যবসার ক্ষতি কিছুতেই সহ্য করতে পারে না মাফিয়া পরিবারগুলো।

একদিন সন্ধ্যাবেলার ঘটনা।

কার্লোর বাড়িতে একটা ফোন এল। এই সময় কার্লোর বাড়িতে থাকার কথা নয়, কখনও থাকে না, আজও নেই। ফোনটা করেছে একটা মেয়ে। কিন্তু নিজের নাম বলছে না। তবু আরেকবার জিজ্ঞেস করল কনি, ‘তুমি কে কথা বলছ?’

অপরপ্রান্তে থিক থিক করে অশ্লীল ভঙ্গিতে হাসছে মেয়েটা। কনির প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, ‘কার্লোকে দরকার আমার।’

‘সে বাড়ি নেই।’

আবার সেই অশ্লীল হাসি। তারপর বলল, ‘কার্লো আমার বিছানার বন্ধু। আজ রাতে ওর সাথে আমার দেখা হবে না, শুধু এই কথাটা ওকে জানানোর জন্যে ফোন

করেছি। শহরের বাইরে যাব কিনা।’

‘বেশ্যামাগী! খান্‌কি মাগী—’ রাগে অন্ধ কনি কনিয়নি চোঁচাতে শুরু করল। সাথে সাথে কট করে কেটে গেল কানেকশন।

ঘোড়দৌড়ের মাঠে গেছে কার্লো, অনেক রাত করে ফিরল সে। রেস খেলায় প্রচুর হেরে গেছে, মেজাজ তার আজ এমনতেই সপ্তমে চড়ে আছে। মদের বোতল সারাক্ষণ সাথে রাখে সে, সেটা প্রায় শেষ করে আধা মাত্রাল অবস্থা তার। দরজার চৌকাঠ টপকে ঘরে সবে পা দিচ্ছে, অমনি অপ্রাণ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে শুরু করল স্বামীকে কনি।

কিন্তু স্ত্রীর গালমন্দ গায়ে মাখছে না কার্লো। ওনেও না শোনার ভান করে বাথরুমে ঢুকল সে শাওয়ার সারার জন্যে। গোসল শেষ করে বাথরুম থেকে খালি গায়ে বেরিয়ে এল সে। কনি দাঁড়িয়ে আছে সামনে, তুফান ছুটছে তার মুখে, কিন্তু সেদিকে জক্ষেপ না করে সাজগোজ করছে কার্লো—আবার বাইরে বেরুতে হবে তাকে।

দুইকোমরে হাত রেখে রুখে উঠল কনি। রাগে ছুঁচাল, ফ্ল্যাকাসে দেখাচ্ছে তার চেহারা। চিৎকার করে বলছে, ‘আমাকে তুমি চেনোনি, আজ যদি আবার বাইরে বেরোও, খুন করে ফেলব তোমাকে আমি।’ একটা বেশ্যামাগী ফোন করেছিল তোমাকে, সে আজ বাড়ি থাকবে না বলেছে। তার নাকি বিছানার বন্ধু তুমি!’ রাগে অন্ধ হয়ে মুখে যা আসছে তাই বলছে কনি, ‘কুকুরের বাচ্চা, বান্টাউ! এত বড় সম্পর্ক, একটা খান্‌কি মাগীকে আমার টেলিফোন নম্বর দিতে বাধে না তো! শূয়োর, আজ আমি তোকে মেরেই ফেলব...’ হিংস্র বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল কনি স্বামীর উপর। এলোপাতাড়ি হাত পা চালাচ্ছে। খামচাচ্ছে

পেশীবহুল একটা হাত দিয়ে স্ত্রীকে ঠেকিয়ে রেখেছে কার্লো, নিস্তেজ গলায় বলল, ‘আরে, তুমি কি পাগল হলে?’

কিন্তু কার্লোর ভাবভঙ্গি দেখে পরিষ্কার টের পেয়ে গেল কনি, স্বামী দৃষ্টিভ্রায় পড়ে গেছে। তার এ দৃষ্টিভ্রার একমাত্র কারণ হতে পারে, কার্লো যে আধিপাগলা মেয়েটার সাথে যৌন খেলায় মেতে উঠেছে তার পক্ষে এ-ধরনের একটা ফাজলামি করে টেলিফোন করা মোটেও বিচিত্র কিছু নয়। কার্লোর ভাবনাটা সঠিক ধরতে পেরেছে মনে করে আরও ক্ষেপে গেল কনি।

‘দূর পাগলী!’ বলল কার্লো, ‘ইয়াকি মারছিল, তাও বুঝছ না? মাথা খারাপ নাকি!’ ব্যাপারটাকে গুরুত্ব না দেবার ভান করছে কার্লো।

স্বামীর মোটা হাতের তলা দিয়ে গলে তার মুখে খামচি মারার চেষ্টা করছে কনি। কিন্তু সেই সাথে এও লক্ষ করছে, স্বামী আজ অপ্রত্যাশিত ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছে। কেমন যেন খটকা লাগছে কনির। কি যেন একটা রহস্য আছে এর মধ্যে, কিন্তু নিজের বুদ্ধিতে সে রহস্যের কিনারা পাওয়া কনির পক্ষে সম্ভব নয়। হাজার হোক, মেয়েমানুষ তো!

একটুও রাগছে না কার্লো। বারবার ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে স্ত্রীকে। জানে, এতে আরও বেশি বাড়াবাড়ি করার সাহস পাবে স্ত্রী।

হঠাৎ রহস্যের একটা সমাধান পেয়ে গেল কনি। ওর মনে হলো পেটে বাচ্চা

রয়েছে বলে কার্লো সাবধান হয়ে আছে, পাল্টা মারধোর করা থেকে বিরত রেখেছে নিজেকে। কথাটা মনে পড়ামাত্র, আরও রাগ দেখাবার সাহস পেয়ে গেল সে।

কনির আজকের এই অপ্রত্যাশিত আচরণের জন্যে শুধু সেই মেয়েটার ফোনই দায়ী নয়। আজই কনি যৌন উত্তেজনায় বেশ খানিকটা অশান্ত হয়ে পড়েছে। মনে মনে চাইছে, কার্লো আজ ঠেসে ধক্ক ওকে। আর তো মোটে ক'টা দিন বাকি আছে, তারপর আর ওসব চলবে না। ডাক্তারের নিষেধ। বাচ্চা প্রসব করার দু'মাস বাকি থাকতে সব বন্ধ রাখতে হবে যাই হোক, সেই দু'মাস শুরু হতে খুব বেশি দেরি নেই আর, তাই বাকি ক'টা দিন কামনা চরিতার্থ করার ইচ্ছা জেগেছে কনির। অথচ, এমন নিষ্ঠুর কার্লো, নিজের বিজ্ঞানার ধারেকাছে যেমতে পর্যন্ত দেয় না তাকে তবে, কার্লোকে শারীরিকভাবে আহত করার অদম্য একটা প্রবৃত্তিও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে আজ কনির মধ্যে।

পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে কনি, খানিকটা ঘাবড়ে গেছে কার্লো তার এই ঘাবড়ানো ভাবটা আসলে যে মেকী, তা বোঝার ক্ষমতা কনির নেই। ব্যাপারটা লক্ষ করে স্বামীর প্রতি ঘৃণা আরও বেড়ে গেল তার, সেই সাথে অদ্ভুত একটা আনন্দও অনুভব করছে নিজের মধ্যে। হাঁপাচ্ছে সে, দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'কুণ্ডার বাচ্চা, আজ তোরা একদিন কি আমার একদিন! দেখি, আমি বেঁচে থাকতে আজ তুই কিভাবে বাড়ি থেকে বের হোস্।'

অসীম ধৈর্যের সাথে কার্লো বলল, 'আচ্ছা, তাই। তোমার কথা! না হয় থাকল খুশি? সিজ-ফায়ার, ঠিক আছে?' এখনও কাপড়চোপড় পরা শেষ হয়নি তার, পরনে শুধু শার্টস রয়েছে। শুধু এটা পরেই বাড়ির ভিতর ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করে ও। ইংরেজি ভি অক্ষরটির মত সরু কোমর, বিশাল কাঁধ—এসব নিয়ে গর্ব কত তার। কার্লো সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করায় দৈহিক ক্ষুধা যেন চেপিয়ে উঠল কনির। গরম হয়ে উঠছে শরীরটা। ক্ষুধার্ত পশুর মত স্বামীর দিকে তাকিয়ে আছে সে। হাসি পাচ্ছে না, তবু হাসতে চেষ্টা করে বলল কার্লো, 'আরে বাবা, খিদেতে চোঁ চোঁ করছে পেট—কিছু খেতে অন্তত দেবে তো!'

অন্তত একটা কর্তব্যের কথা স্বামী ওকে মনে করিয়ে দেয়াতে রাগ পানি হয়ে গেল কনির। মায়ের কাছে খুব ভাল রান্না করতে শিখেছে সে। স্বামী কিছু খেতে চাইলে সত্যি সে খুশি হয়। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় দুপদাপ্ পায়ের শব্দ করে বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু তখুনি কিচেনে গিয়ে মাংস আর মিষ্টি লঙ্কা ভাজতে বসে পড়ল।

চুলোয় রান্না চড়িয়ে দিয়ে নানারকম তরি-তরকারি সহযোগে আঁতি যন্ত্রের সাথে একটা সালাদ তৈরি করেছে কনি। ওদিকে খাটের উপর লম্বা হয়ে ওয়ে পড়েছে কার্লো, আগামীকালের রেস-এর ফর্মটার উপর চোখ বুলছে। পাশেই রেখেছে গ্লাস ভর্তি হাইকি, মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছে তাতে।

একটু পরই এল কনি। রেডরুমে ঢুকছে না, দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে, যেন স্বামীর ডাক না পেলে ভিতরে ঢুকতে পারে না। ওখান থেকেই বলল, 'খাবার দেয়া হয়েছে।'

রেসিং ফর্মের উপর থেকে চোখ না তুলেই শান্তভাবে বলল কার্লো, 'খিদে

পায়নি এখনও ।’

আবার কেমন যেন খটকা লাগল কনির । কার্লোর আজ হয়েছে কি? চোখ রাঙাচ্ছে না, মারধোর করছে না, অথচ এমন ব্যবহার করছে, এমনতেই রাগ হয়ে যাচ্ছে কনির । আবার তার জেদ চেপে গেল । এবার ঝাঁঝের সাথে বলল, ‘আমার কথা কানে যাচ্ছে না? টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে ।’

কার্লো যেন স্ত্রীকে আরও ক্ষেপিয়ে তোলার জন্যেই বলল, ‘জাহান্নামে যাও তুমি! আর খাবারগুলো নর্দমায় ফেলে দাও ।’ গ্লাসটা তুলে নিয়ে এক ঢোকে সবটুকু হুইস্কি গিলে নিল সে, তারপর বোতলটা তুলে নিয়ে আবার ভরে নিল গ্লাসটা । কনির দিকে একবার ফিরেও তাকাল না ।

ঝড় তুলে কিচেনে ফিরে এল কনি । খাবার ভর্তি প্লেটগুলো এক এক করে টেবিল থেকে তুলে নিয়ে বাসন-পেয়ালা ধোয়ার বেসিনের উপর আছড়ে ভাঙতে শুরু করে দিল সে । কাঁচ আর চীনা মাটি ভাঙার ঝন ঝন শব্দ শুনে বেডরুম থেকে বেরিয়ে কিচেনে চলে এল কার্লো । কিচেনের দেয়ালে তেলতেলে মাংস আর মরিচ স্টেটে আছে দেখে রাগে মাথায় রক্ত চড়ে গেল তার । লোকটা আবার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ভালবাসে । রুঢ় গলায় স্ত্রীকে বলল সে, ‘আইলাদ পেয়ে মাথায় চড়েছিস, না? অ্যাই মাগী, এফুগি সব পরিষ্কার কর! একটু যদি দেরি করেছিস, পিটিয়ে পেটের ছেলে বের করব তোর আজ ।’

‘যা যা, কুত্তার বাচ্চা!’ দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ভেঙচে দিল স্বামীকে কনি । দু’হাতের দশটা আঙুল মাথার দু’পাশে তুলে হিংস্র জানোয়ারের মত কার্লোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে দেবার জন্যে তৈরি হয়ে গেছে সে । ‘তুই আমার সাথে যা খুশি তাই ব্যবহার করবি, আর আমি তোকে ছেড়ে দেব ভেবেছিস? তোর মত পুরুষকে আমি খোড়াই কেয়ার করি । তুই বড়জোর একটা বেশ্যার ভেড়া হতে পারিস, আমার স্বামী হবার যোগ্যতা তোর নেই ।’

একটা কথাও বলল না কার্লো । নিঃশব্দে কিচেন থেকে বেরিয়ে এসে শোবার ঘরে ঢুকল সে । তারপর নিজের বেল্টটাকে ডবল করে মুড়ে নিয়ে তখুনি আবার ফিরে এল কিচেনে । কনির দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চাপল সে । বলল, ‘সাবধান! এই শেষবার বলছি—জলদি!’

কার্লো কি সাঙ্গাতিক রেগে গেছে, বুঝতে পারছে কনি । গলার সুরে শাসানিটা অনুভব করে গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠছে তার । কিন্তু তবু একচুল নড়ল না সে । চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মত ।

কনির প্রকাণ্ড, মাংসল নিতম্বে সপাং করে এসে লাগল বেল্টের বাড়ি । ব্যথায় আঙুন ধরে গেল যেন জায়গাটায় । এক ছুটে আলমারির সামনে চলে এল কনি । ছোঁ মেরে খোলা দেরাজ থেকে তুলে নিল রুটি কাটার লম্বা ছুরিটা । সেটা বাগিয়ে ধরে ঘুরে দাঁড়াল সে ।

হাসতে চেষ্টা করে বলল কার্লো, ‘আই বাপ । কি সন্ধানাশ! কর্লিয়নিদের মেয়েরাও দেখছি কম খুনী নয়!’ টেবিলের উপর বেল্টটা রেখে দিল সে । স্ত্রীর দিকে এগিয়ে আসছে খালি হাতে ।

ছুরি দিয়ে আচমকা স্বামীকে একটা খোঁচা মারার চেষ্টা করল কনি । কিন্তু

পেটে ব্লাস্টা, শরীরটা এমনিতেও ভারি, যথেষ্ট দ্রুততার সাথে নড়তে পারল না সে। আজ যা হবার হবে, এই ধরনের একটা দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কার্লোর কুঁচকি লক্ষ করে ছুরিটা চালানল বটে, কিন্তু অনায়াসে আঘাতটা এড়িয়ে যেতে পারল কার্লো। ছেলেমানুষের হাত থেকে সহজেই খেলনা কেড়ে নেবার ভঙ্গিতে ছুরিটা কনির হাত থেকে ছিনিয়ে নিল সে। তারপর স্ত্রীর মুখে চড় মারল একটা খুব বেশি জোরে মারল না। চামড়ায় দাগ বা ক্ষত দেখা গেলেনে তো চলবে না।

ওই একটা চড় মেরে ক্ষান্ত হলো না কার্লো। তার অন্য উদ্দেশ্য রয়েছে। তাই একটার পর একটা চড় মেরেই চলল সে।

খুব জোরে মারা না হলেও, প্রতিটি চড় খেয়ে মাথাটা ঝন ঝন করছে কনির, অসহ্য ব্যথায় ছটফট করছে। শেষ পর্যন্ত কার্লোর হাত থেকে ছুড়ো পাবার জন্যে কিচেনের চারদিকে ছুটোছুটি শুরু করে দিল সে। কিন্তু কার্লো তার পথ আগলে মেরেই চলেছে। একটা সুযোগ পেয়েই কিচেন থেকে বেরিয়ে ছুট দিল কনি। শোবার ঘরে চলে এল সে, পিছু ধাওয়া করে কার্লোও ঢুকল সেখানে। ঘুরে দাঁড়িয়ে কার্লোর বাড়ানো হাতটা থপ করে ধরে নিজের মুখের দিকে টেনে এনে কামড় দিতে চেষ্টা করছে কনি। তার চুলের গোছা মুঠো করে ধরেছে কার্লো। এখন আর থামছে না সে।

ব্যথায়, অপমানে এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল কনি। একটু বাঁকা হেসে স্ত্রীকে ধাক্কা দিয়ে খাটের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিল কার্লো। খাটের পাশেই রয়েছে একটা টেবিল, টেবিলটা থেকে হইস্কির বোতল তুলে নিয়ে আবার গলায় মদ ঢালতে শুরু করল সে। চেহারা দেখে কনির মনে হচ্ছে মদ খেয়ে বন্ধ মাতাল হয়ে গেছে কার্লো, উজ্জ্বল নীল চোখ দুটো কিসের এক নেশায় চকচক করছে, যেন রক্তপান করতে চাইছে কার্লো। এবার সত্যি ভয়ে, আতঙ্কে শিউরে উঠল কনি।

পা দুটো ফাঁক করে অদ্ভুত এক বেপরোয়া ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে কার্লো। সরাসরি বোতল থেকে হইস্কি ঢালছে গলায়। হঠাৎ ঝুঁকে পড়ল খাটের দিকে সে, কনির মোটাসোটা উরুর খানিকটা মাংস খামচে ধরে প্রচণ্ড জোরে চিমটি দিল। তীব্র ব্যথায় চিৎকার করছে কনি। 'বাবা গো! মা গো...আর করব না...'

'ভয়োরের মত মোটা হয়েছিস, মাগী...চুপ!' বলতে বলতে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল কার্লো।

সাম্প্রতিক ভয় পেয়েছে কনি। চিরকাল দস্যু টাইপের মেয়ে সে, কিন্তু কার্লোর অগ্নিমূর্তি দেখে আত্মা খাঁচাছাড়া হয়ে গেছে তার। ব্যথায় জ্বলছে দুই গাল, তবু একটু শব্দ করতে সাহস পাচ্ছে না। পাশের কামরায় কি করছে স্বামী উঠে গিয়ে তা দেখে আসার কথা পর্যন্ত ভাবতে পারছে না। কাঠ হয়ে পড়ে আছে বিছানায়। অনেকক্ষণ কেটে গেল। কি করছে কার্লো? অস্থির হয়ে ভাবছে কনি। অনেক চেষ্টা করে সাহস সঞ্চয় করল সে। নিঃশব্দে উঠে বসল। প্রচুর সময় নিয়ে নামল খাট থেকে। এক পা এক পা করে এগোল পাশের কামরার দরজার দিকে। উঁকি দিয়ে তাকাল।

আরেকটা মদের বোতল খুলেছে কার্লো। হাত-পা হুড়িয়ে দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে সোফার উপর। আর একটু পর নেশায় হুঁশ থাকবে না ওর, ভাবছে কনি,

তখন চুপিসারে কিচেন থেকে লং বীচে বাপের বাড়িতে ফোন করতে পারবে। মাকে একটা খবর দিলেই মা ওকে নিয়ে যাবার জন্যে গাড়ি পাঠিয়ে দেবে। ভয় লাগছে শুধু একটা কথা ভেবে। ফোন যেন বড়দা সনি না ধরে। টম হেগেন অথবা মা ধরলে সবচেয়ে ভাল হয়।

রাত দশটা।

ডন কর্নিয়নির বাড়ি। কিচেনের ফোনটা ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল। ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলল কর্নিয়নিদের একজন বডিগার্ড। কনির গলা শুনে, তার যেমন কর্তব্য, বাড়ির কর্তাকে দিল রিসিভারটা।

কনি কথা বলছে। কিন্তু মেয়ের কথা ভাল করে বুঝতেই পারছেন না মা। শুধু বুঝতে পারছেন, কনির সাংঘাতিক কিছু একটা হয়েছে, হিন্দিরিয়ান্সের মত প্রলাপ বকছে সে, তাও এত নিচু গলায় যে তার কথার একটা বর্ণও বোঝা যাচ্ছে না।

কালোর চড় খেয়ে মুখ ফুলে গেছে কনির, ক্ষতবিক্ষত ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে অস্পষ্ট শব্দ বেরুচ্ছে। বসার ঘরে টম হেগেনের সাুখে কথা বলছে সনি, বডিগার্ডকে ইঙ্গিত করলেন মিসেস কর্নিয়নি, সনিকে কিচেনে ডেকে নিয়ে আসতে বলছেন।

তখুনি এল সনি। মায়ের হাত থেকে নিল রিসিভারটা। জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার, কনি?'

ছ্যাৎ করে উঠল কনির বুকটা বড়দার গলা শুনে। এক দিকে স্বামীর ভয়, আরেক দিকে সনি কি না কি করে বসে সেই ভয়—দিশেহারা হয়ে পড়ল কনি, তার কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট হয়ে এল আরও। মুখের ভিতর জড়িয়ে যাচ্ছে তার কথাগুলো, বলছে, 'সনি, আমি যাব...একটা গাড়ি, আর কিছু করতে হবে না তোমাকে, লক্ষ্মী ভাই, শুধু যদি একটা গাড়ি পাঠিয়ে দাও—গিয়ে সব বলব আমি তোমাকে। যীশুর কিরে, কিছু হয়নি, সনি। তোমাকে আসতে হবে না। এসো না কিন্তু, কেমন? টমকে পাঠাও, ওর সাথে যাব আমি। কিছু হয়নি, এমনি তোমাদেরকে দেখার ইচ্ছা হয়েছে, তাই যেতে চাইছি...'

ইতিমধ্যে টম হেগেনও কিচেনে চলে এসেছে।

ঘুমের ওষুধ খেয়ে উপরতলায় নিজের কামরায় ঘুমাচ্ছেন ডন কর্নিয়নি।

কোন অঘটন ঘটার লক্ষণ দেখামাত্র সারাক্ষণ সনির উপর নজর রাখার চেষ্টা করে টম হেগেন। বাড়ির গার্ডরাও বিপদের নিঃশব্দ আঁচ অনুভব করতে পেরেছে, আশপাশের ঘর থেকে সবাই তারা চলে এসেছে কিচেনে।

ফোনে বোনের সাদৃশ্য কথা বলছে সনি। সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে চুপচাপ। কেউ নড়ছে না একচুল।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ বা প্রশ্ন জাগতে পারে না যে সনির প্রকৃতির মধ্যে যে হিংসাত্মক প্রবৃত্তিগুলো রয়েছে, ওর শরীরের গভীর কোন রহস্যময় উৎস থেকে সেগুলোর উৎপত্তি। ওর দিকে যারা চেয়ে আছে তারা সবাই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ওর গলার মোটা রং আর শিরাগুলো পর্যন্ত রক্তের স্রোতে ফুলে উঠছে। অসীম ঘৃণা আর বিদ্বেষে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে চোখের দৃষ্টি। ওর মুখের প্রতিটি রেখা আর ভাঁজ জ্যান্ত, সজীব, আড়ষ্ট আর সঙ্কুচিত হয়ে উঠছে প্রতি মুহূর্তে। মুগ্ধ কোন রোগী তার শেষ প্রাণশক্তির সাহায্যে যখন মৃত্যুর সাথে লড়ে, তার মুখের অবস্থা যেমন ছাইয়ের

মত হয়ে যায়, তৈমনি ছাইয়ের মত হয়ে গেছে সনির চেহারা। শরীরের ভিতর অ্যাড্রেনালিনের চাপে কাঁপছে ওর হাত। অথচ গলার আওয়াজ অস্বাভাবিক সংযত আর শান্ত। নিচু গলায় ওর একমাত্র আদরের বোনকে বলছে ও, 'কোন ভয় নেই তোমার। তুমি শুধু ওখানে অপেক্ষা করো। শুধু অপেক্ষা করো। আর কিছু না।' কনিকে 'আর কিছু বলতে না দিয়ে ক্রেডলে রিসিভার রেখে দিল সনি। নিজের ভিতর রাগের এমন প্রচণ্ডতা অনুভব করছে, নিজেই স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছে ও। 'বাস্টার্ড, বাস্টার্ড, বাস্টার্ড!' কয়েক মুহূর্ত পর বিড় বিড় করে বলল, 'বাস্টার্ড, বাস্টার্ড, বাস্টার্ড!' ঝড় তুলে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল সনি।

সনির মুখের এই বিশেষ ভাবটা খুব ভাল করে চেনা আছে টম হেগেনের। ও জানে, সনি কর্লিয়নিকে এখন বাধা দিতে পারে এমন কেউ দুনিয়ায় জন্মায়নি। এই মুহূর্তে ও সমস্ত যুক্তি-তর্কের বাইরে চলে গেছে। সব, সব করতে পারে এখন ও।

তবে হেগেন সেই সাথে এও জানে যে শহরে যাবার পথে কিছুটা ঠাণ্ডা হবে সনির রাগ, মাথায় তখন বেশি নয়, অল্প-স্বল্প যুক্তি-বুদ্ধিও ফিরে আসবে। কিন্তু তার ফলে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে ও, তবে এরই সাথে নিজের অন্ধ রাগের পরিণতি থেকে নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতাটাও বেড়ে যাবে ওর। গাড়ির ইঞ্জিনটা গর্জে উঠতেই বডিগার্ডদেরকে আদেশ করল হেগেন, 'পিছু নাও! জলদি!'

দ্রুত ফোনের কাছে চলে এল হেগেন। তাড়াহড়োর সাথে ফোন করল কয়েকটা। শহরে সনির দলের কয়েকজন লোক থাকে, তাদেরকে নির্দেশ দিল তারা যেন এই মুহূর্তে ছুটে যায় কার্লো রিটসির বাড়িতে। সনি ওখানে পৌঁছবার আগেই সরিয়ে ফেলতে হবে কার্লোকে। সেই সাথে নির্দেশ দিল, কার্লোকে বাড়ি থেকে সরিয়ে ফেলার পরও যেন কয়েকজন লোক পাহারায় থাকে সনির কাছে, যতক্ষণ না পৌঁছায় সনি।

সনির সঙ্কল্পে বাধা দেয়া প্রায় অসম্ভব একটা কাজ, এর মধ্যে একাধিক মস্ত ঝুঁকি রয়েছে—কিন্তু টম হেগেন জানে এ-কাজে ডনের সমর্থন পাবে সে।

হেগেনের এখন একটাই ভয়। হয়তো কার্লোকে সনির হাত থেকে শেষ পর্যন্ত আজ বাঁচানো যাবে না, কিন্তু কোন সাক্ষীর সামনে কার্লোকে যদি খুন করে সনি, পরে সাংঘাতিক বিপদ আর জটিলতা দেখা দিতে পারে। শত্রুপক্ষ, অর্থাৎ পাঁচ পরিবারের তরফ থেকে কোন বিপদ আশঙ্কা করছে না হেগেন। বেশ অনেকদিন হয়ে গেল চুপচাপ আছে ওরা, তৈমনি নড়াচড়া করছে না—হেগেনের ধারণা, এখন হয়তো ওরা কোনরকম একটা মিটমাট করে নিতে চাইছে কর্লিয়নদের সাথে।

ফ্যাপা ষাঁড়ের মত তীব্রগতিতে মস্ত উঠান ছেড়ে বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে এল সনির গাড়ি। এরই মধ্যে কিছুটা সুবুদ্ধি ফিরে এসেছে ওর মধ্যে; ভিউ মিররে চোখ পড়ল, দেখল দু'জন বডিগার্ড ওকে অনুসরণ করার জন্যে নিজেদের একটা গাড়িতে উঠছে। মনে মনে ব্যাপারটাকে সমর্থনও করল সনি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ওর মনে বিপদের কোন আশঙ্কা রয়েছে। জানে, পাল্টা আক্রমণ বেশ কিছুদিন থেকে বন্ধ রেখেছে পাঁচ পরিবার। বলতে গেলে মার খেয়ে মুখটি বুজে মার হজম করে যাচ্ছে তারা, একেবারেই লড়াই করছে না। বেরোবার সময় হলঘর থেকে নিজের স্কাটটা তুলে নিয়েছে ও, গাড়ির ড্যাশবোর্ডের চোরা খোপে একটা পিস্তলও

আছে। গাড়িটাও ওর দলের একজন লোকের নামে রেজিস্টার করা—তার মানে, আইনের সামনে ব্যক্তিগতভাবে ওকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। তবে, এখনও ভেবে দেখছে না সনি, কি সিদ্ধান্ত নেবে ও কার্লোর ব্যাপারে।

ফাঁকা রাস্তা ধরে তীরবেগে ছুটেছে গাড়ি। ভাবনা-চিন্তা করার একটু সময় পাচ্ছে এখন সনি। বুঝতে পারছে, একটা অজাত শিশুর জন্মদাতা, যে কিনা ওরই বোনের স্বামী, তাকে হুট করে খুন করে ফেলা ওর কাজ নয়। বিশেষ করে, তেমন জোরাল কোন কারণ নাই যেখানে। ব্যাপারটা ত্রৈফ একটা দাম্পত্য কলহ বৈ ভো নয়। আবার একটু অন্য খাতে বইতে শুরু করল সনির চিন্তা—সে এটাকে শুধুই একটা দাম্পত্য কলহ বলে মনে করছে কেন? লোক হিসেবে আসলে কোনদিক থেকেই ভাল নয় কার্লো। কর্লিয়নি পরিবারের জন্যে একটা মাথাব্যথা হয়ে উঠেছে সে। তাছাড়া, মনে হচ্ছে সনির, ব্যাপারটা ওদের স্বামী-স্ত্রীর নিজস্ব ব্যাপার হলেও, এর মধ্যে ওর নিজেরও খানিকটা দায়িত্ব আছে। কারণ, ওর চেষ্টি আর মধ্যস্থতাতেই তো কনির সাথে আলাপ পরিচয়, তারপর বিয়ে হয়েছে কার্লোর।

সনির হিংস্র প্রকৃতির মধ্যে একটা পরস্পরবিরোধী ভাব আছে। যত বড় কারণই থাকুক, কোন মেয়েমানুষের গায়ে হাত ভুলতে পারে না ও। 'তোলেনি' কখনও। একটা শিশু বা একজন অসহায় মানুষের কাছে এত দুর্বল ও, তাদেরকে আঘাত করা তো দূরের কথা, একটা টোকা পর্যন্ত মারতে পারে না। অবোধ কোন প্রাণী ওর হিংস্র প্রকৃতির কাছে সম্পূর্ণ নিরাপদ। সেদিন কার্লো শুধু একটা কারণে বেঁচে গিয়েছিল। পাল্টা মারতে রাজী হয়নি সে, সেজন্যেই তাকে খুন করা সম্ভব হয়নি সনির পক্ষে। কেউ যদি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে, কেমন যেন নিজীব হয়ে পড়ে ওর ভয়ঙ্কর হিংস্র প্রবৃত্তিগুলো। সবাই জানে, কথাটাও সত্যি, ছোটবেলায় আশ্চর্য কোমল ছিল ওর মনটা। পরে একজন ত্রাসনৃষ্টিকারী হত্যাকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে বটে ও, কিন্তু সেটা নিতান্তই ওর নিয়তি।

কিন্তু আজ, ভাবছে সনি কর্লিয়নি, সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান করে ফেলতেই হবে। লং বীচ থেকে জলার ওপারে জোস বীচে যেতে হলে পথে একটা বাঁধ পড়ে, সেই বাঁধের উপর দিয়ে যেতে হবে ওকে। বুইক নিয়ে বাঁধটার উপর উঠল ও। ওপারে যানবাহনের ভিড় আরও কম থাকবে। ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে গেলে মনের ভিতর সাংঘাতিক যে জটটা পাকিয়েছে, সেটা হয়তো খুলে যেতে পারে। ইতিমধ্যে, অনেক আগেই, বডিগার্ডদের গাড়িটাকে পিছনে ফেলে রেখে অনেকদূর চলে এসেছে সনি। ভিউমিরের গাড়িটার চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না।

বাঁধের উপর আলো খুব কম। একটা গাড়িও নেই। এখনও অনেকটা দূরে দেখা যাচ্ছে তোলাখানার সাদা গম্বুজ। লোকজন আছে ওখানে। পাশাপাশি আরও অনেকগুলো তোলাখানা রয়েছে, সেগুলো এখন বন্ধ, শুধু দিনের বেলাই খোলা থাকে, কারণ তখন যানবাহনের ভিড় থাকে বেশি। বেশ খানিকটা দূরে থাকতেই ব্রেক করে গাড়ির গতি কমিয়ে আনছে সনি, সেই সাথে পকেটে হাত ঢুকিয়ে খুচরো পয়সা খুঁজছে, তোলাখানায় শুদ্ধ দিতে হবে। পকেটে খুচরো কোন পয়সা নেই, অগত্যা মানিক্যাগটা বের করে একহাতেই খুলে ফেলল সেটা বেছে বের করল এক ডলারের একটা নোট। ইতিমধ্যে তোলাখানার আলোর বৃত্তের মাঝখানে চলে

এসেছে ওর বুইক এই প্রথম নজরে পড়ল, তোলাখানার সামনের ফাঁকা জায়গাটা জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা গাড়ি। সামান্য একটু অবাক হলো সনি। তারপর ভাবল, ড্রাইভার সম্ভবত তোলাখানার লোকটার কাছ থেকে পথ জেনে নিচ্ছে। হর্ণ বাজল সনি। সাথে সাথে সুবোধ বালকের মত গাড়িটা এগিয়ে নিয়ে সনির বুইকটাকে এগিয়ে এসে দাঁড়াবার জায়গা করে দিল ড্রাইভার।

গাড়ি থামল সনি। তোলাখানার লোকটার হাতে ধরিয়ে দিল এক ডলারের নোটটা। বাকি পয়সা ফেরত পাবার জন্যে অপেক্ষা করছে ও। একটু অধৈর্য হয়ে উঠেছে মনে মনে। গাড়ির জানালাটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিতে চাইছে ও।

আটলান্টিক মহাসাগরের হ হ বাতাস ঢুকে কনকনে ঠাণ্ডা হিম হয়ে যাচ্ছে গাড়ির ভিতরটা। কিন্তু তোলাখানার লোকটার হাত একেবারে চালু নয়, খুচরো পয়সা ফেরত দিতে অস্বাভাবিক দেরি করছে লম্বীছাড়া হারামজাদা, ভাবছে সনি, হাত থেকে খুচরো পয়সাগুলো সব ফেলেই দিল শেষ পর্যন্ত।

পয়সা তোলার জন্যে ঝুঁকে পড়ল লোকটা। এখন আর ওকে গাড়ির পাশে দেখতে পাচ্ছে না সনি। লোকটার শরীর, মাথা সব দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে।

ঠিক এই সময় একটা বিদ্যুটে ব্যাপার লক্ষ্য করল সনি। সামনের গাড়িটা সরে যায়নি, মাত্র কয়েক ফুট এগিয়ে ওর বুইকের পথ আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইচ্ছা করলেও সনি এখন গাড়ি চালিয়ে চলে যেতে পারবে না। নিজের অজান্তেই ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে ডান দিকে তোলাখানার ভিতর তাকাল সনি। দেখল অন্ধকারে আরেকজন লোক রয়েছে। কিন্তু লোকটার উপস্থিতি সম্পর্কে চিন্তা করার জন্যে একটা সেকেণ্ড সময়ও পেল না সনি। উইণ্ডস্ক্রীনের ভিতর দিয়ে সামনের গাড়িটার দিকে আবার তাকাতে গিয়েই দেখল সেটা থেকে নেমে পড়েছে দু'জন লোক। এগিয়ে আসছে তারা। ওর দিকে।

যে লোকটা পয়সা কুড়োবার জন্যে ঝুঁকে পড়েছে তাকেও দেখতে পাচ্ছে না সনি। এক সেকেণ্ড আগেও তার সার্ভাইজার পাচ্ছিল। এখন পাচ্ছে না।

এরপর, কিছু ঘটবার আগেই, এক সেকেণ্ডের একশো ভাগের একভাগ সময়ের মধ্যেই সনি কলিয়নি বুঝতে পারল, মারা যাচ্ছে সে। সেই মুহূর্তে ওর মন আর অন্তরাঙ্গা আশ্চর্য নির্মল, কলুষমুক্ত হয়ে গেল। মন থেকে নিমেষে সাফ হয়ে গেল সমস্ত হিংসা, বিদ্বেষ আর ঘৃণা। সেই লুকিয়ে থাকা ভীতিটা, যাকে বলা হয় মৃত্যুভয়, তার পূর্ণাঙ্গ চেহারা নিয়ে জ্যান্ত হয়ে উঠে যেন সনির সমস্ত অপবিত্রতা দূর করে দিল।

জীবনের উপর তবু একটা মায়া থাকে, থাকে ভালবাসা, সেই মায়া আর ভালবাসারও থাকে একটা প্রতিক্রিয়া। বিদ্যুৎগতিতে সনির প্রকাণ্ড শরীরটা গাড়ির দরজার উপর দড়াম করে আছড়ে পড়ল। অত বড় বুইক গাড়িটা তীব্র একটা ঝাঁকি খেল। চাবিটা ভেঙে গেছে দরজার।

অন্ধকার তোলাখানা থেকে সেই লোকটা গুলি চালাচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে সনির বিশাল শরীর। ওর গলায় আর মাথায় বুলেট লাগল। তোলাখানার লোকটা গুলি করছে না আর, কারণ সে দেখতে পাচ্ছে বুইকের পাশে চলে এসে সনির দিকে পিস্তল তাক করছে অপর দু'জন লোক।

মাথা, বুক, কোমর পিচ-ঢালা রাস্তার উপর পড়ে গেছে সনির, এখনও গাড়ির ভিতর রয়ে গেছে পা দুটো। দু'জন একসাথে গুলি করেছে এখন সনির শরীরে। তারপর ওরা সনির মুখে লাথি মারতে শুরু করল। বুট জুতোর প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষতবিক্ষত, বিকৃত করে দিল মুখটাকে। ব্যক্তিগত ঘণার নমুনা রেখে যাচ্ছে ওরা। যারা গুলি করেছে সেই তিনজন আর তোলাখানার নকল লোকটা দ্রুত উঠে পড়ল গাড়িতে। জোস বীচের উল্টো দিকে মিডওয়ে পার্কওয়ে, তীরবেগে সেন্দিকে ছুটে যাচ্ছে গাড়িটা।

রাস্তার মাঝখানে বৃহৎ আর সনির মৃতদেহ পড়ে রয়েছে, ওদের পিছু ধাওয়া করার পথ একরকম বন্ধই। কয়েক মিনিট কেটে যাবার পর এসে পৌঁছল সনির বাড়িগার্ডদের গাড়িটা। গাড়ি থামল ওরা। সনিকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখে খুনীদেরকে অনুসরণ করার কোন ইচ্ছাই অনুভব করেছে না তারা। প্রকাণ্ড একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে গাড়ির নাক ঘুরিয়ে নিল, ফিরতি পথ ধরে লং বীচের দিকে তীরবেগে ছুটেছে। বাঁধের নিচে নেমে এসে প্রথম যে পাবলিক টেলিফোন বুদটা চোখে পড়ল সেখানে ঘ্যাচ করে ব্রেক কষে গাড়ি থামাল তারা। লাফ দিয়ে নামল একজন। ছুটে গিয়ে ঢুকল বৃন্দের ভিতর। ফোন করল সে টম হেগেনকে।

হাঁপাচ্ছে লোকটা। দ্রুত, সংক্ষেপে, এক নিঃশ্বাসে বলল সে, 'সনি নেই জোস বীচ তোলাখানার সামনে ওকে মেরে ফেলেছে ওরা।'

এতটুকু চাঞ্চল্য নেই টম হেগেনের কণ্ঠস্বরে। 'সম্পূর্ণ শান্ত এবং সংযত সে বলল, 'বেশ। সোজা ক্রেমেঞ্জার বাড়ি যাও। তাকে এখানে দরকার আমার। সেই জানাবে তোমাদেরকে কি করতে হবে।'

টেলিফোন মেসেজটা কিচেন থেকে রিসিভ করল টম হেগেন। এখানে কর্লিয়নি পরিবারের গৃহকর্তী উপস্থিত রয়েছেন। মেয়ে কনির জন্যে নাস্তা তৈরির কাজে ব্যস্ত হয়ে আছেন তিনি। গলা শান্ত আর মাথা ঠাণ্ডা রেখেছিল হেগেন ফোনে কথা বলার সময়, কি ঘটে গেছে তার কিছুই টের পাননি বৃদ্ধা। ইচ্ছা থাকলে টের যে পেতেন না এমন নয়, কিন্তু দীর্ঘদিন ডন কর্লিয়নির সাথে ঘর-সংসার করার ফলে এইটুকু জ্ঞান তাঁর হয়েছে যে যাই ঘটুক না কেন, নিজে থেকে কিছু লক্ষ্য না করাই সব দিক থেকে ভাল। বেদনাদায়ক কিছু, যদি জানতেই হয়, কেউ না কেউ অচিরেই তা জানাবে তাঁকে। কানে তুলো আর চোখে ঠুলি পরলে সেই বেদনা ভোগ করা থেকে যদি রেহাই পাওয়া যায়, অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে, সেটাই বা মন্দ কিসের। পুরুষদের বেদনা আর মানসিক অশান্তির ভাগ নিতে তিনি রাজী নন, তারা তো আর মেয়েদের বেদনার অংশ নিতে আসে না। তাঁর চেহারা ভাবের লেশমাত্র নেই। নির্বিকার চিওে কফি ফোটাচ্ছেন কনির মা, খাবার সাজাচ্ছেন, টেবিলের উপর। ব্যথা আর ভয়তে খিদে মিটে যায় বলে বিশ্বাস করেন না তিনি, তাঁর অভিজ্ঞতা বরং উল্টো কথা বলে। তিনি জানেন, পেটে কিছু পড়লে ব্যথা জিনিসটা তবু কমে। কখনও কোন ডাক্তার যদি ব্যথা কমানোর জন্যে তাঁকে ওষুধ দেয়, তার উপর ভীষণ রেগে যান তিনি। তবে একটুকরো রুটি আর এক কাপ কফি দিলে, সেটা আনাদা কথা। সন্দেহ নেই, কর্লিয়নি পরিবারের গৃহকর্তী আরও আদিম একটা সংস্কৃতি নিয়ে জন্মেছেন।

তাই তিনি কোন প্রশ্ন করে টম হেগেনকে আটকে রাখার চেষ্টা করলেন না।

কোন কৌতূহল বা উদ্বেগ প্রকাশ করে তাকে মহা একটা বিপদে ফেলে দিলেন না। অনায়াসে টমকে তিনি পালিয়ে যেতে দিলেন।

কোণার সভাঘরে পালিয়ে এসেছে টম হেগেন। ঘরে ঢুকেই থরথর করে কাঁপছে সে। অদম্য কাঁপুনিটা কোনভাবেই চেঁচা করে থামাতে পারছে না। দুই পা এক সাথে চেপে, ঘাড় কুঁজো করে, মাথাটা ওঁজে, দুই হাঁটুর মাঝখানে হাত দুটোকে এক সাথে শক্ত মুঠো পাকিয়ে এমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসে পড়ল সে, যেন খোদ শয়তানের কাছে মিনতির সাথে ক্ষমা চাইছে।

যুদ্ধরত একটা পরিবারের উপদেষ্টা হবার যোগ্যতা যে ওর নেই, তা এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছে টম হেগেন। পাঁচ পরিবার ওকে তাদের অভিনয়ের সাহায্যে সম্পূর্ণ বোকা বানিয়ে ছেড়েছে, ঠকিয়ে ভুত করে দিয়েছে। চুপচাপ, নিঃসাড় পড়ে থেকে, মারের উপর মার খেয়ে সমস্ত ইজম করে, এই ভয়ঙ্কর ফাঁদটা পেতেছিল ওরা। ষড়যন্ত্র পাকা করে, ফন্দি এঁটে, খুঁটি বুজে ওত পেতেছিল ওরা। আহত, রক্তে ভেজা হাত মাথার উপর আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে তুলে রেখেছিল, এদিক থেকে শত ওঁতো খেয়েও সহস্র প্ররোচনাতেও পাল্টা মার দিতে রাজী হয়নি। এসবের পিছনে একটাই উদ্দেশ্য ছিল পাঁচ পরিবারের। মোক্ষম একটা আঘাত হেনে কর্নিয়ানিদের একটা স্তম্ভকে ধ্বংস করে দেবে। তাই দিয়েওছে। প্রাক্তন বুড়ো কনসিলিয়রির চোখে ওদের এই ছল অবশ্যই ধরা পড়ে যেত। এ-ভুল কখনোই হত না তার। ইঁদুরের গন্ধ আগেই এসে লাগত তার নাকে। তিনশো গুণ সতর্কতা অবলম্বন করত সে, ধোঁয়া দিয়ে ঠিক বের করে আনত গর্ত থেকে ইঁদুর।

নিজের সম্পর্কে এই সমস্ত ধিকারসূচক চিত্তার উপর প্রচণ্ড শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে টম হেগেন। ওর সত্যিকার শুভাকাঙ্ক্ষী, বন্ধু আর ভাই ছিল সনি কর্নিয়নি। ও ছিল তার ত্রাণকর্তা। সেই ছোটবেলার কথা, সনি ছিল টমের আদর্শ পুরুষ। তার সাথে কখনোই তো নীচ আচরণ করেনি সনি, জীবনে কখনও একটা কটু কথা পর্যন্ত বলেনি তাকে, সব সময় আপন, ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত ব্যবহার করেছে। তাকে যখন মুক্তি দিল সালোযো, বাড়ি ফিরে আসতেই, বন্ধুকে নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ধরেছিল সনি। দু'জনের সাথে দেখা হওয়ায়, আন্তরিক আনন্দ পেয়েছিল সনি। বড় হয়ে নিষ্ঠুর, রক্তলোলুপ, হিংস্র হয়ে উঠেছিল সনি—কিন্তু তাতে টম হেগেনের কি?

প্রচণ্ড আতঙ্কে কিচেন থেকে পালিয়ে এসেছে টম। জানে, মাকে কিছুতেই ছেলের মৃত্যু-সংবাদ শোনাতে পারবে না সে। ডনকে সবসময় মনে হয়েছে নিজেরই বাবা, সনিকে মনে হয়েছে নিজেরই ভাই, কিন্তু সনির মাকে তার কখনও নিজের মা বলে মনে হয় না। ফ্রেডি, কনি আর মাইকেলকে যেমন স্নেহ করে টম, তেমনি ভালবাসে ওদের মাকেও। কারও কাছ থেকে দয়া পেলে তাকে যেভাবে শ্রদ্ধা করা যায়, সেটাকে ঠিক ভালবাসা বলা যায় না। যাকে বলে অন্ধ ভালবাসা, সনির মায়ের উপর সেটা নেই টমের, তবু টম এ-খবর তাকে নিজের মুখে দিতে পারবে না। ক'মাসই বা হয়েছে, এই অল্প ক'দিনেই তিনি তার সব ক'টা ছেলেকে হারালেন। প্রাণ নিয়ে সিসিলিতে লুকিয়ে রয়েছে মাইকেল, ফ্রেডি নৈভাডায় নির্বাসিত, আর এখন সান্তিনোকেও তিনি হারালেন চিরতরে। তিন ছেলের মধ্যে কে তার সবচেয়ে প্রিয়পাত্র? কাকে তিনি সবচেয়ে ভালবাসেন? তা তো কখনও প্রকাশ

পায়নি তাঁর কথায় বা আচরণে।

ফোন পাবার পর এক মিনিট পেরিয়ে গেছে। এরই মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে টম হেগেন। ক্রেডন থেকে রিসিভার তুলে কনির নাম্বারে ডায়াল করল ও। অপরপ্রান্তে বেজেই চলেছে বেল, কেউ রিসিভার তুলছে না। অনেকক্ষণ পর তুলল, ফিসফিস করে নিজের পরিচয় দিল কনি।

আশ্চর্য নরম সুরে বলল টম হেগেন, 'কনি, আমি টম বলছি। কার্লোর ঘুম ভাঙিয়ে ওকে আমার কথা বলো, জরুরী একটা কথা আছে ওর সাথে আমার।'

সন্তুষ্ট, নিচু গলায় জানতে চাইল কনি, 'টম...টম, এখানে কি আসছে সনি?'

'না, কনি,' মৃদু কোমল সুরে বলল হেগেন। 'সনি তোমাদের ওখানে যাচ্ছে না। কোনও ভয় নেই। কার্লোকে শুধু ডেকে দাও, আমার কথা বলো ওকে। দেরি করো না, লক্ষ্মী বোন। খুব জরুরী ব্যাপার।'

'টম, ভয়ঙ্করভাবে আমাকে মেরেছে ও,' চাপা সুরে কঁদে ফেলে বলল কনি। 'বাড়িতে ফোন করেছি জানতে পারলে আজ আমাকে মেরেই ফেলবে।'

'না। আর মারবে না তোমাকে। কথা দিচ্ছি। আমার কথা বিশ্বাস করো,' দৃঢ় কিন্তু শান্ত গলায় বলল হেগেন। 'ওর সাথে আমাকে শুধু কথা বলতে দাও। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বলো, খুবই জরুরী একটা প্রসঙ্গে আলাপ করতে চাই আমি। এখনি ফোনে আমার সাথে কথা বলা খুব বেশি দরকার ওর। বুঝতে পারছ তো?'

পাঁচ মিনিট অপর প্রান্তে আর কারও সাড়া নেই। তারপর ঘুম আর মদের নেশায় জড়ানো কার্লোর গলা পেল হেগেন।

যত অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব কার্লোকে সজাগ করে তোলার জন্যে আশ্চর্য তীব্র কণ্ঠে বলল টম হেগেন, 'শোনো, কার্লো। নিজেকে তৈরি করে নাও। সাম্প্রতিক একটা খবর দিতে যাচ্ছি তোমাকে। খবরটা শোনার পর তোমার চেহারায কোন রকম প্রতিক্রিয়া যেন না হয়। আমার কথা সব বুঝতে পারছ? খবরটা শোনার পর এমন ভাব দেখাবে যেন কিছুই হয়নি। কনিকে জানিয়েছি তোমার সাথে বিশেষ জরুরী একটা আলাপ আছে। বিষয়টা সম্পর্কে নিশ্চয়ই জানতে চাইবে ও।'

'কি বলব ওকে?' জানতে চাইল কার্লো।

কার্লোর গলার স্বরটা গভীর মনোযোগের সাথে শুনল হেগেন। বিমূঢ় একটা ভাব রয়েছে তার গলার সুরে, কিন্তু এ থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না। বিমূঢ় ভাবটার সাথে রয়েছে একটু কৌতূহলের পরশ। এ থেকেও কিছু প্রমাণ হয় না। তার মানে, কার্লো অভিনয় করছে কিনা তা নিশ্চিত করে বলার কোন উপায় নেই।

'ওকে তুমি জানাবে যে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি,' বলল হেগেন, 'তোমাদের সংসারটাকে লং বীচের উঠানের একটা বাড়িতে তুলে নিয়ে আসা হবে। আরও বলবে যে তোমাকে একটা বড় ধরনের কোন কাজ দেয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ডন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তোমাদের পারিবারিক জীবনটা যাতে আরও সুখের হয় তার ব্যবস্থা তিনি করবেন। সব বুঝতে পারছ তো?'

'হ্যাঁ। ঠিক আছে।' কার্লোর কণ্ঠস্বরে আশার সুর পাওয়া যাচ্ছে।

'একটু পরই তোমাদের দরজায় নক করবে আমার দু'জন লোক,' বলল

হেগেন। 'তোমাকে সাথে করে নিয়ে আসার জন্যেই যাচ্ছে ওরা। কিন্তু ওরা পৌঁছলেই ওদেরকে বলবে আমাকে যেন একটা ফোন করে। শুধু এই একটা কথা। আর কিছু বলবে না। ওদের আমি নির্দেশ দেব কনির সাথে ওখানেই থাকবে তুমি। সব বুঝতে পারছ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—অবশ্যই,' উত্তেজিতভাবে বলল কার্লো। হেগেনের কণ্ঠস্বরে চাপা উত্তেজনা টের পেয়ে গেছে সে। এতক্ষণে সজাগ, সতর্ক হয়ে উঠেছে যেন। পরিষ্কার সব টের পাচ্ছে সে। গুরুতর কোন খবর আছে।

খবরটা দেবার সময় কোন ভূমিকা করল না হেগেন। স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত ভাষায় বলল, 'এই একটু আগে মেরে ফেলেছে ওরা সনিকে। সাবধান, কিছু বলো না আমাকে। তুমি ঘুমাচ্ছিলে, তাই জানো না, কনি ওকে ফোন করেছিল। কনির ফোন পেয়ে তোমাদের বাড়িতে যাচ্ছিল সনি। কিন্তু খবরদার, এ-কথা কোনভাবেই যেন জানতে না পারে কনি—আমি তা চাই না। কিছু একটা সন্দেহ করবে, করুক—আসল কথাটা যেন কোনভাবেই টের না পায়। জানতে পারলেই ভাববে, ওর দোষেই বুঝি মারা গেছে সনি। শুধু আজকের রাতটা তুমি ওখানেই, ওর কাছেই থাকো। কিন্তু মতই জানতে চেষ্টা করুক, কিছু বলো না। ঝগড়া-বিবাদ যা হবার হয়েছে, সব মিটমাট করে নাও। আদর্শ স্বামীর মত ব্যবহার করো। অন্তত ওর ছেলে না হওয়া পর্যন্ত খুব ভাল ব্যবহার করে যেতে হবে ওর সাথে তোমাকে। কাল সকালে দুঃসংবাদটা শোনানো হবে ওকে। হয় তুমি, নয়তো ওর মা, কিংবা ডন নিজে ওকে বলবেন যে ওর ভাই মারা গেছে। ওর কাছ থেকে এক সেকেন্ডের জন্যেও নড়ো না তুমি, এই আমি চাই। বুঝতে পারছ আমি কি বলতে চাইছি? আমার এই একটা অনুরোধ শুধু রাখো তুমি, বিনিময়ে আমিও দেখব কিসে তোমার ভবিষ্যৎ ভাল হয়। কিছু বলার আছে তোমার?'

'না, টম,' কাঁপতে শুরু করেছে কার্লোর গলা। 'তোমার অনুরোধ একশোবার রাখব আমি, সে-কথা আমাকে আর তোমার মনে করিয়ে দিতে হবে না। শোনো, টম, তোমার সাথে আমার তো চিরকালই খুব ভাল সম্পর্ক, তাই না? যীশুর কিরে, তোমার প্রতি আমি সাম্রাজ্যিক কৃতজ্ঞ আর ঋণী। বিশ্বাস করো।'

'করলাম,' বলল হেগেন। 'তোমাকে সম্পূর্ণ আশ্বাস আর নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি আমি, কার্লো, কনির সাথে তুমি ঝগড়া করেছিলে বলে যা ঘটে গেছে সেজন্যে কেউ তোমাকে দায়ী করবে না। এ-ব্যাপারে এতটুকু দুশ্চিন্তা করার কোনও দরকার নেই তোমার। যা করার আমি করব, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।' একটু বিরতি নিল হেগেন, তারপর কার্লোকে উৎসাহ যোগাবার জন্যে আবার বলল, 'যাও এবার, কনির যত্ন নাওগে।' ফোনের কানেকশন কেটে দিল টম।

ডন কর্লিয়নির কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছে টম হেগেন, তাই কাউকে হুমকি দিতে বা শাসাতে শেখেনি সে। তবে, তার কথার একমাত্র অর্থটা যে কি তা বুঝতে একটুও অসুবিধে হয়নি কার্লোর। কার্লো জানে, মৃত্যুর কাছ থেকে মাত্র একচুল দূরে রয়েছে সে এখন।

এরপর টেসিওকে ফোন করল হেগেন। এই মুহূর্তে লং দীচে চলে আসতে বলল তাকে। কি দরকার, সে সম্পর্কে কোন আভাসই দিল না। টেসিও অবশ্য

কিছু জানতেও চাইল না। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল এবার টম হেগেনের বুক থেকে। এইবার তাকে সবচেয়ে ভয়াবহ কর্তব্যটা পালন করতে হবে।

ওষুধ খেয়ে ঘুমাচ্ছেন ডন কর্লিয়নি। তাঁর ঘুম ভাঙতে হবে। দুনিয়ায় যে মানুষটিকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে টম হেগেন, তাকে জানাতে হবে তিনি যে গুরুদায়িত্ব ওর কাঁধে দিয়েছিলেন সেই দায়িত্ব পালন করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে ও। তাঁর সাম্রাজ্য রক্ষা করতে পারেনি ও। তাঁর বড় ছেলের প্রাণ বাঁচাতে পারেনি। তাকে বলতে হবে, এটাই শেষ সুযোগ, এই শেষ মুহূর্তে বিছানা থেকে উঠে তিনি যদি যুদ্ধে নেতৃত্ব গ্রহণ না করেন, সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে কর্লিয়নি পরিবারকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার আর কোন উপায় নেই। হেগেনের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে কোন ভাবাবেগ, অন্ধবিশ্বাস বা কোন রকম ভুল-ভ্রান্তি নেই। অন্তস্তল থেকে বিশ্বাস করে সে, একমাত্র মহান ডন নিজে এখনও, এই নিদারুণ পরাজয়ের মধ্যে থেকেও, একটা মাত্র অমোঘ চাল দিয়ে উদ্ধার করে তুলে আনতে পারেন কর্লিয়নি পরিবারকে, রক্ষা করতে পারেন নিজের এত কষ্টের গড়া ধ্বংসোন্মুখ সাম্রাজ্যকে।

ডন কর্লিয়নির ব্যক্তিগত ডাক্তারদের সাথে পরামর্শ পর্যন্ত করল না হেগেন। কোন লাভ নেই তাতে। ডাক্তারা এখন যে পরামর্শই দিক না কেন, এখন আর তার কোন গুরুত্ব নেই। এমন কি তারা যদি একবারো জানায়, বিছানা থেকে উঠলে ডন কর্লিয়নির প্রাণ বিপন্ন হয়ে পড়বে, তিনি মারা যেতে পারেন—তবু তাদের কথায় কান দেবে না টম হেগেন। গড় ফাদারকে এই মুহূর্তে সব কথা জানাতে হবে। তারপর তাঁর নির্দেশ শুনতে হবে, তাকে অনুসরণ করতে হবে, অন্ধের মত। এবং ডন কর্লিয়নি এই শেষ মুহূর্তে কি করবেন না করবেন সে-বিষয়ে কোন রকম দ্বিধা বা সংশয় দেখা দিতে পারে না, উঠতে পারে না কোনও প্রশ্ন। ডাক্তারদের পরামর্শ এখন অবাস্তব হয়ে গেছে, সমস্ত কিছুই এখন মূলাহীন, অবাস্তব হয়ে গেছে। সব কথা জানাতে হবে ডন কর্লিয়নিকে, এটাই এই মুহূর্তের একমাত্র কাজ। সব শুনে হয় তিনি নিজ সাম্রাজ্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন, নয়তো পাঁচ পরিবারের হাতে তুলে দিতে হবে কর্লিয়নিদের সমস্ত ক্ষমতা, তাদের কাছে বিলিয়ে দিতে হবে নিজেদের সমগ্র অস্তিত্ব। এর কোন বিকল্প নেই।

এত পরিচ্ছন্নভাবে সব কিছু চিন্তা করতে পেরেও পরবর্তী একটা ঘণ্টাকে সর্বান্তঃকরণে ভীষণ ভয় পাচ্ছে টম হেগেন। নিজের ভূমিকাটা কি হবে সে ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হচ্ছে তাকে। মনে মনে একটা ছকও তৈরি করে ফেলল। হ্যাঁ অবশ্যই, নিজের অযোগ্যতার কঠিন বিচার করতে হবে তাকে। যে ভুল সে করেছে তা অস্বীকার করার কথা একবারও উদয় হলো না হেগেনের মনে। তবে, বিশ্লেষণ করে এ-কথাও ভাবল সে যে নিজেকে বেশি দোষ দিতে গেলে গড় ফাদারের দায়িত্বের বোঝা আরও ভারিই করা হবে শুধু। নিজের শোকের প্রচণ্ডতা প্রকাশ করতে গেলে গড় ফাদারের শোকটাই তীব্র করে তোলা হবে শুধু। যুদ্ধরত একটা পরিবারের উপদেষ্টা হবার যোগ্যতা তার নেই এ-কথা সে যদি মুখ ফুটে বলে, এমন একজন অপদার্থ লোককে এত গুরুত্বপূর্ণ একটা পদে এতদিন বহাল রাখার জন্যে ডন নিজেও নিজেকে অপরাধী, দোষী ভাববেন। তাই এমন কিছু তাঁকে বলা চলবে না যাতে তাঁর মানসিক যন্ত্রণার পরিমাণ আরও বেড়ে যায়।

তাই সিদ্ধান্ত নিল টম হেগেন, খবরটা আর সব সাধারণ খবরের মত করেই শোনাতে হবে গড ফাদারকে। তারপর তাঁকে সে জানাবে বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেতে হলে এখন কি করতে হবে তা নির্ধারণের জন্যে সব দায়িত্ব নিতে হবে তাঁকে। কেন, তাও বিশ্লেষণ করে দেবে হেগেন। বাস, এইটুকু। এরপর চুপ করে থাকবে সে। অপেক্ষা করবে ডনের নির্দেশের জন্যে। ওর প্রতিক্রিয়া কি হবে তা নির্ভর করবে ডনের ওই আদেশের উপর। গড ফাদার যদি চান সে তার অপরাধ স্বীকার করুক, অকুণ্ঠচিত্তে তাই করবে হেগেন। তিনি যদি আশা করেন সে শোক প্রকাশ করুক, অন্তর থেকে তাই করবে হেগেন।

গাড়ির শব্দ। মাথা তুলে তাকাল হেগেন। দেখল, উঠানে গাড়ি ঢুকেছে। এসে পৌঁছাচ্ছে ক্যাপোরেজিমিরা। ওদেরকে আগে শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে তার, তারপর ঘুম ভাঙাবে গড ফাদারের। উঠে দাঁড়াল হেগেন। ডেস্কের পাশে কেবিনেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কেবিনেট খুলে একটা গ্লাস আর একটা মদের বোতল বের করল। সেই মুহূর্তে সেখানেই স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল হেগেন, একচুল নড়ার শক্তি নেই তার। সমগ্র অস্তিত্ব এমন সাস্রাতিকভাবে বিচলিত হয়ে পড়েছে যে বোতল থেকে গ্লাসে মদ ঢালবে সে-ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত নেই তার। হঠাৎ, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে, একটা শব্দ এল পিছন থেকে। দরজা খোলা এবং ভিতর থেকে আবার বন্ধ হয়ে যাবার আওয়াজ। ধীরে ধীরে পিছন ফিরল টম হেগেন।

ডন কর্লিয়নি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। গুলি খেয়ে আহত হবার পর এই প্রথম কাপড়চোপড় পরে রোগশয্যা ত্যাগ করে উঠে এসেছেন।

বিশাল কামরার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে হেঁটে এলেন ডন কর্লিয়নি। তাঁর নিজের চামড়া বাঁধানো প্রকাণ্ড আরাম কেদারাটায় বসলেন ধীরে ধীরে। তাঁর হাঁটাটা লক্ষ করল হেগেন, একটু আড়ষ্ট ভাব রয়েছে। পোশাকগুলো শরীরে ঢিলে হয়ে ঝুলছে। কিন্তু হেগেনের তবু মনে হলো, তাঁকে দেখতে বরাবর এই রকমই লাগে। এখন তাঁকে বরং আরও শক্ত বলে মনে হচ্ছে, যেন মনের জোরে শরীর থেকে সমস্ত দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বিছানা থেকে উঠে এসেছেন তিনি। তবে, শরীরটা যে এখনও পুরোপুরি সারেনি তাও বোঝা যাচ্ছে মুখটা গম্ভীর। একটু অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর। সেই গম্ভীরের সাথে আগের সমস্ত শক্তি আর বলিষ্ঠতা প্রকাশ পাচ্ছে। শিরদাঁড়া খাড়া করে আরাম কেদারায় বসে আছেন তিনি কনসিলিয়রিকে বললেন, ‘দাও, আমাকেও এক ফোঁটা অ্যানিসেট দাও।’

বোতল বদল করে নিয়ে এল হেগেন। যাষ্টি-মধুর গন্ধ মেশানো ঝাঁঝালো পানীয় ঢালল দুটো গ্লাসে। ঘরে তৈরি, এ-জিনিস দোকানে কিনতে পাওয়া যায় না পুরানো এক বন্ধুর উপহার। প্রত্যেক বছর এক গাড়ি এই অ্যানিসেট পাঠিয়ে দেয় সে কর্লিয়নিদের বাড়িতে।

‘ঘুমুতে গিয়ে কাঁদছিলেন আমার স্ত্রী,’ বললেন ডন কর্লিয়নি। ‘জানালা দিয়ে দেখলাম, আমার ক্যাপোরেজিমিরাও এল সবাই। এখন তো রাত দুপুর। তাই, হে আমার প্রিয় কনসিলিয়রি, সবাই যা জানে সেটা তোমার ডনকেও জানানো উচিত।’

‘মাকে কিছু বলিনি আমি,’ শান্ত গলায় বলল হেগেন। ‘আপনার ঘুম ভাঙিয়ে সব কথা এখনি আপনাকেই বলতে যাচ্ছিলাম।’

ভাবলেশহীন চেহারা ডন কর্লিয়নির। বললেন, 'কিন্তু আমাকে বলার আগে একটু মদ খেয়ে নৈবার দরকার হয়েছিল।'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল হেগেন

'এখন তো মদ খাওয়া হয়ে গেছে,' বললেন ডন কর্লিয়নি। হেগেন দুর্বল হয়ে পড়েছে লক্ষ করে মৃদু অভিযোগের সুর ফুটল তাঁর কণ্ঠে। 'এবার আমাকে বলতে পারো।'

'বাধের ওপর গুলি করেছে ওরা সনিকে,' বলল টম হেগেন। 'মার্সী গেছে সনি।'

চোখ পিট পিট করছেন ডন কর্লিয়নি। মাত্র এক নিমেষের জন্যে তাঁর সমস্ত মনোবল প্রায় ধ্বংসে পড়ল, তাঁর সমস্ত জগৎ সমগ্র অস্তিত্ব বিগল হয়ে পড়ল তাঁর শরীর থেকে শেষ শক্তি বিন্দুটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেল। চেহারা দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সব। কিন্তু তা ওই এক নিমেষের জন্যে মাত্র। তারপরই নিজেকে সামলে নিলেন গড ফাদার

কয়েক মুহূর্ত পরই একজন ব্রডিগার্ড ঢুকল সভাঘরে। ক্যাপোরেজিমিদের নিয়ে এসেছে সে। ক্যাপোরেজিমিরা সাথে সাথে বুঝতে পারল ছেলের মৃত্যু সংবাদ শুনেছেন গড ফাদার, কারণ ওদেরকে দেখা মাত্র আরাম কেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

গড ফাদারকে বুকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করছে ওরা! এটা ওদের পুরানো বন্ধুত্বের অধিকার। তারপর সবাই একটু করে অ্যানিসেট পান করল। আজ রাতের ঘটনা বর্ণনা দেবার আগে হেগেন নিজ হাতে সবাইকে ঢেলে দিল মদ

সব বলল হেগেন। শুনলেন ডন কর্লিয়নি। তারপর শুধু একটা প্রশ্ন করলেন, 'আমার ছেলে মারা গেছে, ঠিক জানো?'

'হ্যাঁ,' উত্তরটা দিল ক্যাপোরেজিমি পীট ক্রেমেঞ্জা। 'সনির দল থেকে আমি নিজে বাছাই করে নিয়েছিলাম ব্রডিগার্ডদের। আমার বাড়িতে যখন ফিরে এল ওরা, আমি নিজে ওদেরকে প্রশ্ন করে সব জেনে নিয়েছি। তোলাখানার আলোয় পড়ে ছিল সনি, পরিষ্কার দেখে এসেছে ওরা। ওদের বর্ণনা শুনে বুঝলাম, ও-ধরনের আঘাত নিয়ে কেউ বেঁচে থাকতে পারে না। সনি মারা যায়নি একথা প্রমাণ হলে নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত দিতে রাজী রয়েছেন ব্রডিগার্ডরা।'

চরম বাস্তবকে নিঃশব্দে মেনে নিলেন ডন। কোনরকম ভাবাবেগ প্রকাশ করলেন না। শুধু চুপ করে আছেন।

কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল। তারপর তিনি বললেন, 'আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি, তোমরা কেউ এই ব্যাপারটা নিয়ে ব্যস্ত হবে না। কোন প্রতিশোধ নৈবার চেষ্টা নয়। আমার আদেশ ছাড়া আমার ছেলের খুনীকে খুঁজে বের করার কোন তদন্ত নয়। আমি প্রকাশ্যে মুখ ফুটে না বলা পর্যন্ত আমাদের তরফ থেকে পাঁচ পরিবারের সাথে আর যুদ্ধ নয়। আমাদের পরিবারের সমস্ত ব্যবসা এই মুহূর্ত থেকে বন্ধ করে দেয়া হলো, যতক্ষণ না আমার ছেলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হচ্ছে। শুধু তারপরই আবার আমরা একসাথে বসে ইতিকর্তব্য স্থির করব, তার আগে নয়। আজকের দিনটা সান্ত্বিনোর দিন। তার জন্যে যতটা আমাদের সাধ্যো কুলায় তার

সবটুকু করব আমরা, একজন খুঁচানের উপযুক্ত আয়োজন সম্পন্ন করে তাকে আমরা সমাধিস্থ করব। পুলিশ আর অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সাথে আমার বন্ধুরা সমস্ত ব্যবস্থা, যা যা করা দরকার, সব ঠিকঠাক করে রাখবে। ক্লেমেঞ্জা, তুমি আমার পাশে, আমার ছায়া হয়ে থাকবে সব সময়—তুমি আর তোমার দল। টেসিও, তুমি আমার গোটা পরিবারকে রক্ষা করার দায়িত্ব নেবে—তুমি আর তোমার দল।’ কনসিলিয়রির দিকে ফিরলেন ডন কর্লিয়নি, বললেন, ‘টম, আমার ইচ্ছা তুমি একটা ফোন করে আমেরিগো বনাসেরাকে বলো যে আজ রাতে কোন এক সময় ওর সাহায্য দরকার হবে আমার। সে যেন তার কাজের জায়গায় আমার জন্যে অপেক্ষা করে। এক, দুই, এমন কি তিন ঘণ্টাও দেরি হতে পারে আমাদের। তোমরা কেউ আমার কথা বুঝতে না পেরে থাকলে প্রশ্ন করতে পারো।’

নিঃশব্দে মাথা নেড়ে ওরা তিনজনই জানাল যে গড ফাদারের প্রতিটি আদেশ বুঝতে পেরেছে ওরা।

‘ক্লেমেঞ্জা,’ ডন কর্লিয়নি বললেন, ‘কয়েকটা গাড়ি আর কিছু লোক নিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করো। তৈরি হতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগবে না আমার। টম, ভাল কাজ করেছ তুমি। কাল সকালে ওর মায়ের কাছে নিয়ে এসো কনস্ট্যানশিয়াকে। ও আর ওর স্বামী যাতে উঠানে থাকতে পারে তার ব্যবস্থাও করবে তুমি। সাঞ্জার যত বান্ধবী আছে তাদের সবাইকে ওর কাছে পাঠিয়ে দাও, তারা ওর কাছে থাকুক। আমি আমার স্ত্রীর সাথে একটু কথা বলব, তারপর তিনিও ওর কাছে যাবেন। দুঃসংবাদটা আমার স্ত্রীই শোনাবেন ওকে। তারপর মেয়েরা সবাই গির্জায় যাবে, সেখানে তারা আমার ছেলের আত্মার কল্যাণের জন্যে প্রার্থনার ব্যবস্থা করবে।’

বিশাল আরাম কেন্দারা ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন ডন কর্লিয়নি। আর সবাইও সাথে সাথে উঠে দাঁড়াল। তাঁকে আবার নিজেদের বুকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করল ক্লেমেঞ্জা আর টেসিও। কামরা থেকে বেরিয়ে যাবেন ডন, তাই দরজাটা খুলে দাঁড়িয়ে আছে টম হেগেন। বেরিয়ে যাবার সময় একটু থামলেন ডন, ওর মুখের দিকে তাকালেন তারপর ওর মুখে হাত বুলিয়ে তাড়াতাড়ি একটু আদর করলেন, বললেন, ‘তুমি আমার ভাল ছেলে। তোমার কাছে এলে আমি শান্তি পাই।’ কথাটার মানে হলো এই ভয়ঙ্কর সময়ে টম হেগেন তার উচিত কাজই করেছে।

নিজের বেডরুমে উঠে গেলেন ডন কর্লিয়নি। এখন তিনি তাঁর স্ত্রীর সাথে কথা বলবেন।

এই সময় আমেরিগো বনাসেরাকে ফোন করে টম হেগেন বলছে, কর্লিয়নিদের পাওনা উপকারটা এবার তাকে পরিশোধ করতে হবে।

ছয়

ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়ল সনি কর্লিয়নির মৃত্যু সংবাদ। শিউরে উঠল গোটা

যুক্তরাষ্ট্রের অপরাধ জগৎ। নরক ভেঙে পড়বে এবার, বুঝতে বাকি থাকল না কারও। তারপর খবর এল রোগশয্যা থেকে উঠে পারিবারিক ব্যবসার দায়িত্ব নিয়েছেন ডন কর্লিয়নি। ইনফর্মাররা অভ্যুত্থিক্রিয়া দেখে এসে রিপোর্ট করল, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন ডন কর্লিয়নি, তাঁকে দেখে রুগ্ন বলে আর মনেই হচ্ছে না। নিউ ইয়র্কের পাঁচ পরিবার প্রমাদ গুল এবার। সামগ্রিক যুদ্ধ যে অনিবার্য সৈন্যপারে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকল না কারও মনে। যার যতটুকু ক্ষমতা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুতি নিতে শুরু করল তারা। সাজ সাজ রব পড়ে গেল চারদিকে। নিকট অতীতে দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছেন ডন কর্লিয়নি, কিন্তু তাই বলে তাঁকে যে হেয় বা, তুচ্ছ জ্ঞান করা চলে না, এটুকু বুঝতে ভুল করল না কেউ।

জীবনে খুব কম ভুলই করেছেন ডন কর্লিয়নি, যে ক'বার করেছেন, সেগুলো থেকে যথেষ্ট শিক্ষা ও অর্জন করেছেন।

ডনের প্রকৃত অভিপ্রায় একমাত্র হেগেন অনুমান করতে পেরেছে। শান্তি-প্রস্তাব দিয়ে পাঁচ পরিবারের কাছে যখন দূত পাঠালেন ডন, এতটুকু আশ্চর্য হলো না সে। শুধু মাত্র শান্তি-প্রস্তাব নয়, সেই সাথে নিউ ইয়র্কের পাঁচ পরিবারের সাথে একটি আলোচনা-প্রস্তাবও করলেন তিনি। সেই সভায় যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত পারিবারিক সংগঠনকে ডাকা হলো। দেশের মধ্যে শুধু নিউ ইয়র্কের মাফিয়া পরিবারগুলোই সবচেয়ে প্রতাপশালী, তাই সবাই জানে যে তাদের মঙ্গলই দেশের মঙ্গল।

প্রথম দিকে কারও কারও মনে সন্দেহ দেখা দিল বৈকি। ফাঁদ পাতবার তালে নেই তো ডন কর্লিয়নি? শত্রুদের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করছেন না তো? ছেলের মৃত্যুর বদলা নেবার জন্যে পাইকারী হত্যার বন্দোবস্ত করছেন? কিন্তু এটি যে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা অচিরেই তা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন ডন কর্লিয়নি। আলোচনা সভায় শুধু যে সমস্ত মাফিয়া পরিবারকে ডাকলেন তাই নয়, লড়াইয়ের জন্য নিজের লোকদের প্রস্তুত করার, কিংবা মিত্র সংগ্রহ করার কোন চেষ্টাই করলেন না। তারপর তাঁর শেষ সদিচ্ছা প্রকাশের ব্যবস্থাও করলেন, যার ফলে তাঁর অভিপ্রায়ের আন্তরিকতা যথার্থ এবং নির্ভেজাল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। সেই সাথে মহাসভায় যারা উপস্থিত থাকবে সেই সব সদস্যদের নিরাপত্তার গ্যারান্টিও পাওয়া গেল। বোচ্চিচ্চিও পরিবারের সহযোগিতা চাইলেন তিনি।

এই বোচ্চিচ্চিও পরিবারের আশ্চর্য একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সিসিলিতে এক সময় ওরা একটা ভয়ঙ্কর হিংস্র মাফিয়া দল হিসেবে পরিচিত হলেও, আমেরিকায় এসে অবধি ঝগড়া বিবাদ মিটিয়ে দিয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা কায়েমে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়ে আসছে। এক সময়ে যারা বুনো গোয়াতুমির সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করত, এখন তারা যাকে বলা যায় সাধু ও সং উপায়ে সংসার চালায়। এদের বড় একটা গুণ, পরিবারটা রক্তসম্পর্কের সুদৃঢ় ঘনিষ্ঠ বাঁধনে একজোট যে-সমাজে স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ততার চেয়েও পরিবারের প্রতি বিশ্বস্ততার গুরুত্ব বেশি, তাদের তুলনায়ও বোচ্চিচ্চিও পরিবারের একতা অনেক বেশি দৃঢ় আর মজবুত।

এক সময় বোচ্চিচ্চিও পরিবারের চাচাতো ফুফাতো ভাই আর তাদের নাতিদের গোণার মধ্যে ধরলে দাঁড়াত প্রায় দুশো, দক্ষিণ সিসিলির একটা ছোট অংশের সমগ্র অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করত তখন ওরা। গোটা পরিবারের আয়ের উৎস

ছিল চার-পাঁচটি ময়দার কল, সেগুলোর মালিকানা সকলের হাতে সমান ভাবে না থাকলেও, পরিবারের কাউকেই খাওয়া, চাকরি বা খানিকটা নিরাপত্তার জন্যে ভাবতে হত না। তার উপর নিজেদের মধ্যে বিয়ে-থা হওয়াতে ওরা সবাই মিলে একজোট হয়ে শত্রুপক্ষের মোকাবিলা করতে পারত।

সিসিলির ওই অঞ্চলে ওদের সাথে রেষা-রেষি করার জন্যে কাউকে ময়দার কল, কিংবা বাঁধ তৈরি করতে দেয়া হত না, যাতে প্রতিযোগীরা পানি না পায়, কিংবা ওদের পানি বিক্রির আয়ে কেউ ভাগ না বসায়। একবার একজন প্রতিপত্তিশালী জমিদার শুধুমাত্র নিজের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে একটা ময়দার কল বসাবার চেষ্টা করল। কলটা পুড়িয়ে ফেলা হলো। জমিদার তখন পুলিশের কাছে সাহায্য চাইল। তারা বোচ্চিচ্চিও পরিবারের তিনজনকে গ্রেফতারও করল। কিন্তু তাদের বিচার হবার আগেই জমিদারের বাড়িতে আগুন ধরে গেল। নালিশ অভিযোগ তুলে নিতে আর দেরি করেনি জমিদার। এর কয়েক মাস পরে, ইতালীয় সরকারের শ্রেষ্ঠ পদাধিকারীদের একজন সিসিলিতে এসে এই দ্বীপের বারোমেসে পানির অভাব মেটাবার জন্যে প্রকাণ্ড একটা বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা করল। রোম থেকে স্থপতিরা এল মাটি পরীক্ষা করার জন্যে। স্থানীয় অধিবাসীরা মুখ কালো করে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। এরা সবাই বোচ্চিচ্চিও পরিবারের সদস্য। বিশেষভাবে নির্মিত ব্যারাকে পুলিশের লোকদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকাটাকে পানিতে ডুবিয়ে দেয়ার কাজও শেষ।

সবাই ধরে নিল এবার বাঁধ তৈরি ঠেকাতে পারবে না কেউ। রসদ, মাল মসলা, যন্ত্রপাতি জাহাজ থেকে নামানো হলো পালার্মোতে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। ইতিমধ্যে বন্ধু মাফিয়া নেতাদের সাথে যোগাযোগ করে, তাদের কাছ থেকে সাহায্য চেয়ে রেখেছে বোচ্চিচ্চিওরা। ভারি ভারি যন্ত্রপাতি যথাসময়ে ধ্বংস করা হলো সব, আর হালকা জিনিসগুলো সব চুরি হয়ে গেল। ওদিকে ইতালীয় সংসদে মাফিয়াদের প্রতিনিধিরা বাঁধের প্রস্তাবকারীদের বিরুদ্ধে আমলাতান্ত্রিক প্রতি-আক্রমণ চালাতে শুরু করেছে। এভাবে চলল দীর্ঘ কয়েকটা বছর। তারপর ক্ষমতাসীন হলেন মুসোলিনি। ডিক্টেটর সাহেব নির্দেশ দিলেন, বাঁধ তৈরি করতেই হবে। তবু করা গেল না। মুসোলিনি জানতেন মাফিয়ারা তাঁর শাসন ব্যবস্থার বিপন্ন করার চেষ্টা চালাবে, তাঁর রাজ্যে ওদের নিজেদের প্রভাবাধীন একটা আলাদা এলাকা সৃষ্টি করবে। একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারীকে পূর্ণ ক্ষমতা দিলেন মুসোলিনি। সে লোকটি সবাইকে জেলে ভরে, নয়তো দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে সাথে সাথে সমস্যার সমাধানও করে ফেলল। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে মাফিয়াদের শিরদাঁড়া ভেঙে দিল সে, যাকেই মাফিয়াদের সমর্থক বলে সন্দেহ হয় তাকেই ধরে বন্দী করে। এতে অসংখ্য নিরীহ পরিবারেরও সর্বনাশ ঘটল।

এই সীমাহীন ক্ষমতার বিরুদ্ধে জোর খাটাতে যাওয়াটা উচিত হয়নি বোচ্চিচ্চিওদের। সশস্ত্র সংগ্রামে গোষ্ঠীর অর্ধেক পুরুষ প্রাণ হারাল। বাকি অর্ধেককে সাজা দিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হলো দ্বীপান্তরে। মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন বাকি থাকল তাদের জন্য বেআইনি চোরা পথে, কানাডা পৌছে, জাহাজ থেকে পালিয়ে, আমেরিকায় আসার বন্দোবস্ত করা হলো। টেনেটুনে প্রায় কুড়ি জন বহিরাগত

ইতালীয়, নিউ ইয়র্কের অনতিদূরে, হাডসন ভ্যালির ছোট শহরে শুরু করল বসবাস। সমাজের নিম্নতম স্তরের কাজ থেকে জীবিকা অর্জন শুরু করে ক্রমে নিজেদের অবস্থা উন্নত করল ওরা। শেষ পর্যন্ত একটা আবর্জনা সংগ্রহ সংস্থার মালিক হলো। সেই সাথে নিজেদের কয়েকটা ট্রাকও হলো ওদের। প্রতিযোগিতা করার মত কেউ না থাকায় তাদের অবস্থা দিনে দিনে খুব ভাল হয়ে উঠল। প্রতিযোগিতা না থাকার কারণ হলো, কেউ প্রতিযোগিতা করতে এলেই তাদের ট্রাক পুড়ে যায়; ভেঙে যায়। একজন গৌয়ার-গোবিন্দ গোছের লোক দাম কমিয়ে ওদের ব্যবসা হাতাবার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু তাকে দেখা গেল নিজের সংগ্রহ করা আবর্জনার স্তুপের তলায় চাপা পড়ে দম আটকে মরে রয়েছে।

ক্রমে পুরুষদের সকলের বিয়ে হলো, বলা বাহুল্য সিসিলীয় মেয়েদের সাথে তাদের ছেলেরপিলে হলো, তখন আবর্জনা সংগ্রহের ব্যবসা দিয়ে খাওয়া-পড়া চলে গেলেও, আমেরিকার যে-সব উন্নত বিলাসদ্রব্য কিনতে পাওয়া যায় তা কিনতে গিয়ে পয়সায় কুলোয় না। কাজেই, বাড়তি রোজগারের উদ্দেশ্যে বোচ্চিচ্চিও পরিবার মধ্যস্থতার ভূমিকা নিয়ে আর জামিন হয়ে, যুদ্ধরত মাফিয়া পরিবারগুলোর মধ্যে শান্তি স্থাপনের দায়িত্ব নিল।

এই বোচ্চিচ্চিও পরিবারের মধ্যে আবার একটা নির্বুদ্ধিতার ভাব দেখা যায়। তবে সেটা ওদের আদিম স্বভাবও হতে পারে। সে যাই হোক, ওরা নিজেদের দুর্বলতা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। ওরা জানে, অন্যান্য 'মাফিয়া' পরিবারের সাথে প্রতিযোগিতা করে, যে-সমস্ত ব্যবসাতে আরও বেশি বুদ্ধির দরকার, যেমন বেষ্যা ব্যবসা, জুয়া খেলা, মাদক-দ্রব্যের ব্যবসা, জনসাধারণকে ঠকিয়ে খাওয়া, সে-সব গড়ে তোলা বা চালানো ওদের বুদ্ধিতে কুলিয়ে উঠবে না। ওদের স্পষ্ট কথা, ওরা টহলদার পুলিশের লোককে হয়তো কিছু দিয়ে খুশি করতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিক দালালদের কাছে এগুতে পারবে না। শুধু দুটো গুণ আছে ওদের, সততা আর হিংস্রতা।

বোচ্চিচ্চিওরা কখনও মিথ্যা কথা বলে না। কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করেন না। জানে এসব করতে গেলে বড় বেশি জটিলতার মধ্যে পড়তে হয়। তবে কেউ যদি বোচ্চিচ্চিওদের কোন অনিষ্ট করে সে-কথা তারা কখনও ভোলে না, প্রতিশোধ নিতেও ছাড়ে না, তার জন্যে যে দামই দিতে হোক না কেন। তাই একেবারে হঠাৎ করেই ওরা যে-ব্যবসাটায় ঢুকে পড়ল কালক্রমে দেখা গেল সেটাতেই ওদের সবচেয়ে বেশি লাভ হচ্ছে।

যদি যুদ্ধরত পরিবারগুলো আপোস গীমাংসা করার জন্যে পরস্পরের সাথে মিলিত হতে চায়, বোচ্চিচ্চিও পরিবারকে খবর দেয় তারা। বোচ্চিচ্চিও পরিবারের কর্তা গিয়ে শান্তি-প্রস্তাবের কথা পাড়েন, জামিনের ব্যবস্থা করেন। যেমন, মাইকেল যখন সলোয়োর সাথে দেখা করতে গিয়েছিল, মাইকেলের নিরাপত্তার জামিন হয়ে বোচ্চিচ্চিও পরিবারের একজন লোক কর্নিয়নিদের কাছে বসে অপেক্ষা করছিল। এই জামিনের টাকা দিয়েছিল সলোয়ো। সলোয়ো যদি মাইকেলকে মেরে ফেলত, তাহলে ওই জামিনের লোকটিকে মেরে ফেলত কর্নিয়নিরা। সেক্ষেত্রে, তাদের পরিবারের লোকের মৃত্যুর কারণ হবার জন্যে বোচ্চিচ্চিওরা সলোয়োকে খুন

করত। বোচ্চিচ্চিওদের মধ্যে একটা আদিম ভাব থাকার দরুন তারা প্রতিশোধ নেবার পথে কোন বাধা মানে না, কোন শাস্তিকে ডরায় না। ওরা স্বচ্ছন্দে নিজেদের প্রাণ দেয়া। ওদের সাথে যে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাকে কেউ রক্ষা করতে পারে না। বোচ্চিচ্চিওদের কাউকে জামিন রাখা সম্পূর্ণ একটা নিরাপদ জীবনবীমার মত।

শান্তি-সভায় যে সব পরিবারের নেতারা আসবেন, বোচ্চিচ্চিওরা তাঁদের প্রত্যেকের জামিন হবে, তার পাকাপাকি ব্যবস্থা করলেন কর্লিয়নি। সুতরাং তাঁর আন্তরিকতা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠল না। সবাই বুঝল শান্তি-সভাটি হবে বিয়ে বাড়ির মত নিরাপদ।

জামিনের সমস্ত খুঁটিনাটি দিক সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর আলোচনা বৈঠক শুরু হলো ছোট একটা বাণিজ্যিক ব্যাংকের ডিরেক্টরদের কনফারেন্স রুমে। এই ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট কোন কারণে ঋণী হয়ে আছেন ডন কর্লিয়নির কাছে, তিনি ব্যাংকের কিছু শেয়ারের মালিকও বটে, যদিও শেয়ারগুলো ব্যাংকের প্রেসিডেন্টের নামেই রয়েছে। ডন কর্লিয়নিকে তাঁর শেয়ারের মালিকানার প্রমাণস্বরূপ একটা লিখিত দলিল দিতে চেয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট, যাতে তাঁর প্রতি কোনরকম বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ না থাকে। সেই মুহূর্তটা প্রেসিডেন্টের কাছে সাম্প্রতিক মূল্যবান হয়ে রয়েছে। আঁতকে উঠেছিলেন ডন কর্লিয়নি। বলেছিলেন, ‘আপনাকে বিশ্বাস করে আমার সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে দিতে পারি। আমার নিজের জীবন, আমার সন্তানদের মঙ্গল কিছুই আপনাকে অদেয় নেই। আপনি আমাকে কখনও ঠকাতে পারেন, কিংবা আর কোনভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন, এ আমি কল্পনাও করতে পারি না। তাহলে যে আমার সমস্ত জগৎ, আমি মানব চরিত্র বিচার করতে পারি এই বিশ্বাস, সবই মিথ্যে হয়ে যাবে। তবে আমার নিজের টুকে রাখা হিসেবপত্র আছে বটে, যাতে হঠাৎ যদি আমার কিছু হয়, আমার ওয়ারিশরা জানতে পারবে যে আপনি অছি হয়ে ওদের কিছু সম্পত্তি রেখেছেন। কিন্তু এটা আমি অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি, আমার ছেলেমেয়েদের অধিকার রক্ষা করার জন্যে আমি যদি এই পৃথিবীতে নাও থাকি, তবে আপনি তাদের বঞ্চিত করতে পারবেন না।’

ব্যাংকের সভাপতি, সিসিলীয় না হলেও, দারুণ অনুভূতিশীল। ডনের কথা মর্ম সাথে সাথে বুঝে নিয়েছিলেন। এখন গড ফাদার কিছু অনুরোধ করলে, প্রেসিডেন্টের কাছে সেটা আদেশ স্বরূপ। তাই আজ শনিবার সকালে, নিউ ইয়র্কের পাঁচ পরিবারের প্রয়োজনে ব্যাংকের কনফারেন্স রুমে বড় বড় চামড়া-বাঁধানো চেয়ার আর একান্ত নির্জনতার ব্যবস্থা হয়েছে।

নিরাপত্তা এবং প্রহবার দায়িত্ব দেয়া হলো বাছাই করা একদল লোককে। ব্যাংক-গার্ডদের ইউনিফর্ম পরে আছে তারা। শনিবার। সকাল দশটা। সভাঘরে লোক জমা হতে শুরু করেছে। নিউ ইয়র্কের পাঁচ পরিবার ছাড়াও এসেছে দেশের চারদিক থেকে দশটা পরিবারের প্রতিনিধিরা। নিমন্ত্রণ করা হয়নি শুধু শিকাগোর পরিবারগুলোকে। এদের জগতে শিকাগোর লোকদেরকে কলঙ্ক বলে মনে করা হয়। ওদেরকে শিষ্টাচার শেখাবার চেষ্টাও বাকিরা ছেড়ে দিয়েছে। এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশে ওদেরকে ডাকার কোন মানেই হয় না, এ-ব্যাপারে সবাই

একমত ।

একটা 'বার' খোলা হয়েছে মদ পরিবেশনের জন্যে । খাবার সাজানো হয়েছে 'বুফে' টেবিলে । প্রত্যেক সদস্যকে আলোচনা সভায় একজন করে সহকারী সাথে নিয়ে আসার অনুমতি দেয়া হয়েছে । সহকারী হিসাবে সব ডনই তাঁদের কনসিলিয়রদের এনেছেন । তার ফলে সভায় কমবয়সী লোক নেই বললেই চলে । অল্পবয়সীদের মধ্যে টম হেগেন একজন । তাছাড়া উপস্থিত ভদ্রলোকদের মধ্যে একমাত্র সে-ই সিসিলীয় নয় । কৌতূহলের সাথে সবাই দেখেছে তাকে, সে যেন আজব কোন চিড়িয়া ।

সবিন্দ্র সৌজন্য কাকে বলে হেগেন তা ভালই জানে । সে কথাও বলছে না, হাসছেও না । রাজার প্রিয় পাত্র কোন 'আর্ল' যে-ভাবে রাজার পরিচর্যা করে, টম হেগেনও সেভাবে গড ফাদারের পরিচর্যা করছে । তাঁর জন্য ঠাণ্ডা পানীয় এনে দিচ্ছে, তাঁর চুরুট ধরিয়ে দিচ্ছে, তাঁর এ্যাশট্রেটা ঠিক জায়গায় সরিয়ে রাখছে । সবটাই শ্রদ্ধার সাথে, কিন্তু স্থূল তোশামুদে চাকরের ভঙ্গিতে নয় ।

গাঢ় রঙের কাঠের প্যানেল দেয়া দেয়ালে যাদের ছবি ঝুলছে, তাদের পরিচয় একমাত্র হেগেনই জানে । দামী তেল-রঙে আঁকা অর্থনৈতিক জগতের স্বনামধন্য কয়েকজন লোকের প্রতিকৃতি ওগুলো । একটি ছবি ট্রেজারী সচিব হ্যামিলটনের । হেগেন জানে, একটা ব্যাংক ভবনে এ ধরনের শান্তি-সভা বসেছে জানলে খুশি হবেন না হ্যামিলটন ।

উপস্থিতির সময় সকাল সাড়ে নটা থেকে দশটা পর্যন্ত নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে ।

এক অর্থে ডন কর্নিয়নিকে এই অনুষ্ঠানের হোস্ট বলা যেতে পারে, কারণ এই শান্তি-আলোচনার প্রস্তাব তিনিই উত্থাপন করেছেন । এসেওছেন তিনি সবার আগে । তাঁর বহুবিধ গুণের মধ্যে সময়নিষ্ঠা হলো একটা । তাঁর পরেই এলেন কার্লো ট্রামন্টি । যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অংশটাকে নিজের এলাকা বলে বেছে নিয়েছেন তিনি । ভদ্রলোক মাঝবয়সী, তাকিয়ে থাকার মত সুপুরুষ, সিসিলীয়দের পক্ষে মাথায় খুব উঁচু, গায়ের রঙ রোদে পোড়া । পোশাক-পরিচ্ছদ, কেশ-বিন্যাস নিখুঁত । দেখে ইতালীয় মনে হয় না । পত্রিকাতে যে সব কোটিপতিদের ছবি বেরোয়, নিজেদের সৌখিন ইয়টে আরাম করে বসে মাছ ধরছে, ভদ্রলোক বরং তাদের মত দেখতে । ট্রামন্টি পরিবারের টাকা আসে জুয়া খেলা থেকে । কিন্তু তাদের ডনকে দেখলে কেউ ধারণাও করতে পারবে না কি হিংস্র, রক্তারক্তি সংগ্রাম করে রাজ্য লাভ করতে হয়েছে তাঁকে ।

ছোট বেলায় সিসিলি থেকে চলে এসে ফ্লোরিডাতে বসবাস করেছেন । তিনি বড় হয়েছেন সেখানেই । দক্ষিণ অঞ্চলের ছোট শহরগুলোতে যারা রাজনীতি করে, তাদের একটা সংগঠন আছে, তারা জুয়া খেলা নিয়ন্ত্রণ করে । ট্রামন্টি তখন তাদের একজন কর্মী । ভারি শক্তিশালী লোক সব, ওখানকার ক্ষমতামূলী পুলিশ কর্মচারীরা ওদের পৃষ্ঠপোষকতা করে, ওরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে বিদেশ থেকে আনকোরা কাঁচা আমদানী হওয়া এই ছোকরা তাদের পরাস্ত করতে পারবে । তাঁর ওই হিংস্রতার জন্য ওরা তৈরি হবারই সময় পায়নি, তাঁর সামনে ওরা দাঁড়াতেই

পারেনি। কারণ ওদের মতে এত সামান্য লাভের জন্যে এত বেশি রক্তপাতের কোন মানে হয় না। বেশি করে লাভের অংশ দিয়ে ট্রামন্টি পুলিশের লোকদের দলে টেনে নিলেন। লাল মুখো গুণ্ডাগুলোর একটুও কল্লনাশক্তি নেই, এরা আবার সংগঠন চালাবে। ট্রামন্টি এদের সমূলে উৎখাত করলেন। কিউব আর বাঁটিস্টা সরকারের সাথে ট্রামন্টিই যোগাযোগ করলেন। হাভানার সুখের নিবাসগুলোয় যত জুয়ার আড্ডা আর বেশ্যা বাড়ি আছে, সবখানে অচেন টাকা ঢাললেন ট্রামন্টি, যাতে আমেরিকার জুয়াড়ীদের আকৃষ্ট করতে পারেন। এখন ট্রামন্টি বহু লক্ষ ডলারের মালিক, মিয়ামী বীচের সবচেয়ে সৌখিন একটা হোটেলের মালিক।

সভাঘরে এলেন ট্রামন্টি, পিছন পিছন এল তাঁরই মত রোদে পোড়া তাঁর কনসিলিয়রি। ঢুকেই ডন কর্লিয়নিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ট্রামন্টি, ডনের ছেলের মৃত্যুর জন্যে শোক প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে মুখে সমবেদনার ভাব ফুটিয়ে ডুললেন।

অন্যান্য ডনও এসে পৌঁছুতে শুরু করেছেন। সবাই সবার পরিচিত, বহু বছরের দেখা-শোনা কখনও সামাজিক অনুষ্ঠানে, কখনও ব্যবসা ক্ষেত্রে। এঁরা কেউই কাউকে পেশাদারি সৌজন্য দেখাতে ভুল করেন না। এবং বয়স যখন আরও কম আর শরীর আরও হালকা ছিল তখন পরস্পরকে নানাভাবে সাহায্যও করেছেন। ট্রামন্টির পরপরই এলেন ডেট্রয়ট থেকে জোসেফ জালুচি। উপযুক্ত বেনাম ও ছদ্মবেশ নিয়ে ডেট্রয়ট অঞ্চলের একটা ঘোড়দৌড়ের মাঠের মালিক জালুচি পরিবার। তাছাড়া জুয়া খেলারও একটা বড় আয় আছে তাদের। অমায়িক চেহারা জালুচির। ডেট্রয়টের সৌখিন গোস পয়েন্ট অঞ্চলে এক লাখ ডলার দামের একটা বাড়িতে বাস করেন। তাঁর এক ছেলের বিয়ে হয়েছে একটা প্রাচীন খ্যাতিনামা আমেরিকান পরিবারে। ডন কর্লিয়নির মত জালুচিও খুব কায়দাদুরস্ত। সিসিলীয় পরিবার পরিচালিত যতগুলো শহর আছে তার মধ্যে ডেট্রয়ট শহরে হিংসাত্মক ঘটনার সংখ্যা সবচেয়ে কম। গত তিন বছরের মধ্যে মাত্র দু'জনকে প্রাণদণ্ড দেয়া হয়েছে। তিনিও ড্রাগ ব্যবসা সমর্থন করেন না।

কনসিলিয়রিকে সাথে করে এনেছেন জালুচিও। দু'জনেই সবার আগে ডন কর্লিয়নির কাছে এলেন, আলিঙ্গন করলেন তাঁকে। গলার স্বর আমেরিকানদের মত গম্‌ গম্‌ করে জালুচির, তাতে খুব সামান্য একটু টান আছে। পোশাক-আশাকে প্রাচীনপন্থী, কটুর ব্যবসাদারের মত হাবভাব, আবার প্রয়োজনে অমায়িক সহৃদয়তার পরিচয় দিয়ে থাকেন। ডন কর্লিয়নিকে তিনি বললেন, 'শুধু আপনার ডাক শুনেই এসেছি আমি।' মাথা নিচু করে ধন্যবাদ জানালেন ডন কর্লিয়নি। সমর্থনের জন্যে তিনি নির্ভর করতে পারবেন জালুচির উপর।

এরপর এলেন, পশ্চিম তীরের দু'জন ডন। একসাথে এক গাড়িতেই এসেছেন তাঁরা। কাজকর্মও করেন একসাথে। নাম, ফ্র্যাঙ্ক ফ্যালকনি আর অ্যান্টনি মলিনারি, আর সবাই যারা এই সভায় যোগ দিতে এসেছেন, তাঁদের চেয়ে এঁদের দু'জনের বয়স কম, চল্লিশের কোঠার গোড়ার দিকে। এদের পোশাক-পরিচ্ছদ অন্যদের চেয়ে কম কেতাদুরস্ত, ধরন ধরনে কিঞ্চিৎ হলিউডি কায়দা, যতটা হলেই চলে আচার-ব্যবহারে তার চেয়ে একটু বেশি অমায়িক আর বন্ধুত্বের ভাব। ফ্র্যাঙ্ক ফ্যালকনির হাতে আছে চলচ্চিত্র শ্রমিক সংঘগুলো। তাছাড়া আছে স্টুডিওর জুয়া খেলা আর

একটা বেশ্যা ব্যবসা চালানোর সংগঠন, সেখানে থেকে সুদূর পশ্চিমের গণিকালয়ে বেশ্যা সরবরাহ করা হয়। কোন ডনের পক্ষে 'শো বিজ'-এ জড়িয়ে পড়া সম্ভব নয়, 'শো বিজ' হলো নাচ-গান-অভিনয় ইত্যাদি, তবু ফ্যাল্কনির একটু ঝোক আছে সেদিকে। তাই অন্যান্য ডনরা তাঁকে বিশ্বাস করেন না।

স্যান ফ্রান্সিস্কোর তীরভূমি পরিচালনা করেন অ্যান্টনি মলিনারি। খেলাধুলা সংক্রান্ত জুয়ায় তাঁর খুব প্রতিপত্তি। ইতালীয় জেলে বংশের ছেলে তিনি। স্যান ফ্রান্সিস্কোর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট 'সী-ফুড' রেস্তোরাঁর মালিক। সেখানে নানারকম উপাদেয় সামুদ্রিক খাবারদাবার ছাড়া আর কিছু পরিবেশন করা হয় না। লোকে বলাবলি করে যে ওই রেস্তোরাঁ নিয়ে লোকটা সাম্রাজ্যিক গর্বিত গর্বটা এতই বেশি যে সেখানে একেবারে পানির দামে ভাল খাবার পরিবেশন করা হয়। ব্যবসাটা তাই লোকসান দিচ্ছে। পেশাদার জুয়াড়ীর মত ভাবলেশহীন মুখ তাঁর। সবাই জানে, মেক্সিকোয় সীমান্তের ওপার দিয়ে আর পূর্ব সাগরের অলিগলি দিয়ে যে সব জাহাজ যাতায়াত করে তাদের কাছ থেকে নিয়ে মলিনারি কিছু ড্রাগনের চোরা কারবারও করেন। এঁদের সহকারীদের বয়স বেশি নয়। বলিষ্ট গড়ন, দেখেই বোঝা যাচ্ছে সহকারীটারী নয়, স্নেফ বডিগার্ড। তবে, এ ধরনের সভায় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আসার সাহস ওদেরও নেই। সবাই জানে, এই বডিগার্ডরা 'কারাতে' জানে। ব্যাপারটা আর সব ডনদের হাসির খোরাক। ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, ক্যালিফোর্নিয়ার ডনরা যদি পোপের আশীর্বাদ দেয়া মাদুলীও বেঁধে আসতেন, তার চেয়ে একটুও বেশি শঙ্কিত হতেন না কেউ। যদিও একটা লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে এদের মধ্যে কেউ কেউ অত্যন্ত ধার্মিকও বটে, সৃষ্টিকর্তার উপর প্রবল বিশ্বাস রাখেন।

তারপর বোস্টন পরিবারের প্রতিনিধি এলেন। একমাত্র তাঁকেই অন্যরা একটুও শঙ্কা করেন না। তিনি নিজের লোকদের সাথে ন্যায্য ব্যবহার করেন না বলে যথেষ্ট দুর্নাম আছে তাঁর। তিনি তাদের নির্মমভাবে ঠকান। তাও ক্ষমা করা যায়, কেননা সব মানুষের লোভের মাত্রা তো আর সমান নয়। যেটা ক্ষমা করা যায় না সেটা হলো নিজের এলাকায় তিনি শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারেন না। তাঁর এলাকা বোস্টনে বড় বেশি খুন, ক্ষমতা নিয়ে বড় বেশি স্থূল ঝগড়াঝাটি, বড় বেশি স্বাধীন অনুমোদিত ক্রিয়াকলাপ, বড় বেশি বেয়াড়াভাবে আইন ভাঙাভাঙি। শিকাগোর মারফিয়ারা যদি বুনো জঙ্গলী হয়ে থাকে, বোস্টনের লোকদের বলা চলে অমার্জিত অসভ্য বর্বর। স্নেফ ওণ্ডা। বোস্টনের ডনের নাম ডনমিক পাঞ্জা বেঁটে, গাট্টাগোঁটা চেহারা। একজন ডনের ভাষায়, স্নেফ একটা চোরের মত দেখতে

যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ক্ষমতাবান নিছক জুয়াখেলার সংগঠন বোধ হয় ক্রীভল্যাণ্ডের সংঘটাই। তাদের প্রতিনিধি সূক্ষ্ম অনুভাবনশীল চেহারার একজন প্রৌঢ়, চোখ মুখ বসে গেছে, ধপধপে সাদা চুল। তাঁর সামনে কিছু না বললেও, পিছনে সবাই তাঁকে 'ইভুদী' বলে। তার কারণ, সিসিলীয় লোক না রেখে, নিজের চারপাশে ইভুদী মোতায়ন রাখেন তিনি। এমন কি লোকমুখে এ কথাও আটকায় না যে যদি সাহসে কুলাত তাহলে উনি কনসিলিয়রির পদেও একজন ইভুদীকেই বহাল করতেন। মোট কথা, হেগেন থাকায় ডন কর্লিয়নির পরিবারকে যেমন বলা হয়, 'আইরিশ দঙ্গল', তেমনি আরও যুক্তিসঙ্গত কারণে ডন ভিনসেন্ট ফরলেঞ্জার

পরিবারকে বলা হয় ‘ইহুদী পরিবার’। তবে তাঁর সংগঠনটি পরিচালিত হয় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। ডনের মুখের ওই সুবোধ চেহারা সত্ত্বেও, রক্ত দেখে কখনও তিনি মুর্ছা গেছেন বলে শোনা যায়নি। তাঁর ওই মখমলের রাষ্ট্রনৈতিক দস্তানার ভিতরে রয়েছে প্রচণ্ড লৌহমুষ্টি।

সবার শেষে এলেন নিউ ইয়র্কের পাঁচ পরিবারের প্রতিনিধিরা। সাথে সাথে টম হেগেন লক্ষ করল, মফঃস্বল থেকে আসা ওই সব পাড়াগেঁয়ে নেতাদের চেয়ে এঁদের ব্যক্তিত্বের জোর কত বেশি, কত বেশি শ্রদ্ধা করার মত চেহারা প্রত্যেকের। প্রথম কথা হলো, নিউ ইয়র্কের পাঁচজন ডনই প্রাচীন সিসিলীয় ঐতিহ্যের অনুগামী। ‘পেটওয়ানা মানুষ তাঁরা’—অর্থাৎ আলঙ্কারিক ভাষায় বলা হচ্ছে, যেমন প্রতাপ তেমনি সাহস তাঁদের, আর সাদামাঠা ভাষায় বলা হচ্ছে, গায়ে-পায়ে তাঁদের মাংস আছে। সত্যি কথা বলতে কি, সিসিলীতে ওই দুটো বৈশিষ্ট্যকে এক করেই দেখা হয়। নিউ ইয়র্কের পাঁচজন ডনের সবার চেহারা শক্ত, মেদবহুল। সিংহের মত বিশাল মাথা প্রত্যেকের, প্রকাণ্ড মুখাবয়ব, মাংসল রাজকীয় নাক, পুরু ঠোঁট। খুব একটা কায়দাদস্তুর ভাবে সাজগোজ করেননি কেউ, তাঁদের দেখলেই মনে হয় বাবুয়ানী-বর্জিত কাজের মানুষ সবাই, বাজে কাজে নষ্ট করার মত সময় নেই কারও।

এঁদের মধ্যে রয়েছেন অ্যান্টনি স্ট্রাচি। ঐর হাতে আছে নিউ জার্সি আর ম্যান হ্যাটনের পশ্চিম ঘাটার জাহাজি কারবার। নিউ জার্সিতে ইনি জুয়ার ব্যবসা চালান। ডেলক্যাট রাজনৈতিক দলের সাথে খুব দহরম মহরম তাঁর। একরাশ মালবাহী ট্রাক আছে, সেগুলো থেকে তাঁর লক্ষ লক্ষ ডলার আয় হয়। এত বেশি আয় হবার কারণ ট্রাকগুলোতে বে-আইনী ভাবে বেশি মাল চাপান তিনি, অথচ ওজন ইসপেক্টররা কেউ সেগুলোকে থামাতে, কিংবা জরিমানা করতে পারে না। এই ট্রাকগুলো আবার ভেঙে তছনছ করে দেয় রাস্তাগুলোকে, রাস্তা মেরামতের মোটা মোটা সরকারি কন্ট্রাক্ট পান অ্যান্টনি। এ ধরনের ব্যবসার কথা শুনেও ভাল লাগে, এক ব্যবসার ভিতর থেকে কেমন বেরিয়ে আসছে আরেক ব্যবসা। স্ট্রাচিও একটু সেকেন্ডে ধরনের মানুষ, বেশ্যা-ব্যবসা তিনি কখনও ছুঁয়েও দেখেন না। কিন্তু জাহাজঘাটার কারবার চালাতে হয় বলে ড্রাগসের ব্যবসা পরিহার করতে পারেন না। কর্লিয়নিদের বিপক্ষে যে পাঁচটি পরিবার দাঁড়িয়েছে তার মধ্যে ঐর দলটা সব চেয়ে দুর্বল। কিন্তু ইনিই আবার সব চেয়ে সুবিবেচক বলে পরিচিত।

একটা পরিবার নিউ ইয়র্ক রাজ্যের উত্তরাংশটা শাসন করে। কানাডা থেকে বহিরাগত ইতালীয়দের বে-আইনীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করে তারা, ও-দিককার সমস্ত জুয়ার ব্যবসাও তাদের হাতে ঘোড়দৌড়ের ঘাঠ ব্যবহার করার লাইসেন্স পাওয়া না পাওয়া নির্ভর করে তাদের উপর। এদের নেতার নাম ওটিলিও কুনিও। লোকটাকে দেখলেই গলে যায় মন, গ্রাম্য মায়রার মত গোলগাল হাসিখুশি চেহারা তাঁর। আইনসম্মত ব্যবসা আছে। দুধের কারবার। ছেলেপিলে ভালবাসেন কুনিও, পকেটে সব সময় লজেন্স নিয়ে ঘুরে বেড়ান, আশা, ন্নিজের নাতি-নাতনি আর বন্ধু-বান্ধবদের ছোট ছেলেমেয়েদেরকে খুশি করবেন। গোল একটা ফিডরা টুপি থাকে মাথায়, মহিলাদের রোদ ঠেকাবার টুপির মত তার কার্নিশটা সব সময়

নামানো থাকে। এমনিতেই মুখখানা চাঁদের মত গোল, তার উপর ওই টুপিটার জন্যে মুখটাকে আরও চওড়া দেখায়, ঠিক যেন একটা কমেডিয়ানের মুখোশ। যে অল্প কয়েকজন ডন কখনও গ্রেগোর হননি, ইনি তাঁদের একজন। এর আসন কীর্তিকলাপ সম্পর্কে কারও কোন ধারণাই নেই। এমনি তাঁর প্রতিষ্ঠা যে তিনি বাস্তব বিভাগের সদস্য পর্যন্ত হয়েছেন, নিউ ইয়র্ক রাজ্যের চেম্বার অফ কমার্স তাঁকে এ বছরের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী বলে সম্মানিতও করেছে।

টাটাগ্লিয়া পরিবারের সাথে সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা ডন এমিলিও বার্জিনির। ব্রুকলিন আর কুইনসে কিছু কিছু জুয়াখেলাও পরিচালনা করেন বার্জিনি। কিছু বেশ্যা ব্যবসাও আছে তাঁর। ওগা বাহিনী তো আছেই। স্টেটেন আইল্যান্ডে সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করেছেন। ব্রক্স আর ওয়েস্টচেস্টারে খেলাধুলা সংক্রান্ত বাজির ব্যাপারেও হাত আছে তাঁর। ড্রাগ ব্যবসাতে জড়িত ইনি। ক্লীভল্যান্ড আর পশ্চিম তীরের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাছাড়া অল্প কয়েকজন ব্যক্তি যারা লাস ভেগাস, রিনো আর নেভাডার শহরাঞ্চলেও নজর দেন তিনি তাঁদের মধ্যে একজন। মিয়ামি বীচ আর কিউবার সাথে তাঁর ক্রারবার আছে। নিউ ইয়র্ক শহরে, তথা গোটা দেশে, কর্নিয়নি পরিবারের পরেই তাঁর পরিবারের স্থান। সিসিলি পর্যন্ত এর প্রতিপত্তি প্রসারিত যেখানে যত বে-আইনী ব্যাপার ঘটে, সবগুলোতে তাঁর হাত আছে। এমন কি, লোকে বলে, ওয়াল স্ট্রীটেও ইনি একটা পা রাখার জায়গা করে নিয়েছেন। যুদ্ধের শুরু থেকেই ইনি অর্থবল আর পৃষ্ঠপোষকতার সাহায্যে টাটাগ্লিয়া পরিবারকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে আসছেন।

তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, একদিন তিনি আমেরিকার সবচেয়ে ক্ষমতাশালী আর শ্রদ্ধাভাজন মাফিয়া হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে ডন কর্নিয়নিকে পদচ্যুত করবেন আর কর্নিয়নি সাম্রাজ্যের খানিকটাকে ভোগে হস্তগত করবেনই। তাঁর প্রকৃতি অনেকটা ডন কর্নিয়নির মতই, তবে ইনি আরও আধুনিক, আরও কেতাদুরস্ত, আরও ব্যবসা-বুদ্ধি সম্পন্ন। একে কেউ 'বুড়ো গুঁফো সরদার' বলে উল্লেখ করে না। যে সব আরও আধুনিক, আরও কম বয়েসী, আরও দৃঃসাহসিক নেতা উন্নতির দিকে ক্রমে অগ্রসর হচ্ছে তারা তাঁর ওপর আস্থা রাখে। তাঁর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব আছে কিন্তু তাতে উত্তাপ নেই। ডন কর্নিয়নির মত সফলদায়িতা নেই। তবে বর্তমানে মাফিয়াদের মধ্যে তাঁকেই লোকে সবচেয়ে বেশি খ্যাতির করে থাকে।

সবার শেষে এসে পৌঁছুলেন টাটাগ্লিয়া পরিবারের কর্তা, ডন ফিলিপ টাটাগ্লিয়া। তাঁর পরিবারই সলোয়াকে সমর্থন করে কর্নিয়নীদের ক্ষমতাকে শক্তি পরীক্ষায় ডাক দিয়েছিল এবং আরেকটু হলে জিতেও গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অন্যেরা সবাই তাঁকে একটু তাচ্ছিল্য করেন। তার কারণ, সলোয়োর বশ্যতা মেনে নিয়েছিলেন ইনি। সত্যি কথা বলতে কি, চতুর তুর্কী তাঁর নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে। উপস্থিত হটগোল, এই যে ঝামেলা যার জন্যে নিউ ইয়র্কের সমস্ত মাফিয়া পরিবারের দৈনন্দিন ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তার জন্যে বাকিরা সবাই দায়ী করেছেন একে। তাছাড়া, ষাট বছর বয়স লোকটার, অথচ শখের অন্ত নেই। আর এক নম্বর লম্পটও বটে। নিজের এই সব দুর্বলতাকে প্রণয় দেবার যথেষ্ট সুযোগও তিনি পান। কারণ টাটাগ্লিয়া পরিবার মেয়েমানুষের ব্যবসা

করে। ওদের প্রধান কারবারই এটা। তাছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের বেশির ভাগ নাইট-ক্লাব রয়েছে এদের হাতে। দেশের যে-কোন অঞ্চলে এরা যে-কোন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারে। সম্ভাবনাময় গাইয়ে কিংবা ভাঁড়ামির ওস্তাদদের আয়ত্ত করার জন্যে গায়ের জোর খাটাতে ফিলিপ টাটাগ্লিয়ার বাধে না, রেকর্ডের কারবারেও হস্তক্ষেপ করেন ইনি। তবে পারিবারিক আয়ের প্রধান উৎস বেশ্যা ব্যবসা।

আর সবার কাছে তাঁর চরিত্রটা অপ্রীতিকর। সব সময় নাকী কান্না কাঁদেন, পারিবারিক ব্যবসাটার কি ভীষণ খরচ, তার ফিরিস্তি দেন। ধোপার বিল আছে, গাদা গাদা তোয়ালে দরকার হয়, তাতে লাভের টাকা খেয়ে যায়। যদিও যে কোম্পানি কাপড় কেচে দেয়, সেটারও মালিক তিনি। বলেন, মেয়েগুলো কুঁড়ে, একটুও বিশ্বাস করা যায় না তাদেরকে —কে কখন কেটে পড়ে, আত্মহত্যা করে। দালালগুলো সব বিশ্বাসঘাতক, অসৎ, এতটুকু আনুগত্য নেই মালিকের প্রতি। কাজের উপযুক্ত ভাল লোক পাওয়া দুষ্কর। সিসিলীয় ছোকরাগুলো আবার এ ধরনের কাজ দেখলে নাক সিটকায়। তাদের ধারণা, মেয়েমানুষ নিয়ে ব্যবসা করা বা তাদেরকে গালাগালি করা অধর্মের কাজ। অথচ নচ্ছারগুলো কোটের বুকে ইস্টারের সময় তাল পাতার বাহারে জুশ ঝুলিয়ে, দিবিয় গান গাইতে গাইতে মানুষের গলা কাটে। এইভাবে বক বক করেন ফিলিপ টাটাগ্লিয়া, শোভাদেব না পান সহানুভূতি, না পান শ্রদ্ধা। তাঁর সবচেয়ে রাগ কর্তৃপক্ষের উপর। নাইট ক্লাব, নাচশালা আর মদের লাইসেন্স যারা ইচ্ছামত দিতে বা কেড়ে নিতে পারে। বলে থাকেন, সরকারী সীলমোহর চোরদের পেটে যত টাকা ঢেলেছেন, তার সাহায্যে তিনি নাকি ওয়াল স্ট্রীটের চেয়েও বেশি লক্ষপতি তৈরি করতে পারতেন।

অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, কর্লিয়নিদের সাথে লড়াই করে প্রায় জিতে গিয়েও যথাযোগ্য খাতির পাননি তিনি। অন্য ডনরা জানেন, টাটাগ্লিয়ার শক্তি প্রথমদিকে সলোয়ার কাছ থেকে, পরে বার্জিনির কাছ থেকে ধার করা। তাছাড়া, কর্লিয়নিদেরকে অতর্কিতে আক্রমণ করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও জয়লাভ অসম্পূর্ণ থাকার ব্যাপারটাও তাঁর অযোগ্যতার সাক্ষ্যস্বরূপ। সবাই বোঝে, ওদের যদি আরেকটু দক্ষতা থাকত, বর্তমান গোলমেলে অবস্থাটা এড়িয়ে যাওয়া যেত। ডন কর্লিয়নির মৃত্যু হলে লড়াইটাও বাধত না।

পরস্পরের সাথে লড়তে গিয়ে দু'জনেই ছেলে হারিয়েছেন, সে-ক্ষেত্রে ডন কর্লিয়নি আর ফিলিপ টাটাগ্লিয়া যে শুধু একটু মাথা নেড়ে পরস্পরের উপস্থিতিতে স্বীকৃতি দেবেন, সেটাই তো স্বাভাবিক। ডন কর্লিয়নি আজ সকালের লক্ষ্যস্থল, আঘাত আর বিফলতা তাঁর শরীরে কতটা অবসন্নতার ছাপ রেখে গেছে, সে-বিষয়ে সবারই দারুণ কৌতূহল। একটা কথা ভেবে সবাই আশ্চর্য যে প্রিয় পুত্রের মৃত্যুর পর কেন শান্তির প্রস্তাব করছেন ডন কর্লিয়নি। এ তো পরাজয় স্বীকারের সামিল, এর ফলে তাঁর ক্ষমতা কমে যাবে। যাই হোক, ভারছে সবাই, শিগগিরই জানা যাবে সব।

সকলকে অভিবাদন করা হলো। পানীয় পরিবেশন করা হলো। এভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে যাবার পর পালিশ করা আখরোট কাঠের টেবিলে তাঁর আসন

নিলেন ডন কর্নিয়নি। ডনের বাঁ দিকে একটা চেয়ার একটু পিছনে সরিয়ে বসল টম হেগেন, যাতে অনধিকার প্রবেশ করা না হয়। আর সব ডনরাও ইঙ্গিত পেয়ে টেবিলের চারধারে বসলেন। সহকারীরা বসল তাঁদের পিছনে। একটু এগিয়ে এল কনসিলিয়রীরা, যাতে দরকার হলে উপদেশ দিতে পারে।

প্রথমে কথা বললেন ডন কর্নিয়নি। এমন ভাবে বললেন, যেন কিছুই হয়নি। যেন তিনি 'মর্মান্তিক আঘাত পাননি, তাঁর বড় ছেলে মারা যায়নি, তাঁর সাম্রাজ্য তছনছ হয়নি, নিজের পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েনি, মলিনারি পরিবারের নিরাপত্তাধীনে ফ্রেডি পশ্চিমে চলে যায়নি, সিসিলির বন-বাদাড়ে মাইক লুকিয়ে নেই। বলা বাহুল্য, সিসিলির ভাষাতেই কথা বলছেন ডন কর্নিয়নি।

ডন কর্নিয়নি বলছেন, 'আপনারা এসেছেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য, সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি মনে করি আমার ডাকে আজ এসে আপনারা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে দয়া করেছেন, সেজন্য আমি আপনাদের প্রত্যেকের কাছে ঋণী। সুতরাং শুক্রতেই বলে রাখছি, আমি শুধু একটু যুক্তি দেখতে চাই আর নিজে যুক্তি ভালবাসি বলে আজ এখান থেকে আমরা যাতে সবাই হাসিমুখে বিদায় নিতে পারি তাঁর জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে চাই। আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে চেনেন, তাঁরা জানেন, কথা আমি কখনও হালকাভাবে দিই না। সে যাই হোক, এখন কাজের কথায় আসা যাক। এখানে আমরা যাঁরা সমবেত হয়েছি তাঁরা সবাই সজ্জন। আমরা তো আর উকিল নই যে সবার কাছে সবাই প্রতিশ্রুতি দেব।'

এই বলে ডন থামলেন। কেউ কোন কথা বলছেন না। কেউ চুরুট ফুঁকছেন, কেউ গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন। এঁরা সবাই আদর্শ শ্রোতা, ধৈর্য ধরে কথা শোনেন। এঁদের সবার আরেকটা গুণও রয়েছে। এঁদের মত মানুষ খুব বিরল, এঁরা কেউ সংগঠিত, প্রচলিত সমাজের অনুশাসন মানতে রাজী নন, এঁরা নিজেদের উপর অন্য মানুষের আধিপত্য স্বীকার করেন না। এঁরা স্বেচ্ছায় না করলে, কোন শক্তি কিংবা কোন মরণশীল মানুষ এঁদের দিয়ে বশ্যতা স্বীকার করাতে পারে না। এঁরা চাতুরি আর খনের সাহায্যে নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছা সংরক্ষণ করেন। এঁদের স্বাধীন ইচ্ছা নতি স্বীকার করে একমাত্র মৃত্যুর কাছে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন ডন কর্নিয়নি, তারপর স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপার এতদূর পড়াল কি করে? থাক সে কথা। নির্বুদ্ধিতা অনেক হয়ে গেছে। শোচনীয়ভাবে, মিছেমিছি। তবু আমি যে দৃষ্টিতে বিষয়টাকে দেখেছি, সেটা বলি।'

আবার থামলেন ডন। তাঁর বিবৃতি শুনতে কারও যদি আপত্তি থাকে সে যেন তা প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু কেউ তাঁকে বাধা দিচ্ছে না এখনও।

'সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানাই যে আমার শরীরটা সেরে উঠেছে। ব্যাপারটা হয়তো মিটিয়ে ফেলতে সাহায্য করতে পারব আমি। আমার ছেলে হয়তো বড় বেশি হঠকারি, বড় বেশি গোয়ার ছিল। সেটা আমি অস্বীকার করব না। সে যাই হোক, কেন এত কিছু ঘটল সে-ব্যাপারে শুধু এইটুকু বলতে চাই যে সলোযো আমার কাছে একটা ব্যবসার প্রস্তাব আনে, আমার টাকা আর পৃষ্ঠপোষকতা চায়। এ ব্যাপারে টাটাগ্লিয়া পরিবারও জড়িত। ব্যবসাটা ড্রাগনের। আমার তাতে কোন

আগ্রহ নেই। আমি চুপচাপ থাকতে ভালবাসি, ওসব ব্যবসাতে অনেক রকম ঝামেলা, তাই আমার পছন্দ নয়। তাকে আর টাটাগ্লিয়া পরিবারকে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে, তাকে সব কথাই বুঝিয়ে বলেছিলাম আমি। বিনয় আর সৌজন্যের সাথেই প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। বলেছিলাম, তার ব্যবসা আর আমার ব্যবসার মধ্যে কোন বিরোধ নেই, যে যেভাবে ইচ্ছে টাকা রোজগার করুক, তাতে আমার কোন আপত্তিও নেই। সে কিন্তু আমার কথাটাকে ভালভাবে নিল না, না নিয়ে আমাদের সবার সর্বনাশ ডেকে আনল। জানি, এরই নাম জীবন। এখানে আপনারা যারা এসেছেন, তারা প্রত্যেকেই যার যার দুঃখের কথা বলতে পারেন। আমার নিজের ইচ্ছা তা নয়।’

আবার থামলেন ডন কর্লিয়নি, ইশারা করে কিছু ঠাণ্ডা পানীয় আনতে বললেন হেগেনকে। তাড়াতাড়ি পানীয় এনে দিল হেগেন

ঠোট ভিজিয়ে নিয়ে আবার শুরু করলেন ডন কর্লিয়নি। বললেন, ‘আমি শান্তি চাই। শান্তি ফিরিয়ে আনতেও রাজী আছি। একটি ছেলে গেছে টাটাগ্লিয়ার, আমারও একটি ছেলে গেছে। সব শোধবোধ হয়ে গেছে। সবাই যদি অকারণে মনে মনে বিদ্বেষ পুষে রাখে, পৃথিবীটার কি দশা হ’বে তাহলে? এটা কি? এটা হলো সিসিলির সেই অভিশাপ। সেখানে লোকেরা প্রতিশোধ নিতে এত বেশি ব্যস্ত থাকে যে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের মুখে একটু রুটি দেবে, তার পয়সা রোজগার করার পর্যন্ত সময় পায় না। এর একমাত্র অর্থ মৃত্যু। তাই আমি বলি, আগে যেমন চলছিল সেইভাবেই সব চলুক। ফাঁদ পেতে আমার ছেলেকে কে ধরিয়ে দিল, কে মারল, তা জানবার আমি চেষ্টাও করিনি। কেন? কারণ শান্তি চাই আমি। তাতে যদি শান্তি আসে, তাহলে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবও না। আমার এক ছেলে বাড়ি ফিরে আসতে পারছে না। এ ব্যাপারে আমি আপনাদের কাছ থেকে একটা প্রতিশ্রুতি চাই। আমি যখন তার নিরাপদে ফিরে আসার ব্যবস্থা করব, তখন কেউ যেন বাধা দেবেন না, কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন বিপদের সম্ভাবনা যেন না থাকে। এই প্রতিশ্রুতি চাই আমি। পেনে, আমরা অন্য বিষয়ে আলোচনা করতে পারব। তাতে আমাদের সবারই সুবিধে। সবার লাভও হবে।’ হাত নেড়ে আবেগ আর বিনয়ের ভাব প্রকাশ করলেন ডন কর্লিয়নি, বললেন, ‘এইটুকুই আমি বলতে চাই।’

চমৎকার বললেন ইনিই তো সেই আগেকার ডন কর্লিয়নি। যুক্তি মেনে চলেন ইনি। অন্যদের সুবিধে করে দেবার জন্য নিজের মত বদলান। কোমল, আপোসের সুরে কথা-বার্তা। কিন্তু উপস্থিত সবাই লক্ষ করল যে শরীর ভাল হয়ে যাবার দাবি করলেন তিনি, অর্থাৎ কর্লিয়নি পরিবারের নানান দুর্ভোগসত্ত্বেও তাঁকে হেয়জ্ঞান করা চলবে না। এও লক্ষ করার বিষয় যে ডন কর্লিয়নি বললেন, আগে শান্তি প্রস্তাবটা গ্রহণ করা হোক, তার আগে পর্যন্ত অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করে লাভ নেই। এও লক্ষণীয় যে তিনি আগের অবস্থায় ফিরে যেতে চান, অর্থাৎ গত এক বছর ধরে নানান বিপর্যয় ভোগ করা সত্ত্বেও কোন রকম লোকসান মেনে নেবেন না।

সে যাই হোক, ডন কর্লিয়নির বক্তব্যের উত্তরে কথা বললেন এমিলিও বার্জিনি,

টাটাগ্লিয়া নয়। বক্তব্য-বিষয় সোজা ও সংক্ষেপে পেশ করলেন তিনি। অবশ্য অভদ্র বা অপমানকর কিছু বললেন না।

বার্জিনি বললেন, “আপনি যা বললেন তার সবই সত্যি কথা বটে, কিন্তু তাছাড়া আরও কথা আছে। আপনি, ডন কর্নিয়নি, বড়ই বিনয়ী। তবে আসল কথা হলো আপনার সাহায্য না পেলে সলোযো আর টাটাগ্লিয়াদের পক্ষে তাঁদের নতুন ব্যবসা চালানো সম্ভব ছিল না। অজ্ঞও সম্ভব নয়। এমন কি আপনার অস্বীকৃতি মানেই তাঁদের ক্ষতি। সেটা অবশ্য আপনার অপরাধ নয়। কিন্তু কথা হলো, যে-সব বিচারক আর রাজনীতিবিদরা আপনার কাছ থেকে অনুগ্রহ নিতে রাজী রয়েছেন, এমন কি নেশার ওষুধপত্র সংক্রান্ত ব্যাপারেও, তারাই কিন্তু ড্রাগসের বেলায় অন্য কারও দ্বারা প্রভাবিত হতে প্রস্তুত নন। সলোযোর লোকদের সাথে কর্তৃপক্ষ নরম ব্যবহার করবে, এই আশ্বাস না পেলে সেই বা কি করে কাজ করত? তা যে সম্ভব ছিল না, এ তো আমরা সবাই জানি। ড্রাগের ব্যবসা করতে না পারলে আমরা সবাই গরীব হয়ে থাক। আজকাল শাস্তির মেয়াদও বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ড্রাগ ব্যবসা চালাতে গিয়ে আমাদের কোন লোক যদি ধরা পড়ে, তাহলে বিচারক আর অ্যাটর্নিরা বড় কঠোর আচরণ করেন। কুড়ি বছরের মেয়াদের ভয়ে সিসিলির লোকরা পর্যন্ত তাদের ‘ওমের্তা’ অর্থাৎ নীরবতার নিয়ম ভেঙে সব কথা গড় গড় করে বলে ফেলতে পারে। তা হলে তো চলবে না। এর কলকাঠি, ডন কর্নিয়নি, আপনার হাতে। আপনি সে কলকাঠি আমাদের জন্য না নাড়লে, বন্ধুর কাজ করা হয় না। আমাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের মুখ থেকে রুটি কেড়ে নেয়া হয়। সময় পাণ্টে গেছে, আগেকার সেই দিন আর নেই। একটা সময় ছিল যখন যার যেদিকে মন চাইত সে সেদিকে চলত। এখন যার যা খুশি করার দিন গত হয়েছে। নিউ ইয়র্কের বিচারকরা যদি কর্নিয়নিদের কেনা গোলাম হয়ে থাকে, তাহলে তাদের সেবা পাবার সুযোগ আমাদেরকেও দিতে হবে। কুয়ো থেকে পানি আমাদেরকে তুলতে দিতেই হবে। এই আমাদের শ্রক কথা।”

বার্জিনি থামলেন। সবাই চুপ করে আছেন। সীমারেখা টানা হয়ে গেছে। তার মানে আগেকার অবস্থায় ফিরে যাওয়া যাবে না আর।

অবশেষে বার্জিনির কথার উত্তর ডন কর্নিয়নিকেই দিতে হলো। ‘বন্ধুগণ, আমার প্রত্যাখ্যানের পিছনে বিদ্বেষ ছিল না। আপনারা আমাকে চেনেন। কবে আমি কার সুবিধে করে দিতে অস্বীকার করেছি? কেন করব? আমার ও রকম স্বভাবই নয়। কিন্তু এবার অস্বীকার না করে উপায় ছিল না। কেন? কারণ, আমার মতে এই ড্রাগস-এর ব্যবসাই একদিন আমাদের কাল হবে, আমাদের সর্বনাশ ডেকে আনবে। এদেশে এই ব্যবসা সম্পর্কে জনসাধারণের প্রবল ঐক্যপন্থি আছে। এ তো আর হুইস্কি, কিংবা জুয়া অথবা মেয়েমানুষের ব্যাপার নয়। এগুলো বেশির ভাগ লোকেই মেনে নেয়। ড্রাগের সাথে যারাই জড়িত হবে, তাদেরই বিপদ হতে পারে। এর জন্য অন্য সব ব্যবসাও বিপন্ন হতে পারে। তাছাড়া, আমাকে একটু বলবার অনুমতি দিন যে বিচার আর আইন-বিভাগের ওপর আমার এত প্রভাব, এ কথা শুনে আমি খুশি হলেও, কথাটা সত্যি হলে আরও ভাল হত। খানিকটা প্রভাব যে নেই তা নয়, কিন্তু যারা আমার পরামর্শকে শ্রদ্ধা করে, তারা যদি জানে যে

আমি ড্রাগের সাথে জড়িত, তাহলে তাদের অনেকেই শঙ্কা হারাব তারা এই ব্যবসার সাথে জড়িয়ে পড়তে ভয় পায়, এর সম্পর্কে তাদের মনোভাব অত্যন্ত বিরূপ। এমন কি যে-সব পুলিশ আমাদের জুয়া খেলা ইত্যাদিতে সাহায্য করে, ড্রাগ ব্যবসায় সাহায্য করতে তারাও রাজী হবে না। সুতরাং এ বিষয়ে আপনাদেরকে সুবিধা করে দিতে বলার মানে দাঁড়াচ্ছে, আমাকে আমার নিজের অসুবিধে করতে বলা তবে আপনারা সবাই যদি তা সত্ত্বেও মনে করেন যে অন্যদের সমস্যা সমাধান করতে হলে এটুকু আমার করা দরকার, বেশ, তাহলে আমি তাও করব।’

ডন কর্লিয়নির কথা শেষ হতেই ঘরের আবহাওয়া সম্পূর্ণ বদলে গেল। সকলে আশ্বস্ত হয়ে ফিসফিস আলোচনা, কথা কাটাকাটি শুরু করে দিয়েছে। প্রধান শর্তে ডন কর্লিয়নি রাজী হয়ে গেছেন। ড্রাগসের কোন সংগঠিত ব্যবসা চললে, তিনি সেটাকে রক্ষা করার চেষ্টা করবেন। অর্থাৎ সলোয়োর মূল প্রস্তাবের প্রায় সবটুকুই মেনে নেবেন—যদি আজকের এই জাতীয়সভা সে-প্রস্তাব সমর্থন করে। তবে এটাও বুঝে নিতে হবে যে ব্যবসার উপর তাঁর কোন অংশ থাকবে না, তাঁর টাকা পয়সাও তাতে খাটবে না। তিনি শুধু আইনের সাথে সংঘর্ষ হলে তাঁদেরকে রক্ষা করার জন্যে প্রভাব বিস্তার করবেন কিন্তু সেটাও কিছু কম পাওয়া নয়।

এবার কথা বললেন লস অ্যাঞ্জেলেসের ডন, ফ্রাঙ্ক ফ্যান্কনি, ‘এই ব্যবসা থেকে আমার লোকদের হটাবার কোন উপায় নেই। তারা নিজেদের দায়িত্বে কাজ চালাতে গেলেই বিপদে পড়বে। এ ব্যবসাতে এত বেশি লাভ যে লাভ সামলানো অসম্ভব। তাই এতে না নামলে আরও বেশি বিপদ। ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্ব যদি আমাদের হাতে থাকে, তাহলে রক্ষণাবেক্ষণটা অন্তত আরও ভাল হবে, সংগঠনের কাজ আরও ভাল হবে, যাতে গোলমাল কম হয় তার ব্যবস্থাও করা সম্ভব হবে। ব্যবসাটা তুলনাহীন, কিন্তু এর পরিচালনা দরকার, একে রক্ষা করা দরকার, এর শক্তিশালী সংগঠন দরকার, এক দঙ্গল নৈরাজ্যবাদীর মত শুধু যা ইচ্ছে তাই করে বেড়ালে তো আর চলবে না।’

কর্লিয়নিদের প্রতি অন্যদের চেয়ে ডেট্রয়টের ডন একটু বেশি বন্ধু ভাবাপন্ন। কিন্তু যুক্তির খাতিরে তিনিও এখন বন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে কথা বললেন, ‘ড্রাগসের ওপর আমার কোন আস্থা নেই। বহু বছর ধরে আমার লোকরা যাতে এই ব্যবসাটাতে না ঢোকে, সেজন্যে তাদের বেশি করে টাকা দিয়েছি আমি। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি কিছুই, কোন সুবিধে হয়নি। অন্য লোকরা এসে তাদের বলছে, কিছু ঝুঁড়ো আছে আমার কাছে, তোমরা যদি তিন চার হাজার ডলার খাটাতে পারো, তাহলে লাভের অংশ পঞ্চাশ হাজার ডলার ভাগ করে নিতে পারব আমরা। এমন লাভের প্রস্তাব ক’জন লোক ফিরিয়ে দিতে পারে! নিজেদের এই বাঁ হাতের ব্যবসা নিয়েই আমার লোকরা ব্যস্ত থাকে। আমার যে-কাজের জন্যে তারা মাইনে খায়, তা করার সময় পায় না। ড্রাগ বিজনেসে লাভ ঢের বেশি। শুধু তাই নয়, লাভের অংক ক্রমে বেড়েই চলেছে। ব্যবসাটা বন্ধ করার আসলে কোন উপায়ই নেই, সুতরাং ব্যবসাটা নিজেদের হাতে রেখে ওর মান বাঁচানোর চেষ্টা করাই উচিত। কোন স্কুলের কাছে-পিঠে ব্যবসাটা চলুক, তা আমি চাই না। সে বড় জঘন্য কাজ হবে। আমাদের শহরে, ব্যবসাটাকে আমি কালো মানুষদের মধ্যে

সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। আশ্চর্য ভাল খন্দের ওরা, গোলমাল বাধায় সবচেয়ে কম, এমনতেও জানোয়ার বই তো নয়। নিজেদের, স্ত্রীদের, নিজেদের পরিবারের, কারোই সম্মান রাখে না ওরা। ড্রাগ ব্যবহার করে যাক না গোলায়।’

ড্রেটয়টের ডনের বক্তৃতা থামতে না থামতেই চাপা গলায় বাহবা দিচ্ছে সবাই। ঠিক জায়গায় টোকা দিয়েছেন তিনি। টাকা দিয়েও তো লোককে ড্রাগ ব্যবসা থেকে সরিয়ে রাখা যাচ্ছে না। আর ওই যে স্কুলের ছেলেমেয়েদের কথা বললেন তিনি, ওটা তো তাঁর সেই বিখ্যাত স্পর্শকাতরতা, তাঁর কোমল হৃদয়ের ব্যাপার-সাপার। যে যাই বলুক, ছেলেপুলেদের কাছে কে আবার ড্রাগ বেচতে যাচ্ছে? ছোটরা টাকা পয়সাই বা পাবে কোথায়? আর ওই যে কোনো মানুষদের কথা বললেন, ও তাঁ কেউ কান পেতে শুনলই না। নিগ্রোদের কেউ কোন মূল্যই দেয় না, ওদের কোন শক্তিও নেই। সমাজ যে ওদেরকে মাটিতে পিষে ফেলতে পারছে, তা থেকেই তো প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে ওদের কোন মনুষ্যত্ব নেই বলেই এমনটি সম্ভব হচ্ছে। ওদের কথা উত্থাপন করে ড্রেটয়টের ডন প্রমাণ করে দিলেন, ভাবছে সবাই, ওঁর মনটা সব সময় অবান্তর বিষয়ের দিকে ঝোঁকে। তারপর সব ডনরা কথা বলতে শুরু করলেন, সকলেই দুঃখ করতে লাগলেন এই বলে যে ড্রাগের ব্যবসা বড় খারাপ ব্যবসা, কিন্তু ওটা বন্ধ করার কোন উপায় নেই। এ ব্যবসায় বড় বেশি লাভ কিনা, তাই সব রকম ঝুঁকি নিয়েও এতে হাত দেবেই লোকেরা। মানুষের স্বভাব যে কি তা তো আর কারও অজানা নেই

রফা হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। ড্রাগের ব্যবসা চলবে। পূর্বাঞ্চলে ওদেরকে কিছু আইনের আশ্রয় দেবেন ডন কর্নিয়নি। স্থির হলো, বার্জিনি আর টাটালিয়া পরিবার ব্যবসার বেশির ভাগটা হাতে রাখবে। এ বিষয়ে চূড়ান্ত একটা সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। তারপর অন্যান্য আরও ব্যাপক সুবিধে সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হলো। কিছু জটিল সমস্যার সমাধান করা দরকার। স্থির হলো, লাস ভেগাস আর মিয়ামি হবে মুক্ত শহর, সেখানে যে কোন ব্যবসা চলতে পারবে সকলেই সায় দিয়ে বললেন, জায়গা দুটোর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আরও স্থির হলো শহর দুটোয় কোন হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ চলবে না বা কোন ছোটখাট দুষ্টকারীদের ওখানে যেতে উৎসাহিত করা হবে না সেই সাথে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বড় ব্যাপারে, যাতে জনসাধারণের প্রবল আপত্তি রয়েছে বা থাকবে, কিছু করার আগে এই সভার অনুমোদন পাওয়া চাই। সকলে একমত হলেন যে সভার সমস্ত দণ্ড কর্মী আর সৈনিকরা কোন ব্যক্তিগত কারণে পরস্পরের উপর কোন হিংসাত্মক ব্যবস্থা কিংবা প্রতিশোধ কখনও নেবে না কোন মারফিয়া পরিবার অনুরোধ করলে অন্য পরিবারগুলো তাকে সাহায্য দেবে। যেমন ঘাতকের ব্যবস্থা করার কোন বিশেষ দায় থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে জুরিকে ঘুষ দেয়া ইত্যাদি ব্যাপারে পেশাদারি সহযোগিতা করবে। কোন কোন সময় তো এ ধরনের সাহায্যের উপর মানুষের প্রাণ পর্যন্ত নির্ভর করে। এই রকম আরও অনেক বিষয়ে আলোচনা হলো বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে, অতি উঁচু পর্যায়ের সং উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে। এতে সময়ও লাগল যথেষ্ট। মাঝখানে লাঞ্চ আর ‘বুফে বার’ থেকে পানীয় গ্রহণের জন্যে বিরতি।

অবশেষে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘটাবার চেষ্টা করে ডন বার্জিনি বললেন,

‘এই তো সমস্ত বিরোধ মিটে গেল। শান্তি কায়েম হয়েছে, এবার আমার শত্কা জানাই ডন কর্লিয়নিকে। আমি অনেক বছর ধরে চিনি তাঁকে। কথা দিলে তিনি কথা রাখেন। এর পর যদি আবার কোন মতভেদ হয় তাহলে আমরা আবার মিলিত হতে পারি, আরও মৃত্যুর পরিচয় দেবার কোন প্রয়োজন নেই। মীমাংসা হয়ে গেল, এর চেয়ে খুশির ব্যাপার আমার জন্যে আর কিছু হতে পারে না।’

একমাত্র ফিলিপ টাটাগ্লিয়ার মনে এখনও দৃশ্চিন্তা। আবার যদি লড়াই বাধে, তাহলে সান্তিনো কর্লিয়নিকে হত্যা করার জন্যে তাঁর অবস্থাটা কাহিল হবে সবচেয়ে বেশি। শেষ পর্যন্ত এই প্রথম মুখ খুললেন তিনি

‘আমি সব কিছুতে রাজী আছি। আমি নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভুলে যেতে রাজী আছি। কিন্তু ডন কর্লিয়নির কাছ থেকে আশ্বাস পেতে চাই আমি। তিনি কি ব্যক্তিগতভাবে কখনও প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবেন? আরও কিছু সময় গেলে, তাঁর অবস্থা হয়তো তখন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে, তখন কি তিনি ভুলে যাবেন যে আমরা বন্ধুত্বের শপথ নিয়েছি? কি করে বুঝব যে আরও তিন চার বছর পর তাঁর মনে হবে না ওঁর সাথে অন্যায় ব্যবহার করা হয়েছে, জোর করে ওঁকে দিয়ে এই চুক্তি সই করানো হয়েছে, অতএব এসব শর্ত ভাঙার অধিকার আছে তাঁর! আমাদেরকে কি চিরকাল পরস্পর সম্পর্কে সতর্ক হয়ে চলতে হবে? নাকি সত্যি সত্যি স্বস্তি এবং শান্তি নিয়ে এখান থেকে যেতে পারব? আমি আমার তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, কর্লিয়নিও কি তাঁর তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি দেবেন?’

এবার তাঁর সেই অবিস্মরণীয় বক্তৃতা দিলেন ডন কর্লিয়নি। উপস্থিত সকলের মধ্যে তিনিই যে সব চাইতে দূরদর্শী পলিটিশিয়ান, এই বক্তৃতায় তা প্রমাণ হয়ে গেল। এত সাধারণ অথচ গভীর বুদ্ধি, এত আন্তরিকতা আর কোথায় পাওয়া যাবে? বিষয়টির মূলে গিয়ে কে এমন আঘাত করতে পারে? এই বক্তৃতাতেই তিনি একটা বাক্যাংশ রচনা করলেন, সেটি পরে প্রায় চার্চিলের ‘লৌহ যবনিকার’ মতই বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল, যদিও আরও দশ বছর পর কথাটি সাধারণ লোকের কানে পৌঁছেছিল।

এই প্রথম উঠে দাঁড়িয়ে সভাকে সম্বোধন করলেন ডন কর্লিয়নি।

‘কেমন মানুষ আমরা, যদি বিচার বুদ্ধি হারাই? তাহলে বনের পশুর চেয়ে কিসে আমরা ভাল? না, বিচার বুদ্ধি আছে আমাদের। আমরা পরস্পরের সাথে যুক্তি দিয়ে আলোচনা করতে পারি। নিজেদের সাথেও পারি। কি উদ্দেশ্যে আমি আবার ওই গঙগোল, ওই হিংসাত্মক কাজ করবার, ওই অশান্তি শুরু করব? ছেলে আমার মারা গেছে, সেই বড় দুঃখ। কিন্তু সে দুঃখ আমাকে সইতে হবে, তার জন্যে আমার চারদিককার নিদোষ জাতিটাকে কষ্ট দিলে চলবে কেন? তাই আমি বলছি, ধর্ম সাক্ষী করে বলছি, কখনও প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা আমি করব না, অতীতে যে-সব কাণ্ড হয়ে গেছে, সে-বিষয়ে কিছু জানবার চেষ্টাও করব না। নির্মূল চিন্তে এখান থেকে বিদায় নেব আমি।’

‘আমাকে এ-কথা বলতে দিন যে আমরা সব সময় নিজেদের স্বার্থটাই দেখব। আমরা কি সেই মানুষ নই, যারা বোকা বনতে রাজী হইনি? যারা ওপরওয়ালাদের হাতের সূতোয় বাঁধা পুতুলের মত নাচতে অস্বীকার করেছি? এদেশে এসে

আমাদের কপাল খুলে গেছে। এরই মধ্যে আমাদের সন্তানেরা উন্নততর জীবনের আস্বাদ পেয়েছে। আমাদের ছেলেরা অধ্যাপক হয়েছে, বৈজ্ঞানিক, সঙ্গীতশিল্পী হয়েছে। আমরা সৌভাগ্যবান। হয়তো আমাদের নাতি-নাতনিরা আগামী দিনে এই দেশের কর্তাব্যক্তি হবে। আমরা কি কেউ চাই আমাদের ছেলেরাও আমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করুক? না, চাই না। এ বড় কঠিন জীবন। ওরা অন্যদের মত হতে পারে, পারে নিরাপদ, সহজ জীবনের অধিকারী হতে। ওদের পদমর্যাদা আর নিরাপত্তা আমাদের সংসাহসের ফল হিসেবেই চিহ্নিত হবে। আমার এখন নাতি-নাতনি হয়েছে, আমি আশা করছি, কে জানে হয়তো একদিন তাদের ছেলেরাই গভর্নর হবে, প্রেসিডেন্ট হবে কিছুই অসম্ভব নয় এই আমেরিকায়। অবশ্য সময়ের সাথে সাথে আমাদেরও এগিয়ে যেতে হবে। গোলাগুলি, হত্যা আর খুনের দিন গত হয়েছে। ধূর্ত হতে হবে আমাদেরকে। ব্যবসায়ীদের ভাইতো হওয়া উচিত, তাতে আরও টাকা রোজগার হবে আমাদের সন্তানদের জন্যে, তাদের সন্তানদের জন্মেও সেটাই তো ভাল।

‘আর আমাদের কীর্তিকলাপের কথা যদি বলেন, ওই সব “নস্টুই ক্যালিবারের” হোমরাচোমরাদের কাছে মোটেও আমরা দায়ী নই। তারা মনে করে, আমাদের জীবন নিয়ে আমরা কি করব না করব তা ওরা আমাদেরকে সমঝে দেবে। তারা লড়াই বাধিয়ে দিয়ে ভাবে, তাদের সম্পত্তি রক্ষা করার জন্যে আমরা বুঝি লড়াই করব। কে বলেছে যে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা আর আমাদের ক্ষতি করার জন্যে ওরা যে সব আইন তৈরি করেছে, আমাদেরও সে সব মানতে হবে? কক্ষনো না! আমরা আমাদের ব্যবস্থা নিজেরা করলে, তাতে ওদের কি? তারা নাক গলাতে আসে কোন্ অধিকারে? এ-সব আমাদের ব্যাপার, আমরা বুঝব। আমাদের জগৎটা আমাদের, এই জগৎটাকে আমরাই সামলাব। তাই বাইরে থেকে যারা অনধিকার প্রবেশ করে, তাদের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের সকলকে একজোট হয়ে দাঁড়াতে হবে। তা না হলে আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে ওরা, যে-ভাবে নেপলস্ আর ইতালির লক্ষ লক্ষ লোকের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে।

‘এই সব কারণেই আমি আমার ছেলের খুনের প্রতিশোধ নিতে চাই না। প্রতিশোধের দাবি ছেড়ে দিচ্ছি, সবার স্বার্থে, সবার কল্যাণের জন্যে। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমার পরিবারের আচরণের জন্যে যতদিন দায়ী থাকব আমি, ততদিন ন্যায্য কারণ কিংবা গুরুতর প্ররোচনা ছাড়া উপস্থিত কারও বিপক্ষে আমাদের কেউ একটি আঙুল তুলবে না। সবার স্বার্থে আমার বৈষয়িক স্বার্থ পর্যন্ত আমি ছেড়ে দিতে রাজী। আমার কথা রইল, ধর্ম সাক্ষী রইল। এখানে যাঁরা উপস্থিত রয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই জানেন, আমি কখনও কথার বা ধর্মের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করি না।

‘তবে আমার একটা স্বার্থপর উদ্দেশ্যও আছে বৈকি। আমার ছোট ছেলেটাকে এখান থেকে পালাতে হয়েছে, কারণ সলোযো আর একজন পুলিশ ক্যাপটেনকে খুন করার জন্যে তাকে দায়ী করা হচ্ছিল। এখন যাতে তার ওপর থেকে ওই সব মিথ্যে অভিযোগ তুলে নেয়া হয় আর সে যাতে নিরাপদে বাড়ি ফিরে আসতে পারে, তার ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে। হয় আসল অপরাধীকে ধরে দিতে হবে, নয়তো

আমার ছেলের নির্দোষিতা সম্পর্কে সরকারকে নিশ্চিত প্রমাণ দিয়ে আশ্বস্ত করতে হবে। অথবা সাক্ষী আর ইনফর্মাররা যাতে তাদের মিথ্যে কথা ফিরিয়ে নেয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু, আবার বলি, এগুলো আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে, আমার বিশ্বাস, আমার ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে পারব আমি।

‘তবু একটি কথা বাকি থেকে যায়। সেটা না বললেই নয়। কুসংস্কারে বিশ্বাস করি আমি, জানি ওটা একটা হাস্যকর দুর্বলতা, তবু কথাটা স্বীকার করতে হচ্ছে। যদি আমার ছেলের কোন আকস্মিক, অশুভ দুর্ঘটনা ঘটে, যদি কোন পুলিশ অফিসারের পিস্তল থেকে আচমকা গুলি ছুটে ওর গায়ে লাগে, যদি নিজের সেলে নিজের গলায় দড়ি দেয় ও, যদি নতুন সাক্ষী ওর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্যে দেখা দেয়, স্বেচ্ছ কুসংস্কারের বশে মনে হবে আমার, এখানকার কারও কারও মনে আমার ওপর বিদ্বেষ রয়ে গেছে বলেই অমনটি হলো। আরেকটু বলি। আমার ছেলের মাথায় যদি বাজ পড়ে, তা হলেও হয়তো এখানকার কাউকে কাউকে দায়ী করব আমি। যদি ওর প্লেন সমুদ্রে পড়ে, ওর জাহাজ যদি টেউয়ের নিচে তলিয়ে যায়, ওর যদি কোন মারাত্মক জ্বর হয়, ওর গাড়ি যদি ট্রেনের সাথে ধাক্কা খায়—এমনি আমার কুসংস্কার যে আমি মনে করব এখানকার কারও না কারও অশুভ ইচ্ছার জন্যেই অমন হয়েছে। ভদ্রমহোদয়গণ, সেই অশুভ ইচ্ছাকে, সেই দুর্ভাগ্যকে কখনও ক্ষমা করতে পারব না আমি। শুধু এইটা বাদ দিলে, আমার নাতি-নাতনিদের আত্মার দিব্যি, আজ যে শান্তি স্থাপন করলাম এ-শান্তি আমি কখনও ভাঙব না। যে যাই বলুক, ওই সব হোমরাচোমরা যারা আমাদের জীবনকালেই অশুভগতি কোটি লোকের মৃত্যু ঘটিয়েছে, তাদের চেয়ে আমরা ভাল, না কি ভাল না?’

কথা শেষ করে তার জায়গা থেকে উঠে টেবিলের ধারে যেখানে ডন ফিলিপ টাটাগ্লিয়া বসে রয়েছেন সেখানে এলেন ডন কর্লিয়নি। উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন করলেন টাটাগ্লিয়া। তাঁরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে পরস্পরের গালে চুমো খেলেন। ঘরে অন্য ডন যারা উপস্থিত রয়েছেন তাঁরা জয়ধ্বনি দিচ্ছেন, উঠে পড়ে সামনে যাকে পাচ্ছেন তাঁর সাথেই হ্যাওশেক করছেন এবং ডন কর্লিয়নিকে আর ডন টাটাগ্লিয়াকে তাঁদের নতুন বন্ধুত্বের জন্যে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। দুনিয়াতে হয়তো এর চেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব আরও আছে, তাঁরা হয়তো বড় দিনের সময় পরস্পরকে শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে উপহার পাঠাবেন না, তবে পরস্পরকে খুনও করবেন না। এঁদের দুনিয়াতে এইটুকুকেই যথেষ্ট বন্ধুত্ব বলা যায়, এর বেশি কিছু দরকার পড়ে না।

ডন কর্লিয়নির ছেলে ফ্রেডি পশ্চিমাঞ্চলে মলিনারি পরিবারের হেফাজতে আছে, সুতরাং সভা ভেঙে যাবার পর ডন কর্লিয়নি স্যান ফ্রান্সিস্কোর ডনকে ধন্যবাদ জানাবার জন্যে একটু অপেক্ষা করলেন। মলিনারি তাঁকে যতটুকু বললেন, তা থেকে ডন কর্লিয়নি বুঝলেন যে ফ্রেডি সেখানে তার উপযুক্ত কাজই খুঁজে পেয়েছে। সুখেই আছে সে, মহিলাদের সাথে তার নাকি খুব ভাব। মনে হলো হোটেল পরিচালনার ব্যাপারে তার জন্মগত প্রতিভা আছে। বিস্মিত হয়ে মাথা নাড়লেন ডন কর্লিয়নি। নিজের ছেলের মধ্যে অপ্রত্যাশিত গুণ আছে শুনলে অনেক বাপই এভাবে মাথা নাড়েন।

এ কথা কি সত্য নয় যে মাঝে মাঝে মর্মান্তিক দুর্ভাগ্যের ফলে অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য লাভ করা যায়? এ বিষয়ে দু'জনেই একমত হলেন।

এরই মধ্যে স্যান ফ্রান্সিস্কোর ডনকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন ডন কর্লিয়নি যে ফ্রুডিকে আশ্রয় দিয়ে তিনি কর্লিয়নিদের যে মহৎ উপকার করেছেন সেজন্যে কর্লিয়নিরা তাঁর কাছে চিরঋণী হয়ে থাকবে। ডন কর্লিয়নি আরও বললেন, তিনি তাঁর প্রভাব বিস্তার করবেন যাতে সমস্ত প্রধান ঘোড়দৌড়ের তারবার্তার সুবিধে শুধু মলিনারির লোকরাই পায়, ক্ষমতা বটনে যত পরিবর্তনই হোক না কেন ভবিষ্যতে। এধরনের গ্যারান্টির অনেক মূল্য আছে। কারণ এই সুবিধাটুকু নিয়ে সব সময়ই ঝগড়া বিবাদ চলে, যথেষ্ট বিদ্বেষেরও সৃষ্টি হয়। অবস্থাটা আরও জটিল হয়ে ওঠে, কারণ শিকাগোর লোকগুলোর নোংরা হাতও এর মধ্যে রয়েছে। কিন্তু ওই বর্বরদের মনকেও একেবারে ক্ষমতাশূন্য নন ডন কর্লিয়নি সোনার চেয়েও দামী তাঁর এই প্রতিশ্রুতি।

সাত

লং বীচ।

ওদের বডিগার্ড তথা ড্রাইভার রকো ল্যাম্পনি ডন কর্লিয়নি আর টম হেগেনকে নিয়ে উঠানে পৌঁছল। এরই মধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

‘আমাদের ড্রাইভার রকোর ওপর একটু নজর রেখো,’ বাড়ির ভিতর ঢুকেই টম হেগেনকে বললেন ডন কর্লিয়নি। ‘ওকে আমার এর চেয়ে ভাল কাজের যোগ্য বলে মনে হয়েছে।’

গড ফাদারের মন্তব্য শুনে একটু অবাক হলো হেগেন। একটা কথাও বলেনি সারাদিন রকো। পিছনের সীটের আরোহী দু'জনের দিকে একবারও ফিরে তাকায়নি। ওরা যখন বাইরে বেরিয়ে ব্যাংকের সামনে গাড়ির কাছে এসেছিল, ডনের জন্যে গাড়ির দরজা খুলে দিয়েছিল রকো ল্যাম্পনি, সব কাজই সে সুচারু ভাবে করেছিল, কিন্তু কোন শিক্ষিত চালকের চেয়ে বেশি কিছু করেনি। বোঝা গেল, ডন নিশ্চয় এমন কিছু দেখেছেন যা চোখে পড়েনি টম হেগেনের।

এরপর টমকে বিদায় করে দিলেন ডন। বলে দিলেন রাতের খাবারের পর আবার যেন ফিরে আসে সে। ব্যস্ততার কিছু নেই, টম যেন একটু বিশ্রাম করে নেয়। কারণ গভীর রাত পর্যন্ত শলা-পরামর্শ চলবে ডন আরও বললেন, ক্রেমেঞ্জা আর টেসিওকেও উপস্থিত থাকতে হবে। দশটার সময় আসে যেন তারা, তার আগে নয়। শান্তি-বৈঠকে কি হয়েছে না হয়েছে, ক্রেমেঞ্জা আর টেসিওকে টম যেন সব জানিয়ে দেয়।

রাত দশটা। তাঁর কোণার ঘরে ওদের তিন জনের জন্যে অপেক্ষা করছেন ডন কর্লিয়নি। এই কামরাটা তাঁর অফিস, তাঁর আইন সম্পর্কিত বইয়ের লাইব্রেরিও বটে এটা, তাঁর বিশেষ টেলিফোনটাও রয়েছে এখানে। একটা ট্রেতে বরফ, সোডা, হুইস্কির বোতল রয়েছে। নির্দেশ দিতে শুরু করেছেন ডন। বলছেন, ‘আজ আমরা

শান্তি করলাম। আমি আমার কথা দিয়েছি, ধর্ম সাক্ষী রেখেছি। তোমাদের সকলের জন্যে সেটাই যথেষ্ট হওয়া উচিত। তবে আমাদের বন্ধুরা সবাই অতটা বিশ্বাসযোগ্য নয়, তুই এখনও আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। কিন্তু আর কোন অপ্রত্যাশিত অঘটন যেন না ঘটে, তারপর হেগেনের দিকে ফিরে জানতে চাইলেন, 'বোচ্চিচ্চিওর জামিনদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে তো?'

মাথা দুলিয়ে বলল হেগেন, 'বাড়ি পৌছেই ক্রেমেঞ্জাকে ফোন করে দিয়েছিলাম।'

প্রকাণ্ডদেহী ক্রেমেঞ্জার দিকে ফিরলেন ডন। ক্যাপোরেজিমি মাথা দুলিয়ে বলল, 'সবাইকে ছেড়ে দিয়েছি। আচ্ছা, গড ফাদার, বোচ্চিচ্চিওরা যতটা ভান করে, কোন সিসিলীয়র পক্ষে অতটা বোকা হওয়া কি সম্ভব?'

একটু হাসলেন ডন কর্লিয়নি। 'কিন্তু ভাল রোজগার করার মত বুদ্ধি আছে ওদের। তার চেয়ে বেশি বুদ্ধি থাকার দরকারটা কি শুনি? এ দুনিয়ায় এত যে গুণগোল, সে সব বোচ্চিচ্চিওরা বাধায় না। তবে, হ্যাঁ, একথাও সত্যি—সিসিলীয় মাথা নেই ওদের।'

যুদ্ধ থেমে গেছে। সবার মনে স্বস্তি। নিজের হাতে পানীয় মেশালেন ডন কর্লিয়নি, প্রত্যেকের হাতে গ্লাস ধরিয়ে দিলেন। নিজের গ্লাসে সযত্নে চুমুক দিচ্ছেন। চুরুট ধরালেন একটা। তারপর বললেন, 'সনি কেন, কিভাবে মারা গেল সে ব্যাপারে কোন অনুসন্ধান হোক, এ আমি চাই না। ওসব শোধবোধ হয়ে গেছে। অন্যান্য পরিবারের সাথে সহযোগিতা করতে চাই আমি। তারা যদি একটু বেশি লোভ করে, আমাদের ন্যায্য পাওনা থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করে, তবুও। আমি চাই এমন কিছু যেন না ঘটে, যাতে এই শান্তি নষ্ট হয়, যতদিন না মাইকেলকে বাড়ি ফিরিয়ে আনার একটা বন্দোবস্ত করা যায়। এই চিন্তাটাই যেন তোমাদের মনে সব কিছুর আগে থাকে, এই আমি চাই। মনে রেখো, সে যখন ফিরে আসবে, যেন সম্পূর্ণ নিরাপদভাবেই আসতে পারে। না, আমি টাটাল্লিয়া অথবা বার্জিনিদের তরফ থেকে কোন বিপদের কথা বলছি না। আমার যত ভাবনা পুলিশদেরকে নিয়েই। ওর বিরুদ্ধে বাস্তব প্রমাণ যা আছে, সমস্ত আমরা দূর করে দিতে পারি। ওই ওয়েটারও সাক্ষ্য দেবে না আর এই প্রত্যক্ষদর্শী বা পিস্তলধারী বা ওকে যাই বলো না কেন, সেও সাক্ষ্য দেবে না। বাস্তব প্রমাণগুলোর কথা তো আমরা জানিই, তাই ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আমাদের দেখতে হবে শুধু পুলিশ যেন মিথ্যে সাক্ষী তৈরি করে না রাখে। কারণ, ওদের ইনফর্মাররা হয়তো জেনেই বলেছে যে ক্যাপটেনকে মাইকেল কর্লিয়নিই খুন করেছে। বেশ। এবার তাহলে আমাদের দাবি কি হবে? আমাদের দাবি হবে, নিউ ইয়র্কের পাঁচ পরিবার পুলিশের এই ধারণা ওধরে দেবার জন্যে এবার তাদের যথাসাধ্য করুক। ওদের যে সব ইনফর্মাররা পুলিশের সাথে সহযোগিতা করে, তারা নতুন নতুন বিবৃতি দিক। আমার বিশ্বাস, আজ দুপুরে আমার কথা শুনে ওরা সবাই বুঝতে পেরেছে যে, এই কাজটা করে দিলে তাদেরই সুবিধা হবে। কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়। আমাদের দিক থেকে এমন একটা নিখুঁত বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে ব্যাপারটা নিয়ে ভবিষ্যতে কোন দিন মাইকেলকে ডাকতে বা বিপদে পড়তে না হয়। তা না হলে, এদেশে ওর ফিরে

এসেই বা কি লাভ? কাজেই, এসো সবাই মিলে একটু চিন্তা করা যাক। এটাই হলো এখনকার জন্যে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা।

‘কি জানো, প্রত্যেক মানুষকে জীবনে একবার অন্তত নির্বোধের মত কাজ করতে দেয়া উচিত। সেই রকম একটা কাজ আমিও করছি। আমি চাই আমাদের উঠানের চারদিকে যত জমি আছে তার সবটা কিনে ফেলা হোক, সমস্ত বাড়ি কিনে ফেলা হোক। কেউ তার জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালে আমার বাগান দেখতে পাবে, এ আমি চাই না। এক মাইল দূর থেকেও তা যেন ক্লেউ দেখতে না পায়। আমি উঠানের চারধারে পাঁচিল চাই, রাতদিন চক্ষিণ ঘন্টার জন্যে সতর্ক পাহারা চাই। পাঁচিলে একটা ফটক চাই। এক কথায়, একটা দুর্গের মত দুর্ভেদ্য জায়গায় বাস করতে চাইছি আমি। তোমাদের জানিয়ে রাখছি, কাজ করতে আর কখনও শহরে যাব না। ধরে নাও, আধা-অবসর নিয়েছি। বাগানে কাজ করার ইচ্ছা হয়েছে আমার। নিজের বাড়িতে থাকব যদি কখনও বের হই, শুধু কোথাও ছুটি কাটাতে বের হব। অথবা বিশেষ কোন জরুরী কাজ পড়লে যদি বের হতে বাধ্য হই। তখন আমি আশা করব সব রকম সতর্কতা যেন অবলম্বন করা হয়। দেখো, আমাকে তোমরা কেউ ভুল বুঝো না। ভেবো না আমি কিছু পাকিয়ে তুলছি। আমি শুধু খানিকটা বিচক্ষণ হতে চাইছি। অবশ্য চিরকালই আমি তাই। বেচে থাকার মধ্যে অসাবধানতার মত আর কোন জিনিসে আমার অকুচি নেই। মেয়েমানুষ আর শিশুদের অসাবধান হওয়া সাজে, পুরুষদের সাজে না। ধীরে-সুস্থে সমস্ত ব্যবস্থা করো, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে আমাদের বন্ধুদের যেন আবার শঙ্কিত করে তুলো না। এমন ভাবে ধীরে-সুস্থে করো, যাতে কারও চোখে কিছুই অস্বাভাবিক না ঠেকে।

‘এখন থেকে ক্রমশ তোমাদের তিনজনের হাতে বেশি করে কাজের ভার দেব আমি। সান্তিনোর দলটা ভেঙে ওই দলের লোকদের তোমরা নিজেদের দলে নিয়ে নাও। এই আমার ইচ্ছা। এটা লক্ষ করে আমাদের বন্ধুদের আশ্বস্ত হওয়া উচিত, বোঝা উচিত আমি সত্যি সত্যিই শান্তি চাই। টম, আমি চাই তুমি একদল লোককে লাস ভেগাসে পাঠাও। সেখানে সত্যি কি হচ্ছে না হচ্ছে সে-ব্যাপারে একটা পূর্ণচিত্র দেবে তুমি আমাকে। ব্যাপারটা জানতে চাই আমি। আসলে ওখানে কি হচ্ছে জানাবে আমাকে। আমি নাকি নিজের ছেলেকে চিনতেই পারব না। ও নাকি এখন ভাল রাঁধতে পারে, অল্পবয়সী মেয়েদের নিয়ে নাকি ফুটি করতে পারে। কি আশ্চর্য, এসব করার বয়স তো কবেই শেষ হয়ে গেছে ওর। অথচ ছোট বেলায় ও বড় বেশি গম্ভীর ছিল, তাছাড়া কোন দিনই আমাদের পারিবারিক ব্যবসাতে ওকে মানায় না। সে যাই হোক, এবার ওখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা জানা দরকার আমার।’

ধীর শান্ত গলায় বলল হেগেন, ‘আপনার জামাইকে পাঠাই? ও তো নেভাভারই ছেলে, ও-দিককার হালচাল সব জানে সে।’

মাথা নেড়ে বললেন ডন কর্লিয়নি, ‘না। ছেলে-মেয়েরা কেউ কাছে না থাকলে আমার স্ত্রীর বড় একা লাগে। আমি চাই কনি আর তার স্বামীকে উঠানের একটা বাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে আসা হোক। একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেয়া হোক কার্লোকে।

ওর সাথে হয়তো বড় কর্কশ ব্যবহার করা হয়ে গেছে। তাছাড়া, 'মুখ বিকৃত করে বললেন ডন কর্লিয়নি, 'আমার ছেলের অভাব। ওকে জুয়ার ব্যবসা থেকে সরিয়ে এনে ইউনিয়নের কাজে লাগাঁও। কিছু খাতাপত্র দেখতে পারবে, প্রচুর কথাও বলতে পারবে। বেশ সুন্দর কথা বলে।' সামান্য একটু তাচ্ছিল্যের সুর শোনা গেল ডনের গলায়।

মাথা দুলিয়ে তাঁকে সমর্থন করে হেগেন বলল, 'বেশ। ক্রেমেঞ্জা আর আমি আমাদের সমস্ত লোককে যাচাই করে ভেগাসে পাঠাবার জন্যে কয়েকজনকে নির্বাচন করব। যদি বলেন, কয়েকদিনের জন্যে ফ্রেডিকে আনিয়ে নিতে পারি।'

মাথা নাড়ালেন ডন। বললেন, 'কিসের জন্যে? কেন? আমার স্ত্রীই তো আমাদের রান্না করতে পারেন। ও ওখানেই থাকুক।'

অস্বস্তির সাথে চেয়ারে নড়েচড়ে উঠল ওরা তিনজনই। এতদিন টের পায়নি ওরা যে ফ্রেডির বাবা ছেলের উপর এতটা অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন। ওদের এখন সন্দেহ হচ্ছে, এর পিছনে নিশ্চয়ই এমন কিছু কারণ আছে যা ওদের কারও জানা নেই।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ডন কর্লিয়নি বললেন, 'আশা করছি, এই বছর বাগানে কিছু ভাল মিষ্টি লঙ্কা আর টম্যাটো ফলাবে। আমাদের খেতে যত লাগবে তাঁর চেয়েও বেশি। সেগুলো তোমাদেরকে উপহার দেব। এই বুড়ো বয়সে এবার আমি একটু শান্তি চাই। একটু নির্জনতা চাই। একটু মনের সুখ চাই। বাস, এইটুকুই তোমাদেরকে বলতে চেয়েছি। ইচ্ছা হয় তো আরেক গ্লাস পানীয় নাও না তোমরা সবাই।' ইঙ্গিতে ওদেরকে বিদায় জানাচ্ছেন।

উঠে পড়ল ওরা তিনজন। ক্রেমেঞ্জা আর টেসিওকে তাদের গ্লাডি পর্যন্ত পৌছে দিয়ে, তাদের সাথে আরও বারকতক আলোচনায় বসার কথা স্থির করে এল হেগেন। ডনের নির্দেশ পালন করতে হলে অনেক খুঁটিনাটি কার্যকর ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে হবে ওদেরকে। আবার বাড়ির ভিতর ফিরে এল হেগেন। ডন কর্লিয়নি ওর জন্যে অপেক্ষা করে আছেন, জানে ও।

কোট আর টাই খুলে সোফার উপর শুয়ে পড়েছেন ডন। তাঁর কঠিন চেহারা য় ক্লান্তির ছাপ ফুটে এখন আরও নরম দেখাচ্ছে। একটা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে ডন বললেন, 'এবার বলো তো, কনসিলিয়রি, আমার আজকের কথাবার্তার কোনটাতে কি তোমার আপত্তি আছে?'

মুখ খুলতে একটু সময় নিল হেগেন। তারপর বলল, 'তা নেই। কিন্তু গোটা ব্যাপারটার মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব দেখতে পাচ্ছি আমি। আপনার সাথে ঠিক যেন মিলছে না। আপনি বলছেন, সান্ত্বিনোকে কিভাবে হত্যা করা হয়েছে তা আপনি জানতে চান না, প্রতিশোধও নিতে চান না। এ আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। কিন্তু এও জানি, আপনি কথা দিয়েছেন শান্তি রক্ষা করবেন, সুতরাং নিশ্চয়ই শান্তি রক্ষা করবেন। তবু আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না যে আজ আপাতদৃষ্টিতে যেটাকে আপনার শত্রুদের জয়লাভ বলে মনে হচ্ছে, সেটা আপনি সত্যি সত্যি তাদের দিচ্ছেন। আমার জন্যে আপনি একটা অপূর্ব হেঁয়ালির সৃষ্টি করেছেন, আমি তার কোন উত্তরই খুঁজে পাচ্ছি না। তাই বুঝতেই পারছি না আপনাকে আমি সমর্থন

করব, নাকি আপত্তি জানাব।’

পরম পরিতৃপ্তির একটা ভাব দেখা গেল ডনের মুখে। তিনি বললেন, ‘সবার চেয়ে আমাকে ভাল বোঝ তুমি। যদিও তুমি সিসিলীয় নও, তোমাকে সিসিলীয় বানিয়েছি আমি। যা বললে তার সবই সত্যি। তবে এর একটা সমাধানও আছে। খেলা শেষ হবার আগে তুমিও সেটা জানতে পারবে। তুমি তাহলে স্বীকার করছ যে সবাইকেই আমার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতে হবে আর আমিও আমার কথা রাখব। আমার আদেশগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হোক, এই আমি চাই। দেখো, টম, সবচেয়ে বড় কথা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি ফিরিয়ে আনতে হবে মাইকেলকে। এই কথাটাকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনেও করবে আর কাজেও দেখাবে। যত টাকা লাগে লাগুক, আইনের গলিঘুঁজি খুঁজে দেখো। ও বাড়ি এলে কোথাও যেন কোন বিপদ ঢোকার ফুটো না থাকে। ফৌজদারী আইন সম্পর্কে সবচেয়ে বড় বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা বলো। কয়েকজন বিচারকের নাম দেব তোমাকে, তারা তোমার সাথে গোপনে আলোচনা করবেন। কিন্তু সমস্যাটার সুচারু সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সব রকম বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে চলতে হবে আমাদের।’

হেগেন বলল, ‘আমি বাস্তব প্রমাণ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। আমি শুধু ভাবছি ওরা না কোথাও কোন মিথ্যে, জাল ষড়যন্ত্র তৈরি করে রাখে। তাছাড়া, মাইকেল একবার গ্রেপ্তার হলে ক্যাপটেন ম্যাকক্লান্সির কোন পুলিশ-বন্ধুও খুন করতে পারে ওকে। ওর সেনে চুকে ওকে মেরে ফেলা বা লোক দিয়ে খুন করানো পানির মত সহজ। আমি যতদূর বুঝি, ওর ধরা পড়ার, অভিযুক্ত হবার ঝুঁকিটুকুও নিতে পারি না আমরা।’

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ডন কর্নিয়নি বললেন, ‘জানি, আমি জানি। মুশকিলটা তো ওখানেই। কিন্তু তাই বলে খুব বেশি দেরিও করা যায় না। গোলমাল সিসিলীতেও আছে। ওখানকার ছোকরারাও আর গুরুজনদের কথামত চলছে না। তাছাড়া এখান থেকে যাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, তাদের সাথে ওখানকার সেকেন্ডে ডনরা পেরে উঠছে না। যদি দু’দলের মাঝখানে পড়ে যায় মাইকেল? অবশ্য সে ব্যাপারেও কিছু কিছু ব্যবস্থা নিয়েছি আমি। এখনও ভাল একটা গোপন আশ্রয়েই আছে ও। কিন্তু সে আশ্রয়ও চিরকাল নিরাপদ থাকবে না। শান্তি ফিরিয়ে আনার সেটাও একটা কারণ। সিসিলীতে বন্ধু-বান্ধব আছে বার্জিনির, তারা খুঁজছে মাইকেলকে। এই তো তোমার হেঁয়ালির পেয়ে গেলে একটা উত্তর। আমার ছেলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে শান্তি-চুক্তি করতে হলো। আর কোন উপায় ছিল না।’

এত খবর কোথেকে পেলেন ডন, সে কথা জানতে চেয়ে সময় নষ্ট করল না টম। বিন্দুমাত্র অবাকও হলো না, আর এ কথাও সত্যি যে হেঁয়ালির খানিকটা সমাধানও পাওয়া গেল। সে জানতে চাইল, ‘খুঁটিনাটি বন্দোবস্ত করার জন্যে যখন টাটাঘিয়ার লোকদের সাথে দেখা করব, তখন কি আমি দাবি তুলব যে যারা ড্রাগ ব্যবসায় মধ্যস্থতা করবে তারা পুলিশের চেনা হলে চলবে না? দাগী আসামীকে অল্প শাস্তি দিতে বিচারকেরা অস্বস্তি বোধ করতে পারেন।’

‘এটুকু বুঝে নেবার মত বুদ্ধি ওদের থাকা উচিত,’ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন ডন কর্লিয়নি। ‘কথাটা তুলো, তবে দাবির সুরে নয়। আমরা যথাসাধ্য করব, কিন্তু ওরা যদি একটা পেশাদার ড্রাগের দালানকে কাজে লাগায়, আর সে ব্যাটা ধরা পড়ে, তাকে আমরা কোন সাহায্যই করব না। সোজা বলে দেব, কিছু করার উপায় নেই। তবে বলার দরকার হবে না, বার্জিনি ঠিক বুঝে নেবে। লক্ষ্য করেছ কি, এ ব্যাপারে নিজের মতামত একবারও জানাল না ও। এ সবার সাথে ও যে কোনভাবে জড়িত, বোঝাই যাচ্ছিল না। এই ধরনের লোকেরা কখনও হেরে যাওয়ার দলে থাকে না।’

চমকে উঠল হেগেন। ‘আপনি বলতে চাইছেন প্রথম থেকেই সলোযো আর টাটাগ্লিয়ার পিছনে ছিল ও?’

‘টাটাগ্লিয়াটা তো একটা দালান,’ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন ডন কর্লিয়নি। ‘সান্তিনোর সঙ্গে লড়াই করে ও কখনও পেরে উঠত না। সে জন্যেই কি হয়েছিল না হয়েছিল আমার জানার দরকার নেই। ওতে বার্জিনির হাত ছিল, এইটুকু জানাই আমার জন্যে যথেষ্ট।’

কথাটা মনে গেঁথে রাখল হেগেন। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে ও, কিছু কিছু সূত্র দিচ্ছেন বটে ডন, কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু চেপে যাচ্ছেন তিনি। সেটা যে কি তাও জানে হেগেন, সেই সাথে এও জানে যে এ প্রসঙ্গে কিছু জিজ্ঞেস করা শোভা পায় না। ওড নাইট বলে বাড়ি ফেরার জন্যে উঠে পড়ল সে। কিন্তু একটা কথা বলতে বাকি আছে তখনও ডন কর্লিয়নির।

‘মনে রেখো, মাইকেলকে কিভাবে বাড়ি আনা যায়, মাথা ঘামিয়ে তার একটা উপায় বের করতে হবে। আরেকটা কথা। আমাদের টেলিফোনের লোকটার সাথে প্রয়োজনীয় কথা বলো, যাতে ক্রেমেঞ্জা আর টেসিওকে প্রতি মাসে কে কটা টেলিফোন করে আর ওরাই বা কাকে কটা টেলিফোন করে তার একটা তালিকা পাই আমি। না, কোন কারণে সন্দেহ করছি না ওদেরকে। হলপ করে বলতে পারি, আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না ওরা। তবে বড় ঘটনার আগে ছোটখাট সমস্ত খুঁটিনাটি জানা থাকলেও কোন ক্ষতি নেই।’

মাথা দুলিয়ে বেরিয়ে গেল হেগেন। ভাবছে, কে জানে ওর ওপরেও গড ফাদার হুকান উপায়ে নজর রাখছেন কিনা। কিন্তু পর মুহূর্তে নিজের সন্দেহের কথা ভেবে লজ্জা পেল টম। সে যাই হোক, এবার ও নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছে গড ফাদারের সূক্ষ্ম জটিল মনে কোন সুদূরপ্রসারী কাজের পরিকল্পনা গুরু হয়ে গেছে, তার তুলনায় সেদিনকার ঘটনাবলী একটা কৌশলী পশ্চাদপসারণ ছাড়া কিছুই নয়। তাছাড়া সেই একটা রহস্যময় সূত্র উহা রয়েছে, যার কথা কেউ উল্লেখ করেনি। টম নিজেও প্রশ্ন করে জেনে নিতে সাহস পায়নি, ডন কর্লিয়নিও উপেক্ষা করে গেছেন সমস্ত কিছু থেকেই একটা বোঝাপড়ার দিনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। একমাত্র ভবিষ্যৎই বলতে পারে সেই দিনটাতে কি ঘটবে না।

আট

কিন্তু মাইকেলকে গোপনে আমেরিকায় ফিরিয়ে আনতে আরও একটা বছর নেগে গেল ডন কর্লিয়নির। এর আগে পর্যন্ত কর্লিয়নি পরিবারের সবাই একটা উপযুক্ত উপায় খুঁজতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে গেছে।

কিন্তু মাইকেলকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে যে যত উপায় বলছে কোনটাই পছন্দ হচ্ছে না ডন কর্লিয়নির। উঠানের একটা বাড়িতে কনিকে নিয়ে বাস করে এখন কার্লো। আজকাল তার কথায় পর্যন্ত কান দেয় লোকে।

শেষ পর্যন্ত নিজেদের একটা শোচনীয় করুণ ঘটনার পরিণতির সাহায্যে বোচ্চিচ্চিও পরিবারই সমাধান করে দিল সমস্যাটার। বোচ্চিচ্চিওদের নিকট আত্মীয় এক ছেলে, নাম ফীলিক্স, বয়স পঁচিশের মত, জন্ম আমেরিকায়, তার মাথায় যত বুদ্ধি আছে ওদের বংশের কখনও কারও মাথায় এতটা ছিল না বা নেই। ওদের আবজনা ফেলার পারিবারিক ব্যবসায় ঢুকতে রাজী হয়নি ফীলিক্স ভাল একটা ইংরেজ বংশের আমেরিকান মেয়েকে বিয়ে করে নিজের পরিবারের সাথে বিচ্ছেদটা আরও পাকা করে এনেছে। উকিল হবার জন্যে রাতের বেলা ক্লাস করে, আর দিনের বেলা করে সিভিল সার্ভিসের ঠাকঘরে কেরানীর চাকরি। এরই মধ্যে তিনটি বাচ্চা হয়েছে। কিন্তু ওর স্ত্রী খুব হিসাবী আর ভাল গৃহিণী বলে যত দিন না ফীলিক্স তার আইনের ডিগ্রী পেল তত দিন তার এই সামান্য আয়টুকু দিয়েই সংসার চালিয়ে নিয়েছে সে।

অন্যান্য যুবকদের মত ফীলিক্স বোচ্চিচ্চিও-ও ভেবেছিল, এত কষ্ট করে লেখাপড়া শেষ করে আইনের ডিগ্রীটা লাভ করা গেছে যখন, এবার নিশ্চয়ই আপনা থেকেই এতবড় একটা ওণের পুরস্কার পাওয়া যাবে, দুই হাতে টাকা লুটবে সে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হলো না। টাকা রোজগার করা খুবই কঠিন আর কষ্টসাধ্য। নিজের আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্যে সে আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে সাহায্য নিতে রাজী হলো না। ওর এক উকিল বন্ধু আছে, কম বয়স, ভাল পরিবারের ছেলে। বড় একটা আইন ব্যবসাতে তার কর্মজীবন সবে শুরু হতে যাচ্ছে। সে-ই ফীলিক্সকে বুঝিয়ে-ওনিয়ে তার একটা উপকার করতে রাজী করাল। ব্যাপারটা ভারি জটিল, বাইরে থেকে মনে হয় এতে বেআইনী কিছু নেই। একটা ব্যবসার দেউলিয়া ঘোষণা সংক্রান্ত জোচ্ছুরির কেস। জোচ্ছুরিটা ধরা পড়ার সম্ভাবনা দশ লাখে এক বা নেই বললেই চলে। ঝুঁকিটুকু নিল ফীলিক্স। বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে আইনে যে দক্ষতা অর্জন করেছে সেটাকে ব্যবহার করে জোচ্ছুরিটাকে যদি ঢাকতে পারা যায় তাতে আপত্তিকর কিছু আছে বলে মনে হয়নি তার। কাজটা অন্যায় বলেও মনে হয়নি। বরং মনে হয়েছে, নিজের যোগ্যতা পরীক্ষা করে দেখার এইতো এক সুযোগ।

যাই হোক, সংক্ষেপে ঘটনা হলো, জোচ্ছুরিটা ধরা পড়ে গেল। উকিল বন্ধু গায়েব হয়ে গেল, এই বিপদে ফীলিক্সকে কোনভাবে সাহায্য তো করলই না, এমন

কি টেলিফোন করলেও উত্তর দেয় না। জোচ্ছুরির ব্যাপারে হোতা যারা, তারা দু'জন আধা-বয়সী বিচক্ষণ ব্যবসায়ী। মতলব ফেঁসে যাবার জন্যে তারা ক্ষেপে আঙুন। ফীলিক্সের আনাড়ীপনাকেই দায়ী করল তারা। তারপর নিজেরা অপরাধ স্বীকার করে, রাজসাক্ষী হয়ে ফীলিক্সকে আসল জোচ্ছোর হিসাবে চিহ্নিত করে বলল, সে নাকি প্রাণের ভয় দেখিয়ে তাদের ব্যবসা হস্তগত করে নেবার উদ্দেশ্যে নিজের বেআইনী কীর্তিকলাপে যোগ দিতে তাদেরকে বাধ্য করেছিল। এমন সব সাক্ষীও দাঁড় করানো হলো, যারা নানান গুণামীর জন্যে পুলিশের খাতায় নাম লেখানো বোচ্চিচ্চিও পরিবারের ভাই বেরাদারদের সাথে ফীলিক্সকেও জড়িয়ে ফেলল। এটাই হলো সর্বনাশের মূল কারণ। ব্যবসায়ী দু'জনের শাস্তি রদ্ হয়ে গেল, ফীলিক্স বোচ্চিচ্চিওকে পাঁচ বছর কারাদণ্ড দেয়া হলো। তিন বছর মেয়াদ খাটল সে। বোচ্চিচ্চিওরা অন্যান্য মাফিয়া পরিবারের কিংবা ডন কর্লিয়নির সাহায্য চায়নি। কারণ, ফীলিক্স বোচ্চিচ্চিওদের কাছ থেকে কোন সাহায্য চায়নি। বোচ্চিচ্চিওরা স্থির করল, ফীলিক্সকে এই শিক্ষা দেয়া দরকার যে একমাত্র নিজের পরিবারের কাছ থেকেই সাহায্য পাওয়া যায় এবং সমাজের চেয়ে পরিবারের উপরেই বেশি বিশ্বাস ও আস্থা রাখা উচিত।

সে যাই হোক, তিন বছর মেয়াদ খাটার পর ফীলিক্স তো ছাড়া পেল। সোজা বাড়ি ফিরে স্ত্রী আর তিনটি সন্তানকে চুমো খেয়ে, বছর খানিক শান্তিতে বাস করার পর, হঠাৎ প্রমাণ করে দিল যে সেও বোচ্চিচ্চিও পরিবারের যোগ্য সন্তানই বটে। নিজের অপরাধ গোপন করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করল না ফীলিক্স। একটা পিস্তল যোগাড় করল সে। সেটা দিয়ে গুলি করে তার উকিল বন্ধুকে মেরে ফেলল তারপর সেই দুই ব্যবসায়ীকে খুঁজে বের করল। তারা একটা রেষ্টোরাঁ থেকে বেরুচ্ছে, এই সময় নির্বিকার চিত্তে দু'জনের মাথায় গুলি চালিয়ে দিল রাস্তায় পড়ে রয়েছে লাশ দুটো। রেষ্টোরাঁয় ঢুকে কফির অর্ডার দিয়েছে ফীলিক্স বসে বসে কফির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে, আর অপেক্ষা করছে, কখন এসে ওকে ধরে নিয়ে যাবে পুলিশ।

খুব তাড়াতাড়ি বিচার হয়ে গেল ওর। রায়টা হলো নির্মম প্রকাশ পেল অপরাধ জগতের একজন সদস্য নির্দয়ভাবে দু'জন সরকারী সাক্ষীকে হত্যা করেছে। কারণ তাদের সাক্ষ্যের জন্যে ন্যায়্য ভাবেই কারাদণ্ড হয়েছিল তার। এভাবে সামাজিক নিয়মকে তাচ্ছিল্য করা কোনমতেই মেনে নেয়া যায় না, তাই এই একবারের মত দেখা গেল জনসাধারণ, খবরের কাগজ এবং আইন সংরক্ষকেরা সবাই একবাক্যে ফীলিক্স বোচ্চিচ্চিওর প্রাণদণ্ড দাবি করেছে। রাজ্যপালের নিকটতম রাজনৈতিক সহকারীদের একজন বলল, খোঁয়াড়ের প্রহরীরা যেমন কখনও পাগলা কুকুরের প্রাণরক্ষা করে না, তেমনি রাজ্যপালও কখনোই ফীলিক্স বোচ্চিচ্চিওকে ক্ষমা প্রদর্শন করবেন না বোচ্চিচ্চিও পরিবার অবশ্য উচ্চতর আদালতে আপীলের জন্যে যত টাকা লাগে ঢালতে প্রস্তুত হয়ে আছে, তার কারণ এখন তারা ফীলিক্সকে নিয়ে রীতিমত গর্ববোধ করছে কিন্তু পরিণামে কি হবে তা আর জানতে বাকী নেই কারও। আইনের কচকচি শেষ হলে, তাতে কিছু সময় নেবে, ফীলিক্স বোচ্চিচ্চিও ইলেকট্রিক চেয়ারে মারা যাবে। এর কোন ব্যতিক্রম ঘটতে পারে না।

ঘটনাটা ডন কর্লিয়নির নজরে আনল টম হেগেন। বোচ্চিচ্চিওদের ডন আশা

করছে, ডন কর্লিয়নি হয়তো হতভাগ্য যুবকের জন্যে কিছু করতে পারবেন। তিনিই হেগেনের কাছে এসেছেন। ডন কর্লিয়নি সংক্ষেপে প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি তো আর জাদুকর নন। লোকে তাঁর কাছে কেবলই অসম্ভব জিনিস চায়। কিন্তু পরদিন হেগেনকে তাঁর অফিসে ডেকে পাঠিয়ে, ঘটনাটার খুঁটিনাটি সব কথা শুনলেন তিনি। সব কথা শুনে ডন কর্লিয়নি ওকে বললেন, 'বোচ্চিচ্চিও পরিবারের কর্তাকে আমার সাথে দেখা করার জন্যে উঠানে নিয়ে এসো।'

এরপর যা ঘটল তাতে ডন কর্লিয়নির প্রতিভার সরলতাই প্রমাণ হয়। তিনি বোচ্চিচ্চিও নৈতাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে ফীলিক্স বোচ্চিচ্চিওর স্ত্রী পুত্র-পরিবারকে প্রচুর পরিমাণে মাসোহারা দেয়া হবে এবং তার জন্যে যত টাকা লাগবে তার সব এখনই বোচ্চিচ্চিও পরিবারের হাতে তুলে দেয়া হবে। এর বিনিময়ে ফীলিক্সকে স্বীকার করতে হবে যে সলোযো আর পুলিশ ক্যাপটেন ম্যাককুস্কির খুনের জন্যেও সে-ই দায়ী।

এ ব্যাপারে অনেক খুঁটিনাটি ব্যবস্থা করতে হলো। ফীলিক্সকে এমনভাবে দোষ স্বীকার করতে হবে যাতে শোতাদের মনোবিশ্বাস জন্মায়। সুতরাং হত্যাকাণ্ডের প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপার সমস্তই তার জানা দরকার। তাছাড়া, ক্যাপটেনকে ড্রাগসের ব্যবসার সাথে জড়াতে হবে। তারপর লুনা রেস্টোরার সেই ওয়েটারকে রাজী করাতে হবে যাতে সে ফীলিক্স বোচ্চিচ্চিওকেই অপরাধী বলে সনাক্ত করে। খানিকটা সাহসের দরকার হবে তার। কারণ এর আগে আততায়ীর যে বর্ণনা সে দিয়েছে তার আমূল পরিবর্তন করা দরকার এখন। ফীলিক্স মাইকেলের চেয়ে অনেক বেশি বেঁটে আর মোটা। তবে সে-ব্যবস্থাও ডন কর্লিয়নিই করলেন। ফীলিক্সের ছেলেমেয়েরা সুশিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে সেজন্যে আরও কিছু বেশি টাকা বরাদ্দ করলেন তিনি। তারপর বোচ্চিচ্চিও পরিবারকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন, আসলে তিনটে খুনের জন্যে মৃত্যুবরণ করতেই হচ্ছে ফীলিক্সকে, ক্ষমা পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এই নতুন স্বীকৃতির ফলে আরও সুনিশ্চিত হবে মৃত্যুদণ্ড—এর বেশি কিছু নয়।

সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেল। আগেই দিয়ে দেয়া হলো টাকা। দণ্ডিত ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করা হলো। নির্দেশ ও উপদেশ পেল সে। বিনা দ্বিধায় রাজী হয়ে গেল ফীলিক্স। দণ্ডিত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি সব কাগজেই ছাপা হলো বড় বড় হরফে। সমস্ত ব্যাপারটা সাফল্যমণ্ডিত হলো, কোথাও কোন খুঁত নেই। কিন্তু ডন কর্লিয়নি সবসময়ই সাজাতিক ইঁশিয়ার মানুষ। ফীলিক্স বোচ্চিচ্চিওর প্রাণদণ্ড না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন তিনি। চার মাস কেটে গেল তারপর তিনি বাড়ি ফিরে আসার নির্দেশ পাঠালেন তাঁর ছোট ছেলে মাইকেলকে

নয়

সনির মৃত্যুর পর একটাবছর কেটে গেছে। কিন্তু লুসি ম্যানচিনির মনে এখনও তার জন্যে হাহাকার জাগে। তার তীব্র শোকের সাথে কোন প্রাচীন কাহিনীর নাট্যিকার

শোকের তুলনা হয় না। ওর স্বপ্নগুলি কোন স্কুল ছাত্রীর পান্সে স্বপনের মত নয়। ওর বাসনা সতী-সাক্ষী স্ত্রীর বাসনার মতও নয়। জীবনসঙ্গীকে হারিয়ে লুসি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েনি, তার বলিষ্ঠ চরিত্রের অভাব তাকে পীড়া দিচ্ছে না। কোন আবেগময় উপহারের কোমল স্মৃতি ওর মনে কাঁটার মত বেঁধে না। তরুণ চিত্তের কোন বীরপূজার স্মৃতিও নয়। লুসির কোন স্নেহের কথা, রসের কথা শুনে সে মানুষটির মুখে হাসি, চোখে সরলতার আভাস ফুটে ওঠার স্মৃতিও নয়।

এসব কিছুই নয়, সনির অভাব বোধ করার প্রধান কারণ হলো, একমাত্র সে-ই যৌন-মিলনে লুসিকে পরিতৃপ্তি দিতে পারত। এই তরুণ বয়সে, অনভিজ্ঞ মনে লুসির আজ ধারণা, আর কেউ তাকে কখনও সেই পরিতৃপ্তি দিতে পারবে না।

এক বছর পর এখন লুসি নেভাডার মিষ্টি বাতাসে রোদ পোয়াচ্ছে। পায়ের কাছে শুয়ে রয়েছে ছিপছিপে শরীর, সোনালী চুল এক যুবক। ওর পায়ের আঙুল নিয়ে খেলা করছে। রোববার। দুপুর। হোটেলের পাশে সুইমিং পুলের ধারে শুয়ে রয়েছে ওরা। চারদিকে এত লোকজন থাকাসত্ত্বেও যুবক ওর অনাবৃত উরুতে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

‘জুলস, এবার থামো,’ বলল লুসি। ‘আমার তো ধারণা ছিল অন্তত ডাক্তাররা আর সব পুরুষের মত বোকা হয় না।’

একগাল হাসল জুলস। বলল, ‘আমি যে লাস ভেগাসের ডাক্তার।’ লুসির উরুর ভিতর দিকে একটু সুড়সুড়ি দিতেই, অবাক হয়ে জুলস দেখল এই সামান্য স্পর্শেই কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠছে মেয়েটা। গোপন করার চেষ্টা করলেও, ওর মুখ দেখেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সেটা। সত্যি মেয়েটা বড় আদম্য, আর নির্দোষ। কিন্তু তবু ওকে আয়ত্ত করতে পারছে না জুলস। কেন? ভেবে দেখার মত ব্যাপার। হারানো প্রিয়তমের জায়গায় কাউকে বসানো যায় না, এসব বাজে কথা। এই তো হাতের নিচে জ্যান্ত জিনিস জ্যান্ত জিনিস আরেকটা জ্যান্ত জিনিসকেই চায়। ডা. জুলস সীগল ঠিক করল, নিজের ফ্ল্যাটে আজ রাতে একটা মরিয়া আর মোক্ষম চেষ্টা করে দেখবে সে। জুলসের একান্ত ইচ্ছা, চালাকির সাহায্য না নিয়েই ওকে আয়ত্ত করা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি চালাকিই করতে হয়, তাতেও সে পিছপা হবে না। সাবজেক্টটা তো নির্ভেজাল বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের জন্যে কি না করা যায় তা ছাড়া, এ-বেচারি তো সেটার জন্যই মরে যাচ্ছে।

‘জুলস, থামো,’ মিনতির সুরে বলল লুসি। ‘লক্ষ্মীটি, থামো!’

অনুতপ্ত হয়ে জুলস বলল, ‘আচ্ছা। বেশ। এই থামলাম। খুশি, মানিক?’

লুসির কোলে মাথা রেখে, ওর নরম উরু দুটোকে বালিশ বানিয়ে ছোট একটা ঘুম দিয়ে নিল জুলস। লুসির ছটফট করে ওঠা, লুসির কটিদেশের উত্তাপ, সব লক্ষ করে হাসি পাচ্ছে ওর। তারপর যেই লুসি ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিতে শুরু করল, খেলাচ্ছলে ওর হাতের কজি ধরে রাখল জুলস, যেন আদর করছে, আসলে কিন্তু ওর পালস পরীক্ষা করছে। ঘোড়ার মত লাফাচ্ছে ওর পালস। আজ ওকে আয়ত্তে আনতেই হবে, ভেদ করতেই হবে রহস্যটা, তা যে ভাবেই হোক না কেন। এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ডা. জুলস সীগল।

সুইমিং পুলের চারদিকে তাকাচ্ছে লুসি। লোকজন দেখছে। দু’ বছরও তো

কাটেনি, এরই মধ্যে ওর জীবনে এতটা পরিবর্তন আসবে ঘূণাক্ষরেও তা সে ভাবতে পারেনি। কনি কর্নিয়ানির বিয়ের দিন ওর সেই 'মুড়তার' জন্য সে কখনও অনুগোচনা বোধ করেনি। সেদিন যা ঘটেছিল তার কোন তুলনা নেই ওর জীবনে, আর কখনও ঘটেনি। সনির সাথে সেই ঘটনার কথা স্মরণ করে আজও সে পুলকিত হয়।

হুগায় কমপক্ষে একদিন ওর কাছে আসতই সনি। কোন কোন হুগায় একাধিক বার। সনিকে আবার দেখতে পাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সারা শরীরে ওর সে কি যন্ত্রণা! পরস্পরের শরীর পাবার ওদের এই কামনাটা নিতান্তই আদিম ছিল, তার মধ্যে কাব্য বা মননশীলতার ছিটেফোঁটাও ছিল না। যাকে বলা যেতে পারে সবচেয়ে স্থূল ধরনের প্রেম, বৈষ্ণব শারীরিক প্রেম, মাংসের জন্যে বিপরীত মাংসের কামনা।

যেই ফোন করে সনি বলত যে সে আসছে, অমনি লুসি দেখে রাখত বাড়িতে যথেষ্ট মদ, রাত আর সকালের জন্য যথেষ্ট খাবার ইত্যাদি আছে কিনা। কারু সনি সাধারণত বেশ বেলা করে বিদায় নিত। প্রাণভরে ওকে পেতে চাইত সনি, ও-ও তাকে প্রাণ-মন দিয়ে পেতে চাইত। নিজের চারি ছিল সনির, সে দরজা দিয়ে ঢোকামাত্র লুসি ছুটে গিয়ে তার বিশাল আলিঙ্গনের ভিতর সৈঁধিয়ে যেত। পশুর মত সোজাসুজি করত ওরা কাজটা। জানোয়ারের আদিমতা প্রকাশ পেত ওদের আচরণে। হল ঘরে দাঁড়িয়েই প্রেম করত ওরা, যেন সেই প্রথম দিনের প্রেম করার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, তারপর লুসিকে বুকে তুলে নিয়ে শোবার ঘরে আসত সনি।

বিছানায় শুয়েও প্রেম চলত ওদের। দু'জনেই বিবস্ত্র অবস্থায় মোলো ঘন্টা কাটাত বাড়ির ভিতর। মহা ঘটা করে রান্না-বাণা করত লুসি। মাঝে মাঝে সনির টেলিফোন আসত, সম্ভবত কাজের কথা হত, লুসি সে-সব কখনও কান পেতে শুনতে যায়নি। সনির শরীরটাকেই আদর করতে ব্যস্ত থাকত ও, হাত বুলিয়ে দিত, চুমু খেত, মুখ ঝুঁজে রাখত দু' উরুর মাঝখানে। মাঝে মাঝে সনি মদ ঢালার জন্য উঠত। ওর পাশ ঘেষে যাবার সময় হাত বাড়িয়ে ওর নগ্ন দেহ স্পর্শ করত লুসি। ধরে রাখত, আদর করত, যেন সনির শরীরের অঙ্গগুলো ওর খেলার সামগ্রী। বিশেষভাবে শুধু যেন ওর জন্যে তৈরি। বিচিত্র, নির্দোষ খেলনা, বড় পরিচিত, তবু তার মধ্যে কত অপ্রত্যাশিত আনন্দের ভাণ্ডার। প্রথম প্রথম নিজের এই উচ্ছ্বাসের জন্য লজ্জা স্বেদ করত লুসি, পরে দেখল এতে সনি খুশি হয়। সব কিছুর মধ্যে একটা পশুসুলভ নির্মল ভাব ছিল। দু'জনে দু'জনকে পেয়ে ওরা বড় সুখী হয়েছিল।

সনির দ্বারা যখন আততায়ীর গুলি খেয়ে রাস্তায় মুখ খুবড়ে পড়লেন, সেই প্রথম লুসির মনে হয়েছিল বিপদ তো তাহলে সনিরও ঘটতে পারে। সেদিন বাড়িতে একা বসে শুধু ফুঁপিয়ে কাঁদেনি লুসি, জানোয়ারের মত গলা ছেড়ে বিলাপ করেছিল। সনি যখন তিন হুগার মধ্যে একবারও এল না, তখন লুসির একমাত্র আশ্রয় হয়ে উঠেছিল ঘুমের বড়ি, মদ, আর হৃদয়ের যাতনা। সে যন্ত্রণা ছিল সত্যিকার শারীরিক যন্ত্রণা। ওর গা ব্যথা করত। অবশেষে আবার একদিন যখন সনি এল, সারাটা সময় তাকে আঁকড়ে ধরে রাখল লুসি। এর পর প্রতি হুগায় অন্তত একবার আসত সনি, মারা যাবার আগের দিন পর্যন্ত।

খবরের কাগজে ওর মৃত্যুর খবর পড়েছিল লুসি। সেই রাতে আত্মহত্যা করার

জন্যে একগাদা ঘুমের ওষুধ খেয়েছিল সে। কে জানে কেন, তবু মারা যায়নি লুসি। শুধু মনে আছে, সাম্প্রতিক অসুস্থ অবস্থায় টলতে টলতে ফ্ল্যাটের হলঘর থেকে বেরিয়ে এসে লিফটের সামনে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে কারা যেন ওকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। সনির সাথে ওর অবৈধ সম্পর্কের কথা বিশেষ কেউ জানত না, তাই খবরের কাগজে ওর সম্পর্কে কয়েক ইঞ্চির বেশি কিছু লেখা হয়নি।

ও যখন হাসপাতালে, টম হেগেন ওকে দেখতে এসে সমবেদনা জানিয়ে গেল। লাস ভেগাসে সনির ভাই ফ্রেডি যে হোটেলটি চালায়, সেখানে টম হেগেনই ওর জন্য একটা চাকরি ঠিক করে দিল। টম হেগেন বলল, কর্লিয়নি পরিবারের কাছ থেকে একটা বার্ষিক ভাতা পাবে সে। সনি ওর জন্য এই ব্যবস্থা করে রেখে গেছে। টম জানতে চাইল, ও অন্তঃসত্ত্বা কিনা যেন, সে জন্যেই ঘুমের ওষুধ খেয়েছিল লুসি। লুসি বলল, না। সেই মমান্তিক রাতে সনি ওর সাথে দেখা করতে এসেছিল কিনা, কিংবা ফোন করে আসবার কথা বলেছিল কিনা জিজ্ঞেস করতে, লুসি জানাল, না, আসেওনি ফোনও করেনি। কাজ শেষ হয়ে গেলে লুসি সব সময় সনির জন্যে বাড়িতে বসে অপেক্ষা করত; সত্যি কথাই বলল লুসি। 'একমাত্র ওকেই আমি ভালবাসতে পেরেছিলাম, আর কাউকে কখনও ওভাবে ভালবাসতে পারব না।' লক্ষ করল, কথাটা শুনে হাসল হেগেন। মনে হলো, আশ্চর্যও হয়েছে সে। লুসি জানতে চাইল, 'অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে কথাটা? তুমি যখন ছোট ছিলে, ও-ই না তোমাকে ওদের বাড়িতে নিয়ে এসে আশ্রয় দিয়েছিল?'

হেগেন বলল, 'তখন অন্য রকম মানুষ ছিল সে। বড় হয়ে সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল সনি।'

'আমার কাছে নয়,' বলল লুসি 'অন্যদের কাছে হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে নয়।' এখনও বড় দুর্বল লুসি, ভাল করে বুঝিয়ে বলতে পারেনি যে সনি তার সাথে আশ্চর্য কোমল ব্যবহার ছাড়া কখনও রুঢ় ব্যবহার করেনি। রাগ করেনি কখনও, বিরক্ত হয়নি কখনও, তাকে অবিশ্বাস করেনি কখনও।

লাস ভেগাস যাবার সব ব্যবস্থা করে দিল হেগেন। একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করা হলো, নিজে ওকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিল হেগেন ওকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল, সেখানে গিয়ে নিঃসঙ্গ মনে হলে কিংবা কোন অসুবিধার কারণ ঘটলে হেগেনকে যেন অবশ্যই জানায়, যেমন করে পারে সাহায্য করবে হেগেন।

প্লেনে চড়ার আগে একটু ইতস্তত করে লুসি জানতে চাইল, 'তুমি যে আমার জন্যে এত সব করছ সনির বাবা তা জানেন?'

'আমি তাঁর পক্ষ এবং নিজের পক্ষ থেকে এসব করছি,' মৃদু হেসে বলল হেগেন। 'তিনি সেকেলে মানুষ, সনির বৈধ স্ত্রীর বিরুদ্ধে কখনও কিছু করবেন না কিন্তু ওঁর ধারণা, তুমি একজন অবিবাহিতা তরুণী, তাই সনির আর একটু বিবেচক হওয়া উচিত ছিল। তাছাড়া তুমি যখন অতগুলো ঘুমের বড়ি খেয়ে ফেললে, তোমার জন্যে আমরা সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লাম।' ইচ্ছা করেই টম হেগেন লুসিকে বলল না যে কেউ কারও জন্যে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে, এই ঘটনাটাই একেবারে সাম্প্রতিক ব্যাপার ডন কর্লিয়নির কাছে।

লাস ভেগাসে আঠারো মাস বাস করার পর লুসি এই ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে যে এখন তাকে প্রায় সুখীই বলা চলে। কোন কোন রাতে সনিকে স্বপ্নে দেখে সে এখনও। তারপর ঘোর অন্ধকার থাকতে জেগে উঠে নিজেকে নিজে আদর করে স্বপ্নটাকে আরও প্রলম্বিত করে, যতক্ষণ না আবার ঘুম আসে চোখে। সনি মারা যাবার পর থেকে কোন পুরুষ মানুষের দিকে ফিরেও তাকায়নি লুসি; কিন্তু লাস ভেগাসে মনের মত জীবন পেয়েছে সে। হোটেলের সুইমিং পুলে সাতার কাটে, লেক মীডে নৌকা চড়ে বেড়ায় আর ছুটির দিনে মরুভূমির মাঝখানে গাড়ি নিয়ে ঘোরে। আগের চেয়ে কিছুটা রোগা হয়ে গেছে লুসি, তাতে শরীরের গডনটা আরও সুন্দর হয়েছে দেখতে। এখনও লুসি পুরোদস্তুর ভোগবিলাসী, কিন্তু প্রাচীন ইতালীয় কায়দায় নয়, নব্য মার্কিনী কায়দায়। হোটেলের জন-সংযোগ বিভাগে অভ্যর্থনা-কর্মীর কাজ করে সে। ফ্রেডির সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই, তবে দেখা হলেই ফ্রেডি থেমে ওর সাথে একটু গল্প করে যায়। ফ্রেডির এত পরিবর্তন দেখে লুসি মনে মনে আশ্চর্য না হয়ে পারে না। মহিলাদের সাথে আজকাল তার সামাজিক সদ্ভাব। ভাল কাপড়চোপড় পরে ফিটফাট বাবু হয়ে থাকে। শৌখিন ক্যাসিনো চালাবার দক্ষতা সত্যিই রয়েছে তার। আবাসিক দিকটা পরিচালনা করে ফ্রেডি, ক্যাসিনোর মালিকরা কেউ একাজ সাধারণত করে না। প্রচণ্ড গরম আর হয়তো অতিরিক্ত যৌন সম্ভোগের ফলে সে-ও রোগা হয়ে গেছে। তার উপর হলিউডে তৈরি পোশাক-আশাকের জন্য ওকে মারাত্মক স্মার্ট আর সুন্দর লাগে দেখতে।

ছ'মাস পর টম হেগেন লাস ভেগাসে এল লুসির অবস্থা নিজের চোখে দেখার জন্যে। প্রত্যেক মাসে লুসি ছ'শো ডলারের একটা চেক পায়, বেতন ছাড়াই পায় এটা। হেগেন ব্যাখ্যা করে বলল যে ওই চেকের টাকা কোথা থেকে আসছে সেটা খাতা-পত্রে দেখানো দরকার, তাই লুসি যেন ওকে সম্পূর্ণ আমমোক্তারনামা সই করে দেয়, তাহলে হেগেনের পক্ষে টাকাটা এনে দিতে সুবিধে হবে। হেগেন তাকে আরও জানাল, বিধি-মতে হোটেলের মালিকানার ফর্দে পাচ পার্সেন্টের অধিকারিণী হিসেবে লুসির নাম তোলা হবে। নেভাডার আইন মত ওর এই আয়ের ব্যাপারে যা কিছু করণীয় তার সবই করতে হবে। অবশ্য ওর নিজের দায়িত্ব খুব কমই থাকবে, সমস্ত কর্তব্যই ওর হয়ে করে দেয়া হবে। কিন্তু হেগেনের অনুমতি ছাড়া এ বিষয়ে যেন কখনও কারও সাথে আলোচনা না করে লুসি সব দিক দিয়ে আইনের কবল থেকে ওকে রক্ষা করার ব্যবস্থা হবে। প্রতি মাসে নিয়মিত টাকা পেতে থাকবে সে কর্তৃপক্ষ কিংবা কোন আইন সংস্থার তরফ থেকে ওকে কখনও কোন প্রশ্ন যদি করা হয়, লুসি যেন সরাসরি তার উকিলকে জানিয়ে দেয়। তাহলে ওকে আর কেউ বিরক্ত করবে না।

রাজী হলো লুসি। এর ভিতরের ব্যাপারটা সবই বুঝেছে ও, এবং কর্লিয়নিদের সুবিধে করে দেবার জন্যে ওকে যেভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে তাতে ওর কোন আপত্তিও নেই। ওর মনে হচ্ছে ওদের জন্যে এটুকু ওর করাই উচিত। কিন্তু হেগেন যখন বলল, হোটেলের চারদিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেদিকে তো খেয়াল রাখতে হবেই, তাছাড়া ফ্রেডি আর ফ্রেডির উপরওয়ালার দিকেও নজর রাখতে হবে, তখন লুসি বলল, 'তার মানে? ফ্রেডির ওপরেও চোখ রাখতে হবে নাকি?' ফ্রেডির

উপরওয়ালাটি হোটেলের অনেকগুলো শেয়ারের মালিক। হোটেলটা সেই চালায়।
লুসির কথা শুনে হাসল হেগেন। 'ফ্রেডির বাবা ওর জন্য দুশ্চিন্তা করেন। ওর
সঙ্গীটি, মো গ্রিন গভীর পানির মাছ। আমরা শুধু এইটুকুই চাই ফ্রেডি যেন কোন
বিপদে না পড়ে।' লাস ভেগাসের এই মরুভূমির মাঝখানে হোটেলটা তৈরি করার
জন্যে ডন কর্নিয়ানি অজস্র টাকা ঢেলেছেন, তার কারণ শুধু ছেলের জন্য একটা
নিরাপদ আশ্রয় সৃষ্টি করা নয়, আরও অনেক বড় উদ্দেশ্যের চৌকাঠ পেরোবার
ইচ্ছাটাও রয়েছে তাঁর—কিন্তু এত কথা লুসিকে বুঝিয়ে বলার দরকার আছে বলে
মনে করল না হেগেন।

এই সাক্ষাৎকারের ক'দিন পরই হোটেলের আবাসিক চিকিৎসকের পদে বহাল
হয়ে এল ড. জুলস সীগল। রোগা, খুব সুদর্শন, মার্জিত চালচলন, ডাক্তার হবার
পক্ষে বয়সটা যেন খুবই কম, অন্তত লুসির সেই রকম মনে হলো। ওর সাথে প্রথম
দেখা হলো একটা ঠেকায় পড়ে। লুসির হাতের কজির উপরে কি যেন একটা গোল
হয়ে ফুলে উঠেছে। কয়েকটা দিন তাই নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে কাটাবার পর, একদিন
সকালে হোটেলের ভিতর ডাক্তারের অফিসে এসে হাজির হলো লুসি। কোরাসের
দু'জন নাচিয়ে গাইয়ে মেয়েও অপেক্ষা করছে ওয়েটিং রুমে। নিজেদের মধ্যে গল্প
করছে তারা। সোনালি চুল, পীপ ফলের মত রূপ তাদের। এরকম চেহারা দেখলে
ঈর্ষা হয় লুসির। দেখতে যেন দেবীদের মত সুন্দরী। লুসি শুনল একজন আরেক
জনকে বলছে, 'সত্যি বলছি, আরেক ডোজ যদি দেয় আমাকে, আমি নাচা ছেড়ে
দেব।'

দরজা খুলে একজন মেয়েকে ড. জুলস যখন ডেকে নিলেন, লুসির ইচ্ছা হলো
চলে যায়। ড. সীগলের পরনে স্ল্যাকস আর বুক খোলা শার্ট রয়েছে। চোখে শিং-
এর তৈরি ফ্রেমের চশমা। তাতে শান্ত গভীর একটা ভাব ফুটে উঠেছে চেহারায়।
তবু দেখে মনে হচ্ছে, মানুষটার হাবভাবে কেমন যেন একটা ঘরোয়া ভঙ্গি, লুসি
মনে-প্রাণে সেকেনে, তাই ওরও বিশ্বাস, চিকিৎসকদের ভাব-ভঙ্গিতে ঘরোয়া ভাব
থাকতে নেই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন ডাক্তারের খাস কামরায় পৌঁছল, লোকটার ব্যবহারের
মধ্যে এমন একটা আশ্বাস টের পেল যে ভয়ভীতিগুলো সাথে সাথে দূর হয়ে গেল
মন থেকে। এখনও প্রায় কিছুই বলেনি ডাক্তার, অবশ্য আচরণের মধ্যে রুঢ় ভাবও
নেই। বেশ সময় নিয়ে ওকে দেখছে। লুসি জানতে চাইল, ফোনাটা কি ব্যাপার?
ধৈর্য ধরে বুঝিয়ে বলল ডাক্তার, ওটা খুবই সাধারণ একটা ব্যাপার। কোষ ফুলে
গেছে। এতে ক্যাসারের কোন ভয়ই নেই, সুতরাং দুশ্চিন্তা করবেন না। তারপর
মোটো একটা ডাক্তারী বই হাতে তুলে বলল, 'হাতটা একটু বাড়ান ভো দেখি।'

ভয়ে ভয়ে হাতটা বাড়াল লুসি। ওর দিকে তাকিয়ে এই প্রথম একটু হাসল
ডাক্তার। 'একটা অপারেশনের ফী থেকে নিজেকে বঞ্চিত করছি। এই বই দিয়ে
একটা বাড়ি দিলেই ওটা চ্যাপ্টা হয়ে চামড়ার সাথে সমান হয়ে যাবে। পরে আবার
গজাতে পারে, তা ঠিক। কিন্তু কাটাকুটি করতে গেলে, আপনার টাকাও খরচ
হবে, আবার ব্যাঙের বেঁধেও ঘুরে বেড়াতে হবে। কি করবেন, বলুন?'

এখন ওর দিকে ফিরে লুসিও হাসছে। যে কারণেই হোক, প্রবল বিশ্বাস জন্মে

গেছে তার ডাক্তারের উপর। বলল, 'বেশ।'

পর মুহূর্তেই চিৎকার করে উঠল লুসি। কারণ ডাক্তার সেই ভারী বইটা দিয়ে দুম করে ওর হাতে এক ঘা বসিয়ে দিয়েছে। ফলে সাথে সাথে ফোলা জায়গাটা প্রায় সমান হয়ে গেছে।

'খুব লাগল নাকি?' নিরীহ ভঙ্গিতে জানতে চাইল ডাক্তার।

'না,' মুখ ভার করে বলল লুসি।

ডাক্তার ওর কেসের হিন্দি লিখেছে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে লুসি। 'ব্যস হয়ে গেল?'

ডাক্তার মাথা দুলিয়ে জানাল, হ্যাঁ হয়ে গেল। ওর দিকে আর নজর দিল না সে। বিদায় নিয়ে চলে এল লুসি।

এক হপ্তা পর কফির দোকানে আবার দেখা। ডাক্তার এসে লুসির পাশে বসে জানতে চাইল, 'হাত কেমন আছে?'

'ভাল,' একটু হেসে বলল লুসি। 'আপনার পদ্ধতিটা বিচিত্র বটে, কিন্তু কাজ দেয়।'

একগাল হাসল ডাক্তার। 'আপনি ভাবতেও পারবেন না আমি কতটুকু নিজের নিয়মে চলি। আর আমিও জানতাম না আপনি এত ধনী মানুষ। ভেগাসের "সান" পত্রিকাতে হোটেলের মালিকানার ফর্দ বেরিয়েছে, তাতে দেখছি দশ পয়েন্ট রয়েছে আপনার। ওই ফোলাটাকে পুঁজি করে বেশ দু'পয়সা করে নিতে পারতাম।'

হঠাৎ হেগেনের সতর্কবাণীটা মনে পড়ে গেল লুসির। কোন উত্তর দিল না ও। আবার দাঁত বের করে হাসল ডাক্তার। 'কোন চিন্তা নেই,' অভয় দিয়ে বলল সে, 'আমি ব্যাপারটা বুঝি, আপনি স্বেচ্ছা একটা পুতুল। এই ধরনের পুতুলের কোন অভাব নেই লাস ভেগাসে। যাবেন নাকি আমার সাথে আজ রাতে একটা শো দেখতে? ডিনার খাওয়ার আপনাকে। তারপর ক্যাসিনোতে রুলেত খেলার "চিপস"ও কিনে দেব।'

ইতস্তত করছে লুসি। কিন্তু ডাক্তার জেদাজেদি করতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত লুসি বলল, 'যেতে তো আপত্তি নেই। কিন্তু রাতটা যে ভাবে শেষ হবে তা দেখে শেষে না আপনি হতাশ হন। আমি এখানকার আর সব মেয়ের মত যা তা করে বেড়াই না।'

'সেই জন্যেই তো সাথে চাইছি তোমাকে,' আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে বলল ডাক্তার। সম্বোধনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আপনজনের সুর ফুটে উঠল। 'আমি নিজের জন্যেও একরাত বিগামের প্রেসক্রিপশন লিখে রেখেছি কিনা।'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল লুসি। একটু অসহায় ভঙ্গি করে বলল, 'আমি কি অতটা চোখেপড়ার মত?'

মাথা ঝাঁকাল ডাক্তার।

লুসি বলল, 'বেশ। তাহলে সাপার খেতে যাব। কিন্তু রুলেতের চিপস আমি নিজেই কিনব।'

সাপার খেতে আর শো দেখতে গেল ওরা। জুলস ওকে খুব এক চোট হাসান ডাক্তারী পরিভাষায় মহিলাদের নগ্ন উরু আর বুকের বর্ণনা দিয়ে। তাই বলে

তাচ্ছিল্যের সাথে কিছু বলেনি, রসিকতার সাথেই বলল। পরে ওরা রুনেত খেলে একশো ডলারের কিছু বেশি জিতল। আরও পরে চাঁদের আলোয় গাড়ি নিয়ে বোল্ডার বাঁধে বেড়াতে এল। এখানে ডাক্তার একটু প্রেম করার চেষ্টা চালানল বটে, কিন্তু দুটো একটা চুমো খাওয়ার পর লুসি আপত্তি জানাতেই ক্ষান্ত হলো সে, বলল, আসলে এসব সে-ও চায় না। পরাজয়টা হাসি মুখেই মেনে নিল। মুখের ভাব অপরাধীর মত করে লুসি বলল, 'বলেই তো ছিলাম, ওসব আমার সাথে চলবে না।' 'আহা,' বলল জুলস, 'আমি একটু চেষ্টা না চালালে তুমিই তো অপমান বোধ করত।'।

হেসে ফেলল লুসি। ভাবছে, মিথ্যে বলেনি জুলস।

পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠল ওরা। তাকে ঠিক প্রেম বলে না, কারণ ওরা কখনও শরীর ঘাঁটাঘাঁটি করে না। আসলে জুলসকে কোন সুযোগই দেয় না লুসি। লক্ষ করে ডাক্তার একটু অবাক হয়, কিন্তু আর সব পুরুষের মত ক্ষুধা হয় না। তাতে ওর উপর লুসির আস্থা আরও বেড়ে গেল। আবিষ্কার করল বাইরে গুরুগম্ভীর পেশাদারী ডাক্তারী চেহারার আড়ালে তারি ফুটিবাজ বৈপরোয়া একটা মানুষ বাস করে। শনি আর রবিবার একটা রিকর্ডিশন করা এম-জি গাড়ি নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার মোটর রেসে যোগ দেয় সে। ছুটি নিয়ে মেক্সিকোর ভিতর দিকে চলে যায়। লুসিকে বলে, সে বড় বুনো জংলী জায়গা, একজোড়া জুতোর নোভে ওখানকার লোকেরা বিদেশীদের খুন পর্যন্ত করতে ছাড়ে না। হাজার বছর আগের আদিম জীবন যাত্রা এখনও চলছে ওখানে। দৈবাৎ লুসি জানতে পারল, জুলস একজন সার্জেন, এক সময় নিউ ইয়র্কের কোন একটা বিখ্যাত হাসপাতালের সাথে জড়িত ছিল সে।

এসব শুনে আরও আশ্চর্য হয় লুসি। ভাবে, তাহলে জুলস এই হোটেলে চাকরি নিয়েছে কেন? একদিন জিজ্ঞেস করায় বলল, 'তোমার গোপন কথা আমাকে বললে আমারটাও তোমাকে বলতে পারি।'।

লাল হয়ে উঠল লুসির মুখটা। প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল ও। জুলস আর কিছু বলল না। ওদের সম্পর্কটা আগের মতই রয়ে গেল। অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের সম্পর্ক। তার উপর লুসি যে কতটা নির্ভর করে নিজেও সে বোঝে না।

দশ

জুলসের সোনালি চুলভর্তি মাথা কোলে নিয়ে সুইমিং পুলের ধারে বসে রয়েছে লুসি। জুলসের উপর গম্ভীর স্নেহে অভিভূত হয়ে উঠেছে ওর মন। কামনায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ওর শরীর। নিজের অজ্ঞাতে জুলসের গলায় হাত বুলাচ্ছে। জুলস ঘুমাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে ওর, ভাবছে টের পাচ্ছে না কিছুই। গায়ের সাথে গায়ের ছোঁয়া লাগতেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ও। হঠাৎ ওর কোল থেকে মাথা তুলে উঠে দাঁড়াল জুলস, হাত ধরে দাঁড় করাল ওকে। ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে সিমেন্ট বাঁধানো পথের উপর নিয়ে এল ওকে। লক্ষ্মী মেয়ের মত ওর পিছন পিছন আসছে

ও। একটি কটেজে থাকে জুলস, ওর সাথে সেই কটেজে এল লুসি। ভিতরে ঢুকে দু'জনের জন্যে দুটো লম্বা গ্লাসে পানীয় ঢালল জুলস। বাইরের চোখ ঝলসানো রোদ আর নিজের যৌনকামনাময় বাসনার গায়ে পানীয়টুকু যেন আতুন জ্বলে দিল। মাথা ঘুরছে ওর। ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল জুলস, সাতারের পোশাক পরা প্রায় অনাবৃত শরীরের সাথে শরীর সংলগ্ন হলো। নিচু গলায় বলল লুসি, 'না। প্লীজ, না।' কিন্তু গলার সুরে তেমন জোর নেই, কান দিল না জুলস। ভাঁড়াতাড়ি ওর অন্তর্ভাস খুলে ফেলে ওর বুকে আদর করছে সে, সাতারের পোশাক ছাড়িয়ে ওর সারা শরীরে, সুভৌল উদরে, উরুতে চুমু খাচ্ছে। উঠে দাঁড়িয়ে এবার নিজের সুইম সুট ছেড়ে ওকে জড়িয়ে ধরল জুলস। তারপর মিলিত হলো ওরা। এতটুকু স্পর্শ লাগতে না লাগতেই লুসির শরীরে চরম মুহূর্ত উপস্থিত। পরমুহূর্তে জুলসের ভাব-ভঙ্গি থেকে বোঝা গেল, ভারি আশ্চর্য হয়ে গেছে সে। সনিকে পাবার পূর্ব মুহূর্তের সেই লজ্জা আর হীনম্মন্যতা আবার গ্রাস করল লুসিকে। কিন্তু জুলস ওর শরীরটাকে খাটের কিনারায় বিচিত্র কায়দায় ঘুলিয়ে নিয়ে আবার মিলন ঘটাল। ওকে অনেকক্ষণ ধরে চুমো খেলো জুলস। এবার নে-ও পরম ভৃগু পেয়েছে

শরীরের উপর থেকে জুলস নেমে যেতেই খাটের আরেক প্রান্তে সরে গিয়ে শরীরটাকে ছোট করে কাঁদছে লুসি। এ কি বিষম লজ্জা তার। পরমুহূর্তে চমকে উঠল। মৃদু শব্দে হাসছে জুলস। বলল, 'ওরে বোকা ইতালীয় মেয়ে, এইজন্যেই তাহলে এতদিন অস্বীকার করেছ আমাকে! হাঁদা কোথাকার!' সঙ্গেহে 'হাঁদা' ডাক শুনে ওর দিকে ফিরল লুসি। ওর নগ্ন শরীর জড়িয়ে ধরে জুলস বলল, 'শ্বেফ সেকেনে, একেবারে মধ্যযুগীয়।' ওর কণ্ঠস্বরে গভীর সান্ত্বনা রয়েছে, রয়েছে আশ্বাস, কাঁদতে কাঁদতে সেটা অনুভব করছে লুসি।

একটা সিগারেট ধরাল জুলস, সেটা লুসির ঠোঁটে গুঁজে দিল। ধোঁয়া খেয়ে কেশে উঠল লুসি, অগত্যা থামাতে হলো কান্নাটাকে। 'এবার আমার কথা শোনো,' বলল জুলস। 'তুমি যদি আরেকটু আধুনিক হতে, বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাদীক্ষা পেতে, তাহলে তোমার এই সমস্যা কোনকালে মিটে যেত। তোমার অসুবিধেটা কোথায়, বুঝিয়ে দিচ্ছি, শোনো। তুমি কুৎসিত, তোমার চামড়া কর্কশ কিংবা তোমার চোখ ট্যারা—এসব তোমার সমস্যা নয়। এসব ত্রুটি প্লাস্টিক সার্জারি দিয়েও সম্পূর্ণ সারানো যায় না। তোমার সমস্যাটা বরং খুতনিতে একটা আঁচিল অথবা মুখের কোথাও একটা জড়ুল থাকার মত। কিংবা কানের গঠনে ত্রুটি থাকার মত। এটা একটা খুদে যৌন সমস্যা। দৃষ্টিভ্রান্তি ছাড়া। যদি ভেবে থাকো তোমার নিতম্বের আকার বেশি বড় বলে কোন পুরুষ তোমার সাথে সঙ্গমে সুখ পায় না, তাহলে মস্ত ভুল করেছে। গঠনে খানিকটা দোষ যে নেই তা নয়, ডাক্তাররা যাকে বলে নিতম্বের নিচেকার ত্রুটি। সাধারণত সন্তান প্রসবের পর ওরকম হয়ে থাকে, এমনিতে হাড়ের আকৃতির দোষেও হয়। কত মেয়েরই তো অমন থাকে। মহা অসুখী অবস্থায় জীবন কাটায় তারা। অথচ সামান্য একটা অপারেশন করিয়ে নিলেই সব ল্যাঠা চুকে যায়। জানো তুমি, অনেকে এর জন্যে এমন কি আত্মহত্যা পর্যন্ত করে। কি বোকা! তোমার এমন আশ্চর্য সুন্দর গড়ন, অথচ তোমারও যে এই সমস্যা থাকতে পারে তা আমি ভাবতেও পারিনি। ভেবেছিলাম, মানসিক কোন

ব্যারাম বাধিয়ে বসে আছ। তোমার কাহিনী তো আমার জানা আছে—সনির সাথে সাপ্তাহিকভাবে জড়িয়ে ছিলে। তোমার মুখেও সে-গল্প অনেকবার শুনেছি। এখন যখন সমস্যাটা জানা গেছে, চিন্তার কিছুই নেই তোমার। একবার যদি তোমার শরীরটাকে ভাল করে পরীক্ষা করতে দাও আমাকে, কোথায় কতটা কি করার দরকার হবে তা আমি সাথে সাথে বলে দিতে পারব। এবার যাও, শাওয়ারটা সেরে ফেলো।’

শাওয়ার সেরে ফিরে এলো লুসি। আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না কোনমতে। রাজ্যের কুষ্ঠা, লজ্জা এসে জড়সড় করে ফেলছে ওকে। জুলস ওর দিকে এগিয়ে আসছে দেখে দ্রুত মাথা নাড়ল ও। বলল, ‘না।’

কিন্তু ওর কথায় কান দিল না ডাক্তার। তাই বলে ধমক-ধামক মেঝে আরও সন্তুষ্ট করে তুলল না ওকে। ধৈর্যের সাথে বোঝাল খানিকক্ষণ, তারপর ওর পা দুটো আলগা করে শুইয়ে দিল খাটের উপর। কামরায় একটা অতিরিক্ত ডাক্তারী ব্যাগ রয়েছে। খাটের পাশে রয়েছে কাঁচ দিয়ে ঘেরা ছোট একটা টেবিল, এটার উপরেও কিছু যন্ত্রপাতি দেখা যাচ্ছে। মুহূর্তে পেশাদার ডাক্তার বনে গেল জুলস। পরীক্ষা করছে লুসিকে। ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। ওদিকে লুসির অবস্থা ওরতর, লজ্জায় দম আটকে মারা যায় আর কি। টের পেয়ে ওর নাভির ওপর চুমু খেলো জুলস, আদর করে বলল, ‘কাজ করে এই প্রথম আনন্দ পেলাম আমিই।’ এরপর আবার পরীক্ষা করল লুসিকে, এবার ওকে উপড় করে শুইয়ে নিল। মল নিষ্কাশনের ফুটোটা পরীক্ষা করার সময় লুসির শরীরটা শিউরে শিউরে উঠছে। তাই দেখে রেগে কাঁই হয়ে গেল জুলস। খুব একচোট বকাবকি করেও যখন কাজ হলো না, তখন আবার সেই আগের পন্থায় ফিরে এলো সে, আদর করতে শুরু করল। সস্নেহে ওর গলায় হাত বুনিয়ে দিচ্ছে।

পরীক্ষা শেষ হতে লুসিকে আবার সোজা করে শুইয়ে দিল জুলস। ওর ঠোটে হালকা চুমু খেয়ে বলল, ‘সোনা মানিক, তুমি দেখো, তোমার এই শরীরটাকে একেবারে নতুন করে গড়ে দেব আমি। তারপর আবার পরীক্ষা করে দেখব—আমি নিজেই। এ-বিষয়ে এটা আমার এই প্রথম ডাক্তারী প্রচেষ্টা। ফলাফল যদি ভাল হয়, ডাক্তারী পত্রিকায় তথ্যবহুল একটা প্রবন্ধ লিখতে পারব।’

ইতিমধ্যে কুষ্ঠা আর লজ্জার কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই লুসির মধ্যে। এর জন্যে দায়ী জুলসের সরল সস্নেহ ব্যবহার। যা কিছু করল আর বলল তার মধ্যে পেশাদারী একটা কর্তব্যের ভাব ছিল, আন্তরিক ভালবাসা ছিল কিন্তু নোংরা কৌতূহল বা যৌন-বিকৃতির লক্ষণ ছিল না।

এখন জুলস শেলফ থেকে মোটা একটা বই নামিয়ে লুসির মত আরেকটা কেসের বিবৃতি পড়ে শোনাচ্ছে। এতে অপারেশনের কথাও লেখা রয়েছে। শুনতে শুনতে হঠাৎ আবিষ্কার করল লুসি, সে-ও ভীষণ কৌতূহলে আক্রান্ত হয়েছে।

‘শুধু বেটপ আকৃতি শুধরে নেয়ার জন্যে নয়,’ বলল জুলস, ‘স্বাস্থ্যের জন্যেও প্রয়োজন রয়েছে এটা। সময় থাকতে ক্রটিটা সারিয়ে না নিলে পরে তোমার শরীরের সমস্ত নিষ্কাশন ব্যবস্থায় গোলযোগ দেখা দিতে পারে। অপারেশন করে শুধরে নিতে যত দেরি করা হবে জায়গাটা ততই দুর্বল হয়ে পড়বে। দুঃখের কথা

কি জানো? এই ধরনের রোগের চিকিৎসা করা তো দূরের কথা, অনেক ডাক্তার সেকেন্দ্রে লজ্জা-শরমের জন্যে আসল গলদটা কোথায় তাই ধরতে পারে না। এই একই কারণে বেশির ভাগ মেয়েরাও মুখ ফুটে কিছু বলে না।

‘এবার তুমি থামবে?’ মুখটা লাল হয়ে আছে লুসির। ‘দোহাই লাগে, অন্য কিছু বলো তুমি।’

বুঝতে পারছে জুলস, নিজের বিধী বিকৃতির কথা ভেবে এখনও স্বাভাবিক হতে পারছে না লুসি। ডাক্তারী প্রশিক্ষণ পেয়েছে জুলস, তার কাছে ব্যাপারটা স্রেফ বোকামি বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু মনটা তার কোমল, বিরক্ত বোধ করলেও লুসির প্রতি আশ্চর্য্য একটা সহানুভূতি অনুভব করছে সে। আর এই সহানুভূতিটাই লুসির মন ভাল করে দেবার জন্যে সবচেয়ে বেশি দরকার এখন।

‘যাই হোক,’ হাসতে হাসতে বলল জুলস, ‘তোমার গোপন কথাটা জানা হয়ে গেছে আমার। ইচ্ছা হলে আমারটাও এখন শুনতে পারো তুমি।’

চুপ করে আছে লুসি, কিন্তু চোখ দুটো কৌতূহলে চিক চিক করছে।

‘তোমার মুখে তো একটা প্রশ্ন লেগেই আছে,’ বলল জুলস, ‘আমার মত কম বয়েসী একজন প্রতিভাবান ডাক্তার এই বাজ-পড়া শহরে কেন মরতে এসেছি?’ নিজের সম্পর্কে খবরের কাগজে প্রকাশিত কয়েকটা বিবৃতি নিয়ে ব্যঙ্গ করল জুলস। ‘তোমার কাছে কিছুই লুকাবার নেই আমার। শোনো তাহলে, আমি একজন গর্ভপাত বিশেষজ্ঞ। কাজটাকে তুমি খারাপ বলতে পারো না,’ একটু হাসল জুলস। ‘কিন্তু কপাল মন্দ, আমি ধরা পড়ে গেলাম। আমার এক বন্ধু আছে, সেও একজন ডাক্তার, নাম কেনেডি। হাসপাতালে একসাথে চাকরি করতাম আমরা। ঘনিষ্ঠ বন্ধু কিনা, আমার বিপদ দেখে কথা দিল, কোন না কোন ভাবে সাহায্য করবে আমাকে। যতদূর জানা আছে আমার, টম হেগেন তাকে বলেছিল, কর্লিয়নি পরিবার তার কাছে ঋণী, কখনও যদি কোন সাহায্যের দরকার হয়, সে যেন ওকে স্মরণ করে। সেই সূত্রেই টম হেগেনের সাথে আমার ব্যাপারে কথা বলল কেনেডি। এই ঘটনার পরই শুনলাম, আমার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ তুলে নেয়া হয়েছে। কিন্তু শুধু মেডিকেল এসোসিয়েশন আর পূর্বাঞ্চল কর্তৃপক্ষ আমার নামটা ব্ল্যাকলিস্ট থেকে বাতিল করল না। তার মানে, ওরা আমার খুব একটা উপকার করতে পারল না। তাই শেষ পর্যন্ত, কর্লিয়নি পরিবার এই চাকরিটা দিল আমাকে। খুব ভাল রোজগার করি আমি এখানে। শো-বিজনেসের এইসব বোকা মেয়েগুলো পা পিছলে ফ্যাসাদে পড়ে যায়—সময় মত আমার কাছে এলে ওদের গর্ভপাত ঘটাতে একটুও বেগ পেতে হয় না আমার। চেষ্টা একেবারে কিউরেট করে দিই সব। তুমি জানো, ওই ফ্রেডি কর্লিয়নিটি কি রকম সাংঘাতিক? আমি এখানে আসার পর গোটা পনেরো মেয়েকে বিপদে ফেলেছে ও। তার আগে কি করেছে না করেছে বুঝে নাও। ভাবছি, ওর সাথে একদিন কথা বলতে হবে আমাকে। কিছু জ্ঞান দেব, যা বাপের কালেও শোনেনি ও। ভাবতে পারো, তিনবার গনোরিয়া আর একবার সিফিলিস বাধিয়ে আমার কাছে এসেছে চিকিৎসার জন্যে? এমন লম্পট ছোকরা দ্বিতীয়টি দেখিনি আমি।’

থামল জুলস। ইচ্ছা করেই গোপন সব কথা ফাঁস করে দিচ্ছে ও। অথচ কারও

ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কথা বলা অভ্যাস নয় ওর। কারও দুর্বলতা প্রকাশ করে দেয়াটাকে এক ধরনের অপরাধ বলেই মনে করে ও। কিন্তু লুসির মনটাকে হালকা করার জন্যে এই ছোট্ট অপরাধটা করতে হলো ওকে। ওর ইচ্ছা, লুসিও জানুক যে অন্যদেরও এমন কি ফ্রেডি কর্লিয়নির মত লোক, যাদেরকে লুসি শ্রদ্ধা আর ভয় করে, তাদেরও অনেক গোপন, লজ্জাকর ব্যাপার থাকে।

‘মনে করো তোমার শরীরের একটুকরো ইলাস্টিক ঢিলে হয়ে গেছে,’ বলল জুলস, ‘ওটার খানিকটা কেটে বাদ দিলেই আঁটো হয়ে যাবে আবার।’

‘ঠিক আছে, কি করব না করব ভেবে দেখা যাবে পরে,’ বলল লুসি। অপারেশন করাবেই, মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ও। ওর মনে জুলস সম্পর্কে অগাধ বিশ্বাস জন্মে গেছে। কিন্তু হঠাৎ আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল ওর। জানতে চাইল, ‘কি রকম খরচ পড়বে?’

‘এ-ধরনের অপারেশন করার মত যন্ত্রপাতি তো এখানে নেই,’ ভুরু কঁচকে, চিন্তিতভাবে বলল জুলস, ‘তাছাড়া এ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞও নই আমি। তবে আমার এক বন্ধু আছে লস এঞ্জেলসে, ঠিক এই বিষয়েই একজন বিশেষজ্ঞ সে। ওখানকার সবচেয়ে ভাল হাসপাতালে ভর্তিও করে দিতে পারবে তোমাকে। সমস্ত চিত্রতারকাদের শরীর ওই তো আঁটসাঁট করে দেয়। মুখের আর বুকের চামড়া টেনে তুলে সেলাই করিয়ে নৈবার পরও এই সব মহিলারা যখন দেখেন যে পুরুষরা তাদেরকে যথেষ্ট ভালবাসছে না তখন তারা আমার ওই বন্ধুর কাছে আসে। অপারেশনে দারুণ হাত তার, সমস্ত ক্রটি-বিচ্যুতি একেবারে নিখুঁতভাবে সারিয়ে দেয়। কোন একটা ব্যাপারে আমার কাছে একটু ঋণী ও... তোমার কাছে স্বীকার করতে আপত্তি নেই, ওর গর্ভপাতের কেসগুলো আমিই করে দিই। দেখো, লুসি, নীতির বাধা না থাকলে তোমাকে এমন বেশ কয়েকজন চিত্র-সম্রাজ্ঞীর কথা এই মুহূর্তে বলতে পারতাম যারা এই অপারেশন করিয়েছে।’

‘আমাকে তুমি অনায়াসে বলতে পারো,’ মেয়েলি কৌতূহলে চিকচিক করে, উঠল লুসির চোখ দুটো। ‘আমি কি আর কাউকে বলতে যাচ্ছি।’ জুলসের সামনে একটু না হয় পরচর্চা করা যেতে পারে, ভাবছে লুসি, তাই নিয়ে ও তো আর ব্যঙ্গ করবে না।

‘বলতে পারি,’ মৃদু হেসে বলল জুলস, ‘একশর্তে
‘কি শর্ত?’

‘ডিনার খেয়ে আজ রাতটা আমার সাথে কাটাবে তুমি,’ বলল জুলস। ‘তোমার বোকামির জন্যে অনেকদিন ধরে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। অনেক দুঃখ আর ক্ষোভ জমা হয়ে আছে তোমার শরীর আর মনে, সেগুলো পূরণ হওয়া দরকার।’ এমন আশ্চর্য সহানুভূতি আর আন্তরিকতার সাথে কথাগুলো বলল জুলস যে নিমেষে অভিভূত হয়ে পড়ল লুসি।

একটা ঢোক গিলল লুসি, কোনমতে বলল, ‘অনেক দোষ-ক্রটি আছে আমার, তুমি মোটেও আনন্দ পাবে না।’

‘কি বোকা মেয়ে রে বাবা!’ হেসে ফেলল জুলস। ‘প্রেম করার যে আরও কত উপায় আছে তাও জানো না তুমি? আরও প্রাচীন, কিন্তু আরও সভ্য?’

‘ও,’ বুঝতে পারার ভঙ্গিতে ছোট করে মাথা নেড়ে চোখ নামান লুসি, ‘ওটার কথা বলছি তুমি।’

‘হ্যাঁ,’ লুসির কণ্ঠস্বর নকল করে ভেঙচাল জুলস, ‘ওটার কথা বলছি আমি। আজকাল ভাল মেয়েরা ওটা করে না, তেজী ঘোড়ার মত পুরুষরাও ওটা পছন্দ করে না—এমন একটা আশ্চর্য পদ্ধতি, যার সমস্ত দিকই ভাল আর বিজ্ঞান-সম্মত, অথচ এই উনিশশো আটচল্লিশ সালেও এর প্রচলন নেই বললেই চলে। কিন্তু আমি এই লাস ভেগাসেরই এক খুড়খুড়ে বুড়ির কাছে নিয়ে যেতে পারি তোমাকে, একসময় এখানকার সবচেয়ে বিখ্যাত বেশ্যা বাড়ির সবচেয়ে কমবয়েসী মাসী ছিল সে, ওয়াইল্ড ওয়েস্টের সেই উন্মাদ যুগে, সম্ভবত আঠারোশো আশি সালের দিকে। সে-যুগের গল্প বলতে ভালবাসে বুড়ি। তার গল্প শুনে বিস্ময়ে মাথা ঘুরে যাবে তোমার জানো, আমাকে কি বলেছে সে? পৌরুষের প্রতীক, আগ্নেয়াস্ত্রধারী, দুঃসাহসী সেই যুগের পুরুষেরা, যাদেরকে “কাউ বয়” বলি আমরা, তারাও নাকি বেশ্যা পাড়ায় এসে মেয়েদের কাছে এই “ফ্লেক” পদ্ধতির জন্যে অনুরোধ করত। ডাক্তাররা এটাকে “ফেলাশিও” বলে। তোমার প্রিয় সনির সাথে এসব হয়েছে কখনও?’

এই প্রথম জুলসকে বিস্মিত করল লুসি। হঠাৎ হাসল সে, তাই দেখে সর্বশরীর শিহরিত হলো জুলসের। বিদ্যুৎচমকের মত আবিষ্কার এবং উপলব্ধি করল জুলস, হাসিটা হুবহু মোনালিসার ছবির মত। সাথে সাথে জুলসের বিজ্ঞান-সচেতন মন অন্য ঋতে বইতে শুরু করল—মোনালিসার হাসির এই কি তবে রহস্য? তবে কি শতাব্দিক বছরের রহস্য উদঘাটিত হলো আজ?

‘সনির সাথে?’ মৃদু, চাপা গলায় বলল লুসি, ‘সনির সাথে সব করেছি আমি।’ এমন খোলাখুলিভাবে এই প্রথম কারও কাছে কথাটা স্বীকার করল সে।

দুই হণ্ডা পরের ঘটনা।

লুসির অপারেশন হচ্ছে। ডাক্তার জুলস সীগল উপস্থিত রয়েছে অপারেশন থিয়েটারে। অপারেশন করছেন তার বন্ধু ডাক্তার কেলনার।

ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করার আগে লুসির কানে কানে বলল জুলস, ‘ডাক্তার তোমার চারদিকটা খুব ভাল করে এঁটে দেবে। তুমি আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বান্ধবী, সে কথা ওকে বলেছি কিনা।’ তবে, এরই মধ্যে ঘুম পাড়াবার প্রাথমিক ওষুধ খেয়ে তন্দ্রামত এসে গেছে লুসির, তাই হাসতে পারছে না সে। কিন্তু রসিকতাটায় ভাল কাজ হলো, অপারেশনের ভয় বেশ একটু কমে গেল তার।

নিতম্বের ঝুল কমানোকে ডাক্তারী ভাষায় বলা হয় “পেরিন কোরাফি” আর যোনির দেয়াল সেলাই করাকে বলা হয় “কল্লোরাফি”। ডাক্তার কেলনার আত্মপ্রত্যয়ের সাথে ছুরি বসাল। পেশীর ঝুল কমিয়ে যোনি-মুখ সামনের দিকে সরিয়ে আনা, এই দুটো কাজ করতে হয় ডাক্তারকে নিতম্বের তলদেশে শক্ত করার জন্যে। এতে উপর থেকে বেশি চাপ পড়ার সম্ভাবনা থাকে না।

লক্ষ করল জুলস, খুব সাবধানে কাজ করছে এখন ডাক্তার। ছুরি চালানোর ঝুঁকিটা হলো, একটু বেশি কাটা হয়ে গেলেই মলদ্বার পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তবে, কেসটা একটুও জটিল নয়। এক্সরে প্লেট আর অন্যান্য পরীক্ষার ফলাফল দেখেছে

জুলস। কোন বিপদ হবার কথা নয়। কিন্তু, সেই সাথে এ-কথাও সত্যি যে কাটাছেড়ার ব্যাপারে সব সময়ই আশঙ্কা থাকে। জোর করে কিছুই বলা যায় না।

ডায়াফ্রাম স্লিং-এর উপর কাজ করছে এখন কেলনার। যোনির খোপ ধরা রয়েছে টি-ফর্সেপের সাহায্যে, তাতে পেশী “অ্যানি” আর “ফ্যাসি” পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এই পেশী দুটোই যোনির খোপ হিসেবে চিহ্নিত। গজ দিয়ে মোড়া ডাক্তার কেলনারের আঙুলগুলো মধ্যবর্তী সংযোগ রক্ষাকারী টিলা টিসুগুলো একপাশে সরিয়ে দিচ্ছে। যোনির দেয়ালের উপর চোখ রয়েছে ডাক্তার জুলসের, ওখানে কোন শিরা দেখা গেলেই বুঝতে হবে মলদ্বার আহত, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে নিজের কাজে সাংঘাতিক দক্ষ ডাক্তার কেলনার, কাজে কোথাও এতটুকু খুঁত নেই তার। নিপুণ দক্ষতার সাথে ছুতোর যেভাবে পেরেক দিয়ে কাঠ জোড়া দেয় ঠিক সেভাবে লুসির শরীরে নতুন অংশ জুড়ে দিচ্ছে সে।

যোনির দেয়ালের বাইরে সমস্ত বাড়তি অংশ ছেঁটে ফেলে দিচ্ছে কেলনার। কেটে বাদ দেয়া জায়গাটুকু সেলাই করে এমনভাবে জোড়া লাগিয়ে দিচ্ছে পরে যাতে সেখানে খোঁচখাঁচ না গজাতে পারে। যোনির মুখ এখন ছোট হয়ে গেছে। প্রথমে সেটার ভিতরে তিনটে আঙুল ঢোকাবার চেষ্টা চালান কেলনার। কিন্তু পারল না। এরপর দুটো আঙুল ঢোকাবার চেষ্টা করল সে। আঙুল দুটো কোন মতে ঢুকল ভিতরে। অন্দরমহলটা ভাল করে একবার নেড়েচেড়ে দেখে নিল সে। তারপর মুহূর্তের জন্যে জুলসের দিকে একবার তাকাল, গজ দিয়ে তৈরি মুখোশের উপর নেচে উঠল উজ্জ্বল নীল চোখ দুটো, যেন জুলসের মতামত চাইছে, গর্তটা যথেষ্ট সরু হলো কিনা। পর মুহূর্তে আবার নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।

নির্বিয়ে শেষ হলো কাজটা। টুলি করে নিয়ে যাওয়া হলো লুসিকে রিকভারি রুমে, এখন থেকে ওখানেই থাকবে সে, যতদিন না সুস্থ হয়ে ওঠে। ডাক্তার কেলনারের সাথে কথা বলছে জুলস। ডাক্তারকে মহা খুশি দেখে বুঝতে পারছে সে, অপারেশন সফল হয়েছে, কোথাও কোন গোলমাল নেই। জুলসকে বলল সে, ‘কোন দুশ্চিন্তা নেই। পানির মত সহজ কেস, ভেতরেও কিছু গজাচ্ছে না। শরীরের বাঁধুনিটা চমৎকার, এ-ধরনের কেসে সাধারণত যা দেখা যায় না।’ মূচকি হাসল কেলনার। ‘ফুর্তি করার এখন আর কোন অসুবিধেই রইল না—বুঝলে, তোমার ভাগ্যকে ঈর্ষা করি আমি। তবে কয়েকটা দিন ধৈর্য ধরতে হবে। কিন্তু, দেখো, শেষ পর্যন্ত আমার কাজের প্রশংসা না করে পারবে না তুমি।’

‘তুমি একটা পিগমেলিয়ান ডাক্তার,’ সহাস্যে বলল জুলস। ‘সত্যি জাদু জানো তুমি।’

‘এ আবার একটা কাজ নাকি?’ গম্ভীরভাবে বলল ডাক্তার কেলনার। ‘তোমার গর্ভপাতের কেসগুলো যেমন, এটাও সেরকম—পানির মত সহজ ব্যাপার।’ একটু থেমে আরও গম্ভীর হলো ডাক্তার। ‘সমাজটা যদি আরেকটু আধুনিক হত, এখানের লোক-জনের যদি আরেকটু বাস্তব-বুদ্ধি থাকত, হাতুড়েদের জন্যে এসব কাজ ছেড়ে দিয়ে তুমি আর আমি সত্যিকার গুরুত্বপূর্ণ কাজে মন দিতে পারতাম।’ কাঁধ ঝাঁকাল সে। ‘ওহে শোনো, মনে পড়ে গেছে কথাটা, আগামী হুণ্ডায় আমার একটা কাজ করে দিতে হবে তোমাকে। একটা মেয়ে পাঠাব। খুব ভাল একটা মেয়ে। জানোই

তো, ভাল মেয়েগুলোই শুধু বিপদে পড়ে। ওর সমস্যাটা মিটিয়ে দিলেই আজকের ব্যাপারটা শোধবোধ, কেমন?’

‘ঠিক আছে,’ ডাক্তার কেলনারের সাথে হ্যাণ্ডশেক করে জুলস বলল, ‘অসংখ্য ধন্যবাদ, ডাক্তার। কতবার তো বললাম, কই, এলে তো না আমাদের ওখানে বেড়াতে। একবার এসো না। আসবে? জুয়া খেলা থেকে শুরু করে সব কিছু ফ্রি তোমার জন্যে--আপ্যায়নের কোন ক্রটি রাখব না।’

ঠোট বাঁকা করে হাসল ডাক্তার কেলনার। ‘জুয়া তো আমি রোজ খেলি। কিন্তু সে জুয়া খেলতে তোমাদের রুলেভ সার্কেল আর ক্রাপ টেবিলের দরকার হয় না। ও-ধরনের জুয়া না খেলেও ভাগ্যের সাথে মাথা ঠোকাঠুকি কম করতে হয় না আমাকে। একটা কথা, জুলস। তুমি ওখানে আসলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছ। আরও দু’একটা বছর গেলে সত্যিকার সার্জারি কাকে বলে তাই ভুলে যাবে তুমি।’ কথা শেষ করেই বাঁক নিল ডাক্তার, জুলসের জবাব শোনার জন্যে অপেক্ষা পর্যন্ত করল না।

ডাক্তার কেলনারের কথায় অভিযোগ নেই, জানে জুলস। সে শুধু তার শুভানুধ্যায়ী হিসেবে তাকে সাবধান করে দেবার জন্যে কথাগুলো বলল। তাসত্রেও, সাজাতিক খারাপ হয়ে গেল মনটা। কমপক্ষে আরও বারো ঘণ্টা পর রিকভারি রুম থেকে বেরুবে নুসি। অগত্যা গোটা সন্ধ্যাটা হৈচৈ করে কাটাল সে। প্রচুর মদও খেলো। এর কারণ নৈরাশ্য নয়, আনন্দ। নুসির অপারেশনটা ভালয় ভালয় চুকে গেছে বলে ভীষণ খুশি হয়েছে ডাক্তার জুলস।

পরদিন। সকাল।

নুসিকে হাসপাতালে দেখতে এসে আশ্চর্য হয়ে গেল জুলস। ফুলে ফুলে ভরে আছে কেবিনটা। নুসির বেডের কিনারায় বসে রয়েছে দু’জন লোক। নুসিও বালিশে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে, উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ।

জুলস জানে, বাড়ির লোকদের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে নুসির। তাকে জানিয়েছিল ও, তাদেরকে কোন খবর দেবার দরকার নেই। তবে খুব যদি বিপদ দেখা দেয়, শেষ মুহূর্তে খবর তো দিতেই হবে। যাই হোক, বাড়াবাড়ি কিছু ঘটেনি, তাই নুসির বাড়িতেও খবর দেয়া হয়নি। জানার মধ্যে জানে শুধু ফ্রেডি কর্নিয়নি তাকে বলা হয়েছে, ছোট্ট একটা অপারেশনের জন্যে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে নুসি। ফ্রেডিকেও বলা হত না, যদি না ওদের দু’জনেরই ছুটির দরকার হত। কথাটা শুনে ফ্রেডি জানিয়েছে, অপারেশনের যাবতীয় খরচ হোটেলের তহবিল থেকেই মিটিয়ে দেয়া হবে

লোক দু’জনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল নুসি। সাথে সাথে একজনকে চিনতে পারল জুলস। লোকটা হলো সেই বিখ্যাত গাইয়ে, ইদানীং যে অভিনয় করে খুব নাম করেছে। জনি ফন্টেন। তার সাথে লোকটা প্রকাণ্ডদেহী, ভোঁতা চেহারার একজন ইতালীয়। নাম নিনো ভ্যালেন্টি। পরিচয় করিয়ে দেবার সময় ওরা দু’জনেই জুলসের করমর্দন করল, কিন্তু পরমুহূর্ত থেকে ওরা আর তার দিকে ফিরেও তাকাল না। নুসির সাথে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করছে ওরা। নিউ ইয়র্কে ফেলে

আসা পুরানো দিনের গল্প করছে। অজানা-অচেনা ঘটনা আর লোকজন সম্পর্কে কথা বলছে, যার সাথে কোন সম্পর্ক নেই জুলসের।

‘পরে আসব আমি,’ লুসিকে বলল জুলস। ‘ডাক্তার কেলনারের সাথে দেখা করার কাজটা সেরে ফেলি আগে।’

এতক্ষণে ওর দিকে নজর দিল জনি ফন্টেন। তার আচরণে মাধুর্য ফুটে উঠল ‘এই যে, ভাই, একটু থামুন। পালাবার সময় হয়ে গেছে আমাদের, আপনিই এখন সঙ্গ দেবেন লুসিকে। একটা কথা, বড় আদরের আর পুরানো সাথী ও আমাদের, ওর যত্ন নিতে যেন ভুল করবেন না, ডাক্তার।’

জনি ফন্টেনের কণ্ঠস্বরটা কেমন যেন কর্কশ, কানে বাজল জুলসের। গলা ভেঙে গেলে যেমন হয়, অনেকটা সেই রকম। পরমুহূর্তে মনে পড়ে গেল, প্রকাশ্যে এক বছরের উপর গান গায়নি লোকটা। এই বয়সে তবে কি গলা ভেঙেছে লোকটার? কিন্তু তা যদি হয়, খবরের কাগজে ব্যাপারটা নিয়ে লেখালেখি হয়নি কেন? তারা চেপে গেছে? সবাই চেপে গেছে? মনটা খুঁতখুঁত করছে জুলসের। ওর মধ্যে কৌতূহলী একটা স্বভাব আছে, কোথাও কোন ক্রটি-বিচ্যুতি দেখলেই কারণ অনুসন্ধানের জন্যে হন্যে হয়ে ওঠে। কান পেতে আছে ও, জনির গলার আওয়াজ গভীর মনোযোগের সাথে শুনছে। আশা, ক্রটিটা যদি ধরতে পারে। মনে পড়ছে, গান গেয়ে নয়, অভিনয় করে অস্কার পেয়েছে লোকটা। অথচ গানের জন্যে পুরস্কারটা পেলে বেশি মানাত। অতিরিক্ত পরিণামের দরুন গলার এই অবস্থা হতে পারে, ভাবছে জুলস। অথবা প্রচুর ধূমপান আর ধূমসে মদ গিললে এমন করুণ অবস্থা হওয়া বিচিত্র নয়। আবার মেয়েমানুষের শরীর নিয়ে খুব বেশি ঘাঁটাঘাঁটিও এর কারণ হতে পারে। গলাটা বসে গেছে, কেমন যেন বিগ্নী একটা কণ্ঠস্বর—আর যাই হোক, লোকটাকে এখন আর কেউ মধুর গাইয়ে বলবে না।

‘কিছু যদি মনে না করেন,’ মদু কণ্ঠে বলল জুলস, ‘আপনার কি সর্দি লেগেছে?’

ভদ্রতার সাথেই জবাব দিল ফন্টেন, ‘সর্দি? আরে না। স্নেফ অতিরিক্ত খাটাখাটনির ফল, কাল রাতে গাইবার চেষ্টা করেছিলাম কিনা। কি জানেন, গলাটা যে আমার বদলে গেছে তা আমি কোনমতে মেনে নিতে পারছি না। বুড়ো হচ্ছি, গলা তো বদলাবেই।’ কিছুতেই কিছু এসে যায় না, এই রকম একটা ভঙ্গি করে নিঃশব্দে হাসল জনি

‘ডাক্তার দেখিয়েছেন?’ হালকা সুরে জানতে চাইল জুলস। ‘আপনি যা ভাবছেন তা হয়তো নয়, হয়তো সামান্য একটু অসুখ, সারানো যায়।’

জুলসের সাথে এবার আর মিষ্টি ব্যবহার করল না জনি ফন্টেন। ঠাণ্ডা চোখে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে বলল সে, ‘গলাটা যখন ভাঙে, আজ থেকে দু’বছর আগে, সবচেয়ে আগে তাই করেছিলাম, কয়েকজন ডাক্তারকেই দেখিয়েছিলাম। তারা সবাই দেশের সেরা ডাক্তার, হাতুড়ে নয়। আমার ব্যক্তিগত ডাক্তারকেও তো সবাই শ্রেষ্ঠ একজন বিশেষজ্ঞ বলে মনে করে। তারা সবাই একবাক্যে জানিয়েছে, বিশ্রাম নিতে হবে। এর জন্যে বয়স দায়ী। বয়স হলে মানুষের কণ্ঠস্বর তো বদলাবেই।’

কথা শেষ করে মুখ ফিরিয়ে নিল জনি, দ্বিতীয়বার আর ফিরেও তাকাল না

জুলসের দিকে। লুসির দিকে তাকিয়ে ঠাট্টা মস্করায় মেতে উঠল সে, সব মেয়ের সাথেই যেমন করে। অনর্গল কথা বলছে, আর তার কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনেছে জুলস। ভাবছে লোকটার স্বরতন্ত্রীতে নিশ্চয়ই কিছু একটা গজিয়েছে, তা না হয়েই যায় না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বিশেষজ্ঞরা সেটা ধরতে পারেনি কেন? একটা আশঙ্কা দেখা দিল জুলসের মনে—যা গজিয়েছে সেটা কি তবে ম্যালিগন্যান্ট? অপারেশনের বাইরে? তা যদি হয়ও, তারও তো আরেক ধরনের চিকিৎসা আছে।

লুসির সাথে কথা বলতে মগ্ন হয়ে আছে জনি ফন্টেন, তাকে বাধা দিয়ে বলল জুলস, ‘আপনার গলা শেষবার কবে পরীক্ষা করিয়েছেন?’

চেহারা দেখেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, জুলসের উপর মহা বিরক্ত হয়েছেন জনি। কিন্তু লুসির বন্ধু জুলস, তাই ভদ্রতা বজায় না রেখেও পারছে না। ঠাণ্ডা গলায় বলল, ‘মাস আঠারো আগে।’

‘আপনার ব্যক্তিগত ডাক্তারকে দিয়ে মাঝে মধ্যে পরীক্ষা করান না?’ জানতে চাইল জুলস। সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নয় সে।

এবার কণ্ঠস্বরে অসন্তোষ প্রকাশ পেল জনি ফন্টেনের। একটু ব্যঙ্গের সুরে বলল সে, ‘করাই বৈকি। প্রত্যেকবার কোডিন স্প্র লাগিয়ে ভাগিয়ে দেন। কোন প্রশ্ন করলে বলেন, আগেই তো জানিয়েছি, স্বরযন্ত্রটার বয়স বাড়ছে। তাছাড়া, অতিরিক্ত মদ, সিগারেট এসব তো আছেই।’ জুলসের দিকে তীব্র দৃষ্টি হানল জনি। ‘আপনি বোধহয় আরও ভাল একজন ডাক্তার, তারচেয়েও বেশি বোঝেন?’

‘তার নামটা জানতে পারি?’ খোঁচাটা গায়ে না মেখে প্রশ্ন করল জুলস।

‘টাকার,’ গর্বের সুরে বলল জনি, ‘ড. জেমস টাকার। তাঁর সম্পর্কে কি ধারণা আপনার?’

টাকার নামটা পরিচিত জুলসের। যতসব নামকরা ফিল্ম স্টারদের চিকিৎসা করে, তাছাড়া বিখ্যাত একটা স্যানাটোরিয়ামের সাথে জড়িত। এক গান হাসল জুলস, বলল, ‘খুব সাজগোজ করেন ভদ্রলোক।’

‘কি বলতে চান আপনি?’ এবার সত্যি সত্যি খেপে গেছে জনি। ‘আপনি কি নিজেকে তাঁর চেয়ে বড় ডাক্তার বলে মনে করেন?’

হেসে ফেলল পাণ্টা প্রশ্ন করল জুলস, ‘আপনি কি নিজেকে কারমেন লম্বার্ডের চেয়ে বড় গাইয়ে বলে মনে করেন?’

জুলসের প্রশ্ন শুনে হো হো করে হেসে উঠে চেয়ারে মাথা ঠুকতে শুরু করল নিনো ভ্যালেন্টি, তাই দেখে জুলস তো অবাক। সে ভাবছে, রসিকতা এমন কিছু ভাল হয়নি। নিনো ভ্যালেন্টির অট্টহাসির সাথে মদের গন্ধ বেরিয়ে আসছে, নাকে ধাক্কা লাগতেই জুলস বুঝল, যে-ই হোক না কেন, এই সাত সকালেই নেশায় প্রায় আধা-বেইশ হয়ে আছে লোকটা।

‘এই ব্যাটা,’ বন্ধুর দিকে ফিরে হাসছে জনি ফন্টেন। ‘তুই তো আমার রসিকতা শুনে হাসবি, ওরটা শুনে হাসছিস কি মনে করে?’

হাত বাড়িয়ে ইতিমধ্যে বেডের কাছে জুলসকে টেনে নিয়ে এসেছে লুসি।

জনি আর নিনোকে বলছে সে, ‘দেখতে ডাক্তার যাই হোক, হয়তো আনাড়ি বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু বিশ্বাস করো, ও কিন্তু প্রতিভাবান একজন সার্জেন। বাজে

কথা বলার লোক নয়। যদি দাবি করে যে ডাক্তার টাকার চেয়ে ভাল ও, তাহলে নিশ্চয়ই সেটাই সত্যি কথা, এর মধ্যে বড়াই থাকতে পারে না।’ জনির দিকে আবেদনের দৃষ্টিতে তাকান ও। ‘জুলসের কথা একবার শুনেই দেখো না। ও হয়তো তোমার গলার ঝুটিটা সারিয়ে দিতে পারবে, জনি।’

এই সময় কেবিনে একজন নার্স ঢুকে ওদেরকে জানান, লুসিকে দেখার জন্যে আবাসিক ডাক্তার আসবেন, এবার সবাইকে চলে যেতে হয়। একটা কাণ্ড লক্ষ করে বেদম হাসি পেল জুলসের। জনি ফন্টেন আর নিনো ভ্যালেন্টি চুমো খাচ্ছে লুসিকে, কিন্তু লুসি ঠিক সময় মত এমন ভাবে মুখটা ঘুরিয়ে নিল, যাতে চুমোগুলো গালে লাগে, ঠোটে নয়। অবশ্য, দেখে মনে হলো লুসির কাছ থেকে তাই আশা করেছিল তারা। তবে, জুলসকে কিন্তু ঠোটেই চুমো খেতে দিল লুসি। ‘বিকেলে কিন্তু আবার আমাকে দেখতে আসতে হবে,’ ফিসফিস করে জুলসের কানে কানে বলল সে, ‘মনে থাকবে তো?’

মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হলো জুলস।

বাইরের করিডরে বেরিয়ে এল ওরা তিনজন।

‘কি অপারেশন হয়েছে ওর?’ জানতে চাইল নিনো ভ্যালেন্টি। ‘জটিল কোন ব্যাপার নাকি, ডাক্তার?’

এদিক ওদিকে মাথা নাড়ল জুলস। ‘মেয়েলি ব্যাপার। জটিল কিছু নয়, নিতান্ত সাধারণ একটা অপারেশন। এ-বিষয়ে আপনাদের চেয়ে আমার দূভাবনা বেশি। আশা করছি, লুসিকে আমি বিয়ে করব।’

জুলস লক্ষ করল, জনি ফন্টেন আর নিনো ভ্যালেন্টির চোখে সংশয় ফুটে উঠল। ‘লুসি হাসপাতালে তা আপনারা জানলেন কিভাবে?’

‘টেলিফোন করে ফ্রেডি জানিয়েছে আমাদেরকে,’ বলল জনি। ‘ছোটবেলায় আমরা সবাই এক পাড়াতেই বড় হয়েছি কিনা। ফ্রেডির বোন কনির বিয়েতে নীত-কনে হয়েছিল লুসি।’

‘তাই নাকি!’ বলল জুলস। এসব তথ্য যে নতুন নয় ওর কাছে তা আর প্রকাশ করল না। ভাবছে, লুসির সাথে সনির সম্পর্কটা ওরাও হয়তো তার কাছে গোপন করতে চাইছে।

করিডর ধরে হাঁটছে ওরা। ‘এই হাসপাতালে একজন ভিজিটিং ডাক্তারের সুবিধে ভোগ করি আমি,’ জনি ফন্টেনকে বলল জুলস, ‘কিছু যদি মনে না করেন, আপনার গলাটা একবার পরীক্ষা করতে দেবেন আমাকে?’

দ্রুত এদিক ওদিক মাথা নাড়ল জনি। বলল, ‘মাফ করবেন, আজ আমার সময় হবে না।’

‘ওটা কি সস্তা কোন লোকের গলা? ওই গলার দাম লক্ষকোটি টাকা। দেখাতে যদি হয়ই, আজো একজন ডাক্তারকে দেখাবে কেন?’ বলল নিনো ভ্যালেন্টি। হাসছে সে। তার ওই হাসি দেখেই বুঝে নিল জুলস, লোকটা তার দলে, তাকেই সমর্থন করছে।

‘ডাক্তার হিসেবে আমি কিন্তু আজো নই,’ সহাস্যে বলল জুলস। ‘পূব-তীরে আমিই তো একমাত্র প্রতিভাবান সার্জন ছিলাম। একটা গর্ভপাতের কেসে

ধরা পড়ে গিয়েই না আজ আমার এই দশা।’

যেমনটি আশা করেছিল জুলস, ঠিক তাই ঘটল। ওর কথার মূল্য দিল জনি ফটেন আর নিনো ভ্যালেন্টি। নিজের অপরাধ সাধারণত কেউ স্বীকার করে না। ও করেছে দৈখে ওর সম্পর্কে ওদের ধারণা পাল্টে গেল মুহূর্তে। দ্রুত নিজেকে সামলে নিল প্রথমে নিনো ভ্যালেন্টি।

‘আপনার চিকিৎসা জনি যদি না চায়,’ বলল নিনো, ‘তাতে আপনার মন খারাপ করার কিছু নেই। আমার এক বান্ধবী আছে, আপনি তাকে একবার দেখুন। তবে,’ নাটকীয়ভাবে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে তারপর বলল নিনো, ‘গলার দিকটা নয়।’

‘পরীক্ষা করতে কতক্ষণ সময় নেবেন আপনি?’ ভয়ে ভয়ে জ্ঞানতে চাইল জনি ফটেন।

‘মিনিট দশেক,’ মিথ্যে কথা বলল জুলস। এ-ধরনের মিথ্যে কথা হর-হামেশা বলে থাকে ও। ওর বিশ্বাস, ডাক্তারী পেশার সাথে সত্যবাদিতা গানার না, শুধু বিশেষ সংকটাপন্ন অবস্থা ছাড়া—এবং তখনও সত্য প্রকাশ করা সাজে কিনা সন্দেহ আছে জুলসের মনে।

‘ঠিক আছে,’ চাপা কর্কশ গলায় বলল জনি ফটেন। ভয় পেয়েছে সে, তাই আরও খারাপ শোনাল গলাটা।

একজন নার্স আর একটা কনসালটিং রুমের ব্যবস্থা করে ফেলল জুলস। পরীক্ষার জন্যে যা যা দরকার তার সবগুলো এখানে নেই বটে, কিন্তু যা আছে তা দিয়েও চমৎকার কাজ চলে যাবে। জুলসের সন্দেহই সত্যি প্রমাণিত হলো। জনি ফটেনের স্বরতন্ত্রীতে কিছু একটা গজিয়েছে, মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে তা আবিষ্কার করা গেল। পানির মত সহজ একটা কাজ। ওই ব্যাটা টাকারেরই ধরতে পারার কথা, কিন্তু সাজগোজ করে হলিউডি চালচলন রপ্ত করতেই তার সময় বয়ে যায়, রোগীদের পিছনে খরচ করার মত সময় কোথায় তার। মাই গড, ভাবছে জুলস, হারামজাদার হয়তো ডাক্তারী নাইসেসই নেই, আর থাকলেও জান না হয়েই যায় না, সূতরাং অনতিবিলম্বে কেড়ে নেয়া দরকার সেটা। নিনো আর জনির দিকে এখন আর ফিরেও তাকাচ্ছে না জুলস। এই হাসপাতালের গলা বিশেষজ্ঞকে ফোনে ডেকে পাঠান সে। তারপর ধীরে ধীরে ফিরল নিনো ভ্যালেন্টির দিকে। বলল, ‘মি. জনি ফটেনকে বেশ কিছুক্ষণ এখানে থাকতে হবে বলে মনে হচ্ছে। আপনি বরং চলে যান।’

এক নিমেষে খেপে উঠল জনি। ‘অ্যাঁই, শয়তানের হাতি! কি ভেবেছ তুমি আমাকে, অ্যাঁ? ভেবেছ আমাকে এখানে আটকে রেখে তুমি আমার গলা ঘাঁটাঘাটি করবে? এক্সপেরিমেন্ট চালাবে?’

জনি ফটেনের অপমানকর আচরণেও মুখের হাসি এতটুকু ঘান হলো না জুলসের। আনন্দে ডগমগ করেছে সে—এত আনন্দ পাবে, তা সে নিজেও কল্পনা করেনি—পরিষ্কার করে ওকে জানিয়ে দিল, ‘আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করতে যাচ্ছি না আমি। যা খুশি করতে পারেন আপনি। এখান থেকে আপনি চলে যেতে পারেন, তাতে আমি বাদ সাধব না। যাবার আগে শুধু জেনে যান, আপনার

স্বরতন্ত্রীতে কিছু একটা গজিয়েছে। তার মানে, আপনার বাগযন্ত্রে। জিনিসটা কি, ক্যানসার নাকি অন্য কিছু তা জানতে হলে এখানে কিছুক্ষণ থাকতে হবে আপনাকে। ক্যানসার হোক বা না হোক, জিনিসটা সরাবার জন্যে অপারেশনের দরকার নাকি শুধু ওষুধপত্র দিয়ে কাজ হবে, তাও পরিষ্কার জানা যাবে।' একটু থেমে আবার বলল জুলস, 'অনেকগুলো রাস্তা খোলা রয়েছে আপনার সামনে, যেকোন একটা বেছে নিতে পারেন আপনি। গরজ থাকলে নিজেকে আমার হাতে ছেড়ে দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে, আমেরিকার শ্রেষ্ঠ একজন বিশেষজ্ঞ ডাকা যেতে পারে—যদি আপনি খরচ দেন আর আমি দরকার বলে মনে করি। উদ্ভলোক আমার অনুরোধ পেলে আপনাকে দেখার জন্যে প্লেনে চড়ে এখানে চলে আসবেন। অথবা আপনি এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যেতে পারেন, গিয়ে আপনার সেই ব্যক্তিগত হাতুড়ের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিতে পারেন। কিংবা, দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে আর কাউকে দেখাতে পারেন ওরা হয়তো অক্ষম আর কারও কাছে পাঠাবে আপনাকে। ওটা যদি সত্যি ক্যানসার হয়, ততদিনে আরও বেড়ে যাবে, তখন ওরা আপনার গোটা বাগযন্ত্রটাই কেটে ফেলে দেবার পরামর্শ দেবে, বলবে, তা নাহলে আপনি মারা যাবেন। আরেক কাজ করতে পারেন আপনি। সোজা বাড়ি ফিরে গিয়ে চুপচাপ বসে স্নেহ দরদর করে ঘামতে পারেন। আমার পরামর্শ যদি শোনেন, দয়া করে এখানেই থেকে যান। কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার মাত্র। সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। কি হয়েছে না হয়েছে নিশ্চিতভাবে জানতে পারবেন।' একটু থেমে মৃদু হেসে জানতে চাইল জুলস, 'কোথাও খুব জরুরী কোন কাজ আছে বুঝি আপনার?'

'দরকার নেই বাবা আর কোথাও গিয়ে,' বলল নিনো, 'জনি, এত করে যখন বলছেন উনি, পরীক্ষাটা করিয়েই নে, বাবা। ইলকুম থেকে স্টুডিওতে ফোন করে দিচ্ছি আমি। কাউকে কিছু জানাচ্ছি না, শুধু বলব ফিরতে একটু দেরি হবে আমাদের।' জনিকে প্রতিবাদের কোন সুযোগ না দিয়ে দ্রুত চলে গেল নিনো ফোন করতে।

লম্বা দুপুর, কাটতেই চায় না। কিন্তু শেষমেষ কাজ হলো বৈকি। রোগটা কি তা নির্ভুলভাবে ধরতে পারলেন হাসপাতালের গলাবিশেষজ্ঞ এন্ড্রু, সোয়াব ইত্যাদি বিশ্লেষণ-এর রিপোর্ট দেখে রোগটা সম্পর্কে জুলসেরও পরিষ্কার একটা ধারণা জন্মাল।

পরীক্ষার সময় যথেষ্ট অসহযোগিতা করল জনি ফন্টেন। ঠোঁটের কোণ বেয়ে আয়োডিন গড়িয়ে পড়ছে, মুখ ভর্তি গজের রোল, ওয়াক ওয়াক করে বমির আওয়াজ তুলতে তুলতে মাঝপথে উঠে যেতে চাইল সে। দুই কাঁধ চেপে ধরে জোর করে ওকে বসিয়ে রাখল নিনো। পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। জনি ফন্টেনের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছে জুলস, বলল, 'আঁচিল।'

ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতেই পারল না জনি। 'কয়েকটা আঁচিলের মত হয়েছে,' বুঝিয়ে দেবার জন্যে আবার বলল জুলস, 'বড় সসেজের ছাল ছাড়াবার মত করে ওগুলোকে ছাড়িয়ে আনা হবে। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন আপনি। কয়েক মাস সময় লাগবে অবশ্য।'

আনন্দে লাফ মারতে শুরু করল নিনো, গলা ছেড়ে চিৎকার করছে সে।

কিন্তু এখনও ভুরু কুঁচকে রয়েছে জনি। জানতে চাইল, ‘আমার গান গাওয়ার কি হবে? আবার আমি গাইতে পারব?’

শ্রাগ করল জুলস। ‘গান গাইতে পারবেন কিনা তা এখনও গ্যারান্টি দিয়ে কিছু বলা যাচ্ছে না। গান তো আপনি এখনও গাইতে পারছেন না, ভবিষ্যতেও যদি গাইতে না পারেন—মেনে নিতে হবে ব্যাপারটাকে।’

আবার জুলসের উপর চটে গেল জনি ফন্টেন। বিরক্তির সাথে বলল, ‘আজব ছোকরা তো! কি বলছ তা তুমি নিজেই জানো না। তোমার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, আমাকে তুমি কত বড় সুখবরই না দিচ্ছ। অথচ আসলে বলতে চাইছ যে আমি হয়তো আর কোনদিনই গান করতে পারব না। কি? ঠিক এই কথাই বলতে চাইছ তুমি, তাই না? গাইতে পারব না আর কোন দিন? জবাব দাও।’

এবার রেগে উঠল জুলসও। একজন আদর্শ ডাক্তারের কর্তব্য পালন করেছে সে। কাজটা করে যথেষ্ট আনন্দও পেয়েছে। যে-কোন নির্বোধও বুঝবে যে হতভাগা লোকটার মস্ত একটা উপকার করেছে সে, অথচ লোকটার ধারণা সে তার সাংঘাতিক ক্ষতি করে দিয়েছে।

‘শুনুন, মি. ফন্টেন,’ ঠাণ্ডা, চাপা গলায় শুরু করল জুলস, ‘একজন পাস করা ডাক্তার আমি, ছোকরা নই। এবার যখন আমাকে সম্বোধন করবেন, ডাক্তার শব্দটা উচ্চারণ করতে ভুল করবেন না, এবং ছোকরা শব্দটা আর কারও জন্যে মুখের ভিতরেই কোথাও জমা করে রাখবেন। আপনাকে আমি বোকা বলতে চাই না, কিন্তু যে-কোন লোককে একবার জিজ্ঞেস করলেই বুঝবেন আপনাকে সত্যিই আমি একটা সুখবর দিয়েছি। এখানে আপনাকে নিয়ে আসার সময় কি ভেবেছিলাম, জানেন? ভেবেছিলাম গলায় আপনার নির্ঘাৎ ক্যানসার হয়েছে। তার মানে, আমি ধরেই নিয়েছিলাম, আপনার গলার প্রায় সবটা কেটে ফেলে দিতে হবে। তাতে আপনি মারাও যেতে পারতেন। আপনার মৃত্যু অবধারিত; এই কথাটা কিভাবে বলব তাই নিয়ে দৃষ্টিস্তা করছিলাম আমি। তাই শুধু “আঁচিল” শব্দটা উচ্চারণ করার সময় সত্যি ভীষণ আনন্দ হয়েছিল আমার। আনন্দটা শুধু একজন ডাক্তার হিসেবে নয়, আপনার একজন ভক্ত হিসেবেও উপভোগ করেছিলাম। অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করছি, আপনার গান শুনে এক সময় সাংঘাতিক আনন্দ পেয়েছি। ছাত্র-জীবনে তো আপনার গানের জোরেই কত মেয়ে পটিয়েছি। সন্দেহ নেই, আপনি খাঁটি শিল্পী। কিন্তু সেই সাথে এ-কথাও ঠিক যে লাই দিয়ে আপনার মাথাটাও খাওয়া হয়েছে। কি মনে করেন, আপনি জনি ফন্টেন বলে আপনার ক্যানসার হতে পারে না? অথবা আপনার ব্রেনে এমন টিউমার হতে পারে না অপারেশন করে যা বের করে আনার উপায় নেই? হঠাৎ আপনার হার্ট বন্ধ হয়ে যেতে পারে না? নিজেকে আপনি অমর বলে ধরে নিয়েছেন নাকি? জীবনের সবটাই মধুর সঙ্গীত, এ-কথা আপনাকে কে বলেছে? দুঃখ-কষ্ট কালেক্ট বলে তা যদি দেখতে চান, এই হাসপাতালটার ভেতর দিয়ে একবার হেঁটে যান—আঁচিল হয়েছে বলে নিজেকে আপনার মহা-ভাগ্যবান বলে মনে হবে। আঁচিল আপনি কত ভালবাসেন তা রসের গান গেয়ে প্রকাশ করার জন্যে আশ্চর্য একটা অস্থিরতা অনুভব করবেন আপনি। তাই বলছি, ওসব ন্যাকামি বাদ দিয়ে এবার একটু মাটিতে পা রাখতে চেষ্টা করুন।

অ্যাডলফ মেনজুর মত দেখতে আপনার ওই ডাক্তারটি যত ভাল সার্জেনই হোক, সে যদি ভুল করেও অপারেশন রুমে ঢোকার চেষ্টা করে, আমার পরামর্শ, ব্যাটাকে ধরে খুনের অভিযোগে পুলিশের হাতে তুলে দিন।’

একনাগাড়ে কথাগুলো বলে দ্রুত কামরা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে জুলস। পিছন থেকে কথা বলে উঠল নিনো।

‘চমৎকার, অপূর্ব!’ চৈচিয়ে উঠল নিনো। ‘দারুণ বলেছেন, ভায়া।’

চরকির মত আধ পাক ঘুরে দাঁড়াল জুলস। ‘মি. ভ্যালেন্টি, রোজ বেলা বারোটোর আগেই কি মাতাল হয়ে পড়েন আপনি?’

‘নিশ্চয়ই,’ বলল নিনো। নির্মল সতর্কতার সাথে, দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছে সে।

রাগটা পানি হয়ে গেল জুলসের। যতটা রুঢ় ভাবে মন্তব্য করতে যাচ্ছিল তার চেয়ে নরম গলায় বলল, ‘তাহলে আর পাঁচ বছর বাঁচবেন আপনি, তার আগেও শেষ হয়ে যেতে পারেন—কথাটা মনে রাখলে ভাল করবেন।’

ছোট ছোট পা ফেলে, থায় নাচের ভঙ্গিতে জুলসের দিকে এগিয়ে এল নিনো। ডাক্তারকে দু’হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল সে। নিঃশ্বাসের সাথে ভুরভুর করে মদের গন্ধ বের হচ্ছে। দিল খোলা হাসি মুখে বলল, ‘পাঁচ বছর?’ হাসির মাত্রাটা বেড়ে গেল তার। ‘এত বেশি দিন বেঁচে থাকতে হবে, ডাক্তার? তুমি আমাকে এতবড় দুঃসংবাদ দিচ্ছ?’

এক মাস পরের ঘটনা।

লাস ভেগাস। হোটেল। সুইমিং পুলের কিনারায় বসে রয়েছে লুসি ম্যানচিনি। হাতে একটা ককটেলের গ্লাস। ওর কোলে রয়েছে জুলসের মাথা। আরেক হাত দিয়ে জুলসের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে লুসি।

‘এত ভয় পাবার কোন দরকার নেই,’ ঠাট্টার সুরে বলল জুলস। ‘তোমার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে সাহস সঞ্চয় করার চেষ্টা করছ। ঘরে আমাদের জন্যে শ্যাম্পেনের বোতল অপেক্ষা করছে।’

‘তোমার আর ধৈর্য মানছে না, না?’ বলল লুসি। ‘কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কিছু করতে গেলে কোন ক্ষতি হবে না তো?’

‘তুমি ভুলে যাচ্ছ আমি একজন ডাক্তার,’ বলল জুলস। ‘সময় হয়নি মনে করলে এত তাগাদা দিতাম? কোন ভয় নেই তোমার। আজই আমাদের সেই পরম রজনী। একটা ব্যাপার বুঝতে পারছ, ডার্লিং?’

‘কি?’

‘ডাক্তারি ইতিহাসে আমিই একমাত্র ডাক্তার যে তার নিজের হাতের কাজ নিজেই হাতেকলমে পরীক্ষা করবে। পরীক্ষার আগে, এবং পরীক্ষার পরে। বিষয়টা নিয়ে পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতে কি যে মজা লাগবে আমার। সবুর, ব্যাপারটা একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক...’ বক্তৃতা দেবার ঢঙে শুরু করল জুলস, ‘চিকিৎসক তথা গবেষক-সুলভ দক্ষতা এবং হৃদয়গত কারণে যদিও আগের অনুষ্ঠানটি পরম আনন্দদায়ক ছিল, কিন্তু অপারেশনের পরের অনুষ্ঠানটি আগেরটার চেয়ে অবশ্যই

অনেক বেশি উপভোগ্য হতে বাধ্য...।' ব্যথায় চিৎকার করে উঠল জুলস, ভীষণ জোরে তার চুল টেনে ধরেছে লুসি।

মাথা নিচু করে আছে লুসি। চোখ দুটো নত। কিন্তু একটু একটু হাসছে ফিস ফিস করে বলল, 'আজ যদি ভাল না লাগে, মনে করতে হবে তুমিই দায়ী—তোমারই ব্যর্থতা।'

'প্রশ্নই ওঠে না ব্যর্থতার,' দৃঢ় আস্থার সাথে বলল জুলস। 'সেন্ট পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিচ্ছি আমি কেলনার ব্যাটাকে হাতের কাজটুকু করতে দিলেও পরিকল্পনাটা তো আমার। এখন একটু বিশ্রাম নেয়া একান্ত কর্তব্য। সারারাত ধরে গবেষণা চলবে আজ।'

আজকাল এক সাথেই থাকে ওরা। হাত ধরাধরি করে এক সময় নিজেদের কামরায় ফিরে এল। লুসি আবিষ্কার করল, তাকে চমকে দেবার আয়োজন করে রেখেছে জুলস। দু'জন মাত্র মানুষ, কিন্তু বারোজনের খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করেছে সে। শুধু তাই নয়, শ্যাম্পেনের বোতলগুলোর পাশেই দেখা যাচ্ছে একটা বাস্ক। দেখেই চিনতে পারল লুসি, ওটা একটা গয়নার বাস্ক। সেটা খুলতেই প্রকাণ্ড হীরে বসানো বাগদানের একটা আংটি দেখতে পেল লুসি।

'এ থেকেই কি প্রমাণ হয় না, নিজের কাজে আমার কতটা আস্থা?' বলল জুলস। 'আমি তোমাকে আজ আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছি। বিয়ে করার আগে নিজের বউকে মেরামত করিয়ে নেবার আর কোন ঘটনা আছে কিনা আমার জানা নেই। এখন দেখা যাক, আমার স্ত্রী হবার যোগ্যতা কি পরিমাণে রয়েছে তোমার মধ্যে।'

গভীর মমতায় আপ্ত হয়ে উঠেছে জুলসের মনটা। আশ্চর্য কোমল ব্যবহার করছে সে লুসির সাথে। কিন্তু তবু ভয় ভয় করছে লুসির। গায়ে জুলসের মৃদু একটু ছোঁয়া লাগলেই শিউরে উঠছে, জড়োসড়ো হয়ে পড়ছে। তবে, খানিক পর সমস্ত ভয় কাটিয়ে উঠল সে।

কিভাবে, তা সে নিজেই টের পেল না শুধু অনুভব করল, তার সারা শরীর জুড়ে বিদ্যুতের মত তীব্র কামনার স্রোত বইতে শুরু করেছে এমন প্রচণ্ডভাবে আর কখনও আক্রান্ত হয়নি সে।

'হাতের কাজটা আমার ভালই হয়েছে, বুঝলে?' লুসির কানে কানে বলল জুলস। প্রথমবারই পরম তৃপ্তি পেয়েছে সে।

লুসি জবাবে ফিসফিস করে বলল, 'ভাল, হ্যাঁ নিশ্চয়ই,...এত ভাল, এতই ভাল, এতটা আমি আশা করিনি।'

দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসছে ওরা। তারপর আবার শুরু হলো ওদের একান্ত গোপনীয় খেলা গবেষণার সাফল্য আত্মহারা করে তুলেছে জুলসকে। আর লুসি খুঁজে পেয়েছে তার হারানো মানিক। তার জীবনে আজ আর কোন অপূর্ণতা নেই। যে জিনিস হারালে আর কোন দিন ফিরে পাওয়া যায় না, সেই জিনিস ফিরে পেয়েছে সে।

এগারো

সিসিলি। নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছে মাইকেল কর্নিয়নি। পাঁচ মাস পেরিয়ে গেছে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোয় এখন মাইকেল তার বাবাকে চিনতে শিখেছে, বুঝতে পেরেছে তার চরিত্র আর নিয়তিকে। এখানে এসে জীবন সম্পর্কে তার ধারণা একটু একটু করে বদলে গেছে। এখন তার মনে হয় জীবনের কঠোর বাস্তব দিকটা সম্পর্কে তার কোন ধারণাই ছিল না—বলতে গেলে এক রকম অন্ধই ছিল সে। এখন সে শুধু বাবাকে নয়, লুকা ব্রাসিকেও বুঝতে পারে। বুঝতে পারে পাষণ্ড হৃদয় ক্যাপোরেজিমি ক্রুমেজাকে। বুঝতে পারে মায়ের আত্মসমর্পণের কারণ, আর তাঁর নির্ধারিত ভূমিকার তাৎপর্য। এরা সবাই যোদ্ধা, ভাগা এদের শত্রু। ভাগ্যের সাথে যুদ্ধ না করলে এরা সবাই অনেক আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত দুনিয়ার বুক থেকে সিসিলিতে না এলে এই জ্ঞান হত না মাইকেলের। ‘একটাই মাত্র নিয়তি থাকে মানুষের,’ ডনের এই কথাটার অর্থ এবং তাৎপর্য কি, এখন তা পরিষ্কার বুঝতে পারে সে। কর্তৃপক্ষ বা বৈধ, আইনসঙ্গত সরকারকে কেন অমান্য করা হয়, যারা ‘ওমের্তা’ লঙ্ঘন করে, নীরবতার শপথ ভঙ্গ করে, কেন তাদেরকে ঘৃণা করা হয়—সময়ের সাথে সাথে এসবেরই অর্থ বুঝতে পারছে মাইকেল।

আজ থেকে পাঁচ মাস আগে হৃদ্যবেশ পরিয়ে পালার্মো বন্দর থেকে সিসিলি দ্বীপের অভ্যন্তরে নিয়ে আসা হয়েছে মাইকেলকে। ব্যবহার করা পুরানো পোশাক পরানো হয়েছিল ওকে, মাথায় বসিয়ে দেয়া হয়েছিল ঠোট লাগানো টুপি।

জায়গাটা একটা প্রদেশের মাঝখানে, প্রদেশটা পরিচালনা করে একটা মাফিয়া সংগঠন। মাফিয়া সংগঠনের নেতা ডন কর্নিয়নির কাছে ঋণী, ডন কর্নিয়নির কাছ থেকে তিনি বড় ধরনের একটা উপকার পেয়েছিলেন এক সময়। কর্নিয়নি গ্রামটা এই প্রদেশেরই একটা অংশ। অনেক বছর আগে মাইকেলের বাবা যখন দেশ ছেড়ে আমেরিকায় চলে গিয়েছিলেন তখন তিনি তাঁর জন্মস্থানের নামটা নিজের নামের সাথে গেঁথে নিয়েছিলেন।

তবে ডন কর্নিয়নির আত্মীয়-স্বজনরা এখন আর কেউ জীবিত নেই এখানে। মেয়েরা সবাই বুড়ো হয়ে মারা গেছে। আর পুরুষরা হয় নিহত হয়েছে গৃহযুদ্ধে, নয়তো আমেরিকা, ব্রাজিল অথবা ইটালিরই অন্য কোন প্রদেশে চলে গেছে।

আরও পরে মাইকেল জানতে পারল, এই দরিদ্র গ্রামটায় খুনোখুনির হার সারা দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি।

মাফিয়া সংগঠনের নেতার এক চিরকুমার কাকা আছেন, তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে মাইকেল। সত্তর বছর বয়স কাকার, ভদ্রলোক এই এলাকার জনপ্রিয় ডাক্তারও বটে।

মাফিয়া সংগঠনের নেতা ডন টমাসিনোর বয়স প্রায় পঞ্চাশ, সিসিলির সবচেয়ে অভিজাত আর ধনী পরিবারের যাবতীয় সন্মান-সম্পত্তি দেখাশুনা করেন তিনি। এই পরিবারটির প্রধান তত্ত্বাবধায়ক তিনিই, পদমর্যাদার স্বীকৃতিস্বরূপ স্থানীয় ভাষায়

তাঁকে ‘গ্যাবেলোটো’ বলা হয়। গ্যাবেলোটোর কাজের মধ্যে একটা হলো, সর্বহারা বা সুযোগসন্ধানীরা যাতে পতিত জমি দখল করে না ফেলে, বা অবৈধভাবে মালিকের জমিতে শিকার না করে কিংবা ফসল কেটে নিয়ে না যায় সেদিকে নজর রাখা। সংক্ষেপে, মাফিয়াদেরই প্রতিনিধিত্ব করেছে গ্যাবেলোটোরা। গরীব আর সাধারণ লোকদের ন্যায্য অন্যান্য সব রকম দাবি আর অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে ধনী মনিবদের স্থাবর সম্পত্তি রক্ষা করাই এদের কাজ। বিনিময়ে এরা মনিবের মোটা টাকা খায়। কখনও যদি জমিহীন গরীব কৃষক আইনের সাহায্য নিয়ে পতিত জমিতে ফসল বোনার চেষ্টা করে তাহলেই কাজ শুরু হয়ে যায় গ্যাবেলোটোদের। মারধর করে, খুন করার ভয় দেখিয়ে চাষীদেরকে ভাগিয়ে দেয় তারা। পানির মত সহজ কাজ। তেমন ঝঙ্কি-ঝামেলা নেই।

ডন টমাসিনো এলাকার পানি ভাগ-বাঁটোয়ারার মালিকও বটে। রোমক সম্রাট যদি এখানে কোন নতুন বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা করেন, তিনি সেটা এক কথায় বাতিল করে দেন। বাঁধ তৈরি হলে তাঁর মস্ত ক্ষতি হবে, সুতরাং আর সব কিছু তিনি মেনে নেবেন, কিন্তু বাঁধ তৈরি হতে দেবেন না। অসংখ্য আর্টেজীয় কুয়ো আছে তাঁর হাতে। ওই সব কুয়োর পানি বেচে বস্তা বস্তা টাকা কামান তিনি। বাঁধ তৈরি হলে একেবারে সস্তায়, পানির দরে বিক্রি হবে পানি—তাঁর এত লাভের ব্যবসাটা ধ্বংস হয়ে যাবে। তা তিনি কিভাবে হতে দিতে পারেন? যুগ যুগ নয়, শত শত বছর ধরে পানি সরবরাহের একটা একচেটিয়া কারবার কত সহস্র লোকের পরিশ্রমের ফলে তিলে তিলে গড়ে তোলা হয়েছে। বুদ্ধি এবং ভাগ্যের জোরে আজ তিনি এটির মালিক। এমন একটা ঐতিহ্যকে, প্রচণ্ড সাধনার ফসলকে কিভাবে তিনি ধ্বংস হতে দিতে পারেন?

তবে যে যাই বলুক, ডন টমাসিনো ড্রাগস বা নারী ব্যবসা ছুঁয়েও দেখেন না। সবাই জানে, এসব ব্যাপারে তিনি অত্যধিক সেকেন্দ্রে, রক্ষণশীল স্বভাবের মানুষ। ওদিকে পালার্মো আর অন্যান্য বড় শহরে নতুন নতুন যে-সব মাফিয়া নেতার উদয় হচ্ছে তাদের উপর ইটালিতে নির্বাসিত মার্কিন ওগাদের প্রভাব বড় বেশি—বেশ্যা বা ড্রাগস কেন, কোন ব্যবসাতেই তাদের অরুচি নেই।

সাম্প্রতিক মোটা মানুষ ডন টমাসিনো। স্থানীয় ভাষায় যাকে বলে ‘পেটওয়াল মানুশ’। আক্ষরিক অর্থে তো বটেই, আবার আনুষ্ঠানিক অর্থেও বলা হচ্ছে—‘যাকে সবাই সন্তম আর ভয় করে’। এই রকম একজন নেতার আশ্রয়ে রয়েছে মাইকেল। ভয়ের কোন কারণ নেই, সবদিক থেকে নিশ্চিন্দ্রই বলা যায় ওর নিরাপত্তা। কিন্তু তবু ওর পরিচয় গোপন রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ডনের কাকার নাম ডা. তাজা। তাঁর পাঁচিল ঘেরা বাগান বাড়ির ভিতরই সময় কাটে মাইকেলের।

অস্বাভাবিক লম্বা আকৃতির মানুষ ডাক্তার তাজা। পুরো ছয় ফুট, সিসিলীয়দের তুলনায় একটু বেশিই লম্বা। মুখটা টকটকে লাল, মাথায় ধবধবে সাদা চুল। বয়স সত্তরের উপর হলে হবে কি, হুগুয় একবার অন্তত পালার্মোয় যানই তিনি—ওখানেই তো সেরা তরুণী বেশ্যা মেয়েদের আড্ডা। মেয়েগুলোর একনিষ্ঠ ভক্ত তিনি। তাদের বয়স যত কম হবে, ততই আকৃষ্ট হবেন তিনি। সাম্প্রতিক রসিক মানুষ।

তার আরও একটা দুর্বলতা আছে। সেটি হলো বই পড়া। ব্যাপারটা নেশার মত, বা তার চেয়েও বাড়ি। বইগুলো থোথাসে গেলেন বললেও কম বলা হয়। যত পান তত পড়েন। কোন বাছবিচার নেই। ছাপার অক্ষরে যেখানে যত কিছু আছে সবই তার পাঠ্য বিষয়। শুধু যে পড়েই ক্ষান্ত হন, তা নয়। পড়া বিষয়গুলো মজার গল্পের আকারে ঘামের লোকজন, নিজের নিরক্ষর চাষী, রোগী আর জমিদারের রাখালদেরকে শোনান তিনি। তার স্বভাবের জন্যে স্থানীয় লোকেরা তাঁকে পণ্ডিত, বুদ্ধ ইত্যাদি উপাধি দিয়েছে।

প্রায় প্রত্যেক সন্ধ্যায় প্রকাণ্ড বাগানে মাইকেলকে সঙ্গে দেন ডন টমাসিনো আর ডাক্তার তাজা। শ্বেত পাথরের অসংখ্য স্ট্যাচু রয়েছে বাগানে। দেখে মনে হয় এখানের মিঠে-কড়া রসে ভরপুর কালো আঙ্গুরের গাছগুলোর মত মূর্তিগুলোও যেন মাথাচাড়া দিয়ে জেগে উঠেছে মাটির নিচে থেকে। মাফিয়াদের সম্পর্কে, তাদের শত শত বছরের কীর্তি-কলাপ সম্পর্কে মজার মজার গল্প বলতে ভালবাসেন ডাক্তার তাজা। তার মুগ্ধ শ্রোতা হলো মাইকেল কর্নিয়নি। এমন একজন আদর্শ শ্রোতা পেয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন ডাক্তার তাজা। এবং মাঝে-মধ্যে সবুজের গা জুড়ানো মিষ্টি মধুর শীতল বাতাস, ফুলের গন্ধে ভরাট কড়া মদ আর বাগানটির প্রশান্ত পরিবেশের প্রভাবে ডন টমাসিনো পর্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েন। তখন তিনিও নিজের দু'একটি অভিজ্ঞতার গল্প শোনান মাইকেলকে।

কত যুগ, কত শতাব্দী আগে তৈরি হয়েছে বাগানটা। এর সাথে কত শত আনন্দ আর করুণ ঘটনার স্মৃতি জড়িত। এখানে বসে মাইকেল কর্নিয়নি বুঝতে পেরেছে তার বাপের বংশের মূল শিকড়টা কোথায়।

মাফিয়া শব্দটার কথাই ধরা যাক। শব্দটার আদি অর্থ ছিল 'আশ্রয় স্থল'। পরে শব্দটার অর্থ বদলে যায়। নতুন মানে দাঁড়ায়—একটি সংগঠন। এই সংগঠন আপনা-আপনি গড়ে উঠেছিল। যে সরকার দেশে অত্যাচারের স্টিম-রোলার চালিয়ে দেশের লোকদেরকে শত শত বছর ধরে শোষণ আর নিষ্পেষন করে এসেছে সেই সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্যে এই সংগঠনের জন্ম। পৃথিবীর ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে সিসিলির মত আর কোন দেশকে এমন পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠে নিষ্ঠুরভাবে ধর্ষণ করা হয়নি। ধনী-দরিদ্র সবাইকে রোমক 'ইনকুইজিশন' অর্থাৎ ধর্মযাজকদের প্রশাসন অত্যাচার করেছে নির্বিচারে।

এখানকার রাখাল আর চাষী সমাজের উপর বড় বড় জমিদার আর ক্যাথলিক চার্চের রাজপুরুষদের একচেটিয়া প্রভাব প্রতিপত্তি। এই সব প্রভাবশালীদের হাতের পুতুল হলো পুলিশ বিভাগ। সে জন্যেই সিসিলিতে সবচেয়ে জঘন্য আর অশ্লীল গালি বলতে, 'পুলিশম্যান' বোঝায়।

পুলিশের সাহায্যে পরিপুষ্ট এই প্রচণ্ড পাশবিক ক্ষমতার মুখোমুখি হয়ে নিষ্পেষিত দেশবাসীরা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আতঙ্কে বাধ্য হয়ে নিজেদের রাগ, ঘৃণা আর বিদ্বেষ গোপন করে রাখতে শিখেছে। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এ শিক্ষাও হয়েছে তাদের যে শত্রু তাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, ওদেরকে শাসানো বা মুখ ফুটে ওদের বিরুদ্ধাচরণ করা নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছু নয়—এতে কোন লাভও নেই, কারণ পাল্টা আক্রমণ সাথে সাথেই

আসে। তারা সবাই হাড়ে হাড়ে টের পায়, সমাজ ওদের পরম শত্রু। অন্যায়ের প্রতিকার যদি চাইতেই হয়, গোপনে বিদ্রোহীদের কাছে যেতে হয়। বিদ্রোহী মানে মাফিয়ারা ন্যায় বিচার করে দেয়।

ওদিকে মাফিয়া সংগঠনের কাজও দিনে দিনে এগিয়ে চলেছে। ওমেৰ্তা অর্থাৎ নীরবতার কঠোর নিয়ম চালু করে নিজেদের নিরাপত্তা আর ক্ষমতার ভিত্তি আরও মজবুত, আরও নিশ্চিত করে এনেছে তারা। সিসিলির যে কোন একটা পাড়াগাঁয়ের কথা ধরা যাক, অচেনা কোন লোক এসে যদি জিজ্ঞেস করে সবচেয়ে কাছের শহরে কোন পথ ধরে যেতে হবে, স্থানীয় লোকেরা সাথে সাথে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেবে, উত্তর দেবার ভদ্রতাটুকুও দেখাবে না। মাফিয়া সংগঠনের দৃষ্টিতে সবচেয়ে গুরুতর অন্যায় কি? পুলিশের কাছে সাহায্য চাওয়া। সংগঠনের কোন সদস্য যদি গুলি খায়; যদি তার উপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়—তবু সে পুলিশের কাছে গিয়ে মুখ খুলতে পারবে না। পুলিশের সাহায্য না চাইলে লাভ হয়, সবাই টের পেল ব্যাপারটা। ফলে স্থানীয় লোকদের আদর্শ, ধর্ম হয়ে দাঁড়াল ওমেৰ্তা। একটা মেয়ের স্বামী যদি খুন হয়ে যায়, মেয়েটি তার স্বামীর হত্যাকারীর পরিচয় পুলিশকে জানায় না। ছেলে খুন হলে মাও তার খুনির পরিচয় প্রকাশ করে না। যুবতী, কুমারী মেয়ের সতীত্ব নষ্ট করেছে যে তার নামও পুলিশের সামনে উচ্চারণ করা হয় না।

সমাজে ন্যায় বিচার বলে কোন জিনিসের অস্তিত্ব কোন কালেই ছিল না, আজও নেই। এটাই হলো একমাত্র সত্য। কর্তৃপক্ষ বা বৈধ সরকার নিজেদের আর নির্দিষ্ট মহলের ভাগ্য-উন্নয়নে সাম্প্রতিক ব্যস্ত। আরও একটা কাজে তারা ব্যস্ত বটে, সেটা হলো নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার। তাদের কাছ থেকে ন্যায় বিচার পাবার আশা করা বাতুলতা মাত্র। কেউ কোন দিন কখনও পায়নি। তাই রবিনহুডের মত দুষ্টির দমন আর শিষ্টের পালন করে যারা সেই মাফিয়াদের কাছেই গোপনে আসে দেশের লোকেরা। মাফিয়া সংগঠনও ন্যায় বিচার করে দিয়ে দেশবাসীর আস্থা অর্জন করে। কেউ কোন বিপদে পড়লেই মাফিয়া সংগঠনের নেতার কাছে ছুটে আসে। তিনিই দীন-দুঃখীদের আদর্শ সমাজপতি, তিনিই তাদের রক্ষাকর্তা। বস্তা ভর্তি টাকা, বুড়ি ভর্তি খাবার আর গাদা গাদা চাকরি হাতে নিয়ে সারাক্ষণ তৈরি হয়ে থাকেন তিনি সবার জন্যে। কেউ এসে চাইলেই ন্যায় বিচার দেন। তিনিই তো সবার রক্ষাকর্তা।

কিন্তু মাফিয়া সংগঠনের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে একটা কথা উল্লেখ করেননি ডাক্তার তাজা। সংগঠন সম্পর্কে এই সভ্যতা মাইকেল নিজে আবিষ্কার করেছে। তাতে অবশ্য বেশ কয়েক মাস সময় লেগেছে তার। ওর আবিষ্কারটা হলো, সিসিলির মাফিয়া সংগঠনগুলো ইদানীং ধনী জমিদার আর বড় বড় ব্যবসায়ীদের বে-আইনী খাদেমে পরিণত হয়েছে। এমনকি এদেশের বৈধ সরকারি নিয়মের আওতায় যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে, তার নিয়ম-কানুন মেনে নিয়ে এরাও এক একজন রাজনৈতিক পাণ্ডা হয়ে উঠেছে বললে ভুল বলা হবে না। সিসিলীয় মাফিয়া সংগঠন এখন একটা আদর্শচ্যুত ধনিক স্বার্থ রক্ষাকারী সংগঠনে নেমে এসেছে। এরা এখন আর গণতন্ত্রের রক্ষক নয়, বরং গণতন্ত্র বিরোধী। এদের

মধ্যে উদারতার অভাব দেখা যাচ্ছে। এমন লোভী হয়ে উঠেছে যে যে-কোন রকম ব্যবসার উপর ট্যাক্স ধরে বসে এরা, সে ব্যবসা যত ছোট আর নগণ্যই হোক না কেন। অর্থাৎ সিসিলীয় মافیয়া সংগঠন বৈধ সরকার বা আইনসম্মত কর্তৃপক্ষের চেয়েও জঘন্যতর কাজ করতে শুরু করেছে।

বাবার মত একজন সর্বগুণে গুণান্বিত পুরুষও কেন বৈধ সরকারের আদর্শ নাগরিক না হয়ে গুণ্ডা হয়ে গেলেন, এ প্রশ্নের উত্তরও খুঁজে পেয়েছে মাইকেল। যে-কোন আত্মমর্যাদা জ্ঞানসম্পন্ন তেজস্বী পুরুষের পক্ষে এই বিভীষিকাময় দারিদ্র, আতঙ্ক আর অবমাননা সহ্য করা বা মেনে নেয়া এক কথায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। যে সব সিসিলীয় আমেরিকায় গিয়ে বসবাস শুরু করেছিল তারাও ধরে নিয়েছিল মার্কিন কর্তৃপক্ষও সিসিলীয় কর্তৃপক্ষের মত অত্যাচারী।

পালার্মোর বেশ্যাপাড়ায় সাপ্তাহিক অভিযান চালান ডাক্তার তাজা, অভিযানের সঙ্গী হিসেবে মাইকেলকেও তিনি সাথে নিতে তান। কিন্তু রাজী হয়নি মাইকেল হঠাৎ করে সিসিলিতে পালিয়ে আসতে হয়েছে বলে ওর ভাঙা চোয়ালের উপযুক্ত চিকিৎসা হয়নি। ক্যাপটেন ম্যাকক্লান্সির প্রচণ্ড ঘুঘির স্মৃতিচিহ্ন এখনও মুখের বাঁ দিকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও। হাড়গুলো জোড়া লেগেছে বাঁকা ভাবে, পাশ থেকে তাকালে ভাঙাচোরা দেখায় মুখটাকে। শুধু তাই নয়, মুখের এই ভাঙাচোরা, তোবড়ানো চেহারা জেনে কেমন যেন দুশ্চরিত্র লম্পট বলে মনে হয় ওকে। নিজের চেহারা নিয়ে মনে মনে সব সময়ই একটা গর্ব অনুভব করত ও, সেজন্যেই দুঃখটা আরও বেশি করে বাজে বুকে, চেহারা নষ্ট হওয়ায় যে এত দুঃখ পাবে তা নিজেও কখনও ভাবেনি।

শুধু যে চেহারাটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তাই নয়, মর্জি-মাফিক একটা ব্যাথাও আসা-যাওয়া করে। অবশ্য ব্যাথাটা তেমন ভোগাতে পারে না ওকে, ডাক্তার তাজা ট্যাবলেট খাইয়ে সেটাকে সামলে দেন। তিনি ওর মুখের চিকিৎসা করে ঐকটিটা সারিয়ে দিতে চেয়েছেন, কিন্তু মাইকেল এড়িয়ে গেছে। বেশ কয়েকটা মাস সিসিলিতে বসবাস করে এটুকু অন্তত বুঝেছে ও যে এখানকার সবচেয়ে অযোগ্য আর বাজে ডাক্তার সম্ভবত এই তাজা বুড়ো। প্রচুর পড়াশুনা করেন ভদ্রলোক, কিন্তু তার মধ্যে ডাক্তারি বই-পত্র একটাও নেই। মুক্তকণ্ঠে নিজেই স্বীকার করেন, ডাক্তারি বিষয়ের কিছু তিনি বুঝতেই পারেন না। মافیয়া সংগঠনের প্রধান নেতার তদবিরে পরীক্ষায় পাস করে ডাক্তারি করার ছাড়পত্র পেয়েছেন তিনি। তাঁর পক্ষে সুপারিশ করার জন্যে নেতাটি পালার্মোয়ও গিয়েছিলেন। ডাক্তার তাজা তখন হাত, পরীক্ষা দিয়েছেন মাত্র। তাকে কত নম্বর দেয়া যায় না যায় তা অধ্যাপকদের সাথে আলোচনা করে স্থির করে আসেন নেতাটি। এধরনের আরও ঘটনা থেকে মাইকেল বুঝতে পারে, যে-সমাজকে মافیয়া সংগঠন রক্ষা করে সেই সমাজকেই সংগঠনটি ক্যান্সার রোগের মত কুরে কুরে খাচ্ছে। কাজ, সাধনা, পরিশ্রম—এসবের কোন মূল্যই নেই। সিসিলির সব কটা গডফাদার যাকে তাকে দান করেন পেশা, পাবার যোগ্য নয় যে সে-ও পেয়ে যায় উপকার আর সাহায্য—অনুগত হলেই হলো। এই রীতি যে কতটা বিপজ্জনক তা এরা কেউ বুঝতে চায় না। এতে যে সত্যিকার কাজের লোকেরা ঠকছে, বঞ্চিত হচ্ছে, তা একবার ভেবে দেখার মত লোক নেই

সিসিলিতে !

সমস্ত বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবার জন্যে হাতে যথেষ্ট সময় রয়েছে মাইকেলের। দিনের বেলাটা বাইরে বাইরে কাটায় ও, পল্লীথামে ঘুরে বেড়ায়। ডন টমাসিনোর জমিদারিতে কাজ করে দু'জন রাখাল, মাইকেল বাইরে বেরুলেই নুপারা রন্দুক হাতে ওর সঙ্গী হয় তারা। অনেক সময় মাফিয়াদের হয়ে ভাড়াটে খুনি হিসেবে কাজ করতেও পিছ পা হয় না সিসিলি দ্বীপের রাখালরা, অবশ্য শুধু জীবিকা অর্জনের তাড়নায় এ-কাজ করতে বাধ্য হয় তারা।

আমেরিকাতে তার বাবার মাফিয়া সংগঠনের কথা চিন্তা করে মাইকেল। সংগঠনটার প্রভাব যদি আরও বাড়ে, যদি আরও সাফল্য অর্জিত হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত নির্ধাৎ এই দ্বীপের সংগঠনের মত ভয়ঙ্কর অবস্থা হবে সেটারও, তার বিঘাত্ত প্রভাব আর প্রতিক্রিয়া গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ক্যানসার রোগের মত কুরে কুঁচ খাবে, সম্পূর্ণ রসাতলে পাঠাবে দেশটাকে। যার চোখ আছে সেই দেখতে পাচ্ছে এরই মধ্যে একটা ভূতের দেশ হয়ে গেছে সিসিলি। শুধু পেটের জন্যে খাবার যোগাড় করার আশায় কত লোক দেশ ছাড়া হয়ে অচেনা অজানা বিদেশে চলে গেছে। স্রোতের মত এখনও বেরিয়ে যাচ্ছে। আরেক দল লোক, যারা নিজের রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে অন্যান্যদের শত্রুতা অর্জন করেছে, তারাও খুন হয়ে যাবার ভয়ে দেশের মায়া ত্যাগ করে গোপনে গা ঢাকা দিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিদিন বেড়াতে বেরিয়ে পায়ে হেঁটে বহু বহু দূর চলে যায় মাইকেল। সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছে ও দেশটার উদার সৌন্দর্য দেখে। এখানে সেখানে অগভীর, চওড়া খাদ, খাদের মধ্যে কমলালেবুর বাগান ছায়া তৈরি করে রেখেছে। বাগানে পানি সরবরাহ করা হয় বিশাল মুখওয়ালা নালার মধ্যে দিয়ে। প্রকাণ্ড দাঁতালো সাপের মুখের মত দেখতে সেগুলো—খুব সম্ভব তৈরি করা হয়েছে যীশুর জন্মেরও আগে। দালান কোঠাগুলো প্রাচীন রোমক প্রাসাদ আর বাগান বাড়ির ধাঁচে, তৈরি। বিশাল প্রবেশদ্বারগুলো শ্বেত পাথরের তৈরি, প্রকাণ্ড খিলান দিয়ে সাজানো প্রত্যেকটা কামরা। কিন্তু সব ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ধ্বংসস্বপ্নে পরিণত হচ্ছে। বেওয়ারিশ ভেড়ার আস্তানা এখন সব।

দূর-দিগন্তের কাছে দেখা যায় উঁচু পাহাড় শ্রেণী। কঠিন পাথরের পাহাড় ওগুলো, মাংস ছাড়ানো ন্যাড়া হাড়ের সাদা চিবি বলে মনে হয়। চারদিকের এই সাদা মরুভূমির মাঝখানে জ্বল জ্বল করে জ্বলছে যেন উজ্জ্বল সবুজ বাগান আর খেতগুলো—প্রকৃতির গলায় যেন পরানো রয়েছে ঝকঝক সবুজ পাল্লার হার। কখনও কখনও পায়ে হেঁটে কর্নিয়নি গ্রাম পূর্ণ চলে যায় মাইকেল। গ্রামের সবচেয়ে কাছের পাহাড়টার গায়ে নতুন বসতির সূচনা হয়েছে। বাড়িঘর তৈরি করে আঠারো হাজার লোক বাস করে ওখানে। দূর থেকে পাহাড়ের গায়ে লম্বা লম্বা দাগের মত দেখতে লাগে বাড়িগুলোকে।

গরীব মানুষেরা আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে ওখানে। পাহাড়ের গা কেটে কালো পাথর বের করে নিয়ে তাই দিয়ে তৈরি করেছে বাড়ি ঘর। গোটা এলাকায় প্রায় সবারই অবস্থা করুণ। ছোট্ট এই গ্রামটায় গত বছর ষাটজন লোক খুন হয়েছে। মৃত্যু যেন

তার হিম-শীতল ছায়া ফেলেছে এই গ্রামটার উপর।

পাহাড় ছাড়িয়ে আরও দূরে চাষের জমি। খেতের চোখ টাটানো একঘেয়ে দৃশ্য ভেঙে তারপর শুরু হয়েছে ফিকুৎসার বিস্তীর্ণ বনভূমি।

মাইকেলের সাথে যখনই বেরোয়, সাথে অবশ্যই লুপারা বন্দুক নেয় রাখাল বা দেহরক্ষীরা। ভয়ঙ্কর শক্তিশালী সিসিলীয় শটগানকে লুপারা বলা হয়। মাফিয়াদের অত্যন্ত প্রিয় অস্ত্র এটা। এই অস্ত্রকে কতটা ভয়ঙ্কর বলে মনে করা হয় তার একটা উদাহরণ দেয়া যায় মুসোলিনীর নিযুক্ত একজন পুলিশ অফিসারের নির্দেশ থেকে।

সিসিলি থেকে মাফিয়া সংগঠনকে সম্পূর্ণ উৎখাত করার জন্যে সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে মুসোলিনী একবার একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তাকে পাঠানেন। পুলিশ অফিসারের প্রথম কয়েকটা কাজের মধ্যে একটা হলো, যেখানে যত পাথরের তৈরি উঁচু দেয়াল আছে সব ভেঙে তিন ফুট উচ্চতায় নামিয়ে আনা, লুপারাধারী খুনীরা যাতে দেয়ালের পিছনে গা ঢাকা দিয়ে পুলিশ মারতে না পারে। তবে, এতে তেমন ফায়দা হয়নি। অগত্যা, অন্য কোন উপায় নেই দেখে, মাফিয়ার সমর্থক বা সদস্য বলে যাকেই সন্দেহ হয় তাকেই গ্রেফতার করে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়া হলো অন্য কোন দ্বীপে। এই পদ্ধতিতে অবশ্য পুলিশ অফিসারের উদ্দেশ্য সফল হলো।

তারপর মিত্রপক্ষের সৈন্যরা যখন সিসিলিকে মুক্ত করল, মার্কিন সামরিক সরকারের মনে হলো ফ্যাসিস্ট শাসনামলে যাকেই জেলে ভরা হয়েছে সে নিশ্চয়ই গণতন্ত্রের খাটি সমর্থক। মার্কিনীরা মাফিয়া সদস্য আর তাদের সমর্থকদের অসংখ্য লোককে শহর-গ্রামের মেয়রের পদ আর সামরিক সরকারের দোভাষীর পদে নির্বাচিত করল। অপ্রত্যাশিত এই সৌভাগ্য লাভ করে আবার পুনর্গঠিত হওয়ার সুযোগ পেল মাফিয়া সংগঠন। আবার তারা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল।

খানিকটা ঘূমের জন্যে প্রচুর পরিশ্রম আর সাধ্য-সাধনা করতে হয় মাইকেলকে। অনেক দূর পর্যন্ত হাটে ও, রাতে গুরুপাক এক প্লেট 'পাস্তা' এক বোতল কড়া মদ আর প্রচুর মাংস খেতে হয় ওকে। ইতালীয় ভাষায় লেখা অসংখ্য বই আছে ডাক্তার-তাজার লাইব্রেরিতে। কলেজে খানিকটা ইটালিয়ান পড়েছে মাইকেল, ইতালির আঞ্চলিক ভাষায় কিছু কিছু কথাও বলতে পারে, তবু বইগুলো পড়তে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে ওকে। তবে এই কষ্টটুকু স্বীকার করায় একটা লাভ হলো। উচ্চারণ আর টান প্রায় নিখুঁত হয়ে এল ওর। এখন আর ওর কথায় বিদেশী টান নেই। কিন্তু তাই বলে নিজেকে স্থানীয় লোক বলে চালানো সম্ভব নয়। সবাই ভাবে, এই স্ফুটন্ত মানুষটা সুইজারল্যান্ড আর জার্মানীর কাছাকাছি সীমানা থেকে এসেছে।

মুখের ভাঙা বাঁদিকটার জন্যে এদিকের লোক বলে মনে হয় ওকে। চেহারায়ে এ-ধরনের বিকৃতি সর্বত্র প্রচুর সংখ্যায় দেখা যায় সিসিলিতে। তার কারণ, এখানে চিকিৎসার অভাব সবচেয়ে বড়। তাছাড়া, ছোটখাটো ক্ষত বা শারীরিক ত্রুটির চিকিৎসা হয় না টাকার অভাবেও। এখানে ছেলে থেকে বুড়ো পর্যন্ত সবার চেহারায়ে এমন সব বিকৃতি লক্ষ করা যায় যা সামান্য একটু অপারেশন বা ডাক্তারির সাহায্যে শুধরে নেয়া যায় আমেরিকায়।

কে-এর কথা প্রায়ই মনে পড়ে মাইকেলের। মনের পর্দায় ভেসে ওঠে তার

মুখের হাসি। চোখ বুজলে তার শরীরটাও দেখতে পায় ও। যখনই মনে পড়ে তার কথা, প্রতিবার বিবেকের দংশন অনুভব করে ও। একটা অপরাধবোধে জর্জরিত হয়। চলে আসার সময় বিদায় জানানো হয়নি, ওদের সম্পর্কের যে এখানেই ইতি সে-কথা বলা হয়নি—সেটাই ওর অপরাধবোধের কারণ। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, দু-দু'জন লোককে খুন করে আসায় ওর মনে কোন অপরাধবোধ নেই। ওদের ব্যাপারে বিবেকের দংশন অনুভব করে না ও। তার কারণ, ওরা দু'জন ওর ক্ষতি করার চেষ্টা করেছিল। সলোযো ওর বাবাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল, আর ক্যাপটেন ম্যাকক্লাস্কি তো ওর চেহারাই বিকৃত করে দিয়েছে চিরকালের জন্যে।

মাইকেল ব্যথা কমানোর ওষুধ চাইলেই ডা. তাজা ওর ভাঙা মুখের চিকিৎসা করার জন্যে চাপ দেন। যত দিন যাচ্ছে আরও ঘন ঘন দেখা দিচ্ছে ব্যথাটা, সেই সাথে ভীষণতাও বাড়ছে।

এ-ব্যাপারে একটা সবিস্তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন ডা. তাজা। চোখের নিচে একটা স্নায়ু আছে, সেটা থেকে আরও অনেক খুদে স্নায়ু বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে থাকে চারদিকে। মারফিয়া ওঁওরা সাংঘাতিক পছন্দ করে মুখের ওই জায়গাটা। বরফ ভাঙার গাঁইতির ছুঁচের মত সরু ডগা দিয়ে ঠিক ওই জায়গাটা বেছে নিয়ে খোঁচা দেয় ওরা। ওই স্নায়ুটাই জখম হয়েছে মাইকেলের। এমনও হতে পারে, সরু এক চিলতে হাড় ফুটে আছে ওখানে। পালার্মোর হাসপাতালে গেলেনই ল্যাঠা চুকে যায়। ছোট্ট একটা অপারেশন। তাতে চিরদিনের মত দূর হয়ে যাবে ব্যথাটা।

কিন্তু মাইকেল তাতে রাজী নয়। ডাক্তার কারণ জানতে চাইলে শুধু একগাল হাসে। একদিন উত্তরে বলল: বাড়ি থেকে সাথে করে আনা জিনিস যে ওটা।

ব্যথাটাকে গ্রাহ্য করে না মাইকেল। খুলির ভিতর স্পন্দনের মত টনটনে একটা ভাব অনুভব করে ও। জায়গাটাকে যেন যন্ত্রের সাহায্যে পরিষ্কার করার জন্যে পানিতে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে।

পল্লী-গ্রামে এক এক করে সাতটা মাস কেটে গেছে। এবার সত্যি একঘেয়ে লাগছে মাইকেলের। এই সময়টায় নিজের কাজ-করবারেও সাংঘাতিক ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন ডন টমাসিনো। আজকাল তাঁকে বড় একটা দেখা যায় না বাগানবাড়িতে।

নতুন একদল মারফিয়া মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে পালার্মোতে, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন আর গৃহনির্মাণ কারবারে চুকে পড়ে বস্তা বস্তা টাকা রোজগার করেছে তারা। পুরানো মারফিয়া নেতাদের গ্রাম্য জমিদারিতে অনধিকার অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালাচ্ছে তারা ওই টাকার জোরে। পুরানো, বুড়ো নেতাদেরকে তারা শ্রদ্ধা করে না, 'গুঁফো সর্দার' বলে তামিল্য প্রকাশ করে। এদের হাত থেকে নিজের সম্পত্তি রক্ষার কাজেই খুব ব্যস্ত হয়ে আছেন ডন টমাসিনো। ফলে তাঁর সঙ্গে থেকে আপাতত বঞ্চিত হচ্ছে মাইকেল। ওদিকে ডা. তাজা এখনও ওকে গল্প শোনান বটে, কিন্তু তাঁরও ভাঙার নিঃশেষ হয়ে গেছে, ফলে প্রথম থেকে আবার তিনি পুনরাবৃত্তি শুরু করেছেন।

এর মধ্যে একদিন মনস্থির করল মাইকেল, কর্নিয়নি গ্রাম ছাড়িয়ে আরও অনেক দূর পর্যন্ত বেড়াতে যাবে ও, সেই পাহাড় উপকে আরও ভিতর দিকের গ্রামগুলোয়।

বলাবাহুল্য, সেই রাখাল দেহরক্ষীদেরকেও সাথে নিল মাইকেল। সিসিলিতে

কর্লিয়নি পরিবারের শত্রু আছে, তাদের ভয়ে দেহরক্ষী নিয়ে চলাফেরা করতে হয় মাইকেলকে, ব্যাপারটা সেরকম নয়। আসল কথা, এলাকাটা সামাজিক বিপজ্জনক। স্থানীয় নয় এমন যে-কোন লোকের জন্যে একা বাইরে ঘুরে বেড়ানো আত্মহত্যা করার সামিল। অনেক সময় এমন কি স্থানীয় লোকেরাও নিরাপদ নয়, তাদেরও বিপদ ঘটতে পারে। চোর ডাকাত গিজগিজ করছে চারদিকে, তার উপর চলছে নিজেদের মধ্যে মাফিয়া দলগুলোর মারামারি কাটাকাটি। এই সব কারণে সাধারণ লোকেরাও টপাটপ খুন হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া, একা বেরুলে, ‘পাগলিয়াও’-চোর বলে মনে করা হতে পারে মাইকেলকে।

খেতের মাঝখানে খড় দিয়ে তৈরি চালের ঘরগুলোকে বলে পাগলিয়াও। এই ঘরগুলোয় চাষবাসের জন্যে যতরকম হাতিয়ার আর যন্ত্রপাতি লাগে তার সবই রাখা হয়। প্রয়োজনে ওখানে বিশ্রাম নিতে পারে শ্রমিকরাও। সিসিলিতে খেতগুলো গ্রাম থেকে অনেক দূরে, রোজ রোজ কৃষি যন্ত্রপাতিগুলো বয়ে নিয়ে আসার ঝামেলা থেকে রেহাই পাবার জন্যে এই ব্যবস্থা। খেতের কাছেপিঠে বসবাস করার অনেক বিপদ। তাছাড়া, ঘর তুলে খেতের জমি নষ্ট করতে চায় না কেউ। চাষীরা সবাই যে-যার গ্রামে থাকে, সূর্য উঠতে যা দেরি, অমনি সবাই খেতের দিকে হাঁটা দেয়। পায়ে হাঁটা ডেলি প্যাসেঞ্জার বলা চলে এদেরকে। কিছুদিন আগে পাগলিয়াও থেকে যন্ত্রপাতি চুরির হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। এতে চাষীর সামাজিক ক্ষতি হত, তার কারণ সরকার বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী চুরি যাওয়া জিনিস কখনোই উদ্ধার করে দিতে পারত না। আইন যখন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো, স্থানীয় মাফিয়া সংগঠন তখন গরীব চাষীদের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এল। তারা নিজেদের আলাদা নিয়মে সমস্যার সমাধান করে ফেলল। অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এখানেও তারা প্রায় সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। গর্তের ভিতর ধোঁয়া দিয়ে যেমন ইঁদুর বের করা হয় তেমনি কৌশলে যেখানে যত ‘পাগলিয়াও’ চোর ছিল তাদের সবাইকে তাড়া করে বের করে আনা হতে লাগল ঘরের বাইরে, তারপর গুলি করে মেরে ফেলা তো পানির মত সহজ কাজ। একথা সত্যি যে এই পাইকারী হত্যাযজ্ঞের দরুন বেশ কিছু নিরীহ ভাল মানুষও মারা পড়ল।

তবে, চাষীদের যন্ত্রপাতি এখনও কিছু কিছু চুরি যায়। তাই সন্দেহ লুঠ করা কোন পাগলিয়াও-এর আশে পাশে ঘুর ঘুর করতে দেখলে মাইকেলকেও ওরা চোর বলে মনে করতে পারে, কিন্তু ওর সাথে স্থানীয় কোন চেনা লোক জামিন হিসেবে থাকলে আলাদা কথা।

সকালটা মিষ্টি রোদে ভরা। খেতের মধ্যে দিয়ে হাঁটছে মাইকেল। রাখাল দু’জনও আসছে ওর পিছু পিছু।

রাখালদের একজন খুবই সাদাসিধে, যাকে বলে ভাল মানুষের গাছ। দেখেও মনে হয়, আর আসলেও কথাটা সত্যি—লোকটার মাথায় বুদ্ধি-সুদ্ধি বলতে গেলে একেবারেই নেই। লোকটার নাম কার্লো। মরা মানুষের মুখে যেমন কথা থাকে না, কার্লোর মুখেও কথা নেই, তবে বোবা নয় সে, মুখটা রেডইণ্ডিয়ানদের মত ভাবলেশহীন। রোগা পাতলা লোক, শরীরের বাঁধুনির মধ্যে একটা ক্ষিপ্ত ভাব আছে—মাঝ বয়সী সিসিলীয়দের গায়ে চর্বি জমতে শুরু করার আগে যেমন থাকে।

অপর রাখালটা ঠিক তার উল্টো। উদ্যমী, উৎসাহী, প্রাণচঞ্চল এক যুবক। সিসিলি ছাড়াও অন্যান্য দেশ দেখার সুযোগ হয়েছে তার। অবশ্য বেশির ভাগ সমুদ্রই দেখেছে, স্থলভাগ দেখার বিশেষ কোন সৌভাগ্য হয়নি। যুদ্ধের সময় নাবিক হিসেবে ইটালিয়ান নৌ-বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল সে। জাহাজ ডুবির আগে বেচারি উল্কি পরার সময়টুকু পেয়েছিল মাত্র। বৃটিশরা তাকে বন্দী করে। কিন্তু ছাড়া পেয়ে যখন গ্রামে ফিরে এল, ওই উল্কিটার জন্যে মস্ত এক কেউকেটা বনে গিয়েছিল।

সিসিলির লোকদের উল্কি পরতে দেখা যায় না বললেই চলে। আসলে, সুযোগ নেই, সেজন্যে ইচ্ছাও নেই। এই রাখালটার নাম ফ্যাব্রিয়সিও। উল্কি সে শখ করে পেরেনি, তার পেটের উপর বেটপ আকৃতির লাল একটা জড়ুল আছে, সেটা ঢাকার জন্যে পরেছিল।

সিসিলীয়রা উল্কি না পরলেও রঙচঙে ছবি তারা খুবই ভালবাসে। মাফিয়া সংগঠনের যে সব সদস্য বা সমর্থক হাতে গিয়ে বেচাকেনার ব্যবসা করে তাদের কাঠের তৈরি গাড়িতে আশ্চর্য সব আদি রসাত্মক ছবি আঁকা থাকে। প্রচুর শ্রম আর স্নেহ ঢেলে আঁকা হয় রঙচঙে দৃশ্যপটগুলো।

তবে, একথা সত্যি, গ্রামে ফিরে এসে ফ্যাব্রিয়সিও তার উল্কিটাকে নিয়ে খুব বেশি গর্ব করত না। কিন্তু উল্কিতে আঁকা ছবিটার বিষয়বস্তু অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং সিসিলীয়দের আত্মসম্মান জ্ঞানের সাথে জড়িত একটা ব্যাপার। ফ্যাব্রিয়সিওর পেটটা লোমশ। উল্কির ছবিতে দেখা যায় একজোড়া নরনারী, দু'জনেই সম্পূর্ণ বিবস্ত্র, জড়াজড়ি করে রয়েছে—ওদেরকে ছোঁরা মারছে একজন লোক, সে হলো মেয়েটার প্রতারিত স্বামী।

ছোকরা চটপটে, রসিকতা পছন্দ করে। সুযোগ পেলেই মাইকেলের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করে সে, কৌতূহল মেটাবার জন্যে নানা প্রশ্ন করে আমেরিকা সম্পর্কে। মাইকেলের আসল ঠিকানা এই দু'জন রাখালের কাছ থেকে গোপন করে রাখা সম্ভব হয়নি। তবে মাইকেলের প্রকৃত পরিচয় ওদেরকেও জানানো হয়নি। আমেরিকা থেকে এখানে এসেছে নুকিয়ে থাকার জন্যে, এর বেশি কিছু জানে না তারা। আর জানে, এই লোক সম্পর্কে কাউকে কিছু বলা চলবে না।

প্রায়ই পনির এনে দেয় ফ্যাব্রিয়সিও মাইকেলকে। জিনিসটা এত টাটকা যে ঘামের মত পনিরের গায়ে বিন্দু বিন্দু দুধ লেগে থাকে।

ধুলোয় মোড়া পাড়ার পথ ধরে হাঁটছে ওরা। ওদের পাশ ঘেঁষে এগোচ্ছে রঙচঙে ছবি আঁকা গাধায় টানা গাড়ি। যেকোনো তাকালেই দেখা যাচ্ছে গোলাপী ফুল, কমলা লেবুর বাগান, জলপাই আর কাগজি বাদামের কুঞ্জবন। যত দেখে ততই অবাক হয় মাইকেল। যত বই পড়েছে ও, সব ক'টাতে ফলাও করে সিসিলীয়দের দারিদ্রের কথা সবিস্তারে লেখা আছে। তাই মনে করেছিল, যত সামনে এগোবে ততই বন্ধ্য, অনুর্বর নিঃস্র জমি দেখতে পাবে সে। কিন্তু বেড়াতে বেরিয়ে দেখেছে দেশটার চারদিকে শুধু প্রাচুর্য উপচে পড়ছে। পায়ের তলায় এত ফুলের গালিচা। লেবু-ফুলের সুবাস ঢুকছে নাকে। কী সুন্দর এই দেশ! অথচ এই দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যায় কিভাবে মানুষ? সে-দুঃখ সয় কিভাবে? ভেবে

কোন কূল পাচ্ছে না মাইকেল। হঠাৎ উপলব্ধি করল ও, মানুষ যে মানুষের ওপর কতটা নির্মম অত্যাচার চালাতে পারে তার একটা পরিমাপ পাওয়া যায় এই নন্দনকানন ছেড়ে দল বেঁধে চিরকালের জন্যে অন্য কোথাও লোকজনের চলে যাওয়া থেকেই।

ইচ্ছা ছিল পায়ে হেঁটে মাজারা গ্রাম পর্যন্ত যাবে ও গ্রামটা সমুদ্রতীরে। তারপর বিকেলের দিকে কর্নিয়নিতে ফিরে আসবে বাসে চেপে। এতটা পরিশ্রমে শরীর নিশ্চয়ই ক্লান্ত হবে, তাতে নির্মাণ চোখে ঘুম আসবে রাতে। চিন্তার কিছু নেই, প্রচুর কুটি আর পনির আছে রাখালদের পিঠে ঝোলানো থলিতে। পথে কোথাও থেমে মধ্যাহ্নভোজন সেরে নিলেই হবে। লুপারা বন্দুক গোপন করে রাখার কোন চেষ্টা নেই রাখালদের মধ্যে, দেখে যাতে মনে হয় শিকারের তল্লাশে সারাটা দিন কাটাতে যাচ্ছে ওরা।

আশ্চর্য সুন্দর লাগছে আজকের সকালটা। ছোটবেলার কথা, একদিন খুব ভোরে উঠে মাঠে বল খেলতে গিয়েছিল মাইকেল, সেদিন অদ্ভুত এক পুলকে শরীর আর মন পুলকিত হয়ে উঠেছিল ওর—সেই রকম রোমাঞ্চকর পুলক আজও অনুভব করছে সে। সেই ছোটবেলার প্রতিটি সকাল দেখে মনে হত নতুন করে ধুয়ে সাফসুতরো করে কে যেন রঙ দিয়ে কি সুন্দর ভাবে একে দিয়েছে। আজকের সকালটাকেও ঠিক সেই রকম লাগছে।

জমকালো ফুলের গালিচা পাতা সিসিলি। বাতাস ভারী হয়ে আছে কমলা আর লেবু ফুলের গন্ধে। সে-গন্ধ এত তীব্র যে দীর্ঘদিন বুজে থাকা গন্ধনালী ভেদ করে ভিতরে ঢোকান পথ করে নিতে পারল, সেই মন মাতানো গন্ধ বুকে টেনে নিয়ে পুলকিত হয়ে উঠল মাইকেল।

ওর ভাঙা মুখের ক্ষতটা সম্পূর্ণ সেরে গেছে, তবে হাড়টা জায়গামত জোড়া লাগেনি। তাছাড়া, সাইনাসগুলোর উপর একনাগাড়ে চাপ লাগায় বাঁ চোখে ব্যথা অনুভব করে। শুধু তাই নয়, সবচেয়ে বিচ্ছিরি ব্যাপার হলো, অনবরত পানি ঝাবে নাক দিয়ে, রুমালটা ভিজ়ে জবজবে হায়ে যায় শ্লেষ্মায়—গেঁয়ো, অসভ্য চাষাদের মত নাক ঝাড়তে হয় মাটির উপর। অথচ ছোটবেলার কথা মনে আছে মাইকেলের, রুমাল ব্যবহার করা নাকি ইংরেজি বাবুগিরি, তাই বুড়ো ইতালীয়রা ওটা ব্যবহার করত না, পিচঢালা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ড্রেনে নাক ঝাড়ত—সে দৃশ্য সাজাতিক ঘৃণার উদ্দেক করত ওর মনে।

আরেকটা ব্যাপার। মুখটা আগের চেয়ে অনেক ভারী হয়ে গেছে, অস্বস্তির সাথে অনুভব করে মাইকেল। অজায়গায় জোড়া লেগেছে হাড়, তাতে চাপ পড়ছে সাইনাসে, সেটাই নাকি এর কারণ—বলেছেন ডা. তাজা ডিমের খোলা ভাঙন, ডাক্তারি ভাষায়, তিনি জানিয়েছেন, ‘জাইগোমার’। তার বক্তব্য, হাড় জোড়া লাগার আগে ভাল একজন ডাক্তারকে দেখানো উচিত ছিল, চামচের মত একটা যন্ত্র দিয়ে সেই ডাক্তার যদি ঠেলে হাড়টাকে যথাস্থানে বসিয়ে দিত, তাহলে আর এই অবস্থার সৃষ্টি হত না। এখন এর একমাত্র উপায়, ডা. তাজা জানিয়েছেন, পালার্মোতে যেতে হবে, সেখানের একটা হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে মাইকেলকে। অপারেশন ছাড়া এর চিকিৎসা নেই। এই বিশেষ অপারেশনটার

নামও বলে দিয়েছেন ডা. তাজা—‘ম্যাক্সিমো-ফেশ্যাল-সার্জারি’। বড়সড় একটা সার্জারি, ঠিক জায়গায় জোড়া লাগাবার জন্যে আবার ভেঙে নিতে হবে হাড়টাকে। এই শেষ কথাটাই মাইকেলের জন্যে যথেষ্ট। প্রবল আপত্তি জানিয়ে অপারেশন করাবার ধারণাটাকেই বাতিল করে দিয়েছে ও। ওদিকে ব্যথা বা নাকে সর্দি আসার চেয়ে বেশি কষ্ট দেয় ওকে মুখের ওই ভারী ভাবটা।

আজ আর সমুদ্র তীর পর্যন্ত বেড়ানো হলো না ওদের মাইল পনেরো বাকি থাকতে একটা কমলা বনের সবুজ শীতল কোমন ছায়ায় বসে পড়ল মাইকেল, ওর দেখাদেখি অনুগত ভৃত্যের স্নাত বসল রাখাল দু’জনও। মদ আর খাবার দিয়ে পেট ভরাবে এখন। সেই কখন থেকে বক বক করে চলেছে ফ্যাব্রিয়সিও, এখনও সমানে চালিয়ে যাচ্ছে। তার একটাই বক্তব্য, একদিন সে যেভাবে ছোক যাবেই আমেরিকায়।

পান এবং আহারের পর গাছের ঠাণ্ডা ছায়ায় শুয়ে পড়ল মাইকেল, দেখাদেখি রাখাল দু’জনও। শার্টের বোতাম খুলে একটা খেলা দেখাচ্ছে ফ্যাব্রিয়সিও, পেটের পেশী সঙ্কুচিত করে জ্যান্ত করে তুলছে উকির ছবিটাকে। বিবস্ত্র প্রেমিক-প্রেমিকার শরীর রতিক্রিয়ার ভঙ্গিতে নড়েচড়ে উঠছে, যে ছোরাটা ওদের শরীরে গ়েঁথে দিয়েছে প্রতারিত স্বামী সেটা কাঁপছে থরথর করে। আরেক রাখাল কার্লো আর মাইকেল তাই দেখে খুব মজা পাচ্ছে। ঠিক সেই মুহূর্তে প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেল মাইকেলের মগজে। সিসিলির লোকেরা যাকে ‘মাথায় বাজ পড়া’ বলে ঠিক তাই হলো মাইকেল কর্লিয়নির। এক নিমেষে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ভেঙে পড়ল যেন ওর মাথায়।

সামনে কমলাকুঞ্জ, তার পিছনে জমিদারের খেত। খেতের চারধারে সবুজ লতাপাতা আর ঘাসের পাড়। কুঞ্জবন থেকে সামান্য একটু দূরে দেখা যাচ্ছে একটা বাগানসহ বাড়ি। বাগানবাড়িটার আকার-আকৃতি এত বেশি রোমক-ধাঁচের যে একবার তাকালেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে পম্পিয়াইয়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে খুঁড়ে বের করে তারপর এখানে তুলে এনে বসিয়ে দেয়া হয়েছে ছোটখাটো একটা প্রাসাদই বলা চলে। গাড়ি বারান্দাটা বিশাল, শ্বেত-পাথরের তৈরি। প্রকাণ্ড থামগুলোর গায়ে গ্রীসীয় ধাঁচে খাঁজ কাটা। দুটো থামের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে এল গ্রামের একদল মেয়ে, সাথে মোটা মোটা দু’জন বয়স্ক গিল্লি মহিলা, পরনে কালো পোশাক। অবশ্য-পালনীয় একটা কর্তব্য সম্পাদনের জন্যে গ্রাম থেকে এসেছে ওরা। বাগানবাড়িটা জমিদারের, সেটা সাফসুতরো করে রাখা ওদের দায়িত্ব, যাতে শীতকালটা কাটাতে এসে সব কিছু ঝকঝকে তকতকে দেখতে পান জমিদার।

এখন নাঠের দিকে যাচ্ছে মেয়ের দল, সেখান থেকে ফুল তুলে আনবে ওরা, বাগানবাড়ির ঘরে ঘরে সাজিয়ে রাখতে হবে। গোলাপী রঙের ‘সুলা’-র, বেগুনী রঙের উইন্টারিয়ার সাথে লেবু ফুল, কমলা ফুল। তিন তিন জন পুরুষ মানুষ কমলা-বনে বিগ্রাম করছে, মেয়েদের চোখে ব্যাপারটা ধরাই পড়েনি। দ্রুত আরও কাছে চলে আসছে ওরা।

মেয়েদের গায়ের সাথে আঁটসাঁট ভাবে লেপ্টে আছে সস্তা ছিট কাপড়ের পোশাক। সবার বয়স কুড়ির নিচে, কিন্তু এই কম বয়সেই মেয়েদের শরীরে পরিপূর্ণ যৌবন বিকশিত হয়ে উঠেছে, রোদের দেশের যা নিয়ম। দলের তিন চারটে মেয়ে

অপর একটা মেয়েকে তাড়া করছে, তাড়া খেয়ে হরিণীর মত ছুটছে মেয়েটা, সোজা এই কমলা-বনের দিকেই এগিয়ে আসছে। বেগুনী আঙ্গুরের মস্ত একটা গুচ্ছ দেখা যাচ্ছে তার হাতে, তা থেকে একটা করে আঙ্গুর ছিঁড়ে সে, ছুঁড়ে মারছে পিছন দিকে, তাকে যারা ধাওয়া করছে তাদেরকে লক্ষ্য করে। তার হাতের ওই আঙ্গুরের মতই গাঢ় বেগুনী রঙের একরাশ চুল মুকুটের মত শোভা পাচ্ছে তার মাথায়। মেয়ে নয়, পরী! তার শরীরের বর্ণনা দিতে হলে মহাকাব্য রচয়িতার মুস্যিানাতেও বুঝি কুলাবে না। ত্বকের মোড়ক ছিঁড়ে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে যৌবন।

কমলা-বনে প্রায় পৌঁছে গেছে মেয়েটা। এই সময় হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। সবুজ বনে পুরুষদের শাটের বেমানান রঙ চোখে পড়ে গেছে তার। অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটা, কিন্তু তার এই দাঁড়াবার ভঙ্গির মধ্যেও কি এক অদ্ভুত শিল্প রয়েছে। পায়ের আঙুলগুলোর ডগা ব্রেক কখন যেন, ক্ষুরের মত ধারাল কিছু উপর দাঁড়িয়ে ভারসাম্য রক্ষা করছে যেন, ত্রস্তা হরিণীর মত ছুটে পালাবে এখুনি। কিন্তু এরই মধ্যে খুব কাছাকাছি চলে এসেছে সে। মাইকেল কর্নিয়নি তার মুখে প্রতিটি রেখা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

শরীরের রেখা আর ভাঁজগুলো গোল, ডিম্বাকৃতি। চোখজোড়া টানা টানা। সৃষ্টিকর্তা যেন কত রাত জেগে কি ভীষণ পরিশ্রম করে এমন নিখুঁত, এমন অবিশ্বাস্য সুন্দর একটা মুখ গড়েছেন। ছোট সুডৌল কপালে যে সৌন্দর্য দেখতে পাচ্ছে মাইকেল, লক্ষ-কোটি হীরে-জহরত মণি-মাণিক্য দিয়েও এর সমান সৌন্দর্য সৃষ্টি করা কখনও সম্ভব হবে না। গাঢ়, ঘন ঘি-এর মত আশ্চর্য গভীর তার গায়ের রঙ গাঢ় বেগুনী, অথবা বর্জ্জা যায় কান্চে রঙের সুদীর্ঘ চোখের পাপড়ি, ভীষণ সুন্দর মুখের ওপর ছায়া ফেলেছে। আয়ত নোচন। পরিপুষ্ট এক জোড়া ঠোঁট, কিন্তু স্থূল নয়; মিষ্টি অথচ দুর্বল নয়। রসালো আঙ্গুরের মত টসটসে।

এ কেমন সৌন্দর্য! এ কেমন অবিশ্বাস্য রূপ! ফ্যাব্রিয়িয়োর মনে হলো, দম ফেটে মারা যাচ্ছে সে। নিজের অজান্তেই চাপা স্বর বেরিয়ে এলো তার গলার ভেতর থেকে, মরে গেলাম, প্রভু যীশু! তুমি আমাকে তুলে নাও। ফ্যাব্রিয়িয়োর কথা শুনে পেয়েই বুঝি শরীরের ভার আঙুলের ডগা থেকে নামিয়ে, চরকির মত আধপাক ঘুরে ত্রস্তা হরিণীর মত বান্ধবীদের কাছে ফিরে গেল মেয়েটা। ছাপা কাপড়ের আটো পোশাকের নিচে বুনো প্রাণীর সহজ সাবলীল হাঁটার ভঙ্গি, প্রকৃতির কন্যার মতই নিষ্পাপ কামনাময়, নির্মল আর আদম্য।

বন্ধুদের মাঝখানে পৌঁছল মেয়েটা। আঙ্গুরের গুচ্ছ ধরা হাতটা বাড়িয়ে কমলা-বনের দিকটা দেখিয়ে দিল তাদেরকে। সাথে সাথে পুরুষদেরকে দেখতে পেয়ে খিলখিল করে মিষ্টি সুরে হেসে উঠল সব ক'টা মেয়ে। কালবিলম্ব না করে ছুটে পালাচ্ছে ওরা। পিছন পিছন যাচ্ছে কালো পোশাক ধরা মোটাসোটা বয়স্ক দু'জন গিল্লী, ওদেরকে ধাওয়া করে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, খই ফুটছে মুখে, বকা-ঝকা করছে দসি মেয়েগুলোকে।

আর মাইকেল কর্নিয়নির কি অবস্থা? তার কথা আর কিইবা বলা যায়। কখন, কিভাবে উঠে দাঁড়িয়েছে, নিজেও সে তা জানে না। মাথাটা ঘুরে উঠল, তারপর এই

এতক্ষণে আবিষ্কার করল, দাঁড়িয়ে আছে সে। ধড়াস ধড়াস করে বাড়ি খাচ্ছে বুকের খাঁচায় হৃৎপিণ্ড। মাথাটা এখনও ঘুরছে একটু একটু। রক্তে তার বান ডেকেছে, শিরায় শিরায় প্লাবন বয়ে যাচ্ছে—শরীরের সর্বশেষ সীমানায় পৌঁছে হাত আর পায়ের আঙুলের ডগায় আছাড় খেয়ে পড়ছে রক্ত স্রোত। দ্বীপের যত সুগন্ধ বাতাসে ভর করে সব তার নাকে উড়ে এলো—কমলা-ফুল, নেবু-ফুল, পাকা আঙ্গুর আর কসুম সস্তারের সমস্ত সুগন্ধ। তারপর রাখালদের হাসি ঢুকল ওর কানে।

‘মাথায় বাজ পড়ল, সত্যি কিনা?’ বলল ফ্যাব্রিয়সিও। সন্নেহে মাইকেলের কাঁধে একটা হালকা চাপড় মারল সে।

বোকা হাবা কার্লো পর্যন্ত বিমূঢ় হয়ে পড়েছে মাইকেলের করুণ অবস্থা দেখে। পরম বন্ধুর মত সে-ও মাইকেলের হাত ধরে একটু নাড়া দিল। আদরের সুরে বলল, ‘মাথা ঠাণ্ডা রাখো, ব্যাটা, শান্ত হও।’

ঝড়ের বেগে ধাবমান একটা মোটর গাড়ি যেন দূম করে ধাক্কা মেটরেছে মাইকেলকে। পরিস্থিতি বুঝে, বুদ্ধি করে একটা মদের বোতল বাড়িয়ে ধরল ফ্যাব্রিয়সিও। বোতলটা প্রায় ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে সেটা থুথেকে ঢক ঢক করে কয়েক ঢোক মদ খেলো মাইকেল। পরিষ্কার হয়ে গেল মাথাটা।

‘আই, হতভাগা! তোরা কি বলতে চাইছিস?’

দু’জন রাখালই হাসছে।

ইঠাৎ ভালোমানুষ কার্লোর ভাবলেশহীন মুখটা আশ্চর্যজনক গম্ভীর হয়ে উঠল। তারিক্কী ভঙ্গিতে বলল সে, ‘দেখো হে, মাথায় যদি কারো বাজ পড়ে, তা আর লুকোবার জো নেই—তাকালেই দেখতে পায় সবাই। ফ্ল্যুয়, যীশু, এতে আবার লজ্জা কিসের? মানুষ তো মাথায় বাজ পড়ার আশায় সাধনা করে, গির্জায় প্রার্থনার আয়োজন করে। এ তো তোমার পরম সৌভাগ্য!’

এতো সহজে ওর মনের অবস্থা রাখালরা বুঝে ফেলেছে লক্ষ করে মোটেই সন্দেহ নয় মাইকেল। ভাবছে, এমন ঘটনা এই প্রথম ঘটল ওর জীবনে। কিশোর বয়সে একে তাকে এক-আধটু ভাল লাগত বৈকি, কিন্তু এর সাথে সে-সবের কোন মিলই নেই। এতোদিন কে-কে ভালবেসে এসেছে ও, সেই ভালবাসার সাথেও এর কোন মিল নেই। কে-এর স্বাভাবিক ম্যুধূর্য, তার সরলতা আর বুদ্ধি মত্তা, এই সবই ছিল তাকে ভালবাসার আসল কারণ। একজনের কালো চুল, আরেকজনের সোনালী, সেটাও একটা আকর্ষণ ছিল।

কিন্তু এটা সম্পূর্ণ অন্য রকম। দেখামাত্র দুর্দমনীয় বাসনা জেগে উঠেছে, যেভাবে হোক অধিকার করতে হবে অপক্লপ সৌন্দর্য আর যৌবনের আধারটাকে। ওকে পাবার জন্যে দুনিয়াটাকে পায়ে দলতে হয়, যদি নিজের গায়ের মাংস কেটে বিক্রি করতে হয়—হাসি মুখে তা করতে পারবে মাইকেল। মেয়েটার মুখের ছবি গঁথে গেছে ওর মগজে। ও বুঝতে পারছে, মেয়েটাকে না পেলে অসহায় একটা পতঙ্গ মত, মানবোত্তর জীবন যাপন করতে হবে তাকে, নিজের কাছে এত হয়ে হয়ে যাবে যে কোন দামই থাকবে না নিজের অস্তিত্বের। সারাটা জীবন, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে পর্যন্ত মেয়েটার স্মৃতি পীড়া দেবে ওকে।

সেই সাথে অনুভব করছে মাইকেল, আশ্চর্য সহজ হয়ে গেছে তার জীবনটা।

তার সমস্ত অস্তিত্ব এখন কেন্দ্রীভূত হয়েছে একটা মাত্র বিন্দুতে। ওই মেয়েটা, সেই ওর সম্পূর্ণ জীবন। বাকি আর যা কিছু রয়েছে সেগুলোর কোন মূল্য নেই, তাৎপর্য নেই—মনে হচ্ছে, দুনিয়ার আর সব ব্যাপার এতই তুচ্ছ যে সেগুলো সম্পর্কে এক সেকেণ্ডে চিন্তা করারও কোন দরকার নেই। সমস্ত কিছুই চিন্তার অযোগ্য।

সিসিলিতে এই নির্বাসনের দিনগুলোয় প্রায়ই কে-র কথা ভাবে মাইকেল। ও বুঝতে পারে, সেই প্রেমের সম্পর্ক ওদের মধ্যে আর কখনও ফিরে আসবে না। কে-র সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্কও আর সম্ভব নয়। যতভাবেই চাপা দেবার চেষ্টা করা হোক, সে একজন খুনি তো বটে। এখন সে একজন ‘ম্যাফিয়োসো’ যার পৌরুষের পরীক্ষা হয়ে গেছে, পাস করেছে সে। এর ফলে কে-কে হারাতে হয়েছে তাকে, চিরকালের জন্যে। তবু কে-র স্মৃতি মন থেকে মুছে যায়নি এতোদিন। কিন্তু আজ এই একটু আগে যা ঘটে গেল, মাইকেলের চেতনা থেকে কে-এর সমস্ত স্মৃতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল এক নিমেষে।

‘চলো, গ্রামে যাই, মেয়েটার খবর আনি,’ ব্যাকুল ব্যস্ততার সাথে বলল ফ্যাব্রিয়ানো। ‘যা মনে হচ্ছে তা হয়তো নয়—ততটা হয়তো নাগালের বাইরে নয়। বাজ যখন পড়েছেই, তার চিকিৎসা তো করতে হবে, কি বলো, কার্লো? বাজ পড়ার ওই একটা চিকিৎসাই তো আছে। চলো, যাই। গিয়ে দেখাই যাক না কতটা ধরাছোঁয়ার বাইরে ওই মেয়ে।’

এখন আরও গম্ভীর দেখাচ্ছে কার্লোকে। নিঃশব্দে মাথা দোলান শুধু, কথা বলে পরিবেশের গাম্ভীর্য নষ্ট করল না।

মাইকেল কিন্তু সায়ও দিল না, আপত্তিও জানাল না। দুই রাখাল যখন পাশের গ্রামে যাবার জন্যে হাঁটা ধরল, সে-ও নিঃশব্দে ভিজে বেড়ালের মত পিছু নিল ওদের।

এই পথ ধরেই অদৃশ্য হয়ে গেছে মেয়ের দল।

শেষ পর্ব

এক

সিগিনি।

একই ধাঁচে গড়ে উঠেছে সবগুলো গ্রাম। মাঝখানে মস্ত এক ফাঁকা জায়গা, সেখানে বিরাট এক কৃত্রিম ঝর্ণা, ঝর্ণার চারদিক ঘিরে গ্রামের বাড়ি-ঘর। এই গ্রামটা বড় রাস্তার ধারে বলে কয়েকটা মুদি আর মদের দোকান দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এগুলোর কাছ থেকে সামান্য একটু তফাতে খুদে একটা কাফেও রয়েছে। কাফের সামনে ছোট্ট চাতাল, সেখানে তিনটে টেবিল ফেলা।

রাখালেরা, অর্থাৎ মাইকেল কর্নিয়নির দুই বডিগার্ড, কার্লো আর ফ্যাব্রিয়িয়ো, চাতালে উঠে এসে একটা টেবিল দখল করে বসল। একটু পরই সেখানে এসে জুটল মাইকেল। কিন্তু যে মেয়েগুলোর পিছু নিয়ে এদিকে এসেছে ওরা, তাদের ছায়া পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না কোথাও। গ্রামটাকে নির্জীব, ফাঁকা, আর বৈরী লাগছে মাইকেলের। এদিক ওদিক ঘুর ঘুর করছে ধুলোমাখা কয়েকটা বাচ্চা ছেলে। তারপর চোখে পড়ল ভাবঘুরে চরিত্রের, বিশ্ব-সংসার সম্পর্কে উদাসীন এক গাধা। গ্রামটা যেন এদেরকে নিয়েই। ওদের দেখে বেরিয়ে এল কাফের মালিক। বেঁটে, ছোটখাটো মানুষ, কিন্তু দেখেই বোঝা যায় গায়ে শক্তি রাখে। চেহারায় আন্তরিক আনন্দের ছাপ ফুটিয়ে তুলে অভিবাদন করল সে। 'এ-দিকে আপনারা নতুন, তাই আমার ছেলের কথা জানেন না,' টেবিলে এক প্লেট ভাজা মটর রেখে বলল সে, 'একটু শুধু চেখে দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন কি আশ্চর্য হাত ওদের। এত ভাল মদ ইটালির আর কোথাও পাবেন না। নিজস্ব বাগানের আঙুর দিয়ে আমার ছেলেরা নিজের হাতে তৈরি করেছে এই মদ। এর সাথে আবার লেবু আর কমলা মিশিয়েছে। একবার খেলে ভুলতে পারবেন না।'

অর্ডার দিবার আগে মাইকেলের দিকে একবার তাকাল ফ্যাব্রিয়িয়ো।

প্রচুর মদ দরকার এখন ওর, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। দরাজ ভঙ্গিতে হাত নেড়ে সবচেয়ে বড় জগ ভরে মদ আনতে বলল সে। জিভে ঠেকতে যা দেরি, সাথে সাথে মালিকের কথা স্বীকার করে নিল ওরা। যতটুকু বলেছে মদটা তার চেয়েও ভাল। রঙটা ঘন বেগুনী, ব্যাঙির চেয়েও কড়া।

'জানা কথা,' বলল ফ্যাব্রিয়িয়ো, 'এদিকের সব মেয়েকে চেনেন আপনি। আপনার পথে কয়েকজন সুন্দরী চোখে পড়ল, তাদের একজনকে দেখে,' ইশারায় মাইকেলকে দেখাল সে, 'আমাদের এই মনিব ভদ্রলোকের মাথায় বাজ পড়েছে।'

কৌতূহল ঝিলিক দিয়ে উঠল মালিকের চোখে। খুঁটিয়ে দেখছে এখন মাইকেলকে। এর আগে পর্যন্ত চোয়াল ভাঙা লোকটাকে দেখে তেমন কিছু মনে হয়নি তার। কিন্তু মাথায় বাজ পড়েছে যার, তাকে আর সাধারণ বলে মনে করা যায়

না। তার যন্ত্রণায় কাতর হওয়াটাই তো নিয়ম। 'সত্যি? সত্যি আপনার মাথায় বাজ পড়েছে, বন্ধু? তাহলে আমার একটা পরামর্শ নিন, আরও কয়েকটা বোতল সাথে করি নিয়ে যান, রাতে ঘুমাতে চাইলে এগুলোর সাহায্য দরকার হবে আপনার।'

'মেয়েটার খোঁজ দিতে পারেন? মাথার চুল অস্বাভাবিক কঁকড়া, গায়ের রঙ দুধের সরের মত, খুব কালো আর খুব বড় বড় চোখ?' শান্ত উদ্বেগের সাথে জানতে চাইল মাইকেল। 'খুব সুন্দরী, খুব লম্বা, হাসলে টোল পড়ে গলে,' মাইকেলের বুদ্ধিসূক্তি লোপ পেয়েছে, তা নাহলে লক্ষ করতে ভুল করত না যে তার কথা শুনতে শুনতে কেমন ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে মালিকের ক্ষেহারা। 'বান্ধবীদের সাথে এদিকেই তো এল। দেখেছেন নাকি?'

'না, দেখিনি,' গম্ভীর মুখে কথাটা বলে দ্রুত পিছন ফিরল মালিক, হন হন করে হেঁটে ক্যাফের ভেতর গায়েব হয়ে গেল।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ওরা, ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে মদ খাচ্ছে। খানিক পরই শৈষ হয়ে গেল জগটা, কিন্তু গলা ভেজেনি। আরও মদ চাইছে ওরা। অথচ মালিকের ছায়া পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না কোথাও। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান ফ্যাব্রিয়িয়ো। খোঁজ নিতে গেল। একটু পরই ফিরে এল সে। 'চলো, কর্লিয়নির দিকে হাঁটা দেয়া যাক, সেটাই বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে,' বলল সে। 'যা ভেবেছি ঠিক তাই। মেয়েটা ওরই। ক্যাফের পিছনে বসে মাথা গরম করছে এখন সে, আমাদের ক্ষতি করতে চায়।'

যৌন ব্যাপারে সিসিলীয়রা সাম্রাজ্যিক স্পর্শকাতর, কিন্তু এত দিন এই দ্বীপে বসবাস করার পরও এটাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না মাইকেল। তাছাড়া, ক্যাফের মালিক লোকটার আচরণ একজন সিসিলীয়র পক্ষেও বেশি রক্ষণশীল হয়ে যাচ্ছে। সামান্য একটা ব্যাপার, কেউ তো আর তাকে অপমান করেনি, তাহলে এত বাড়াবাড়ি করার কি মানে?

কিন্তু মালিকের আচরণটাকে কার্লো আর ফ্যাব্রিয়িয়ো অতি স্বাভাবিক বলেই ধরে নিচ্ছে। দুর্ভাগ্যক্রমে ভুল জায়গায় টোকা মারা হয়ে গেছে, সুতরাং এ-ব্যাপারে করার আর কিছুই নেই, এই রকম কিছু একটা ভাবছে ওরা। অপেক্ষা করছে মাইকেল কখন চেয়ার ছেড়ে উঠে বসে দেবে।

'কি বলছিল, জানো?' মাইকেলকে বলল ফ্যাব্রিয়িয়ো। 'ভারি জবরদস্ত দুই ছেলে ওর, তাদের একটা খবর দিলেই নাকি তারা ছুটে এসে আমাদের ছাল ছাড়িয়ে নেবে। হারামজাদার কথা শোনো। কই, ওঠো, এখানে বসে থেকে আর কি লাভ?'

চোখ তুলে তাকাল মাইকেল। অমনি মুখের ভেতর জিভ জমে একেবারে বরফ হয়ে গেল ফ্যাব্রিয়িয়োর। ঠাণ্ডা ছুরির মত ধারালো দৃষ্টি মাইকেলের চোখে। পারলে পিছিয়ে যেত ফ্যাব্রিয়িয়ো, কিন্তু হাত-পা অবশ হয়ে গেছে তার। ঘন ঘন ঢোক গিলছে।

মাইকেলের এই চেহারা ওদের পরিচিত নয়। এর আগে পর্যন্ত ওকে চুপচাপ থাকতে দেখেছে ওরা। আমেরিকানরা যেমন হয়, সব সময় শান্তশিষ্ট, নম্র, সাদাসিধে। তবে এটুকু বুঝত, সিসিলিতে এসে যখন গা ঢাকা দিতে হয়েছে, তখন

পুরুষোচিত কিছু একটা ঘটিয়েছে তো বটেই। কিন্তু ‘কর্লিয়নি’ দৃষ্টি কাকে বলে জানা ছিল না ওদের। এই প্রথম দেখছে। ফ্যাব্রিয়িয়ো জর্জনে, এখন একচুল নড়লে বা একটু শব্দ করলে মাইকেলের তরফ থেকে বিপজ্জনক কিছু একটা ঘটে যেতে পারে।

মাইকেলের আসল পরিচয় আর কীর্তির কথা সিসিলিতে একমাত্র ডন টমাসিনো জানেন, জানেন বলে তিনি ওর সাথে সতর্ক আচরণও করে থাকেন। তাঁরই মত একজন বলে মনে করেন ওকে, প্রাপ্য সম্মান আর শ্রদ্ধা দেখাতে ভুল করেন না। কিন্তু এই অশিক্ষিত রাখালেরা ওর সম্পর্কে কিছু জানে না, তবে না জানলেও মনগড়া একটা কিছু ভেবে নিতে তো আর বাধা নেই। তাদের সেই ভাবনাটা মোটেও বিচক্ষণ কিছু নয়। ছুরির মত ধারাল ওই হিম দৃষ্টি ফ্যাকাসে আড়ষ্ট মুখ, বরফ যেমন ধোঁয়া ছাড়ে তেমনি শরীর থেকে বেরিয়ে আসা রাগের ভাপ—এসব দেখে ছ্যাৎ করে উঠল ওদের বুক। মাইকেলকে চেনে বলে ধারণা ছিল ওদের, সেই ধারণাটা এক নিমেষে মিথ্যে প্রমাণিত হয়ে গেছে। ওকে এখন অজানা একটা ভীতি বলে মনে হচ্ছে ওদের।

অপেক্ষার মুহূর্তগুলো শেষ হয়েছে মাইকেলের। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও, রাখালদের কাছ থেকে যথাযোগ্য মনোযোগ আর সম্মান আদায় করা গেছে। এতক্ষণে মুখ খুলল ও, ‘আমার কাছে নিয়ে এসো ওকে।’

একমুহূর্ত দেরি বা ইতস্তত করল না ওরা। দু’জনেই কাঁধে তুলে নিল যার যার বন্দুক, দৃঢ় পায়ে সোজা গিয়ে ঢুকল ক্যাফের ভেতর। খানিক পরই বেরিয়ে এল ওরা। মাঝখানে দেখা যাচ্ছে ক্যাফের মালিককে। একটু সতর্ক দেখাচ্ছে লোকটাকে, কিন্তু ভয়ে একেবারে কেঁচো হয়ে যায়নি।

চেয়ারে হেলান দিল মাইকেল। কয়েক সেকেন্ড সময় নিল ও, লোকটাকে দেখে নিল ভাল করে। ‘আপনার মেয়ের কথা জিজ্ঞেস করায়,’ শান্ত গলায় বলল ও, ‘শুনলাম আপনি নাকি রাগ করেছেন। সেজন্যে দুঃখ প্রকাশ করতে পারি আমি, কিন্তু আসল ব্যাপার হলো, আমি একজন বিদেশী, এখানকার রীতিনীতি ভাল বুঝি না। আমাকে ভুল বুঝবেন, সেটা আমার কাম্য নয়। আপনাকে বা আপনার মেয়েকে অপমান করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, এটা আপনাকে বুঝতে হবে।’

হুতভম্ব দেখাচ্ছে কার্লো আর ফ্যাব্রিয়িয়োকে। কই, ওদের সাথে কথা বলার সময় মাইকেলের গলার আওয়াজ তো এমন শোনায়নি কখনও! অপরাধ হয়ে থাকলে ক্ষমা চাইল মাইকেল, অথচ কথার সুরে ফুটে উঠল কর্তৃত্ব আর আদেশ। আগের চেয়েও এখন আরও সাবধান হয়ে গেল মালিক। মৃদু কাঁধ ঝাকাল সে। পরিষ্কার টের পেয়ে গেছে, যার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, সে কোন চাষাভুষো নয়, কর্তা গোছের একজন কেউ না হয়েই যায় না।

‘আপনি কে?’ জানতে চাইল সে। ‘আমার মেয়ের সাথে কি দরকার আপনার?’

‘আমি একজন আমেরিকান,’ কোন রকম দ্বিধা বা সতর্কতা দেখা যাচ্ছে না মাইকেলের মাঝে, ‘পুলিশের ভয়ে এখানে পালিয়ে এসে লুকিয়ে আছি। একটা যদি খবর দেন পুলিশকে, সাথে সাথে এক বস্তা টাকা পেয়ে যাবেন আপনি। কিন্তু তাতে

লাভ হবে না কিছুই। আপনার মেয়ে তার বাপকে তো হারাবেই, তার ওপর বেচারীর কপালে স্বামীও জুটবে না।’ একটু সময় দিল ও কথাগুলো যাতে লোকটার মনে ভাল করে গেঁথে বসে। তারপর বলল, ‘ভদ্রতা বজায় রেখে চলাফেরা করি আমি, ধর্মের ওপরেও আস্থা আছে, সুতরাং আমাকে দিয়ে আপনার মেয়ের কোন ক্ষতি হবে না। তার অসম্মান করা আমার ইচ্ছা নয়। তবে, ওর সাথে কথা বলতে চাই। কথা বলে যদি দেখি, আমাদের মনের মিল হচ্ছে, তাহলে ওকে বিয়ে করব। আর মনের মিল যদি না হয়, এই শেষ, জীবনে কখনও আপনি বা আপনার মেয়ে দেখতে পাবেন না আমাকে। মনের মিল হবে কি হবে না, তা আগে থেকে কিছুই বলা যায় না। যদি হয়, আমার স্ত্রীর বাপের যা যা জানা উচিত তার সবই আপনাকে জানাব আমি।’

শুধু কার্লো আর ফ্যাব্রিয়সিও নয়, এবার কাফের মালিকও অবাক হয়ে তাকান মাইকেলের মুখের দিকে। ভক্তি আর শঙ্কার সাথে ফিসফিস করে বলল ফ্যাব্রিয়সিও, ‘ঠাট্টা নয়, সত্যি বাজ পড়েছে!’

কাফের মালিকের চেহারা থেকে বিতৃষ্ণা আর রাগের ছাপ মুছে গেছে, চিড় ধরেছে দৃঢ় বিশ্বাসে। মাইকেলের দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকার পর অত্যন্ত সাবধানে জানতে চাইল সে, ‘আপনি কি বন্ধুদের বন্ধু?’

সাধারণ একজন সিসিলীয় ‘মাফিয়া’ শব্দটা ইচ্ছা করলেই হঠাৎ উচ্চারণ করতে পারে না, তাই মাইকেল মাফিয়া সংগঠনের সদস্য কিনা তা এর চেয়ে সহজ করে জানতে চাওয়ার আর কোন উপায় নেই মালিকের। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সরাসরি প্রশ্নটা কখনোই করা হয় না।

‘না,’ বলল মাইকেল। ‘আমি একজন বিদেশী।’

মাইকেলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত আরেকবার চোখ বুলান কাফের মালিক। বাঁ চোয়ালটা ভাঙা, এর একটা তাৎপর্য অবশ্যই আছে—তাছাড়া অমন লম্বা পা সচরাচর দেখা যায় না সিসিলিতে। এরপর কাফের মালিক নির্ভয়ে সোজাসুজি দুই দেহরক্ষীর দিকে তাকান। কাঁধে লুপা রা বন্দুক, মাইকেলের নির্দেশের অপেক্ষায় ঠাণ্ডা একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে। হন হন করে কাফেতে ঢুকে তাকে বলেছিল, ওদের মনিব কথা বলতে চায় তার সাথে। খেঁকিয়ে উঠেছিল সে, শালা বানচোত বলে গালাগাল দিয়ে বলেছিল, এই মুহূর্তে তারা যেন চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যায়। কিন্তু ওরা ভয় তো পায়ইনি, উত্তেজিতও হয়নি। বরং শুভানুধ্যায়ীর মত বুঝিয়ে বলার ভঙ্গিতে ওদের একজন বলেছিল, ‘দয়া করে নিজের অসুবিধে করবেন না। আমার কথা বিশ্বাস করুন, মনিবের কথা শুনলে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। একবার বাইরে এসে ওর কথা শুনুন, তাতে আপনার ভালই হবে।’ দেহরক্ষীর কথা শুনে কেন যেন মাথা ঠাণ্ডা রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল সে, মনে হয়েছিল বাইরে বেরিয়ে এসে লোকটার কথা শুনলেই বোধহয় ভাল হয়।

এখন অচেনা লোকটার কথা শুনে ভাবছে, আর যাই হোক, এই লোককে অপমান করা উচিত হবে না তার। কি থেকে কি হয়ে যায় তার কোন ঠিক নেই, তারচেয়ে এর সাথে ভদ্র আচরণ করাই সবদিক থেকে ভাল। তবু চেহারা আর

কণ্ঠস্বর থেকে অনিচ্ছার ভাবটুকু এড়াতে পারল না সে। ‘আমার নাম ভিটেলি। গ্রামের ওপর ওই পাহাড়ে আমার বাড়ি। রবিবার বিকেলে আসুন আপনি। বাড়িতে নয়, এখানে। এখান থেকে নিয়ে যাব আপনাকে।’

মুখ খুলতে যাচ্ছিল ফ্যাব্রিয়িয়ো, কিন্তু মাইকেল তার দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকাল। বুকের রক্ত ছলকে উঠল ফ্যাব্রিয়িয়োর, মুখের ভেতর শক্ত কাঠ হয়ে গেল জিভটা। ব্যাপারটা লক্ষ করল ভিটেলি। তখনই মাইকেল উঠে দাঁড়িয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিতে তাড়াতাড়ি সেটা ধরে একটু হাসল সে। অচেনা লোকটাকে খেপিয়ে দেয়া উদ্দেশ্য নয় তার। খোজ-খবর তো অবশ্যই নিতে হবে, মন স্থির করে ফেলেছে সে, সেগুলো যদি ঠিক মত মিলে না যায়, চিন্তা কি, মরণ বাড় বেড়ে ওঠা বাছাধন মাইকেলকে অভ্যর্থনা করার জন্যে তো জবরদস্ত ছেলে দুটো রয়েইছে, শট-গানগুলোয় আজই তেল দিয়ে রাখবে তারা।

বন্ধুর বন্ধুদের সাথে এক-আধটু সম্পর্ক আছে বৈকি ভিটেলির, কিন্তু তাদের সাহায্য নিতে হবে বলে মনে করছে না সে। সিসিলির লোকেরা অকারণ সৌভাগ্যে বিশ্বাস করে, সে-ও এই মুহূর্তে তাই করছে। মেয়ের রূপ আছে, এই রূপই এবার তাদের পরিবারের ভাগ্য ফিরিয়ে দেবে। সেটা মন্দ কি! তাছাড়া, পান্ডার কয়েকটা উঠতি ব্যেসের ছোকরা এরই মধ্যে ওর চারপাশে মাছির মত ভনভন করতে শুরু করেছে, সুযোগ পেলে এই মুখ ভাঙা ছেলেটা তাদেরকে ভাগিয়ে দিতে পারবে। অচেনা আগন্তুককে খুশি করার জন্যে তাকে সবচেয়ে ভাল একটা মদের বোতল উপহার দিল ভিটেলি। লক্ষ করল, ওদের বিল মেটাল মাইকেল নয়, দেহরক্ষীদের একজন। তার মানে, দেহরক্ষীদের চেয়ে ওর মর্যাদা অনেক বেশি, বুঝতে পারল সে।

ঘুরে বেড়াতে আর ভাল লাগছে না মাইকেলের। একটা গ্যারেজ খুঁজে বের করতে বেগ পেতে হলো না ওদের। গাড়ি আর ড্রাইভার ভাড়া করে ডিনারের আগেই কর্নিয়নিতে ফিরে এল ওরা।

বাড়ি ফিরেই ডাক্তার তাজাকে সব কথা জানিয়ে দিল রাখালরা। রাতেই বাগানে বসে ডন টমাসিনোকে তিনি বললেন, ‘খবর শুনেছেন? আজ নাকি আমাদের বন্ধুর মাথায় বাজ পড়েছিল।’

ডন টমাসিনো অস্বস্তির সাথে বললেন, ‘পালার্মোর ছোকরাগুলোর মাথায় দু’একটা বাজ পড়লে শান্তি পেতাম আমি।’ বড় শহরগুলোয় নতুন একদল মাফিয়া সর্দারের উত্থান ঘটছে, তিনি তাদের কথা বলছেন। ওরা তাঁর মত পুরানো নেতাদের সাথে ক্ষমতার ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে রেধারেধি করছে। সে যাই হোক, ডাক্তার তাজা কিন্তু নাছোড়বান্দা, তিনি ডন টমাসিনোকে সব কথা সবিস্তারে শোনালেন।

‘রোববারে রাখালদেরকে আপনি আমার সাথে যেতে নিষেধ করবেন,’ ডন টমাসিনোকে বলল মাইকেল। ‘মেয়ের বাড়ির লোকদের সাথে ডিনার খেতে বসব আমি আর বাইরে ঘুরঘুর করবে ওরা, সেটা ভাল দেখায় না।’

একটু গম্ভীর হলেন টমাসিনো। এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন। ‘একটা কথা ভুলে যাচ্ছ তুমি, মাইকেল। তোমার নিরাপত্তার জন্যে আমি তোমার বাবার কাছে দায়ী।

এমন কোন অনুরোধ কোরো না যেটা আমি রাখতে পারব না।’ একটু থেমে রীতিমত অসন্তুষ্ট গলায় আবার বললেন, ‘আরও শুনলাম, তুমি নাকি বিয়ের কথাও তুলেছ।’ কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। ‘এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তুমিই ভাল বোঝো—কিন্তু তোমার বাবার কাছে লোক পাঠিয়ে তাঁর অনুমতিটা আগে নিতে হবে আমাকে, তা নাহলে আমি মত দিতে পারব না।’

ডন টমাসিনো একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, তাই অত্যন্ত সাবধানে, ভেবেচিন্তে কথা বলছে মাইকেল। যাই বলুন তিনি, তাঁকে অপমান করে বা তাঁর মনে আঘাত দিয়ে কিছু বলতে পারে না সে। ‘বাবা কেমন মানুষ সে তো আপনি জানেন, ডন টমাসিনো। একবার কেউ যদি তাঁর কথায় “না” বলে, স্নেহ কালো বনে যান তিনি। যতক্ষণ না আবার “হ্যাঁ” বলছে সে ততক্ষণ তিনি শ্রুতিশক্তি ফিরে পান না। আপনি জানেন না, আপনার জানার কথাও নয়, বাবা কিন্তু অনেকবার আমার মুখে “না” শুনেছেন। দেহরক্ষীরা আমার সাথে যাবে, আপনার এই শর্তটা আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু একটা কথা পরিষ্কার জানা থাকা দরকার আপনার, তা হলো, বিয়ে করার যদি ইচ্ছে হয় আমার, কারও অনুমতি ছাড়াই বিয়ে হবে। এতে আপনার মনে করার কিছু নেই। আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নিজের বাপকে নাক গলাতে দিইনি, এখন যদি আপনাকে নাক গলাতে দিই, তাঁকে যে অপমান করা হয়।’

‘বিয়ে তাহলে হতেই হয়,’ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন টমাসিনো। ‘শোনো তাহলে, তোমার ওই বাজটিকে খুব ভাল করেই চিনি আমি। শুধু সুন্দরী নয়, স্বভাব-চরিত্রের দিক থেকেও ভারি ভাল। পরিবারটিও কারও সাথে-পাঁচে থাকে না, ওরা সবাই খুব ভাল মানুষ। তুমি যদি ওদের মর্যাদা হানির কারণ হও, মেয়ের বাপটি কিন্তু তোমাকে ছেড়ে দেবে না। সেক্ষেত্রে মান বাঁচাবার জন্যে তোমাকেও আবার রক্তপাত ঘটতে হবে। তাছাড়া, পরিবারটির সাথে আমার খাতির আছে, তাই তেমন কিছু ঘটতে দিতে পারি না আমি।’

‘কেমন মেয়ে কে জানে!’ বলল মাইকেল। ‘আমাকে দেখেই হয়তো নাক সিটকাবে। একেবারে ছেলে মানুষ তো, আমাকে হয়তো বুড়ো ভাববে।’ ডাক্তার তাজা আর ডন টমাসিনো নিঃশব্দে হাসছেন। ‘উপহার ইত্যাদি ক্রিনতে হবে, সেজন্যে কিছু টাকা লাগবে আমার। আর একটা গাড়ি।’

‘সব দায়িত্ব ফ্যাব্রিয়িয়োর ওপর ছেড়ে দিলেই হবে,’ বললেন ডন টমাসিনো। ‘ছোকরা নৌ-বহরে যন্ত্রপাতির কাজ শিখেছিল। ভারি চালাক-চতুর। কাল সকালে পাবে তুমি টাকা, সকালেই সব কথা জানিয়ে তোমার বাবাকে খবর পাঠাব আমি। এ-কাজে বাধা দিতে পারবে না তুমি।’

ডাক্তার তাজার দিকে ফিরল মাইকেল। ‘নাক দিয়ে এই যে অবিরাম সর্দি ঝরছে, এটা বন্ধ করার কোন ওষুধ আছে আপনার কাছে? সারাক্ষণ যদি নাক ঝাড়ি, মেয়েটা ভাববে কি?’

‘কিস্সু চিন্তা কোরো না,’ বললেন ডাক্তার তাজা। ‘রওনা হবার আগে একটা ওষুধ লাগিয়ে দেব। জায়গাটা একটু অসাড় হয়ে থাকবে, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না, তুমি তো আর এখুনি ওকে চুমু খেতে যাচ্ছ না।’ নিজের রসিকতাটায় নিজেই

হো হো করে হেসে উঠলেন তাজা, তাঁর সাথে যোগ দিলেন ডন টমাসিনো।

রবিবারের জন্যে একটা আলফা রোমিও গাড়ির ব্যবস্থা হলো। একটু পুরানো, কিন্তু কাজ চলবে। বাসে চেপে পালার্মোয় গেল মাইকেল নিজে, মেয়েটি আর তার বাড়ির লোকজনদের জন্যে কিছু উপহার কিনে আনল। ইতিমধ্যে মেয়েটির নাম জানা হয়ে গেছে: অ্যাপলোনিয়া। রবিবার আসার আগ পর্যন্ত রোজ রাতে তার সুন্দর নাম, সুন্দর চেহারার কথা ভাবে সে। ঘুম আসে না, তাই মদ খেতে হয় প্রচুর। বুড়ি পরিচারিকার ওপর নির্দেশ আছে, সে যেন রাতের জন্যে এক বোতল মদ খাটের পাশে রেখে দেয়। প্রতিটি বোতল নিষ্ঠার সাথে শেষ করছে মাইকেল, যাতে একটু অন্তত ঘুম হয়।

রোববার। সিসিলির সব ক'টা গির্জায় ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজছে। এই সময় ভিটেলিদের গ্রামে পৌঁছল মাইকেল। কাফের বাইরে আলফা রোমিও দাঁড় করাল ও। পিছনের সীটে বসে আছে কার্লো আর ফ্যাব্রিয়সিও। আগেই বলা আছে, কাফেতে অপেক্ষা করবে ওরা দু'জন, মালিকের বাড়িতে যাবে না। কাফের দরজায় তালা ঝুলছে, চাতালের বেড়ায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে ভিটেলি। করমর্দন এবং কুশলাদি বিনিময়ের পর উপহার তিনটে হাতে নিয়ে তার পিছু পিছু চলল মাইকেল। পাহাড়ের ওপর বাড়িটা দেখে চমৎকৃত হলো ও। বেশ বড় বাড়ি, গ্রামের আর সব কুটিরের মত খেলো নয়। বোঝা গেল ভিটেলি পরিবার সচ্ছল।

বাড়ির ভেতর পরিবেশটা এত ঘরোয়া যে চেনা চেনা লাগছে মাইকেলের। যীশুর মায়ের কয়েকটা মূর্তি দেখা যাচ্ছে, কাচ দিয়ে ঘেরা, পায়ের কাছে প্রদীপ জ্বলে রাখা হয়েছে। ঘরের ভেতর অপেক্ষা করছে ভিটেলির দুই ছেলে, আর সবার মত এরাও রোববারের উপযুক্ত কাপড়-চোপড় পরেছে। শক্তসমর্থ তাগড়া দুই ভাই, বড়জোর সবে উনিশ পেরিয়েছে, যদিও খামারে প্রচণ্ড খাটতে হয় বলে বয়সটা একটু বেশি দেখাচ্ছে। ওদের মায়ের গড়নও বেশ বলিষ্ঠ, স্বামীর মতই মোটা। ঘরে বা ঘরের আশপাশে ছায়া পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না মেয়েটার।

আনুষ্ঠানিকভাবে সবার সাথে মাইকেলের পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো, কিন্তু কারও একটা কথাও কানে ঢুকছে না ওর। যে ঘরটায় নিয়ে এসে বসানো হলো ওকে, সেটা বৈঠকখানাও হতে পারে, আবার খাবার ঘরও হতে পারে। মাঝারি আকারের ঘর, আসবাবে ভর্তি, সিসিলীয় মধ্যবিত্তের সচ্ছলতার ছাপ ফুটে রয়েছে চারদিকে।

সিনর ভিটেলি আর সিনরা ভিটেলিকে নিজের হাতে তাদের উপহার দুটো দিল মাইকেল। মেয়ের বাপের জন্যে সোনার সিগার কাটার আর মায়ের জন্যে এক থান কাপড়, পালার্মোর সবচেয়ে মিহি আর মূল্যবান জিনিস। মেয়েটার উপহার বের করল না ও। সিনর ভিটেলি আর সিনরা ভিটেলি, দু'জনই একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করল, তারপর সংযত ভঙ্গিতে ধন্যবাদ জানাল মাইকেলকে। নিজের ভুলটা ধরতে পারল ও, আরও দেরি করে দেয়া উচিত ছিল উপহারগুলো। সাধারণ নিয়ম হলো দ্বিতীয় বার আসার আগে কিছু দিতে নেই।

দেহ-গ্রামের লোকেরা রেখে ঢেকে কথা বলতে জানে না, যা বলে পরিস্কার স্পষ্টভাবে বলে, ভিটেলিও তাই বলছে। 'বাড়িতে যে আসবে তাকেই আমরা আদর করে ডেকে নৈব, অতটা নগণ্য পরিবার ভেব না আমাদেরকে। তুমি আমাদের বাড়িতে ঢোকার অনুমতি পেয়েছ, তার কারণ ডন টমাসিনো তোমার পক্ষ নিয়ে সুপারিশ করেছে আমাকে। সবাই জানে ডন টমাসিনো এই এলাকার একজন সম্ভ্রান্ত কর্তা ব্যক্তি। তাঁর কথা অবিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না। শুধু সেজন্যেই আমরা স্বাগত জানাচ্ছি তোমাকে। কিন্তু একটা ব্যাপারে তুমি যেন ভুল বুঝো না। আমার মেয়ে সম্পর্কে সত্যি যদি তোমার কোন সং ইচ্ছা থাকে, তোমার আর তোমার পরিবার সম্পর্কে সব কথা জানতে হবে আমাকে।'

সবিনয়ে মাথা দোলাল মাইকেল, 'যখন যা কিছু জানতে চাইবেন সবই বলব আপনাকে আমি,' বলল ও।

হাত নেড়ে বলল ভিটেলি, 'তার আগে দেখতে হবে সব কথা জানার সত্যি কোন প্রয়োজন আছে কিনা। পরের ব্যাপারে নাকি গলানো স্বভাব নয় আমার। আজকের ব্যাপারটা একটু অন্যরকম, ডন টমাসিনোর সুপারিশে আজ আমরা তোমাকে বন্ধু মনে করে ঘরে ডেকে বসিয়েছি। তিনি যদি বলেন, তোমাকে আমরা নির্ভয়ে পরিবারের একজন বলে গ্রহণ করতে পারি, তাহলে বোধহয় সব কিছু খুঁটিয়ে জানার দরকার হবে না।'

নাকের ভেতর ওষুধ লাগানো হয়েছে, ফলে সেটা অসাড় মত হয়ে আছে মাইকেলের, ওষুধের গন্ধ ছাড়া আর কোন গন্ধ ঢোকার পথ পাচ্ছে না, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, ওষুধের তীব্র গন্ধকে হারিয়ে অদ্ভুত মিষ্টি একটা সুগন্ধ পেল ও। সাথে সাথে বুঝল, নিঃশব্দ পায়ে কাছেগিষ্ঠে কোথাও এসেছে মেয়েটা। ঘাড় ফেরাতেই দেখল, ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পিছন দিকের খিলান দেয়া দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে সে। ঘন কালো কোঁকড়ানো একরাশ মাথার চুলে কোন ফুল নেই তার, অথচ ভাজা লেবু ফুলের গন্ধ নিয়ে এসেছে সাথে করে। পরনে সাদাসিধে কালো পোশাক, কোন অলঙ্কার পরেনি। সন্দেহ নেই এটাই তার ভুলে রাখা সবচেয়ে ভাল পোশাক, শুধু রোববারে পরে ছোট্ট এক টুকরো হলুদ সোনার মত হাসি ফুটল তার মুখে, চোরা চাহনিতে চকিতে একবার তাকাল, চোখ নামিয়ে নিয়ে সলাজ কুণ্ডার সাথে ধীর পায়ে এগিয়ে এসে বসল মায়ের পাশে।

আবার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল মাইকেলের। রক্তে বাণ ডেকেছে ওর, শরীরের প্রতিটি অঙ্গে দাউ দাউ আগুন জ্বলে উঠেছে। এ ঠিক কামনা নয়, ভোগ স্পৃহা নয়, এ হলো মেয়েটাকে আয়ত্ত করার উন্মত্ত প্রতিজ্ঞা, বাঁধ ভাঙা আকাঙ্ক্ষা। বহু-কথিত ইটালীয় পুরুষদের সেই প্রাচীন ঈর্ষা এই প্রথম অনুভব করছে মাইকেল। এই মুহূর্তে ভুল করেও কেউ যদি স্পর্শ করে এই মেয়েকে, দ্বিতীয়বার চিন্তা না করে সাথে সাথে তাকে হত্যা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে ও। হাড় কিপটে যেভাবে স্বর্ণমুদ্রার অধিকারী হতে চায়, বর্গা-চাবী যেভাবে তার ফসলের ভাগ চায়, মাইকেলও সেভাবে অধিকার করতে চাইছে মেয়েটাকে। ও জানে, ওর উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা থেকে কেউ ওকে এক চুল টলাতে পারবে না, এই মেয়ের স্বামীত্ব তাকে পেতেই হবে, কেউ বঞ্চিত করতে

পারবে না। সম্পূর্ণ দখল করতে হবে ওকে, ঘরের ভেতর তালা-চাবি দিয়ে আটক করতে হবে, শুধু নিজের জন্যে বন্দিরী করে রাখতে হবে। এ এমন এক মুহূর্ত, এখন যদি কেউ অ্যাপলোনিয়ার দিকে তাকায়, মাথার ভেতর বিস্ফোরণ ঘটে যাবে মাইকেলের। দুনিয়ার সমস্ত পুরুষ এখন মাইকেলের ঘৃণা আর সন্দেহের পাত্র। নিজের আর অ্যাপলোনিয়ার অস্তিত্ব ছাড়া দুনিয়ার আর কারও উপস্থিতি অসহনীয় বলে মনে হচ্ছে ওর কাছে। মেয়েটা হাসি মুখে একবার ভাইদের একজনের দিকে ফিরে তাকাল। সাথে সাথে নিজের অজান্তেই ছেলেটার দিকে এমন কটমট করে দৃষ্টি হানল মাইকেল, ঘরের কারও বুঝতে বাকি থাকল না যে এ হলো সেই প্রাচীন রাজ পড়ার ঘটনা, যেমন খাঁটি তেমনি শক্তিশালী বুঝতে পেরে আশ্বস্ত হলো সবাই। কোন সন্দেহ নেই, ছেলেটা এখন থেকে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত মেয়েটার হাতে একদলা কাদা-মাটির মত নরম হয়ে থাকবে। এ অবস্থা বেশিদিন থাকবে না, সবকিছুর মত এটারও পরিবর্তন ঘটবে, কিন্তু কিই বা এসে যায় তাতে!

পালার্মো থেকে নতুন কেনা পোশাক পরে এসেছে মাইকেল, আজ আর ওকে মোটা কাপড় পরা গৈয়ো চামা দেখাচ্ছে না। ডন বা সমমানের কোন পদের অধিকারী ও, অনুমান করে নিল ওরা। মুখটা ভাঙা বলে, মাইকেলের ধারণা তার চেহারায় আর কোন সৌন্দর্য নেই, আসলে কিন্তু অতটা খারাপ দেখায় না ওকে। আরেক পাশ থেকে তাকালে ভয়ঙ্কর সুদর্শন পুরুষ বলে মনে হয়, বিকৃতিটা মানুষের মনে কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। সবাই জানে সিসিলি এমন একটা দেশ যেখানে বিকলাঙ্গ উপাধি পেতে হলে নির্দয় খুনে স্বভাবের বিরাট একদল লোকের সাথে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে হয়। সিসিলিতে শারীরিক ত্রুটির আলাদা একটা মর্যাদা আছে।

মেয়েটার দিকে সরাসরি তাকিয়ে আছে মাইকেল। সুগোল মুখের অপক্লপ সৌন্দর্য দেখে মাথা ঘুরছে ওর। ঠোঁট জোড়ায় অতি বেশি রক্তের চাপ, ফলে শে-দুটোর রঙ হয়ে উঠেছে ঘন নীল। নামটা উচ্চারণ করবে, সে সাহস হলো না মাইকেলের। ঝাঁ ঝাঁ করছে সমগ্র অস্তিত্ব। 'সেদিন তোমাকে কমলা বনের ধারে দেখলাম। পালিয়ে গেলে তুমি। আশা করি ভয় পাওনি আমাকে দেখে,' বলল ও

মুহূর্তের জন্যে চোখ তুলে তাকাল মেয়ে। দ্রুত অথচ সংক্ষিপ্ত ভাবে মাথা নাড়ল শুধু একবার। কিন্তু চোখ দুটো এত সুন্দর, সেই সৌন্দর্যে মগজ ঝলসে যাবে ভেঙ্গে তাকিয়ে থাকতে পারল না মাইকেল, মেয়েটা চোখ নামিয়ে নেবার আগেই দৃষ্টি সরিয়ে নিল ও।

'অ্যাপলোনিয়া,' ঝাঁঝের সাথে বলল মা, 'বেচারার সাথে কথা বলো। কত দূর থেকে এসেছে তোমাকে দেখার জন্য।'

তবু ঘন কালো চোখের পাপড়িগুলো পাখির ডানার মত সযত্নে ঢেকে রেখেছে অ্যাপলোনিয়ার চোখ দুটোকে।

উপহারটা সোনালী কাগজে মোড়া, সেটা তার হাতে দিল মাইকেল। নিয়েই কোলের ওপর ফেলে রাখল অ্যাপলোনিয়া।

'আহা, মেয়ে,' বলল ওর বাবা, 'দেখোই না খুলে।'

হাত দুটো তবু নড়ে না। ছোট ছোট হাত, জ্বাল দেয়া ঘন দুধের সরের মত রঙ।

ক্ষীণ অসহিষ্ণুতা ফুটে উঠল মায়ের চেহারা, হাত বাড়িয়ে মেয়ের কোল থেকে প্যাকেটটা তুলে নিল। খুব যত্নের সাথে, যাতে মূল্যবান কাগজটা ছিঁড়ে না যায়, খুলে ফেলল প্যাকেটটা। ভেতরে লাল রঙের মখমল দিয়ে তৈরি গহনার বাক্স, দেখেই হাত দুটো থেমে গেল মায়ের। এ-ধরনের জিনিস আগে কখনও দেখেনি সে, হাতে নেয়া তো দূরের কথা, কিভাবে খুলতে হয় জানবে কোথেকে! তবে সহজাত উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে বাক্স খুলে বের করে ফেলল উপহারটা।

সোনার একটা নেকলেস, খুব ভারী। হকচকিয়ে গেল ওরা সবাই। অসম্ভব মূল্যবান একটা জিনিস, কিন্তু সেটা কারণ নয়, এদের সমাজে সোনা উপহার দেয়ার একটা অর্থ—সম্পর্কটাকে পবিত্র রূপ দেয়ার একান্ত গভীর ইচ্ছা প্রকাশ। সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার চেয়ে কম নয় ব্যাপারটা, অন্তত বিয়ের প্রস্তাব দিতে উদগ্রীব হয়ে আছে মাইকেল, উপহারটার মাধ্যমে এ-কথা পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছে সে। সমস্ত দ্বিধা-সন্দেহ কাটিয়ে উঠল পরিবারটি, মাইকেলের উদ্দেশ্যটা যে সৎ তা বুঝতে পারল। সেই সাথে তার আর্থিক সঙ্গতি সম্পর্কেও পরিষ্কার ধারণা জন্মান ওদের মনে।

এখনও উপহারটা হাত দিয়ে ছোঁয়নি অ্যাপলোনিয়া। নেকলেসটা ওকে দেখাবার জন্যে একটু তুলে ধরল ওর মা। চোখের দীর্ঘ পাতা তুলে নেকলেসটার দিকে নয়, সরাসরি মাইকেলের দিকে তাকাল মেয়ে। হরিণীর মত চোখ, গাঢ় রঙের—মায়াময় গভীরতায় ভরপুর। এই প্রথম তার কণ্ঠস্বর শোনার সৌভাগ্য হলো মাইকেলের। সে-স্বরে তারুণ্যের সজীবতা, মখমলের মত লজ্জার কোমলতা—কান দিয়ে ঢুকে ওর শরীরে আর রক্তে তুমুল আলোড়ন তুলল।

‘ধন্যবাদ,’ মৃদু কণ্ঠে বলল অ্যাপলোনিয়া।

চোখ ফিরিয়ে নিল মাইকেল, একবারে দু’তিন সেকেন্ডের বেশি তাকাতে পারছে না অ্যাপলোনিয়ার দিকে। সত্যি সত্যি ভয় হচ্ছে, বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে পুড়ে যাবে চোখ দুটো। তাছাড়া, ওর দিকে তাকালেই নিজেকে বশে রাখতে পারছে না মাইকেল, মনের ভেতর সব কেমন যেন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। মেয়েটার বাবার সাথে কথা বলছে ও, তাছাড়া আর করার আছে কি তার? তবে এরই মাঝে চোখে পড়েছে, অ্যাপলোনিয়ার পরনে সেকেনে টিলেটোলা পোশাক থাকলেও, কাপড় ভেদ করে ফুটে উঠেছে যৌবনের ভাঁজ, রেখা আর চূড়াগুলো। মুখটা লজ্জায় রাঙা, তাতে গায়ের রঙ আরও ঘন আর গাঢ় দেখাচ্ছে।

এবার বিদায় চাইতে হয়। ওর সাথে বাকি সবাইও উঠে দাঁড়াল। নিয়ম মত সবাই বিদায় দেবার পর ওর সামনে এসে দাঁড়াল অ্যাপলোনিয়া। হাতটা বাড়িয়ে দিল সে। বুক কাঁপছে মাইকেলের। হাতে হাত স্পর্শ করতেই সারা শরীর শিউরে উঠল ওর। অ্যাপলোনিয়ার হাতের ত্বক একটু ককঁশ। চাষী পরিবারের মেয়েদের যেমন হয়ে থাকে। গলা বুজে গেছে মাইকেলের, ব্যাকুল ইচ্ছেটা মাথা কুটে মরছে মনের ভেতর, কিন্তু একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারল না। ওর সাথে পাহাড়

থেকে নেমে গাড়ি পর্যন্ত এলো সিনর ভিটেলি। ডিনার খেতে নিমন্ত্রণ করল আগামী রবিবার। দাওয়াত কবুল করে মাথা নাড়ল বটে মাইকেল, কিন্তু মনে মনে জানে, অ্যাপলোনিয়াকে আবার না দেখে পুরো এক হপ্তা কিছুতেই থাকতে পারবে না সে।

রাখাল দেহরক্ষীদের সাথে না নিয়ে পরদিনই কাফেতে চলে এল মাইকেল, গাড়ি থেকে নেমে চাতালে বসল অ্যাপলোনিয়ার বাপের সাথে গল্প করতে। অবশেষে দয়া হলো সিনর ভিটেলির, স্ত্রী আর মেয়েকে খবর পাঠাল সে, তারা এসে যেন একটু সঙ্গ দেয় বেচারী মাইকেলকে। এবারের দেখা-সাক্ষাতে জড়তা ভাব অতটা নেই। কিছুটা লজ্জা কেটেছে অ্যাপলোনিয়ার, আর সে বেশ দু'একটা কথাও বলল। রোজকার পোশাক, ছাপা কাপড়ের ফুক পরেছে, সুন্দর মানিয়েছে ওর গায়ের রঙের সাথে।

পরদিনও তাই ঘটল, তফাত কেবল এই যে মাইকেলের উপহার দেয়া সোনার নেকলেসটা পরে এসেছে অ্যাপলোনিয়া। ব্যাপারটা লক্ষ করে ওর চোখে চোখ রেখে হাসল মাইকেল। বোঝাই যায়, অ্যাপলোনিয়ার তরফ থেকে এটা একটা ইঙ্গিত।

ওকে স্নাত্বে নিয়ে পাহাড়ে চড়ল মাইকেল, অবশ্য ওদের পিছনেই রয়েছে সিনরা ভিটেলি। কিন্তু তাতে কি, গায়ের সাথে গায়ের ছোঁয়াছোঁয়ি এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব একটা ব্যাপার। হোঁচট খেয়ে একেবারে ওর গায়ের ওপর পড়ে গেল একবার অ্যাপলোনিয়া, যেন তৈরি হয়েই ছিল মাইকেল, সাথে সাথে ধরে ফেলল তাকে। উষ্ণ, সজীব শরীরের স্পর্শ পেতেই রক্তে যেন বাণ ডাকল ওর। পিছনে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে হাসছে সিনরা ভিটেলি, কিন্তু দু'জনের কেউই তা লক্ষ করল না। মা জানে, মেয়ে তার পাহাড়ী ছাগলের মত পটু, এপথে যেতে-আসতে সেই জাগ্রিয়া ছাড়ার পর থেকে কখনও হোঁচট খায়নি। সেটাই হাসির কারণ। হাসিটা আরও বড় হলো এই কথা ভেবে যে এই হোঁচট খাওয়ার ছুতোয় যতটা পারা যায় মেয়ের গায়ে হাত দিতে পারবে ছোকরা, বিয়ের আগে আর কোন সুযোগ জুটছে না ওর কপালে।

পরবর্তী দু'হপ্তা চলল এইভাবে। ধীরে ধীরে সঙ্কোচ কেটে যাচ্ছে মাইকেলেরও, রোজই কিছু না কিছু একটা উপহার নিয়ে আসে অ্যাপলোনিয়ার জন্যে। তবে মুরুব্বি স্থানীয় কেউ একজন উপস্থিত না থাকলে দেখা হয় না ওদের। হাজার হোক গ্রামের মেয়ে, কোনরকম অক্ষরজ্ঞান হয়েছে মাত্র, দুনিয়া সম্পর্কে ভাল মন্দ কোন ধারণাই নেই তার। কিন্তু আশ্চর্য্য একটা প্রাণচাঞ্চল্য আছে, আছে প্রাণের উচ্ছ্বাস আর সজীবতা, সেই সাথে ভাব প্রকাশে ভাষার বাধা, তাই আরও রহস্যময়ী লাগে ওকে। মাইকেলের অনুরোধে বিয়ের তারিখ খুব তাড়াতাড়ি স্থির করা হলো। ইতিমধ্যে অ্যাপলোনিয়ার জানা হয়ে গেছে মাইকেল যে শুধু ওকে দেখে মুগ্ধ তাই নয়, সে একটা বিরাট ধনী পরিবারের ছেলেও বটে। দু'হপ্তা পর এক রবিবারে ধার্য হলো বিয়ের তারিখ।

এবার কাজে হাত দিলেন ডন টমাসিনো। আমেরিকা থেকে তাঁকে জানানো হয়েছে কোন আদেশ বা বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে হবে না মাইকেলকে, কিন্তু

সম্ভাব্য সমস্ত প্রাথমিক সতর্কতা যেন অবলম্বন করা হয়। নিজের বডিগার্ড দিয়ে মাইকেলকে ঘিরে রাখার জন্যে বর-কর্তা হলেন তিনি। বরযাত্রী হয়ে কর্লিয়নি থেকে গেল কার্লো আর ফ্যাব্রিয়সিও, ওদের সাথে ডাক্তার তাজাও গেলেন। আগেই ঠিক করা হয়েছে, বিয়ের পর স্ত্রীকে নিয়ে মাইকেল পাথরের পাঁচিল ঘেরা ডাক্তার তাজার বাড়িতেই থাকবে।

বিয়েটা সম্পন্ন হলো চাষী পরিবারের রীতি অনুযায়ী। বরযাত্রী, বর-কনে আর নিমন্ত্রিত মেহমানদের গায়ে ফুল ছুঁড়ে মারল গ্রামবাসীরা। গির্জা থেকে পায়ে হেঁটে ফিরল সবাই কনের বাড়ি। বিয়ের শোভাযাত্রাটা হলো দেখবার মত, যেমন দীর্ঘ তেমনি রঙচঙে। চিনি মাখানো কাগজি বাদাম আর চিনির মিষ্টি ছুঁড়ে মারা হলো প্রতিবেশীদের দিকে। অবশিষ্ট মিষ্টি দিয়ে তৈরি হলো ফুলশয্যার ওপর চিনির টিপি। এটা শুধু নিয়মরক্ষার জন্যে করা, কারণ কর্লিয়নি গ্রামের বাইরে ডাক্তার তাজার বাগানবাড়িতে কাটবে বর-কনের প্রথম রাতটা। বিয়ের ভোজ চলবে মাঝরাতের পরও, কিন্তু বর-কনে আলফা রোমিওতে চড়ে বিদায় নেবে অনেক আগেই।

রওনা হবার সময় একটা ব্যাপার লক্ষ করে অবাক হয়ে গেল মাইকেল। সম্ভবত অ্যাপলোনিয়ার আবদারে তার মা-ও ওদের সাথে গাড়িতে উঠছে। মাইকেলের মনোভাব টের পেয়ে শ্বশুর এগিয়ে এসে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে। একেবারে কচি বয়স মেয়েটার, কুমারী, তাই একটু ভয় পেয়ে গেছে। বিয়ের পরদিন সকালে ও হয়তো কারও সাথে কথা বলতে চাইবে। এরকম ক্ষেত্রে এক-আধটু গোলমাল তো হতেই পারে। তা যদি হয়, ওকে সব বুঝিয়ে দেবার জন্যে কাউকে দরকার।

অ্যাপলোনিয়ার দিকে তাকাল মাইকেল। গভীর হরিণ চোখে একরাশ অনিশ্চয়তা নিয়ে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে সে। মৃদু হেসে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল মাইকেল। তারপর মাথা নেড়ে সন্মতি জানাল।

কর্লিয়নিতে ওদের সাথে অ্যাপলোনিয়ার মা এল বটে, কিন্তু ভদ্রমহিলা যথেষ্ট কাণ্ড-জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে দ্রুত দৃশ্যপট থেকে কেটে পড়ল। ডাক্তার তাজার বাড়িতে পৌঁছেই প্রথমে সে পরিচারিকাদের সাথে কি যেন পরামর্শ করল, জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো মেয়েকে, তারপর অন্দরমহলে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল। বিশাল একটা ঘরে ফুলশয্যা পাতা হয়েছে, নববধূকে নিয়ে সেখানে মাইকেল একাই ঢুকল।

বিয়ের সাজ-পোশাক এখনও খোলেনি অ্যাপলোনিয়া, ওপরে শুধু একটা সিল্কের আলখাল্লা জড়িয়ে নিয়েছে। আগেই গাড়ি থেকে ওর ট্রাঙ্ক আর সুটকেস শোবার ঘরে নিয়ে আসা হয়েছে। ঘরের ভেতর ছোট্ট একটা টেবিল, তার ওপর এক প্লেট বিয়ের কেক আর এক বোতল মদ দেখা যাচ্ছে। খাটটা প্রকাণ্ড, ঝালর দিয়ে ঘেরা, না তাকালেও চোখে পড়ছে সারাক্ষণ। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে তরুণী। অপেক্ষা করছে। প্রথম উদ্যোগ মাইকেল নেবে, এই আশায়।

কিন্তু আজব এক আড়ষ্টতায় কাঁঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাইকেল, একচুল নড়ার শক্তি পাচ্ছে না সে। এতদিন নিজের সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে এই মেয়েকে কামনা করেছে, এখন তাকে একাকিনী পেয়েও, তার স্বামিত্ব অর্জন করেও তাকে স্পর্শ

করার জন্য হাত উঠছে না। এই তো সেই অপরূপ মুখ, রোজ রাতে স্বপ্নের ঘোরে দেখেছে সে, এই তো সেই যৌবনপুষ্ট সজীব শরীর, তাকে জড়িয়ে ধরার পথে আজ আর কোন বাধাই নেই, তবু সেদিকে এগোতে পারছে না কেন! ধীরে ধীরে নড়ে উঠল অ্যাপলোনিয়া, বিয়ের শালটা খুলে ফেলল গা থেকে, বুলিয়ে রাখল একটা চেয়ারে। তারপর মাথা থেকে নামাল বিয়ের মুকুট, ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখল সেটা। পালার্মো থেকে নিয়ে আসা নানারকম সুবাস আর ক্রীম সাজানো রয়েছে একটা টেবিলে, সেদিকে তাকাল অ্যাপলোনিয়া।

ও কি চাইছে ঘরটা অন্ধকার করে দিই? কাপড় ছাড়ার জন্যে অন্ধকারের আশ্রয় ভাল লাগবে ওর? চিন্তাটা মাথায় আসতেই হাত বাড়িয়ে আলো নিভিয়ে দিল মাইকেল। তাতে কিন্তু অন্ধকার দূর হলো না। জানালাগুলো খোলা রয়েছে, উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে সিসিলির জ্যোৎস্না। একটা বাদ দিয়ে বাকি জানালার খড়খড়ি বন্ধ করে দিল ও। সবগুলো বন্ধ করলে গুমোট হয়ে উঠবে পরিবেশটা।

তবু টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে রইল অ্যাপলোনিয়া, একচুল নড়ছে না। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল মাইকেল, স্বর ছেড়ে বেরিয়ে এল। বাগানে বসে গল্প করছেন ডাক্তার তাজা আর ডন টমাসিনো, তাঁদের সাথে যোগ দিল ও। বাড়ির মেয়েরা এরই মধ্যে শোবার জন্যে তৈরি হয়ে গেছে। এক গ্লাস মদ খেলো মাইকেল। মনে মনে ভাবছে ফিরে গিয়ে দেখবে, অ্যাপলোনিয়া রাতের পোশাক পরেই বিছানায় শুয়ে পড়েছে। পোশাক খোলার ব্যাপারে মেয়েকে পরামর্শ দেয়নি মা, কথাটা ভেবে একটু অবাক হলো মাইকেল। আবার ভাবল, এমনও হতে পারে যে মায়ের সাহায্য নিতে অস্বীকার করেছে অ্যাপলোনিয়া। সে হয়তো মাইকেলের সহযোগিতা পাবে বলে আশা করে আছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই, মুখ ফুটে কথাটা প্রকাশ করা তার সাধ্যের বাইরে। মাইকেল জানে, এ মেয়ে আশ্চর্য নিষ্পাপ, কোমল, অতটা এগোবে সে-দুঃসাহস নেই।

পা টিপে টিপে শোবার ঘরে ফিরে এল মাইকেল। প্রথমেই লক্ষ করল, একমাত্র যে জানালাটা খোলা ছিল সেটাও এখন বন্ধ। ঘন অন্ধকারে ঘরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। একবার ভাবল অ্যাপলোনিয়ার নাম ধরে ডাকবে নাকি। কিন্তু মন তাতে সায় দিল না। অন্ধের মত নিঃশব্দ পায়ে এগোল ও। হাতড়ে স্পর্শ করল খাটটা। বুকে পড়তেই আঁধারের ভেতর চোখে পড়ল বিছানার ওপর কি যেন পড়ে রয়েছে, সম্ভবত অ্যাপলোনিয়াই। অন্ধকারটা চোখে আরও একটু সয়ে আসতে নিজের অনুমানটা সঠিক বলে বুঝতে পারল ও। ওর দিকে পিছন ফিরে শুয়ে আছে অ্যাপলোনিয়া। মনটা একটু দমে গেল ওর। ঘুমিয়ে পড়ল নাকি?

ধীরে ধীরে কাপড় ছাড়ল মাইকেল। তারপর দুরুদুরু বুকে ঢুকল চাদরের নিচে। হাত বাড়তেই রেশমের মত নরম ত্বকের ছোঁয়া অনুভব করল ও। শিউরে উঠল মাইকেল। ঢোক গিলল নিজের অজান্তেই। টের পেল নিঃশ্বাসগুলো কি গরম! শরীরের পাশে শুয়ে রয়েছে আরেকটা শরীর, দুটোই ওর নিজের শরীর, কিন্তু তবু কেন যেন চোর চোর মনে হচ্ছে নিজেকে, হাত বাড়তে ভয় লাগছে। হঠাৎ টের

পেল, অ্যাপলোনিয়ার গায়ে নাইট-গাউন নেই। মেয়ের সাহস দেখে ভীষণ খুশি মাইকেল। এই আনন্দই তাকে একটু সাহস যোগাল। অত্যন্ত যত্নের সাথে, খুব আলগোছে, একটা হাত রাখল নববধুর কাঁধে। কি এক পরম পাবার আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল সারা শরীর। একটু চাপ দিল অ্যাপলোনিয়ার কাঁধে। নিজের দিকে ওকে ফেরাতে চাইল ও।

প্রথমে কাঁঠ হয়ে পড়ে থাকল অ্যাপলোনিয়া। তারপর সাড়া দিল সে। ধীরে ধীরে ফিরল। অদ্ভুত এক পুলকে ছেয়ে গেল মাইকেলের মন, কি এক পরম তৃপ্তি পাবার ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষায় অস্থির হয়ে উঠল ও। এখনও ওর দিকে ফিরছে অ্যাপলোনিয়া, তার কোমল বকের স্পর্শ পেল ও।

পরমুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল দু'জনের শরীরে। পরস্পরের আলিঙ্গনে ধরা দিল ওরা। নববধুকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরল মাইকেল, তার পাতলা ঠোঁটে গাঢ় চুমু খেলো। নয় দুটো শরীর পরস্পরের সাথে সেঁটে আছে।

আঁটো রেশমের মত অ্যাপলোনিয়ার শরীর। কুমারী মেয়ের অধীর কামনায়, ব্যাকুল আগ্রহে উন্মাদিনী হয়ে উঠে সে-ও দুই হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে মাইকেলকে। ভাবের আদান প্রদান চলছে ওদের মাঝে, কিন্তু কোন ভাষার সাহায্য নিচ্ছে না ওরা। অ্যাপলোনিয়ার কুমারী শরীরটার ওপর খেলা করছে মাইকেলের দুই হাত, কোথা থেকে কোথায় না চলে যাচ্ছে। তার শরীরে ঠোট ঘষছে ও। আর অ্যাপলোনিয়া? খানিক আগে পর্যন্ত নিজেকে ধন্য, কৃতজ্ঞ আর সৌভাগ্যবতী বলে মনে করছিল সে, কিন্তু এখন সে গর্ব অনুভব করছে। অদ্ভুত এক রোমাঞ্চে পুলকিত হয়ে উঠেছে শরীর। তার প্রতিটি অঙ্গ, সবটুকু মাধুর্য, সমস্ত আবেগ দিয়ে ধন্য করতে চাইছে মাইকেলকে। নিজের ভেতর মাইকেলের উদ্দেশ্যে আশ্চর্য একটা ব্যাকুল আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে সে—আমাকে নাও! আমাকে নাও! গর্ব অনুভব করার সেটাই তার কারণ, শুধু হাত পেতে নেয়ার পাত্রী নয় সে, মাইকেলকে দেবারও অনেক কিছু রয়েছে তার এবং মাইকেল নিচ্ছেও প্রাণভরে। সেখানেই অ্যাপলোনিয়ার সার্থকতা।

যত পাচ্ছে তত আরও বেশি করে পেতে চাইছে মাইকেল। নির্লজ্জেরও একটা লজ্জার সীমা থাকে কিন্তু ও সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে বেপরোয়া, দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। আর অ্যাপলোনিয়া তাকে উৎসাহ যোগাচ্ছে, প্ররোচনা দিচ্ছে।

এক সময় জ্ঞান হারাবার মত অবস্থা হলো অ্যাপলোনিয়ার। এত আনন্দ, এত উত্তেজনা, এত সুখ সহ্য করার সাধ্য নেই তার। সারা শরীরে বিদ্যুতের প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে, গুণ্ডিয়ে উঠল সে। আনন্দের আতিশয্যে অস্থির হয়ে পড়ল। ওর অবস্থাটা বুঝতে পারল মাইকেল। নিজেও ধৈর্যের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে ও। মিলনের চরম মুহূর্তে অ্যাপলোনিয়ার মুখ থেকে সশব্দে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। মিলন চরিতার্থ হবার পরও কেউ কাউকে ছাড়ল না, দুর্দম আকর্ষণে একজন আরেকজনকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রাখল। কেউ কাউকে ছেড়ে দিলেই যেন হিম শীতল অন্ধকারে মৃত্যু এসে ছুঁয়ে দেবে ওদেরকে।

অন্যসর সমাজ কৌমার্যকে এত মূল্য দেয় কেন, আজ রাতে তা খানিকটা

বুঝতে পারল মাইকেল কর্লিয়নি। এসব ওর কাছে নতুন নয়, কিন্তু আজকের মত এমন লাগেনি কখনও আর। আজকের তৃপ্তির সাথে সৈসব ঘটনার কোন তুলনাই হতে পারে না। আজ সে তার নিজের পৌরুষকে উপলব্ধি করতে পেরেছে।

এরপর হপ্তার পর হপ্তা ধরে প্রতিদিন অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে মাইকেলের উপলব্ধি আরও প্রখর হলো। সঙ্গিনী নয়, অ্যাপলোনিয়া ওর ক্রীতদাসীর মত হয়ে উঠেছে। অনগ্রসর সমাজে মেয়েদের যৌবন এক অমূল্য সম্পদ, অকাতরে শুধু স্বামীকে বিলিয়ে দেবার সাধনায় জীবন কাটে ওদের। এই সাধনার উপকরণ হলো প্রেম আর স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যবতী তরুণীর শরীর আর মনে যখন প্রথম যৌন চেতনা জাগে তখন সে হয় পাকা ফলটির মত মধুর। সেই ফল যখন নিজেকে অকাতরে বিলিয়ে দেবার জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে তখনই তো তাকে পেয়ে মজা।

নিরানন্দ বাগান বাড়িটা অ্যাপলোনিয়ার কোমল স্পর্শ পেয়ে সজীব হয়ে উঠেছে। ফুলশয্যার পরদিনই মাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে সে। প্রাণ-চঞ্চল মাধুরী দিয়ে গোটা বাড়িটা আলোকিত করে রেখেছে ও। লজ্জা এখনও কাটেনি তার, কিন্তু খাবার টেবিলে সবার জন্যে হাজির থাকে, এটা সেটা এগিয়ে দেয়, ফার কি লাগবে না লাগবে জিজ্ঞেস করে। আজকাল প্রায় রোজ রাতেই ওদের সাথে খেতে বসেন ডন টমাসিনো।

বাগানে তিনজনের আঙুটা আবার গুরু হয়েছে। মদ খেতে খেতে পুরানো গল্পগুলো আরেকবার করে শোনান ডাক্তার তাজা। বাগানের সবখানে দাঁড়িয়ে আছে শ্বেতপাথরের মূর্তি, তাদের গলায় লাল ফুলের মালা, সেগুলো দুলতে থাকে বাতাসে। বড় আনন্দে কাটে প্রতিটি সন্ধ্যা। আর রাতে নব দম্পতি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যাথ ব্যাকুলতার মধ্যে কাটায়। দু'জনকে নিয়ে দু'জন একেবারে উন্মাদ হয়ে আছে। অদ্ভুত এক নেশার ঘোরে সময়টা কাটছে মাইকেলের। অ্যাপলোনিয়ার শরীরের গঠনে কোন খুঁত দেখতে পায় না ও। ওর দিকে যখন তাকায়, তার দৃষ্টিতে কামনা-মদির লালসা দেখতে পায়। দেখে দেখে মনের আশ মেটে না ওর। গায়ে এক অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধ আছে অ্যাপলোনিয়ার, মেয়েমানুষের গায়ের সৌরভ নাকে ঢোকা মাত্র কামনার আগুন ধরিয়ে দেয় শরীরে। অ্যাপলোনিয়া এখনও লজ্জাবতী, কিন্তু অস্বীকার করতে পারবে না মাইকেল, ওর ক্ষুধা রাস্কুসীর মত। তার যৌন কামনা ওর লালসার চেয়ে কোন অংশে কম তীব্র নয়। অসীম ক্রান্তিতে এক একদিন ঘুমিয়ে পড়ে ওরা, তখন হয়তো ভোর হয়ে এসেছে। আবার এক একদিন কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না মাইকেলের। জানালার চৌকাঠে পা তুলে বসে থাকে, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অ্যাপলোনিয়ার নগ্ন শরীরের দিকে। ভোর হয়ে যায়, বেলা চড়ে, তবু চোখ ফেরাতে পারে না। এমন সুন্দর মুখাবয়ব আর কখনও দেখেনি ও। না, দেখেছে—শুধু ইতালির শিল্পীর আঁকা বইতে, ঠিক যেন যীশুর কুমারী মায়ের চেহারা। না, তার চেয়েও সুন্দর, সে চেহারায় অ্যাপলোনিয়ার মত কৌমার্য ফোটে না।

ষিয়ার পর প্রথম ক'টা দিন রোজ আলফা রোমিও চড়ে পিকনিক করতে গেল ওরা। একদিন মাইকেলকে ডেকে ডন টমাসিনো বললেন, 'মাইকেল, তোমার আর

একটু সতর্ক হয়ে চলা দরকার।’

অবাক হয়ে জানতে চাইল মাইকেল, ‘কেন বলুন তো?’

ডন টমাসিনো জানানেন, বিয়েটা ধুমধামের সাথে হওয়ায় ইটালির এই এলাকায় মাইকেলের পরিচয় কারও আর জানতে বাঁকি নেই, তাই কর্নিয়নি পরিবারের শত্রুদের চোখ খুলে গেছে। তিনি আভাস দিলেন শত্রুদের লম্বা হাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এই ছোট্ট দ্বীপেও পৌঁচেছে।

বাগানবাড়ির চারদিকে সশস্ত্রগার্ড মোতায়েন করা হলো। বাড়ির ভেতর থাকল আরও দু’জন সশস্ত্র প্রহরী, কার্লো আর ফ্যাব্রিয়সিও। সেদিন থেকে বলতে গেলে বাড়ির ভেতর বন্দী জীবন কাটাতে শুরু করল মাইকেল আর অ্যাপলোনিয়া।

অ্যাপলোনিয়াকে নিয়েই সময় কাটে মাইকেলের। তাকে ইংরেজি লিখতে আর পড়তে শেখায়, বাড়ির উঠানে গাড়ি চালানো শেখায়, কিছু কিছু আদব-কায়দা রপ্ত করার জন্যে তালিমও দেয়। এই সময়টা খুবই অন্যমনস্ক দেখায় ডন টমাসিনোকে। সব সময় কি যেন চিন্তা করেন, ভাল করে কথা বলেন না কারও সাথে। ব্যাপারটা কি জানার জন্যে ডাক্তার তাজাকে একদিন প্রশ্ন করল মাইকেল। ডাক্তার বললেন, ‘পালার্মোয় কিছু মাফিয়া নেতা উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, তাদের সাথে বিরোধ দেখা দিয়েছে ডন টমাসিনোর।’

এর মধ্যে একদিন এক ঘটনা ঘটল। বাড়ির বুড়ি ঝি এক পেয়লা জলপাইয়ের আচার নিয়ে দেখা করতে এল মাইকেলের সাথে। সোজা বাগানে ঢুকে পড়ল সে। গ্রামেরই মেয়ে বুড়ি, এখানেই বড় হয়েছে সে। বেশ কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে মাইকেলকে দেখল সে, তারপর জিজ্ঞেস করল, ‘সবাই একটা কথা বলছে, তা কি সত্যি? নিউ-ইয়র্ক শহরের গড ফাদার, ডন ভিটো কর্নিয়নির ছেলে তুমি?’

গোপনীয়তা এতদূর প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়লেন ডন টমাসিনো। কিন্তু বুড়ির সেদিকে জ্ঞপ্তি মাত্র নেই, সে মাইকেলের দিকে এমন নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল যেন মাইকেল কি উত্তর দেয় তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে তার। মৃদু হেসে মাথা নাড়ল মাইকেল। ‘বাবাকে তুমি চেনো?’ জিজ্ঞেস করল ও।

মেটে রঙের আখরোটের মত কোঁচকানো মুখ বুড়ির, নাম/ফিলোমিনা। দাঁতগুলো ফিকে লাল রঙের, মুখের পাতলা খোলের ভেতর দেখা যায় সেগুলো। মাইকেলের ফাই-ফরমাস খাটে, কিন্তু আজ পর্যন্ত ওর সাথে বিশেষ কথা বলার গরজ দেখায়নি সে, কিন্তু আজ বুড়ি ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে শুধু কথা বলতে আসেনি, তার জীবনের মস্ত বড় একটা ভীতিও দূর করতে এসেছে। মাইকেলের কথা শুনে হাসল বুড়ি, দুই কান পর্যন্ত গিয়ে ঠেকল তার আঁকিবুকি কাটা ঠোঁটজোড়া। অদ্ভুত এক কৃতজ্ঞ দৃষ্টি ফুটে উঠল চোখে। ‘গড ফাদার সুস্থ থাকুন,’ বলল সে। ‘যীশু তাঁর মঙ্গল করুন।’ মাইকেলের দিকে তাকিয়ে চোখ বড় বড় করল সে, ‘জানো, এই যে আজও আমি বেঁচে আছি, এ কার দান? গড ফাদারের। তিনি একবার আমার এটা, ‘বুড়ি হাত দিয়ে নিজের মাথাটা দেখাল, ‘বাঁচিয়েছিলেন। হ্যাঁ, মাইকেল কর্নিয়নি, তাঁর দয়ায় সেবার আমার এই প্রিয় প্রাণটা রক্ষা পায়।’

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, আরও অনেক কথা বলার আছে ফিলোমিনার। উৎসাহ দেবার জন্যে একটু হাসল মাইকেল।

কিন্তু কি ভেবে যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে চুপসে গেল বুড়ির চেহারা। খানিক ইতস্তত করার পর জানতে চাইল সে, ‘আরেকটা কথা! আচ্ছা, লুকা ব্রাসি সত্যি মারা গেছে কিনা তুমি জানো, বাবা?’

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল মাইকেল, অমনি পরম স্বস্তির একটা ভার ফুটে উঠল বুড়ির চেহারায়, মস্ত একটা হাঁফ ছাড়ল সে। বুকে ত্রুশ চিহ্ন একে বলল, ‘খাঁড় মাফ করুন আমাকে, কিন্তু তবু চাই ওর আত্মা যেন অনন্ত নরকে পোড়ে।’

বুড়ির কথা শুনে লুকা ব্রাসি সম্পর্কে অনেক আগের কৌতূহলটা আবার নতুন করে জেগে উঠল মাইকেলের মনে। বহুবার এই কৌতূহল মেটাবার চেষ্টা করেছে ও, কিন্তু হেগেন আর সনি মুখ খুলতে রাজী হয়নি। লুকা সম্পর্কে এমন একটা রহস্য আছে যা নাকি একশো বছরের বুড়ো না হওয়া পর্যন্ত মাইকেলের শোনা উচিত নয়। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে কথাটা জানার সুযোগ পেয়ে সেটাকে হাতছাড়া করার ইচ্ছে হলো না মাইকেলের। ও ধরেই নিয়েছে যে বুড়ি ব্রাসি-রহস্য অবশ্যই জানে। বুড়ির হাত ধরল ও, টেনে নিয়ে এসে নিজের পাশে বসাল, তারপর তাকে এক গ্লাস মদ খেতে দিয়ে বলল, ‘পুরানো দিনের অনেক কথা জানো তুমি, তাই না? সে-সব আমি শুনতে চাই। তুমি আমাকে বাবা আর লুকা ব্রাসির গল্প বলো। কোথায় ওদের দেখা হলো, কে ওরা, কাকে কেমন চোখে দেখত... শুনছি, লুকা নাকি বাবাকে সাংঘাতিক ভক্তি করত... কোন ভয় নেই তোমার, সব কথা নির্ভয়ে বলো আমাকে।’

কিন্তু ভয় তবু দূর হয় না ফিলোমিনার। অপ্রতিভভাবে অনুমতির জন্যে ডন টমাসিনোর দিকে তাকাল সে। মাথা নেড়ে সায় দিলেন তিনি। মাইকেলের উৎসাহ লক্ষ করে বুড়িকে মুখ বুজে থাকার নির্দেশ দিতে পারলেন না। ফিলোমিনার কিসমিসের মত কালো চোখে খানিকটা স্বস্তি ফিরে এল, কোঁচকানো মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটল একটু। গল্প বলতে শুরু করল সে। তার মুখ থেকে লুকা ব্রাসির গল্প শুনেই সন্ধ্যাটা কাটিয়ে দিল সেদিন ওরা।

ত্রিশ বছর আগের কথা।

নিউ ইয়র্ক। টেনথ্‌ এভিনিউ ইতালীয়দের পাড়া। ধাত্রীর কাজ করে ফিলোমিনা। এই সব ইতালীয় মেয়েরা ফি বছর বাচ্চা বিয়েয়, ভালই রোজগার হয় তার। নিজের পেশায় যথেষ্ট জ্ঞান রাখে সে। প্রসবের সময় যদি কখনও অস্বাভাবিক জটিলতা দেখা দেয় বাড়ির কর্তারা ফিলোমিনার কথা অগ্রাহ্য করে ডাক্তার ডাকে। ডাক্তাররা ফিলোমিনার কাছ থেকে কিছু কিছু ব্যাপারে শিক্ষা লাভ করে ফিরে যায়। একটা খুদির দোকান আছে তার স্বামীর, তাতেও ভাল রোজগার হয় ওদের। কিন্তু স্বামী তার বাধ্য নয়, যখন যা ইচ্ছা তখন তাই করে বেড়ায়। মদ তো খায়ই, জুয়াও খেলে। আর মেয়েমানুষ নিয়ে ফুটি করাটা তো তার একটা দুরারোগ্য ব্যাধি। এই করতে করতে লোকটা মারা গেল। ফিলোমিনা তার আত্মার কল্যাণের জন্যে গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করে। তবে মারা যাবার সময় লোকটা তার জন্যে একটা পয়সাও রেখে যায়নি।

এক নিশ্চিতি রাতের ঘটনা। ফিলোমিনার জীবনে সেটা একটা অভিশপ্ত রাতও বটে। পাড়ার সব ভাল মানুষ যে যার বাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েছে, এই সময় কে যেন তার দরজায় টোকা দিল। এত রাতে কে ডাকে? ভয় পায়নি ফিলোমিনা, কারণ সে জানে, পাপ আর পাপীতে ভরা এই দুনিয়ায় নিরাপদে টোকার জন্যে খুব বুদ্ধি করে এই নিশ্চিতি রাতকেই বেছে নেয় শিশুরা। তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নিয়ে দরজা খুলে দিল সে। সামনে একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাকে দেখেই শিউরে উঠল ফিলোমিনা। জুকা ব্রাসি। ইতালীয় পাড়ার সবচেয়ে নিষ্ঠুর লোক বলে বদনাম আছে এর। তাছাড়া, পাড়ার সবাই জানে, লুকা বিয়ে করেনি। তার মানে, কোন অবৈধ কাজ করিয়ে নেবার জন্যে এসেছে। ফিলোমিনার স্বামী তখনও বেঁচে, তাই লুকাকে দেখে প্রথমে তার স্বামীর নিরাপত্তার কথাটাই মনে পড়ল। ভাবল, লুকা নিশ্চয়ই তার স্বামীর কোন ক্ষতি করতে এসেছে। ছোটখাট কোন ব্যাপারে কেউ সাহায্য করতে অস্বীকার করলে লুকা তার চরম সর্বনাশ করতে দ্বিধা করে না।

অনিষ্ট করার উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছে লুকা, কিন্তু ফিলোমিনার স্বামী তার লক্ষ্য নয়। বলল, এ পাড়া থেকে কিছুটা দূরে একটা মেয়ের প্রসব হবে, এখুনি সেখানে যেতে হবে ফিলোমিনাকে। সেই মুহূর্তে বুঝে নিল ফিলোমিনা, নিশ্চয়ই কোথাও কোন গোলমাল আছে। তাকিয়ে দেখল, পাষাণটাকে আজ রাতে কেমন যেন অস্থির, উন্মাদ মত দেখাচ্ছে। ভূতে পাওয়া মানুষের মত দিশাহারা। খুব ভয়ে ভয়ে মৃদু আপত্তি জানাল ফিলোমিনা। কর্কশ একটা চাপা আওয়াজ বেরিয়ে এল লুকার গলার ভেতর থেকে। ফিলোমিনার হাতে কয়েকটা কাগজের নোট গুঁজে দিয়ে গম্ভীরভাবে বলল সে, 'কথা নয়। আমার সাথে এসো'। সেই জলদগম্ভীর আদেশ অমান্য করার সাহস হলো না ফিলোমিনার।

একটা ফোর্ড গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়। ড্রাইভারের সীটে বসে আছে লুকারই এক সহচর। পাড়ার বাইরে সেই বাড়িটার পৌছতে আধঘণ্টাও লাগল না। লং আইল্যান্ড সিটির ঠিক পুলের ওপর ছোট্ট কাঠের তৈরি বাড়িটা। খুব জোর হলে কোনরকমে দুটো পরিবার থাকতে পারে ওখানে, কিন্তু একটু পরই জানা গেল লুকা আর তার সহচররা ছাড়া আর কেউ থাকে না।

ভেতরে ঢুকে ফিলোমিনা দেখল কয়েকজন গুপ্তা কিচেনে বসে মদ গিলছে আর জুয়া খেলছে। ওপর তলার একটা বেডরুমে তাকে নিয়ে এল লুকা। অল্প বয়েসী একটা মেয়ে শুয়ে আছে খাটে। খুবই সুন্দরী। রঙের প্রলেপ রয়েছে মুখে, চুলগুলো লাল, পেটটা শুয়োরের মত ফুলে উঠেছে। দেখে আইরিশ বলে মনে হলো। চেহারা য ভয় আর আতঙ্ক নিয়ে শুয়ে আছে সে। ওদের দু'জনকে দেখেই আঁতকে উঠল, হ্যাঁ আঁতকে উঠল, তারপর দ্রুত মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে পাশ ফিরল। লুকা ব্রাসির চেহারা য ভয়ঙ্কর একটা বিদ্বেষের ভাব লেপ্টে রয়েছে, তাই দেখে ঠক ঠক করে কাঁপছে ফিলোমিনা।

নিঃশব্দে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল লুকা ব্রাসি। ধাত্রী ফিলোমিনাকে সাহায্য করল লুকারই দু'জন সহকারী। পোয়াতী তেমন কষ্ট পেল না, সহজেই বেরিয়ে এল বাচ্চাটা। সাথে সাথে ক্লান্তিতে ঢলে পড়ল মা, ঘুমিয়ে পড়ল। খবর পেয়ে কামরায়

ফিরে এল লুকা।

নবজাতককে কন্ডলে জড়িয়ে নিয়ে এগোল ফিলোমিনা। লুকা বাসির সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে, তার দিকে বাড়িয়ে ধরল বাচ্চাকে, বলল, 'আমার কাজ শেষ। আপনি যদি এর বাবা হন, নিন।'

ফিলোমিনার দিকে নিঃশব্দে তাকাল লুকা। ভয়ে আবার কাঁপতে শুরু করল ফিলোমিনা। আবার সেই পাগলের মত দেখাচ্ছে লুকাকে, কি যেন একটা অশুভ শক্তি ভর করেছে তার ওপর, কি যেন একটা অসম্ভব কথা চিন্তা করেছে সে।

'হ্যাঁ, আমিই ওর বাবা,' কর্কশ গলায় বলল লুকা। 'কিন্তু এই বংশের কেউ বেঁচে থাকুক তা আমি চাই না। ওকে নিয়ে বেসমেন্টে চলে যাও, ফেলে দাও চুলোয়।'

ফিলোমিনার মনে হলো, ঠিক কি বলতে চাইছে লুকা তা সে বুঝতে পারছে না। বংশের কথা কেন তুলল সে? মেয়েটা ইতালীয় নয়, সৈজন্যে? নাকি সে বেশ্যা বলে? অথবা লুকার ওরসে যে জন্মেছে তার বেঁচে থাকার অধিকার নেই, যোগ্য নয়? কিন্তু পরমুহূর্তে ভাবল, এসব কিছু না, ব্যাপারটা আসলে লুকার নির্দয় একটা ঠাট্টা।

'আপনার সন্তান, কার কি বলার আছে—যা ইচ্ছে করুন।' ছোট্ট পৌটলাটা লুকার দিকে আরেকটু বাড়িয়ে দিল ফিলোমিনা।

ঠিক এই সময় ঘুম ভেঙে গেল মায়ের। পাশ ফিরল সে, ওদের দিকে তাকাল। দেখল, থমথম করছে লুকার চেহারা। কন্ডলে জড়ানো পৌটলাটা ঠেলে ফিরিয়ে দিচ্ছে ফিলোমিনার বুকের ওপর। 'লুকা!' আঁতকে উঠল মা। 'ও, লুকা! ওকে তুমি মাফ করো!' সদ্যজাত সন্তানের হয়ে ক্ষমা চাইল সে। 'ওকে রেহাই দাও! তোমার পায়ে পড়ি, ওকে নয়, তুমি আমাকে...'

ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল লুকা।

ফিলোমিনা দেখল, ঘৃণায় বিকৃত হয়ে উঠেছে ওর চেহারা। সদ্যজাত শিশুর মায়ের দিকে তাকাল ফিলোমিনা। তার চেহারাতেও ফুটে উঠেছে তীব্র ঘৃণা। দুই হিংস্র জানোয়ার যেন পরস্পরকে চিনতে পেরে প্রচণ্ড আক্রোশে ফুসছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, দু'জনের কেউই এখন দুনিয়ার কোন ব্যাপারে সচেতন নয়, শিশুটির কথাও ভুলে গেছে ওরা—পরস্পরের প্রতি ওদের ঘৃণা আর ক্রোধ প্রতি সেকেন্ডে শুধু বেড়েই চলেছে।

হিংস্র পশুর মত পরস্পরের দিকে আরও অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওরা। অদ্ভুত এক পৈশাচিক লালসা ফুটে উঠেছে লুকার চেহায়ায়। খুনের নেশায় পাগল দেখাচ্ছে ওকে।

ধীরে ধীরে ফিলোমিনার দিকে ফিরল লুকা। ছ্যাৎ করে উঠল ফিলোমিনার বুক। সভয়ে এক পা পিছিয়ে গেল সে।

'যা করতে বলেছি তাই করো—যাও,' চাপা কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল নিশ্চল কামরার ভেতর। আবার বলল লুকা, 'তোমার কোন অভাব রাখব না। যাও।'

ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল ফিলোমিনা। কথা বেরুল না মুখ থেকে। দ্রুত মাথা নাড়তে পারল শুধু। কিন্তু সেটা লুকার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে যথেষ্ট নয়

বুঝতে পেরে প্রাণপণ চেষ্টায় ফিসফিস করে বলল, ‘আমাকে মাফ করুন। আপনি ওর বাপ, যা হয় আপনি করুন।’

তিন সেকেন্ডে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল লুকা। তারপর শার্টের ভেতর হাত গলিয়ে একটা ছোরা বের করল। ‘তোমাকে কাটব,’ বলল সে।

একপর কিছুক্ষণ হুঁশ ছিল না ফিলোমিনার। কারণ আবার যখন সুস্থ বোধ করল সে, চিন্তা শক্তি ফিরে পেল, দেখল বাড়িটার নিচে বেসমেন্টে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে দেখা যাচ্ছে প্রকাণ্ড চুলোটা। সদ্যজাত শিশুকে এখনও বুকের সাথে জাপটে ধরে আছে সে। আশ্চর্য, মায়ের পেট থেকে বেরবার পর থেকে এখন পর্যন্ত একবারও কাঁদেনি সে—যেন প্রতিবাদ করে কোন লাভ নেই জানতে পেরে চুপচাপ থাকারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিষ্পাপ শিশু। কিন্তু ফিলোমিনা চাইছে, একবার অন্তত কেঁদে উঠুক বাচ্চাটা। তাতে যদি লুকার প্রাণে একটু দয়া হয় একটা চিমটি কাটলেই ব্যথা পেয়ে কেঁদে ওঠে ও, কিন্তু দিশেহারা ফিলোমিনার মাথায় বুদ্ধিটা এল না।

চুলোর দরজা কেউ একজন খুলে দিয়ে গেছে। ভেতরে আগুন দেখা যাচ্ছে। বেসমেন্টে লুকা আর ফিলোমিনা ছাড়া কেউ নেই। চারদিকে গরম পানির পাইপ দেখা যাচ্ছে, ঘামের মত বিন্দু বিন্দু পানি ঝরছে পাইপের গা থেকে। ইঁদুর-ইঁদুর বোঁটকা একটা গন্ধ ঢুকছে নাকে।

ছোরাটা আবার কখন যেন বের করে হাতে নিয়েছে লুকা। ফিলোমিনা জানে, ওকে খুন করার জন্যে তৈরি হয়ে আছে সে।

আগুনের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল ফিলোমিনা। ধীরে ধীরে লুকার দিকে তাকাল আরেকবার। বুঝতে পারল, প্রকৃতিস্থ অবস্থায় নেই লোকটা। মুখটা বিকৃত হয়ে গেছে। শয়তানের চেহারাও বুঝি এমন বীভৎস নয়। খালি হাতটা দিয়ে ওকে ধাক্কা দিল সে। ধাক্কাটা সামলাতে না পেরে চুলোর খোলা দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল ফিলোমিনা।

অসহায় ফিলোমিনা জানে, কিছুই তার করার নেই। লুকার হুকুম অমান্য করতে পারে সে, তাতে খুন হতে হবে। কিন্তু খুন হয়ে লাভ কি যদি না বাচ্চাটাকে বাঁচানো যায়?

গল্প থামিয়ে চুপ করল ফিলোমিনা। তাকে এক গ্লাস মদ দিল মাইকেল। সেটা খেয়ে বুকে জ্বল চিহ্ন আঁকল সে। ঠোঁট জোড়া নড়ে উঠল, বিড়বিড় করে প্রার্থনা করছে সে।

‘কাজটা তুমি করলে?’ কোমল গলায় জানতে চাইল মাইকেল।

উপর নিচে মাথা দোলাল ফিলোমিনা।

‘তারপর কি হলো?’

গল্পটা আবার বলতে শুরু করল ফিলোমিনা। এক বাঙালি টাকা দিয়ে তাকে গাড়িতে তুলে বাড়ি পাঠিয়ে দিল লুকা। বিদায় দেবার আগে গভীর সুরে জানান, মুখ খুললে মরতে হবে ফিলোমিনাকে। ফিলোমিনা মুখ খোলেনি। কিন্তু দু’দিন পরই পুলিশ এসে বেঁধে নিয়ে গেল লুকাকে। কারণ শিশুর মাকে খুন করেছিল সে।

কয়েক দিন বাড়ি ছেড়ে ভয়ে কোথাও বের হত না ফিলোমিনা। তারপর

মনস্থির করে গড ফাদারের কাছে গেল সে, তাঁকে সব কথা খুলে বলল। সব শুনে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর সম্পূর্ণ আশ্বাস দিয়ে ফিলোমিনাকে বললেন, তোমার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমি নিলাম। কিন্তু এ-ব্যাপারে কাউকে তুমি কিছু বোলো না।

গড ফাদারের আশ্বাস পেয়েও খুব একটা নিরাপদ বোধ করেনি ফিলোমিনা। তার কারণ, লুকা রাসি তখনও ডন কর্লিয়নির কাজ করে না।

ডন কর্লিয়নি কোন পদক্ষেপ নেবার আগেই সেলে বসে লুকা রাসি আত্মহত্যার চেষ্টা করল। ভাঙা কাচের টুকরো দিয়ে নিজের গলা কেটে ফেলেছিল, কিন্তু দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ায় বেঁচে গেল সে। ওদিকে, সে সুস্থ হয়ে ওঠার আগেই তাকে পুলিশ এবং আইনের হাত থেকে বাঁচাবার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করে ফেললেন ডন কর্লিয়নি। আদালতে প্রমাণ দাখিল করার মত কিছুই পেল না পুলিশ, বেকসুর খালাস পেয়ে গেল লুকা।

ডন কর্লিয়নি ফিলোমিনাকে সম্পূর্ণ আশ্বাস দিলেও পুলিশ বা লুকার তরফ থেকে বিপদ হতে পারে এই ভয় কাটেনি তার। কাজে মন বসে না, সব সময় গা ছমছম করে। শেষ পর্যন্ত সব কথা খুলে বলল স্বামীকে। লোকটা ভাল ছিল, সব কথা বুঝল সে। যদি দোকান বিক্রি করে ইটালিতে ফিরে আসতে রাজী হলো।

ফিরে এল ওরা। আমেরিকায় কঠোর পরিশ্রম করে প্রচুর টাকা রোজগার করেছিল ফিলোমিনার স্বামী, কিন্তু ইটালিতে ফিরে এসে দুর্বল লোকটা সব টাকা উড়িয়ে দিল। তাই তো আজ এই অবস্থা ফিলোমিনার, পরের দোরে চাকরানীর কাজ করতে হচ্ছে।

শেষ হলো ফিলোমিনার গল্প। মাইকেলের হাত থেকে আরেক গ্লাস মদ নিয়ে খেলো সে।

‘মাইকেল কর্লিয়নি,’ বলল বুড়ি, ‘তোমার বাবা খুব ভাল মানুষ, যখনই গির্জায় যাই তখনই তাঁর জন্যে প্রার্থনা করি। আমার আশীর্বাদ সব সময় তাঁর সাথে আছে। টাকার দরকার হলে কখনও তিনি নিরাশ করেননি, খবর পেয়েই পাঠিয়ে দিয়েছেন। কেন আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ, বুঝলে তো এখন? উনি শুধু আমার প্রাণই বাঁচাননি, বেঁচে থাকার জন্যে সাহায্যও করেছেন। তাঁকে বোলো, মৃত্যুর পর তাঁর কোন ভয় নেই। আমি তাঁর আত্মার কল্যাণের জন্যে প্রার্থনা করি।’

বুড়ি ফিলোমিনা বিদায় নিয়ে চলে গেল।

‘যা বলল তা কি সত্যি?’ ডন টমাসিনোকে জিজ্ঞেস করল মাইকেল।
নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালেন মাফিয়া নেতা ডন টমাসিনো। সব সত্যি

একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল মাইকেল। কেন কেউ ওকে গল্পটা বলতে চায়নি, এখন বুঝতে পারছে ও। সন্দেহ নেই, গল্প বটে একখানা! আর লুকাও একজন মানুষ বটে!

পরদিন। সকালের দিকে মাইকেলের ইচ্ছা হলো, গত রাতে ফিলোমিনার বলা গল্পটা নিয়ে ডন টমাসিনোর সাথে একটু আলোচনা করবে ও। কিন্তু তাঁর খোঁজ নিতে গিয়ে জানল, বিশেষ একটা জরুরী বার্তা পেয়ে হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে পার্লামেন্টে চলে যেতে হয়েছে তাঁকে।

সন্ধ্যায় ফিরলেন ডন টমাসিনো। মাইকেলকে ডেকে পাঠালেন তিনি। ওকে নিয়ে নির্জন একটা কামরায় ঢুকলেন। তারপর বন্ধ করে দিলেন দরজাটা।

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে মাইকেল। এখনও কোন কথা বলেনি ও।

‘আমেরিকা থেকে খবর এসেছে।’ কথা বলছেন ডন টমাসিনো। তাঁর কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ আর দুঃখ।—খারাপ খবর। সাম্প্রতিক খারাপ খবর! সনি, সান্তিনো কার্লিনি খুন হয়েছে।’

দুই

সিসিলি ভোর।

হলদেটে রোদে ভরে গেছে মাইকেলের শোবার ঘর। ঘুম ভাঙতেই টের পেল ও, মখমলের মত অ্যাপলোনিয়ার শরীরটা ওর নিজের শরীরের সাথে সঁটে রয়েছে। আদর সোহাগ দিয়ে জাগাল ওকে মাইকেল। এই ক’মাস তাকে পুরোপুরি অধিকার করেও তার রূপ, তার তীর বাসনা দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারে না ও।

কামরা থেকে বেরিয়ে বাথরুমে ঢুকল অ্যাপলোনিয়া। খালি গায়ে খাটে শুয়ে রইল মাইকেল। একটা সিগারেট ধরাল। গায়ে এসে পড়েছে সকালের রোদ। এই বাগানবাড়িতে আজ ওদের শেষ দিন। সিসিলির দক্ষিণ তীরে, আরেক শহরে ওদের থাকাব ব্যবস্থা করেছেন ডন টমাসিনো। এক মাসের অন্তঃসত্তা অ্যাপলোনিয়া, কয়েক হুণ্ডা বাপের বাড়ি কাটিয়ে সেও যাবে মাইকেলের কাছে, ওদের নতুন নিরাপদ আশ্রয়ে।

গত রাতে অ্যাপলোনিয়া শুয়ে পড়ার পর, মাইকেলকে ডেকে নিয়ে এসে বাগানে বসেছিলেন ডন টমাসিনো। উদ্ভিগ্ন আর ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে। মাইকেলের নিরাপত্তা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির কথা জানানেন। বললেন, ‘বিয়ে করে তুমি লোকের চোখে পড়ে গেছ। তোমার বাবার কথা ভেবে অবাকই লাগছে আমার, তিনি তোমার জন্যে অন্য কোথাও ব্যবস্থা করছেন না কেন? এদিকে পালার্মোর নতুন সর্দারদের নিয়ে আমাদেরও সম্ভাব্যিক ভুগতে হচ্ছে। কিছু কিছু সুযোগ দিতে চেষ্টেছি ওদেরকে, তাতে ন্যায্য ভাগের কিছু বেশিই পাবে ওরা, কিন্তু মসিবত হলো বোকার দল সবটুকুই মুঠোয় ভরতে চায়। ওদের হাবভাব ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না আমি। কয়েকবার চেষ্টাও করেছে, কিন্তু আমাকে খুন করা অত সহজ নয়। ছেলেমানুষদের দোষটাই ওখানে, কার কত শক্তি বোঝে না, তা তারা যত গুলীই হোক না কেন। নিজেদের অধিকার কতটা ভেবে দেখবে না, যত পানি আছে কুয়োয় সবটুকু গিলে ফেলতে চাইবে।’

এরপর ডন টমাসিনো জানানেন, দুই রাখাল দেহরক্ষী কার্লো আর ক্যাব্রিয়িয়ো মাইকেলের সাথে গাড়িতে থাকবে। তিনি নিজে আজ রাতেই বিদায় নেবেন, কারণ জরুরী কাজে খুব ভোরেই তাঁকে পালার্মোয় যেতে হচ্ছে। নিষেধ করলেন, মাইকেল যেন ডাক্তার তাজাকে ওর যাবার ব্যাপারে কিছু না বলে। কারণ, আজ সন্ধ্যাটা তিনি পালার্মোতেই কাটাবেন। গল্প করা স্বভাব, কার কাছে কি বলে বসেন তার কোন

ঠিক নেই।

ডন টমাসিনো যে বিপদে জড়িয়ে পড়েছেন মাইকেল তা খুব ভালভাবে বুঝতে পারে। সশস্ত্র গার্ডরা বাড়ির চারদিকে পাহারা দেয় রাতে। কয়েকজন বিশ্বস্ত রাখাল লুপারা হাতে নিয়ে চম্বিশ ঘণ্টা ঘুরে বেড়ায় বাড়ির ভেতর। নিজেও তিনি প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র সাথে নিয়ে বেরোন। সাথে তাঁর ব্যক্তিগত বডিগার্ডরা তো থাকেই।

রোদটা এখন কড়া হয়ে এসেছে। সিগারেট নিভিয়ে ফেলল মাইকেল। এবার তৈরি হতে হয়। সিসিলীয় শ্রমিকদের প্রিয় ট্রাউজার পরন ও, তারপর শার্ট আর ঠোট লাগানো টুপি। খালি পায়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও, একটু ঝুঁকে পড়তেই ফ্যাব্রিয়িয়াকে দেখতে পেল। বাগানে একটা চেয়ারে বসে রয়েছে, খুব আয়েশের সাথে ঘন কালো চুলে চিরুনি চালাচ্ছে সে। লুপারা বন্দুকটা অবহেলার সাথে ফেনে রেখেছে টেবিলের ওপর। শিশু দিল মাইকেল, সাথে সাথে মুখ তুলে তান্ডাল ফ্যাব্রিয়িয়াকে।

‘গাড়িটা নিয়ে এসো,’ বলল মাইকেল, ‘পাঁচ মিনিটের মধ্যে রওনা হব আমি কার্লোকে দেখছি না যে?’

‘কিচেনে, কফি খাচ্ছে,’ উঠে দাঁড়িয়ে বলল ফ্যাব্রিয়াকো। বোতাম খোলা শার্টের ভেতর লাল-নীল উল্লি দেখা যাচ্ছে বুকে। ‘তোমার সাথে তোমার স্ত্রীও যাচ্ছেন নাকি, মাইক?’

ডুকু কুঁচকে উঠল মাইকেলের। হঠাৎ যেন খেয়াল হলো, কয়েক হণ্ডা থেকে অ্যাপলোনিয়ার ওপর বড় বেশি নজর রেখেছে ফ্যাব্রিয়াকো, বড় বেশি খোঁজ খবর রাখার চেষ্টা করছে। না, ভয় পাবার কিছু নেই—ডন টমাসিনোর বন্ধু মাইকেল, ওর স্ত্রীর সাথে বাড়িবাড়ি করার সাহস কখনোই হবে না তার। সিসিলিতে কেউ যদি মরতে চায়, সম্মানী লোকের বউয়ের দিকে নজর দিক, তাহলেই সাধ মিটে যাবে তার।

‘না,’ ঠাণ্ডা গলায় বলল মাইকেল। ‘এখন বাপের বাড়িতে থাকবে ও, তারপর আমার কাছে যাবে।’ একটা পাথরের কুটিরে মেরামত করা হয় আলফা রোমিও, তাড়াতাড়ি সেখানে যেতে বলল ফ্যাব্রিয়াকো।

হলঘরের ওদিকে হাত-মুখ ধুতে গেল মাইকেল। আশপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না অ্যাপলোনিয়াকে। হয়তো কিচেনে গিয়ে খাবার তৈরি করছে ওর জন্যে। মাইকেলের সাথে এক সাথে যেতে পারছে না বলে বিবেকের একটু দংশন অনুভব করছে হয়তো। মাইকেল তাকে সাথে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু সিসিলির আরেক প্রান্তে চলে যেতে হচ্ছে, তাই মা-বাপ-ভাইদের সাথে ক’টা দিন কাটিয়ে যেতে চাইছে সে। বিবেককে একটু শান্ত করার জন্যে হয়তো আজ সে রাঁধতে বসেছে।

কিন্তু কিচেনে নেমে এসে অ্যাপলোনিয়াকে দেখতে পেল না মাইকেল। ওকে কফি দিয়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল বুড়ি ফিলোমিনা, পিছন থেকে বলল মাইকেল, ‘তোমার কথা বাবাকে বলব আমি।’ একটু থেমে হাসল বুড়ি, তারপর মাথা দোলল।

কার্লো ভেতরে ঢুকল, ‘বাইরে তোমার জন্যে গাড়ি অপেক্ষা করছে,’

মাইকেলকে বলল সে। ‘ব্যাগ নিয়ে আসি সব?’

‘না,’ বলল মাইকেল। ‘আমি আনছি। অপ্লো কোথায়?’

আমুদে হাসিতে ভরে উঠল কার্লোর মুখ। ‘গাড়ির ড্রাইভিং সীটে বসে আছে, স্টার্ট দেবার জন্যে হাত দুটো নিশপিশ করছে।’ যাই বলো, ও কিন্তু আমেরিকায় পৌছুবার আগেই মার্কিনী বনে যাচ্ছে।’ কার্লো কিছু বাড়িয়ে বলছে না। চাবী পরিবারের একটা মেয়ে গাড়ি চালানো শিখেছে, সিসিলিতে এর চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না।

অ্যাপলোনিয়াকে একা একাও গাড়িটা চালাতে দেয় বটে মাইকেল, কিন্তু সব সময় পাশে থাকে ও। বাড়ির ভেতরই প্র্যাকটিস করে অ্যাপলোনিয়া, আজ পর্যন্ত বাইরে একবারও গাড়ি নিয়ে বেরোয়নি সে। চালানোটা এখনও রপ্ত করতে পারেনি ঠিকমত, প্রায়ই ব্রেক চাপতে গিয়ে ভুল করে অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিয়ে ফেলে।

‘ফ্যাব্রিকে নিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করো গাড়িতে,’ কার্লোকে বলল মাইকেল। ‘কিচেন থেকে বেরিয়ে এল ও, একসাথে দু’তিনটে করে সিঁড়ির ধাপ টপকে দোতলায় উঠল। ব্যাগগুলো আগেই গোছানো হয়েছে। তুলে নেবার আগে জানালা দিয়ে নিচে তাকাল একবার, দেখল গাড়িটা কিচেনের দরজার সামনে নয়, গাড়িবারান্দার সামনে রয়েছে।’

গাড়ির ভেতর দেখা যাচ্ছে অ্যাপলোনিয়াকে। হাত দুটো স্টিয়ারিং হুইলের ওপর সত্যি নিশপিশ করছে। পিছনের সীটে খাবারের টুকরি নামিয়ে রাখছে কার্লো। কিন্তু ফ্যাব্রিয়িয়াকে এই মুহূর্তে কোথাও দেখতে পেল না মাইকেল। তারপর হঠাৎ চোখে পড়ল ওকে। বিরক্ত হলো মাইকেল। বাগানবাড়ির গেট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে, খুব ব্যস্ত ভাবে, যেন হঠাৎ জরুরী কি একটা কাজের কথা মনে পড়ে গেছে তার। ব্যাটা করছেটা কি? এই সন্ধ্যা পিছন ফিরে তাকাল ফ্যাব্রিয়িয়ো, চোখে কেমন যেন চোরা চাহনি। ছোকরাকে একটু শাসন করতে হবে, নিজেকে মনে করিয়ে দিল মাইকেল। নিচে নেমে আবার কিচেনে ঢোকান ইচ্ছে রয়েছে ওর, আরেকবার বিদায় নেবে বুড়ি ফিলোমিনার কাছ থেকে। তাই করল। কথা শেষ করে জানতে চাইল, ‘ডাক্তার তাজা কোথায়? এখনও ঘুমাচ্ছেন নাকি?’

‘বুড়ো মোরগদের সূর্য ওঠার তর সয়না,’ ফিলোমিনার আঁকিবুঁকি কাটা মুখে ধৃত ভাব ফুটে উঠল। ‘কাল রাতেই পালার্মোয় চলে গেছেন তিনি।’

হাসল মাইকেল। পালার্মোর বেশ্যাপাড়ার কম-বয়েসী মেয়েগুলোর সান্নিধ্য না পেলে পেটের খাবার হজম হয় না ডাক্তার তাজার।

কিচেনের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ও। সাথে সাথে নাকে এসে লাগল লেবু ফুলের গন্ধ। গত ক’মাসের স্মৃতি হঠাৎ পীড়া দিল ওকে। চলে যেতে হচ্ছে, কে জানে আবার কোনদিন ফেরা হবে কিনা! এগোতে যাবে, হঠাৎ অ্যাপলোনিয়াকে হাত নাড়তে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল ও।

হাত পনেরো দূরে গাড়িটা। অ্যাপলোনিয়া চাইছে মাইকেল ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকুক, গাড়ি নিয়ে সেই আসবে ওর কাছে। গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে কার্লো, দু’পাটি দাঁতের সবগুলো বের করে হাসছে সে। হাতে ঝুলছে লুপারা। কিন্তু

ফ্যাব্রিয়যিয়োর ছায়া পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

ঠিক এই মুহূর্তে, কেমন করে যেন আচমকা সব পরিষ্কার বুঝে ফেলল মাইকেল। সচেতনভাবে কিছু চিন্তা করেনি ও, আত্মরক্ষার সহজাত বুদ্ধিতেই ধরা পড়েছে ব্যাপারটা। মুহূর্তে উন্মাদের মত হয়ে উঠল ওর চেহারা। গলার সবটুকু জোর দিয়ে চিৎকার করে নিষেধ করল অ্যাপলোনিয়াকে, 'না! না!'

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে এরই মধ্যে, ইগনিশনে চাবি দিয়ে ফেলেছে অ্যাপলোনিয়া। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজে তাপা পড়ে গেল মাইকেলের চিৎকার। বিস্ফোরণের ধাক্কায় কিচেনের দরজাটা ভেঙে খান খান হয়ে গেল, ছিটকে পড়ল মাইকেল দশ হাত দূরে। বাগানবাড়ির পাঁচিলে গিয়ে পড়ল সে, সেখান থেকে মাটিতে। পর মুহূর্তে ওপর থেকে বাড়ির পাথরের ছাদ ধসে পড়ল ওর কাঁধে আর মাথায়।

এখনও জ্ঞান রয়েছে ওর বুঝতে পারছে, মারা যায়নি সে। বোকার মত তাকাচ্ছে চারদিকে, যেন শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে দুনিয়াকে দেখে নিচ্ছে। কোথাও নেই আলফা রেগিওটা, চারটে চাকা আর চাকাগুলো জোড়া লাগাবার দুটো ডাঙা ছাড়া তার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল।

জ্ঞান ফিরল মাইকেলের। কামরাটা অন্ধকার লাগছে। কার যেন কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে ও। অস্পষ্ট, বোঝা যাচ্ছে না কিছু। সহজাত বুদ্ধিতেই অচেতন হয়ে থাকার ভান করছে ও। কিন্তু কিভাবে যেন টের পেয়ে গেল ওরা, কেউ আর কথা বলছে না এখন। চোখ না খুলেও বুঝতে পারল মাইকেল, কে যেন খাটের ওপাশ থেকে ঝুঁকে পড়ল ওর ওপর। গলাটা চেনা গেল না, তবে স্পষ্ট 'যীশুর দয়ায় আবার আমাদের কাছে ফিরে এসেছে ও।'

কে যেন আলো জ্বালল একটা। সাদা আলোর ঝলক লাগল ওর বন্ধ চোখের পাতায় মাথাটা ফেরাল ও। অসম্ভব ভারি আর অবশ লাগছে। এখনও ওর ওপর ঝুঁকে রয়েছে মুখটা চিনতে পারল ডাক্তার তাজার মুখ।

'তোমাকে একবার নৈখৈই নিভিয়ে দেব আলোটা,' কোমল স্নেহের সুরে বললেন ডাক্তার তাজা। ছোট পেসিল টচটা আবার জ্বাললেন তিনি, আলো ফেললেন মাইকেলের চোখে। 'কোন ভয় নেই, সুস্থ হয়ে উঠবে তুমি।' আরও কেউ একজন আছে কামরায়, তার দিকে ফিরে আবার বললেন, 'ইচ্ছে করলে এখন ওর সাথে কথা বলতে পারো।'

খাটের কাঁছাকাছি একটা চেয়ারে বসে আছেন ডন টমাসিনো। এতক্ষণে তাঁকে স্পষ্ট দেখতে পেল মাইকেল।

'মাইকেল? মাইকেল? তোমার সাথে কথা বলতে পারব? নাকি খারাপ লাগছে, বিশ্রাম করার ইচ্ছা?'

কথা বলতে পারল না মাইকেল, হাত তুলে ইশারা করল।

'কে এনেছিল গাড়িটা গ্যারেজ থেকে?' জানতে চাইলেন ডন টমাসিনো। 'ফ্যাব্রিয়যিয়ো?'

কিছু চিন্তা না করেই, নিজের অজান্তে হাসল মাইকেল—বরফের মত ঠাণ্ডা অদ্ভুত এক সম্মতির হাসি।

‘ফ্যাব্রিয়যিও গায়েব হয়ে গেছে,’ বললেন ডন টমাসিনো। ‘আমার কথা সব বুঝতে পারছ তো তুমি, মাইকেল? প্রায় এক হপ্তা অজ্ঞান থাকার পর আজ তোমার জ্ঞান ফিরেছে। সবাই জানে তুমি বেঁচে নেই। বুঝতে পারছ? তার মানে, তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ, ওরা তোমাকে খুঁজছে না। খবরটা পেয়ে আমেরিকা থেকে তোমার বাবা কয়েকটা নির্দেশ পাঠিয়েছেন আমেরিকায় ফিরে যেতে তোমার আর খুব বেশি দেরি নেই। তার আগে পর্যন্ত এখানে তুমি নিরবিচ্ছিন্নে বিশ্রাম করবে। এটা পাহাড়ের ওপর আমার একটা ছোট খামার বাড়ি, এখানে তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ, কোনও ভয় নেই। পালার্মোর লোকেরা আপোস করেছে আমার সাথে, তার কারণ, ওরা জানে মারা গেছে তুমি। হ্যাঁ, আসলে তুমিই ওদের হামলার লক্ষ্য ছিলে। ওরা তোমাকেই খুন করার সুযোগে ছিল, কিন্তু সবাইকে ভাবতে দিয়েছিল তোমাকে নয়, আমাকে খুন করতে চায়। বিশেষভাবে এই কথাটা তোমার জানা উচিত, তাই এত কথা বলছি। আর সব ব্যাপার আমার ওপর ছেড়ে দাও তুমি, সবদিক খুব ভালই সামলাতে পারব আমি। তুমি শুধু সুস্থ হয়ে ওঠো। মনটাকে শান্ত করো।’

একে একে সব কথা মনে পড়ছে এখন মাইকেলের। জানে, অগাপলোনিয়া মারা গেছে। মারা গেছে কার্লো। বুড়ি ফিলোমিনার কথা মনে পড়ল। কিচেন থেকে ওর সাথে সে-ও বাইরে বেরিয়ে এসেছিল কিনা স্মরণ হলো না। ফিস ফিস করে জানতে চাইল ও, ‘ফিলোমিনা?’

শান্ত গলায় ধীরে ধীরে বললেন ডন টমাসিনো, ‘কোথাও আঘাত পায়নি, শুধু বিশ্ফোরণের ধাক্কায় রক্ত বেরিয়েছে নাক দিয়ে। তার কথা ভেবে দুঃখিত্তা কোরো না।’

‘ফ্যাব্রিয়যিও,’ মৃদু গলায়, ফিস ফিস করে বলল মাইকেল। ‘ফ্যাব্রিয়যিও। হুঁ বেশ, আপনার রাখালদের জানিয়ে দিন, ওকে আমি চাই। কেউ যদি সিসিলির সেরা ঘাস-জমির মালিক হতে চায়, ফ্যাব্রিয়যিওকে এনে দিক আমার কাছে।’

মগু একটা হাঁফ ছাড়লেন ডন টমাসিনো। আর ডাক্তার তাজা তো নিঃশব্দে হেসেই ফেললেন। পাশের একটা টেবিল থেকে হলদেটে পানীয় ভরা একটা গ্লাস তুলে নিয়ে তাতে চুমুক লাগালেন ডন টমাসিনো। সাথে সাথে মাথাটা পরিষ্কার হয়ে উঠল তাঁর।

হাসিটা মুখ থেকে মুছে ফেলে খাটের ওপর বসলেন ডাক্তার তাজা। একটু অন্যমনস্কভাবে বললেন, ‘তোমার স্ত্রী মারা গেছেন, তুমি এখন বিপত্তীক। জানো তো, সিসিলিতে বিপত্তীকের সংখ্যা খুবই কম, নেই বললেই চলে।’ ভাবটা যেন, এই বৈশিষ্ট্যটুকুর জন্যে খানিকটা সান্ত্বনা পাবে মাইকেল।

ইশারা করল মাইকেল। সাথে সাথে ওর দিকে আরও ঝুঁকে পড়লেন ডন টমাসিনো।

‘বাবাকে খবর পাঠান,’ শান্ত গলায় বলল মাইকেল। ‘আমি বাড়ি ফিরতে চাই। তাঁকে জানান, তাঁর ছেলে হতে চাই আমি।’

কিন্তু পুরোপুরি সেরে উঠতে আরও একটা মাস সময় লাগল মাইকেলের। সুস্থ হয়ে ওঠার পরও সাথে সাথে দেশে ফিরতে পারল না সে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যোগাড়, এবং অন্যান্য কাজ সারতে সময় লেগে গেল আরও দুটো মাস। তারপর প্লেনে চড়ে পালার্মো থেকে রোম, রোম হয়ে সোজা নিউইয়র্ক।

এই তিন মাসে কোথাও ছায়া পর্যন্ত দেখেনি কেউ ফ্যাব্রিয়সিও নামের সেই রাখালের।

তিন

আমেরিকা। নিউ হ্যাম্পশায়ার। কলেজ থেকে ডিগ্রি নিয়ে লেখাপড়ার পাট অনেক আগেই চুকিয়ে ফেলেছে কে অ্যাডামস্। একটা গ্রেড স্কুলে শিক্ষিকার দায়িত্ব নিয়েছে সে।

মাইকেল অদৃশ্য হয়ে যাবার প্রথম ছ'মাস কর্লিয়নি পরিবারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে এসেছে কে। প্রতি হপ্তায় মিসেস কর্লিয়নিকে ফোন করতে ভুল হত না তার। প্রতিবারই তিনি ওর সাথে খুব ভাল ব্যবহার করেছেন। সপ্তাহে বলতেন, 'তোমার মত ভাল মেয়ে হয় না। কিন্তু মাইকের কথা ভুলে যেতে হবে তোমাকে। অন্য কোন ছেলে দেখে বিয়ে করে ফেল।'

কথাগুলো স্পষ্ট, কিন্তু রুঢ় নয়। কে বুঝতে পারত ওর শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবেই কথাগুলো বলছেন তিনি। সেজন্যে কিছু মনে করত না সে। তাঁকে তিনি ছেলেমানুষ বলে মনে করতেন, আর যা ঘটে গেছে তা কোন দিন ফেরানো সম্ভব নয় বলে বিশ্বাস করতেন।

স্কুলে প্রথম টার্ম শেষ হলো। কে সিদ্ধান্ত নিল নিউইয়র্কে যাবে। কিছু বন্ধুবান্ধবের সাথে দেখা করাও দরকার, উদ্‌গোছের কিছু পোশাক-আশাক কেনারও সময় হয়েছে। সেই সাথে ভেবে রেখেছে মনের মত একটা চাকরি বা আর কিছু যদি জুটে যায়, ওখানেই থেকে যাবে সে। দুটো বছর তো কাটান সল্যাসিনীর মত। এই দু'বছর কোন পুরুষ বন্ধুর সাথে দেখা পর্যন্ত করতে অস্বীকার করেছে সে। বই পড়ে আর অধ্যাপনা করে কাটিয়েছে সময়টা। লং বীচে টেলিফোন করার অভ্যাসটা ত্যাগ করেছে অনেক দিন আগেই, বাড়ি থেকে বলতে গেলে কাজ ছাড়া বড় একটা বের হয়নি, দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে নিজেকে। তাতে ফল যে ভাল কিছু হয়েছে তা নয়, বরং মেজাজটা সব সময় খারাপ হয়ে থাকে ওর। ইদানীং বুঝতে পারে, এভাবে জীবন কাটানো সম্ভব নয়।

মাইকেল ওকে চিঠি লিখবেই, এই রকম একটা অন্ধ বিশ্বাস ছিল ওর। ওরা অন্তত একটা খবর তো পাঠাবেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খবর বা চিঠি কোনটাই যখন এল না, রীতিমত অপমান বোধ করেছে ও। এখন ওর মনের অবস্থা আরও খারাপ। বুঝতে পারে, মাইকেলের তরফ থেকে চিঠি পাবার কোন আশা নেই। ওর দুঃখ, মাইকেল ওকে বিশ্বাস করতে পারেনি।

খুব ভোরের ট্রেন ধরল কে। নিউইয়র্কে পৌঁছতে দুপুর হয়ে গেল। মেয়ে বন্ধুরা

সবাই চাকরি করে, তাদেরকে আর নিরস্ত্র করতে ইচ্ছা হলো না। রাতে ফোন করবে স্থির করে সোজা হোটেলে উঠল ট্রেন জার্নির ফলে খুব ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে, এখন আর ঘুরেফিরে কেনাকাটা করারও ইচ্ছে নেই।

হোটেল কামরায় একা বসে আবোলতাবোল ভাবছে। মাইকেলের কথা মনে পড়ে গেল। দু'জনে এই হোটেল কামরাতেই প্রেম করত ওরা। হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল মনটা। সেজন্যেই বোধহয় লং বীচে ফোন করে মাইকেলের মায়ের সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করল ওর।

ভাষাল করতেই কর্কশ পুরুষ কণ্ঠ কানে ঢুকল। মিসেস কর্লিয়নিকে চাই, বলল কে। কয়েক মুহূর্ত আর কোন সাড়া নেই, তারপর একটা মেয়েলি গলা ভেসে এল অপর প্রান্ত থেকে, 'আপনি কে?'

'আমি কে অ্যাডামস,' অপ্রস্তুত হয়ে বলল কে। 'মিসেস কর্লিয়নি, আমাকে কি আপনার মনে আছে?'

'নিশ্চয়! একশোবার মনে আছে,' বললেন মিসেস কর্লিয়নি। 'ফোন করোনি যে অনেক দিন? বিয়ে হয়ে গেছে নাকি?'

'না, না। এই কাজে একটু ব্যস্ত ছিলাম কিনা।' ফোন করা ছেড়ে দেয়ায় মাইকেলের মা অসন্তুষ্ট হয়েছেন বুঝতে পেরে আশ্চর্যই হলো কে। জানতে চাইল, 'মাইকেলের কোন খবর জানেন? ও ভাল আছে তো?'

কয়েক সেকেণ্ড অপরপ্রান্তে কোন সাড়া নেই। তারপর পরিষ্কার, স্পষ্ট কণ্ঠে মিসেস কর্লিয়নি বললেন, 'কেন, মাইকেল বাড়ি এসেছে তুমি জানো না? ফোন করেনি তোমাকে ও? দেখাও করেনি?'

এমন চমকে উঠল কে যে মাথাটা ঘুরে উঠল হঠাৎ। অসুস্থ বোধ করছে ও। গলার কাছে আটকে থাকা অদম্য কান্নাটা বিস্ফোরণের মত বেরিয়ে আসতে চাইছে। ভাঙা গলায় জানতে চাইল, 'মাইকেল বাড়ি ফিরেছে? কত দিন হলো?'

'সে তো আজ ছ'মাসের ওপর।'

'ও, বুঝছি,' ফিসফিস করে বলল কে। এরপর আর বুঝতে বাকি থাকে কিছু? এখন শুধু দুঃখ এই যে মাইকেল ওকে এতটা ত্যাগ করে তা জেনে ফেললেন মিসেস কর্লিয়নি। লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করছে তার পরমুহূর্তে প্রচণ্ড রাগ হলো।

শুধু মাইকেলের ওপর নয়, মনে মনে সব বিদেশীদের ওপর খেপে উঠল কে, মাইকেলের মায়ের ওপর, সব ইতালীয়দের ওপর, যাদের এইটুকু ভব্যতাজ্ঞান নেই যে প্রেমের সম্পর্ক চুকে গেলেও অন্তত একটা বন্ধুত্বের ভাব জিইয়ে রাখা যেতে পারে। মাইকেল তাকে এতটা ভুলে ভাবতে সাহস পেল কিভাবে?

না হয় শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে ওকে সে চাইছে না, নাহয় ওকে বিয়ে করা সম্ভব নয় বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কিন্তু তার তো অন্তত এটুকু মনে করা উচিত ছিল যে কে বন্ধু হিসেবেও তার ভাল মন্দ ভেবে দুঃখিত্য থাকবে! নাকি ভেবে নিয়েছে তাকে সত্যিই দান করার পর বিয়ে হবে না বুঝতে পেরে আত্মহত্যা করেছে কে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইতালীয় মেয়েদের মত? নাকি ভেবেছে খবর দিলেই বিয়ে করার জন্যে ঘাড়ে চেপে বসবে, না করলে গোলমাল পাকাবে, লোক জড়ো করবে?

‘বুঝেছি, ঠিক আছে, অসংখ্য ধন্যবাদ,’ গলাটাকে যথাসম্ভব সংযত রেখে বলল কে। ‘মাইকেল বাড়ি ফিরেছে, ভাল আছে, এটুকু জেনেই আমি খুশি। এর বেশি জানার কিছু নই আমার। আর কখনও ফোন করব না আপনাকে।’

অসহিষ্ণু কণ্ঠস্বর শুনে বোঝা গেল, কে-র ওপর খুব বিরক্ত হয়েছেন মিসেস কর্লিয়নি। এত দ্রুত কথা বলতে শুরু করলেন, মনে হলো কে-র কথা তিনি যেন শুনতেই পাননি। ‘মাইকির সাথে দেখা করতে চাইলে এখন চলে এসো তুমি হঠাৎ তোমাকে দেখে সাজাতিক খুশি হবে ও। ট্যাক্সি নিয়ে এসো, আমাদের গেটের লোককে বলে রাখছি, সে-ই ভাড়াটা দিয়ে দেবে। ড্রাইভার হয়তো এতদূর আসতে আপত্তি করতে পারে, তুমি বলবে ডবল ভাড়া দেব। কিন্তু তুমি তাকে ভাড়া দেবে না। মাইকির বাপের লোক আছে গেটে, সে-ই দেবে।’

‘তা হয় না, মিসেস কর্লিয়নি,’ ঠাণ্ডা গলায় বলল কে। ‘বোঝাই যাচ্ছে আমার সাথে দেখা করার কোন ইচ্ছে মাইকেলের নেই। তা যদি থাকত, অনেক আগেই ফোন করত আমাকে ও। বাড়ির ফোন নাম্বার তো জানাই আছে ওর তার মানে, আমার সাথে কোন সম্পর্ক রাখতে চায় না ও। এই পরিস্থিতিতে আপনাদের বাড়িতে আমার যাওয়া চলে না।’

‘তুমি খুব ভাল মেয়ে,’ চটপট উত্তর দিলেন মিসেস কর্লিয়নি। ‘তোমার পায়ের গড়ন খুব সুন্দর। কিন্তু যাকে বলে বুদ্ধি, সে জিনিসটা খুব বেশি নই তোমার।’ মাইকির সাথে নয়, তুমি আমার সাথে কথা বলতে আসছ। তোমার সাথে গল্প করতে চাই আমি। দেখো, দেরি কোরো না যেন আবার, এখন চলে এসো ট্যাক্সির ভাড়া তুমি দেবে না, মনে আছে তো? তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি আমি।’ কট করে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেবার শব্দ হলো।

আবার ফোন করতে পারে কে, বলতে পারে লং বীচে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু কথাটা একবারও ভেবে দেখল না ও। নিজেকে বোঝান অত্যন্ত ভদ্রতার খাতিরে হলেও মাইকের মার সাথে দেখা করা দরকার একবার। মিসেস কর্লিয়নির কথা শুনে মনে হলো, মাইকেলের নিউইয়র্কে ফিরে আসাটা কোন গোপনীয় ব্যাপার নয়। তার মানে তার আর কোন বিপদের ভয় নেই, এখন স্বাভাবিকভাবেই দিন কাটাচ্ছে। লাফ দিয়ে খাট থেকে নামল কে, খুব যত্ন করে পোশাক পরল, সাজল, মেক-আপ লাগাল। বেরুবার আগে আরেকবার দাঁড়াল আয়নার সামনে। মাইকেলের সাথে শেষ দেখা হবার পর চেহারাটা কি ভাল হয়েছে আরও? নাকি বিচ্ছিরি রকম বেশি মনে হচ্ছে বয়সটা? সন্দেহ নেই, কাঠামোয় নারীত্বের ভাব আরও প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে। কোমরের কাছটা আরও সুগোল এখন, বুকটা আরও কত ভারি। সবাই বলাবলি করে ইতালীয়রা নাকি এই রকমই ভালবাসে। কিন্তু মাইকেল ওর সম্পর্কে সব সময় অন্য কথা বলত, ও এত রোগা বলেই নাকি ওকে অত ভাল লাগে। তবে, এ-সবে এখন আর কিছুই এসে যায় না। ওর কথা ভুলে গেছে মাইকেল। কোন সম্পর্কই রাখতে চায় না। তা না হলে ছ’মাস হলো বাড়ি ফিরেছে, একটা ফোন পর্যন্ত করল না।

ট্যাক্সি ডাকল কে। কিন্তু লং বীচের নাম শুনে বঁকে বসল ড্রাইভার, ওদিকে

যাবে না। মিষ্টি করে হাসল কে, তাতেই অর্ধেক ঘায়েল হয়ে গেল লোকটা, তারপর যখন শুনল কে তাকে দিগুণ ভাড়া দেবে, সাথে সাথে উঠে বসতে ইঙ্গিত করল সে।

লং বীচে পৌছুতে সময় লাগল এক ঘণ্টা। উঠানটাকে কেমন যেন একটু অচেনা লাগল ওর। অনেক দিন আসেনি ও, তার ওপর এখানে সেখানে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। চারদিকে এখন লোহার রেলিং, লোহার গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকতে হয়। স্ন্যাকস, লাল শার্ট আর সাদা কোট পরে একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে গেটে, গাড়ি থামতেই জানালা দিয়ে ভেতরে মাথা গলিয়ে মিটার দেখল। ড্রাইভারকে কয়েকটা নোট দিল সে। টাকাটা গুণে খুব খুশিই বলে মনে হলো ড্রাইভারকে সুতরাং গাড়ি থেকে নেমে পড়ল কে।

উঠানের মাঝখানে বাড়িটার মিসেস কর্নিয়নি থাকেন, সেদিকে এগোল কে। দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন মিসেস কর্নিয়নি নিজেকে যা কোনদিন ঘটেনি, ওকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন তিনি। অবাক হয়ে গেল কে, একটু লজ্জাও পেল। নিজের বুকের ওপর থেকে কে-কে একটু সরালেন মিসেস কর্নিয়নি, কিন্তু ছেড়ে দিলেন না, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেকক্ষণ দেখলেন, কি যেন মেলাচ্ছেন, কি যেন যাচাই করছেন, তারপর বললেন, 'তোমার মত সুন্দর মেয়ে খুব কম হয়। দুঃখ কি জানো, আমার ছেলেগুলো একটাও চালাক নয়।' কে-র হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে এলেন সোজা কিচেনে। খাবারদাবার সেখানে সব সাজানোই রয়েছে। স্টোভে টগবগ করে ফুটছে কফির পানি, মুচকি একটু হাসলেন তিনি। 'ওর আসার সময় হয়ে গেছে। খুব অবাক হয়ে যাবে তোমাকে দেখে।'

কে যেন পালিয়ে যাবে, তাই তার কাঁধে হাত রেখে পাশেই বসে আছেন মিসেস কর্নিয়নি। জোর-জোর করে এটা-সেটা খাওয়াচ্ছেন ওকে, সেই সাথে অত্যন্ত আগ্রহ আর কৌতূহলের সাথে খুঁটিয়ে জেনে নিচ্ছেন সমস্ত খবরাখবর। 'স্কুলে ছাত্রী ঠেঙাচ্ছে কে, নিউইয়র্কে এসেছে মেয়ে-বন্ধুদের সাথে দেখা করার জন্যে, আর তার বয়স মাত্র চম্বিশ বছর—এসব শুনে সামাজিক পুলকিত হয়ে উঠলেন ভদ্রমহিলা। তাঁর মাথা দোলাবার ভঙ্গি দেখে মনে হলো, মনে মনে যা তিনি ভেবে রেখেছিলেন তার সবগুলো ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে, কোথাও কোন ত্রুটি নেই। রীতিমত ঘাবড়ে গেল কে, তাই ঠিক যা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তারই উত্তর দিচ্ছে, বেশি কথা বলছে না।

চোরা চোখে বারবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছিল কে, তাই সে-ই প্রথম দেখতে পেল ওকে।

একটা গাড়ি এসে থামল বাড়ির সামনে। এক এক করে দু'জন লোক নামল নিচে। তারপর নামল মাইকেল। মাথা তুলে লোকগুলোর একজনের সাথে কথা বলছে ও। ওর মুখের বাঁ দিকটা দেখতে পাচ্ছে কে। বাথায় মোচড় দিয়ে উঠল বুকটা। এই মেয়ে, করো কি! নিজেকে শাসন করছে সে, কিন্তু চোখের পানি তাতে বাধা মানছে না। এমন সামাজিকভাবে আহত হয়েছিল মাইকেল তা জানা ছিল না বলে নিজেকে তার অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। লাথি মেরে প্লাস্টিকের পুতুল ভুবড়ে

দিলে যেমন দেখায় ঠিক সেই রকম দেখাচ্ছে মাইকেলকে। কিন্তু তবু কিভাবে যেন কে-র চোখে ওর সৌন্দর্য একটুও কমল না, বরং আরও কঠোর, শক্ত দেখাচ্ছে ওকে—সেটা পছন্দও করছে সে। ধবধবে একটা সাদা রুমাল বের করে প্রথমে নাকে তারপর মুখে চেপে ধরল মাইকেল। ঘুরে দাঁড়াল। বাড়িতে ঢুকছে এবার

দরজা খোলার শব্দ। হলঘরে পায়ের আওয়াজ। কান পেতে শুনেছে কে, হাঁটার অভ্যাসটা আগের মতই আছে মাইকেলের, এই পায়ের আওয়াজ তার হৃৎ-স্পন্দনের সাথে তালে তালে মিলে আছে, এতই চেনা, এতই প্রিয়। এগিয়ে আসছে শব্দটা। কিচেনের খোলা দরজার সামনে দেখা গেল মাইকেলকে।

ওকে দেখে প্রথমে ভাবের কোন পরিবর্তন দেখা গেল না মাইকেলের মধ্যে। তারপরই হাসল সে। মুখের ভাঙনটার কাছে এসে আটকে গেল হাসিটা। ‘হ্যালো, কেমন আছ?’ আগে থেকে ঠিক করে রেখেছে কে, এইরকম কিছু একটা বলবে। কিন্তু মাইকেলকে দেখামাত্র সব ওলটপালট হয়ে গেল। কি করছে নিজেই বুঝতে পারল না, বুঝতে চাইলও না। কিভাবে উঠে দাঁড়ান জানে না ও। একছুটে স্যাং করে সোঁথিয়ে গেল মাইকেলের বাহ-বন্ধনে। ওর কাঁধে মুখ ঝুঁজে দিল।

কে-র ভিজে গালে চুমু খেলো মাইকেল। ফোঁপাচ্ছে কে। যতক্ষণ না শান্ত হলো সে, দু’হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে রাখল মাইকেল। তারপর ধীরে ধীরে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল গাড়ির দিকে।

বডিগার্ডদের বিদায় করে দিল মাইকেল। ওকে গাড়িতে বসিয়ে নিজে উঠল ড্রাইভিং সীটে। স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিল গাড়ি। বেরিয়ে এল ওরা বাড়ি ছেড়ে।

ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে কে। নড়েচড়ে বসে মেক-আপ ঠিক করেছে। ‘স্বেচ্ছায়,’ গৃদু গলায় বলল সে; ‘নিজের অজান্তেই ছেলেমানুষিটা করে বসলাম। কিন্তু তুমি যে এমন ভয়ঙ্করভাবে জখম হয়েছ তা তো আমাকে কেউ বলেনি ওঁরা।’

‘ও কিছু নয়,’ একটু হাসল মাইকেল। মুখের ভাঙা দিকটা ছুঁলো একবার ‘বিপদ হলো, সারাক্ষণ শুধু সর্দি গড়ায়। ফিরে যখন এসেছি, ত্রুটিটা হয়তো এবার সারিয়ে নেব।’ একটু থেমে গলাটাকে আরও খাদে নামিয়ে আবার বলল, ‘উপায় থাকলে তোমাকে চিঠি লিখতাম বা খবর পাঠাতাম, কিন্তু সে উপায় ছিল না—সবকিছুর আগে এটা তোমাকে বুঝতে হবে।’

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল কে, তারপর বলল, ‘বেশ।’ একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল সে।

‘আমার একটা আস্তানা আছে শহরে। সেখানে যাব?’ জানতে চাইল মাইকেল। ‘নাকি কোন রেস্টোরাঁয়?’

‘ক্ষিধে পায়নি আমার,’ বলল কে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল দু’জনেই। তারপর জিজ্ঞেস করল মাইকেল, ‘ডিগ্রিটা নিয়েছ?’

‘নিয়েছি। একটা স্কুলে পড়াছি, আমাদের শহরেই। পুলিশ ক্যাপটেনকে যে খুন করেছে সে কি ধরা পড়েছে? সেজন্যেই তুমি বাড়ি ফিরতে পেরেছ, তাই না?’

উত্তর দেবার আগে কিছুক্ষণ চিন্তা করল মাইকেল। 'তাই। খবরের কাগজে তো সব কথা ছাপা হয়েছিল, পড়েছ নিশ্চয়ই?'

নিজেকে খুশী বলে স্বীকার করেছে না মাইকেল, সেজন্যে পরম একটা স্বস্তির পরশ অনুভব করল কে। মন খুলে এই প্রথম হাসল সে। বলল, 'ছোট শহর, ওখানে নিউইয়র্ক টাইমস্ ছাড়া আর কিছু পৌঁছায় না। খবরটা হয়তো উননক্বই পৃষ্ঠায় চাপা পড়ে গিয়েছিল। যদি জানতাম আরও অনেক আগে ফোন করতাম তোমার মাকে।' খানিক ইতস্তত করে আবার বলল সে, 'তোমার মা কিন্তু অনেক আবোলতাবোল কথা বলতেন, তার মাথামুণ্ডে কিছুই বুঝতে পারতাম না আমি। খুব অদ্ভুত শোনাত তাঁর কথাগুলো, মনে হত ওই জঘন্য কাণ্ডটার জন্যে তুমিই যেন দায়ী। কিন্তু আজ তিনি সম্পূর্ণ অন্য কথা শোনালেন আমাকে, কফি খেতে খেতে খুব হাসির সাথে জানালেন, কোন এক খ্যাপা লোক নাকি নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করেছে।'

'মা হয়তো ভুল করে আমাকেই সন্দেহ করতেন,' বলল মাইকেল। 'আসল ঘটনা জানতে পেরে ভুল ভেঙেছে তাঁর।'

'তোমাকে সন্দেহ করতেন?' চোখ তুলে জানতে চাইল কে। 'তোমার নিজের মা?'

ছেলেমানুষের মত একগাল হাসল মাইকেল। 'জানো না, পুলিশেরও বাড়ি হয় মায়েরা? সবচেয়ে খারাপটাই আগে বিশ্বাস করে?'

মালবেরি স্ট্রীটে পৌঁছে একটা গ্যারেজের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল মাইকেল। মালিক লোকটা ওর পরিচিত বলে মনে হলো কে-র। পায়ে হেঁটে বাক নিল ওরা, চারদিকে ধসে পড়া পোড়ো বাড়িঘর, সেগুলোর একটায় তাকে নিয়ে এল মাইকেল। গেটের চাবি রয়েছে ওর কাছে, ভেতরে ঢুকল ওরা। দেখতে ভাঙাচোরা হলে কি হবে, কে আবিষ্কার করল, বাড়িটার ভেতর সব রকম অত্যাধুনিক আরাম আয়েশের নিখুঁত আয়োজন রয়েছে, একজন শহুরে কোটিপতির বাড়িতে যেমন থাকে।

ওপরতলার ফ্ল্যাটে তাকে নিয়ে এল মাইকেল। বসবার ঘরটা প্রকাণ্ড। কিচেনটা বিশাল। একটা দরজা দিয়ে ঢুকলে শোবার কামরা। বার রয়েছে বসবার ঘরে, মাইকেল দুটো গ্লাসে পানীয় ঢালল। কে-র হাত ধরে টেনে নিয়ে এসে একটা সোফায় বসল ও, নিজেও বসল তার পাশে। তারপর মৃদু গলায় বলল, 'তুমি চাইলে শোবার ঘরে গিয়েও বসতে পারি আমরা।'

গ্লাসে লগ্না একটা চুমুক দিল কে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল মাইকেলের দিকে। হেসে ফেলল দু'জনেই। 'পারিই তো। চলো তাহলে,' বলল সে।

আজকের প্রেমটা কে-র কাছে আগের মতই লাগল। তবে আগের চেয়ে একটু রুঢ় মনে হলো মাইকেলকে। কোমল ভাবটা নেই তত, যা হলো সোজাসুজি হলো। ওর মনে হলো, তার কাছেও মাইকেল যেন সতর্কতা বজায় রাখছে। ঠাট্টার সুরে অনুযোগ করতে পারে সে, কিন্তু ইচ্ছে হলো না। জানে এরকম আড়ষ্ট ভাব কেটে যাবে, অনেক দিন পর প্রথম বলেই হয়তো এমন হচ্ছে। তার ধারণা, এসব ক্ষেত্রে পুরুষদের মধ্যেই আশ্চর্য একটা স্পর্শকাতরতা দেখা যায়। দীর্ঘ দু'বছর পর দেখা এবং মিলন, কই, কিছুই তো অস্বাভাবিক বলে মনে হলো না তার কাছে। সব যেন

সেই আগের মতই আছে। মাইকেলকে এতদিন দেখিনি, ওর সাথে শোয়নি, এসব অনুভবই করছে না।

মাইকেলের গায়ে গা ঠেকিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রইল কে। বলল, ‘আমাকে বিশ্বাস করতে পারোনি, না? তা নাহলে চিঠি লেখোনি কেন? একটা চিঠি লিখে না হয় দেখতেই, তোমার সাথে বেঙ্গমানী করি কিনা। ভুয়া ঠিকানা দিয়েও তো লিখতে পারতে, আমার পরীক্ষাটা অন্তত হয়ে যেত। যদি লিখতে, বিশ্বাস করো, নিউ ইংল্যান্ডের “ওমেটা” পালন করতাম আমি। তুমি বোধহয় জানো না, ইয়াংকিরাও যথেষ্ট মুখ বুজে থাকতে পারে।’

আশ্চর্য একটা পুলক অনুভব করছে মাইকেল। অন্ধকারে নিঃশব্দে হাসছে ও। ‘ভুলেও কখনও ভাবিনি তুমি আমার পথ চেয়ে বসে থাকবে। যা বিধী একটা ব্যাপার ঘটল, তারপরও আমার জন্যে অপেক্ষা করবে, ভাবতেই পারিনি।’

‘লোক দুটোকে তুমি মেরেছ, এ আমি কক্ষনও বিশ্বাস করিনি,’ দ্রুত বলল কে। ‘কিন্তু তোমার মায়ের কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। সে যাই হোক, মনে মনে আমি ঠিকই জানতাম এ ধরনের কাজ তোমার পক্ষে সম্ভবই নয়। অন্তত আমি তোমাকে চিনি তো!’

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মাইকেল। ‘আমি দায়ী কি দায়ী নই, কিছু এসে যায় না তাতে,’ মৃদু গলায় বলল ও। ‘এটুকু তোমাকে মেনে নিতে হবে। আসলে কিছু এসে যায় না। আমার কথা বুঝতে পারলে?’

মাইকেলের গলার সুরে, অদ্ভুত একটা ঠাণ্ডা ভাব, অনুভব করে শিউরে উঠল কে। এক সেকেণ্ড নিজের সাথে যুদ্ধ করে কঠিন সুরে বলল, ‘তাহলে এখনই আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। ওই লোক দু’জনকে তুমি খুন করেছ নাকি করোনি?’

উঠে বসল মাইকেল, ঠেস দিল বালিশে। লাইটার জ্বলে সিগারেট ধরাল একটা। তারপর বলল, ‘ধরো, তোমাকে আমি বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছি, এখন তোমার এই প্রশ্নের উত্তর না পেলে তুমি কি সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না?’

‘তোমাকে ভালবাসি। আমার কাছে তুমিই আসল ব্যাপার। আর কিছু আমি গ্রাহ্য করি না। আর কিছু কেয়ার করি না। আমি যেমন ভালবাসি তোমাকে, তেমনি তুমিও যদি ভালবাসতে আমাকে, তাহলে সত্যি কথাটা বলতে এত ভয় পেতে না। তোমার মনে এই সন্দেহ জাগত না যে আমি পুলিশের কাছে গিয়ে সব কথা লাগাব। ঠিক কিনা? ওগা ওগা, আসলে তুমি একটা ওগা—তাই না? তবু সত্যি বলছি, তাতেও কিছু এসে যায় না আমার। কিন্তু তুমি সত্যি আমাকে ভালবাস কি ভালবাস না তাতে আমার অনেক কিছু এসে যায়। বোঝাই যাচ্ছে, আমাকে ভালবাস না তুমি। যদি বাসতে, প্যাঁচ মেরে কথা বলতে না। বাড়ি ফিরে একটা ফোন পর্যন্ত করলে না। কেমন মানুষ তুমি সে তো বোঝাই যাচ্ছে। পাষণ্ড!’

ঘন ঘন সিগারেটে টান মারছে মাইকেল। কে-র উদ্যম পিঠে খানিকটা ছাঁই পড়ল। শিউরে উঠে বলল কে, ‘“প্লীজ” টরচার কোরো না। কাউকে কিছু বলব না আমি, যীশুর কিরে!’

রসিকতাটায় কিন্তু হাসল না মাইকেল। কথা বলছে, কিন্তু স্বরটা কেমন যেন

দূর থেকে ভেসে আসা বলে মনে হলো কে-র।

‘একটা কথা কি জানো, বাড়িতে ফিরে ওদের সবাইকে দেখে ভাল লেগেছিল, কিন্তু সেটা তেমন কিছু নয়। আজ কিচেনে তোমাকে দেখেই আনন্দে ভরে উঠল বুকটা। এর তুলনা হয় না, এত আনন্দ! এরই নাম কি ভালবাসা?’

‘ঠিক জানি না,’ বলল কে। ‘কিন্তু ভালবাসার এত কাছাকাছি বলে মনে হচ্ছে যে ওতেই আমার চলে যাবে।’

এরপর আবার পরস্পরের শরীর নিয়ে মেতে উঠল ওরা। গতবারের চেয়ে এবার মাইকেলের আচরণে অনেকটা কোমলতা প্রকাশ পেল। এক সময় বেরিয়ে গিয়ে দু’জনের জন্য দুটো গ্লাসে মদ নিয়ে এল ও। ফিরে এসে বিছানায় উঠল না আর, বসল খাটের কাছে একটা আরাম কেরায়ায়।

‘এসো, এবার একটু সিরিয়াস হওয়া যাক,’ বলল ও। ‘আমাকে বিস্তারিত ব্যাপারে কিছু ভেবেছ নাকি?’

প্রশ্নটাকে পাত্তা দিল না কে, ঠোট বাঁকা করে হেসে ইঙ্গিতে বিছানাটা দেখাল।

মাইকেলও হাসল, তারপর বলল, ‘না, আগে কাজের কথা শেষ হোক। একটা কথা মেনে নিতে হবে তোমাকে। যা ঘটে গেছে সে বিষয়ে কিছুই বলতে পারব না তোমাকে। বাবা কিছু কাজ দিয়েছেন, সেগুলো এখন করতে হচ্ছে আমাকে। শেষ পর্যন্ত আমাদের পারিবারিক জলপাই তেলের ব্যবসাটা আমার ঘাড়ে চাপবে, তার ভার নেবার জন্যে তৈরি করা হচ্ছে আমাকে। কিন্তু তুমি তো জানোই; এই পরিবারের শত্রুর কোন অভাব নেই। বাবার কিছু ব্যক্তিগত শত্রুও আছে। আমি বলতে চাইছি, আমাকে বিয়ে করলে, কাল বা পরশু কিংবা তার পরদিন তুমি বিধবা হয়ে যেতে পারো। যাবেই, তা বলছি না—তবে সম্ভাবনা আছে, যদিও খুব বেশি নয়। আরেকটা কথা, অফিসে কি হচ্ছে না হচ্ছে, সে বিষয়ে রোজ তোমাকে আমি জবাবদিহি করতে পারব না। ব্যবসা, পেশা বা কাজ-কর্মের ব্যাপারে কিছুই তোমার জানা চলবে না। আমার ও-দিকটা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে থাকতে হবে তোমাকে। তার মানে, আমার স্ত্রী হয়েও তুমি আমার কর্মজীবনের সহকারিণী হবে না। অন্তত সমান সমান অংশীদার হবে না। সেটা হবার একদম উপায় নেই।’

বিছানায় উঠে বসল কে। টেবিলের আলোটা জ্বালল সে, সিগারেট ধরাল একটা। ধীরে ধীরে বালিশে ঠেস দিয়ে বলল, ‘এত কথা বলে তুমি আসলে নিজের পরিচয়টা পরিষ্কার করার চেষ্টা করছ আমার কাছে, তাই না? তুমি একজন ওপা, এই কথাটাই ঘুরিয়ে বলছ, তাই না? খুন, এবং ওই ধরনের কিছু অপরাধের জন্য তুমি দায়ী। আরও বলছ, ওসব বিষয়ে কখনও কোন কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করতে পারব না, চিন্তা পর্যন্ত করতে পারব না। এই হলো তোমার শর্ত। এ যেন ঠিক হরর ফিল্মের কাহিনী—নরপিশাচ নায়িকাকে ধরেছে, বলছে তাকে ওর বিয়ে করতে হবে।’

ভাঙা মুখটা কে-র দিকে ঘুরিয়ে দেখাল মাইকেল, তারপর হাসল একগাল।

মুখ শুকিয়ে চোখ বড় হয়ে গেল কে-র, অনুতপ্ত হয়ে দ্রুত বলল, ‘যীশুর কিরে, মাইক, তা ভেবে ওকথা বলিনি আমি। সত্যি বলছি, ওটা আমি ধর্তব্যের মধ্যেই

আনি না!’

হাসছে মাইকেল। ‘জানি! আমার নিজেরও আজকাল এটাকে আর খারাপ লাগে না। তবে সারাক্ষণ সর্দি গড়াচ্ছে, এটাই যা দুঃখের বিষয়।’

‘তুমি আমাকে সিরিয়াস হতে বলেছ,’ বলল কে। ‘বিবাহিত জীবনটা কেমন হবে আমার? তোমার মায়ের মত, আর সব ইতালীয় স্ত্রীদের মত? শুধু বাচ্চা বিয়ানোই আমার একমাত্র কাজ হবে? ছেলেপুলে, ঘর-সংসারই আমার জগৎ, তার বাইরে আমি অনাস্থিত থেকে যাব? তারপর ধরো, যীশু না করুন, যদি কিছু হয়? একদিন হয়তো তোমাকে ধরে জেলেই পুরে দিল। তখন?’

এদিক ওদিক মাথা দোলান মাইকেল। ‘না, তা কখনও হবে না। খুন? হ্যাঁ। জেল? না।’

স্বীকারোক্তির বহর লক্ষ করে হেসে ফেলল কে, তার হাসিতে গর্বের সাথে অদ্ভুতভাবে মিশে রয়েছে একটু কৌতুক। ‘আশ্চর্য মানুষ তুমি! এ ধরনের একটা কথা মুখে আনতে পারলে তুমি? কি ভেবে বললে কথাটা? বলো, বলতেই হবে তোমাকে...।’

‘এই সব বিষয়েই তো কিছু জানাতে পারব না তোমাকে। জানাতে চাইও না।’

অনেকক্ষণ আর কোন কথা বলল না কে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকেই নিশ্চিন্ততা ভাঙতে হলো। ‘এতদিন কেটে গেল, একটা খবরও তো নাওনি, আজ আমি হঠাৎ এসে পড়ায় দেখা হয়ে গেল—তাহলে আবার বিয়ে করতে চাইছ কেন? বিছানায় আমি কি এতই ভাল?’

গম্ভীর হয়ে গেল মাইকেল। চেহারাটা ধমধম করছে। মাথা নেড়ে বলল, ‘অবশ্যই। আমার জন্যে বিছানায় তোমার চেয়ে ভাল আর কেউ হতে পারে না। কিন্তু না চাইতেই, বিনা পয়সাতেই পাচ্ছি যখন, বিয়ে করে ঝামেলা ঘাড়ে নিতে যাব কেন? বসো, এখনি উত্তর দিয়ো না। এখন থেকে আগের মত আবার মেলামেশা চলতে থাকুক। ইচ্ছে করলে তুমি তোমার মা-বাবার সাথে বুদ্ধি পরামর্শ করতে পারো। আমি বরং সেটাই চাইব। শুনেছি, তোমার বাপটিও নিজের ক্ষেত্রে কারও চেয়ে কম যান না। তাঁর উপদেশ অবহেলা কোরো না।’

ক্ষীণ জেদের সুর স্কুটে উঠল কে-র গলায়, ‘কিন্তু কেন বিয়ে করতে চাও তা তো বললে না?’

টেবিলের দেওয়াল থেকে সাদা একটা ক্রমাল বের করে নাকে চেপে ধরল মাইকেল। ‘এই সর্দিটাই হয়তো আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে তোমাকে। সারাক্ষণ শুধু নাক ঝাড়ে, এমন লোককে কি কাছে রাখতে ভাল লাগবে তোমার?’

‘ঠাট্টা করছ কেন?’ ধৈর্য হারিয়ে ফেলল কে। ‘একটি বারের জন্যেও কি সিরিয়াস হতে পারো না তুমি? আজীবনে কথা বলে ভোলাতে পারবে না আমাকে। প্রশ্নের উত্তর দাও।’

‘বেশ, দিচ্ছি,’ বলল মাইকেল। আরেকবার নাক ঝেড়ে ভাল করে মুছে নিল। ‘কিন্তু, মনে রেখো, এই প্রথম এবং এই শেষ—আর কখনও এসব ব্যাপারে কোন কথা তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে না। আমি আশা করব, এখন যা বলছি তার

প্রতিটি কথা তুমি বিশ্বাস করবে।' একটু ধামল মাইকেল, তারপর শুরু করল, 'তুমিই একমাত্র মানুষ যার ওপর গভীর টান আছে আমার। সে এত গভীর টান, তার পরিমাপ আমার জ্ঞান নেই। বাড়ি ফিরে এসে তোমাকে ফোন করিনি। কিন্তু সেজন্যে আমাকে দোষ দিতে পারো না তুমি। অমন জঘন্য একটা তুলকানাম কাণ্ড ঘটে যাবার পরও তুমি যে আমাকে ক্ষমা করতে পারবে, মনে রাখবে তা আমি কি করে বুঝব বলো? হ্যাঁ, তোমার পিছু পিছু ঘুরতে পারতাম আমি, পারতাম তোমাকে একগাদা মিথ্যে কথা বলে ধান্দা দিতে, কিন্তু সেরকম ইচ্ছাই হয়নি আমার।' একটু ধামল ও। তারপর গলার স্বর খাদে নামিয়ে বলল, 'এখন যে কথাটা বলব, সেটা তুমি তোমার বাবাকেও বলতে পারবে না। তোমাকে বিশ্বাস করি, তাই বলছি কথাটা। সব কিছু যদি ঠিকঠাক মত চলে, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে কর্নিয়নি পরিবার আর কোন রকম অন্যায়, বেআইনী কাজের সাথে জড়িত থাকবে না। এটা আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছে। এই ইচ্ছেটাকে বাস্তবে পরিণত করতে হলে অনেকগুলো বড় আর সুন্দর চাল চালতে হবে আমাকে। কিন্তু তার আগেই তুমি বিধবা হয়ে যেতে পারো। যদিও, বিধবা হলে অবস্থাপন্ন বিধবাই হবে, ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্যে কখনও দৃষ্টিভ্রান্ত করতে হবে না তোমাকে। এবার বলি, তোমাকে কেন দরকার আমার। কেন যেন মনে হয় আমার, আমার সন্তানের মা হিসেবে একমাত্র তোমাকেই মানায়। ছেলেপুলে চাই আমি, নিজস্ব একটা পরিবার চাই—এসবের প্রয়োজন আছে, তার সময়ও হয়েছে। তোমাকে চাওয়ার আরেকটা কারণ, আমি চাই আমার প্রভাব যেন আমার ছেলেমেয়েদের ওপর না পড়ে। আমার ওপর বাবার প্রভাব পড়েছে, সেজন্যেই এ-ব্যাপারে এতটা সতর্ক হতে চাইছি আমি। তার মানে বাবা আমার ওপর ইচ্ছা করে তাঁর প্রভাব কেলেন তা আমি বলছি না।

না, তা তিনি কেলেননি। বরং উল্টোটাই চেয়েছিলেন তিনি। আমাকে অধ্যাপক, ডাক্তার বা ওই ধরনের কিছু একটা তৈরি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে সব ওলটপালট হয়ে গেল। পারিবারিক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলাম আমি, পরিবারটিকে রক্ষা করার জন্যে লড়তে হলো আমাকে। লড়তেই হলো, তার কারণ, বাবাকে আমি শ্রদ্ধা করি। ভালবাসি। ভক্তি করি। আর সব আদর্শ ছেলের মতই, আমিও আমার বাবার অনুগত পুত্র, বাইরে থেকে যাই মনে হোক না কেন। আসলে, এতটা ভক্তি করার যোগ্য মানুষ আমার জীবনে আর দেখিনি আমি। তাঁর মত ভাল স্বামী, ভাল বাপ, গরীব দুঃখী অসহায়ের এত বড় বন্ধু, এত বিচক্ষণ মানুষ কোথাও আর দ্বিতীয়টি আছে কিনা আমার জ্ঞান নেই। তাঁর আরেকটা দিক আছে, কিন্তু আমি তাঁর ছেলে বলে সেটার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।'

রুমাল দিয়ে আবার নাক মুছল মাইকেল। চেহারায় শাঙ অথচ দৃঢ় একটা ডাব ফুটে উঠেছে তার। 'কিন্তু আসল কথা আমি চাই ছেলেমেয়েরা যেন আমার প্রভাবে না পড়ে। ওদেরকে আমি সত্যিকার আমেরিকান হিসেবে দেখতে চাই। যাকে বলে আপাগোড়া, আপাদমস্তক, পুরোপুরি আমেরিকান, ওরা হবে তাই। কে জানে, ওরা হয়তো আমেরিকার গর্বে পরিণত হবে। ওরা হয়তো রাজনীতি করবে।' আপন মনে

হাসল মাইকেল। 'কে জানে, ওদের মধ্যে কেউ একজন হয়তো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত হবে। হতে বাধাটা কোথায় বনো? কলেজে থাকার সময় মার্কিন প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত, পারিবারিক তথ্য বিষয়ে একটা বই পড়তে হয়েছে আমাকে। তাতে এমন সব তথ্য আছে, পড়লে তুমি হতভম্ব হয়ে যাবে। প্রেসিডেন্টদের বাপ-দাদাদের কারও কারও ভাগ্য নেহাতই ভাল, তা না হলে ওদের অনেকেরই ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল। এমন গুরুতর সব অপরাধ করেছেন তাঁরা, গুরুত্বের আর নৃশংসতার বিচারে ইদানীংকার অপরাধের তুলনায় সেগুলো শতগুণ বেশি জঘন্য। তবু তো তাঁদের ছেলেদের প্রেসিডেন্ট হতে বাধা পেতে হয়নি। আর আমার কথা যদি বনো, আমি তো সজ্ঞানে কখনও কোন অন্যায় কাজ করব না। অন্তত বিবেকের কাছে সাধু সেজে থাকার সব রকম প্রয়াস থাকবে আমার মাঝে। তাই, যদি আশা করি আমার ছেলেদের মধ্যে কেউ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হবে, তাতে অন্যায় কোথায়? সেটাকে দুরাশা মনে করার কি আছে?' এখন আর হাসছে না মাইকেল। 'প্রেসিডেন্ট হতেই হবে, তা আমি বলছি না। হবার পথে কোন বাধা থাকবে না, সেটা বোঝাতে চাইছি। প্রেসিডেন্ট না হলে, অধ্যাপক হবে ওরা, ডাক্তার হবে, কিংবা সঙ্গীতজ্ঞ হবে—তাতেই আমি খুশি। তার মানে, পারিবারিক ব্যবসাতে ওদেরকে আমি ঢুকতে দেব না। সেখানে ওদের কোন জায়গা নেই। তবে, কি জানো, অতটা বড় করতে করতে আমিও অবসর নেব তখন। তখন আমার সময় কাটবে তোমাকে নিয়ে। তুমি আর আমি ক্লাবে যাব। সম্ভল আমেরিকানদের উপযুক্ত সাদামাঠা স্বাস্থ্যময় জীবন উপভোগ করব। এবার বনো, কেমন লাগছে প্রস্তাবটা?'

'চমৎকার! অপূর্ব!' বলল কে। 'কিন্তু ওই বিধবা হবার বিষয়টা এড়িয়ে গেলে কেন?'

'ওটার খুব যে একটা সম্ভাবনা আছে তা নয়, রুমাল দিয়ে নাক মুছে বলল মাইকেল, 'সত্যি কথা বলতে হয়, তাই বললাম আর কি।'

'প্রসঙ্গটা তুলে তুমি যাই বোঝাতে চাও না কেন, আমি কিন্তু ওসব একেবারেই বিশ্বাস করি না। তুমি অত খারাপ লোক হতে পারো না। উঁই, তা কি করে হয়! এমন তো নয় যে তোমাকে আমি চিনি না বা চিনতে ভুল করেছি। অসম্ভব!' কিন্তু চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে কিদ্রাতিতে ভুগছে কে। 'দূর ছাই, তোমার কথা ভাল বুঝতেই পারিনি আমি। আরেকটা ব্যাপার কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না। তোমার বিরুদ্ধে এত বড় আর এমন জঘন্য অভিযোগ আনা হলো কেন?'

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মাইকেল কে-র দিকে। নরম গলায় বলল, 'প্লীজ, জেদ ধরো না, কে। এর বেশি তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না। এসব বিষয়ে আসলে কিছু চিন্তা করার দরকারই নেই তোমার, কেমন? যা ঘটে গেছে, গেছে—এর সাথে তোমার বা আমাদের বিবাহিত জীবনের কোন সম্পর্কই থাকবে না। এর আগেও তো বললাম, পারিবারিক ব্যবসার ব্যাপারে তোমার মাথা ঘামানো চলবে না, তার কোন দরকার নেই। তুমি আমাকে পাবে, আমি তোমাকে পাব, তাতেই সমুদ্র থাকতে হবে আমাদের। আমার ছেলেমেয়ের মা হিসেবে তোমাকে

দেখতে চাই আমি।’

হঠাৎ রেগে গেল কে। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল কণ্ঠস্বর। ‘তোমার কথা কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। আমাকে বিয়ে করার কথা কিভাবে মুখে আনছ, কিভাবে যে আভাস দিচ্ছ আমাকে তুমি ভালবাস—কিছুই পরিষ্কার হচ্ছে না আমার কাছে। ভালবাসি, এই শব্দটা কখনও তুমি আমার সামনে উচ্চারণ করেনি। একটু আগে বললে, তোমার বাবাকে তুমি ভালবাস। কই আমাকে ভালবাস সে কথা তো একবারও বললে না! তা বলবেই বা কিভাবে! আমাকে যদি বিশ্বাস করতে, তাহলে হয়তো বলতে পারতে কিন্তু তা তো করো না। করলে, জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো চেপে রাখতে চাইতে না! তাহলেই জিজ্ঞেস করতে হয়, বিশ্বাসই যখন করতে পারছ না, তাহলে আমাকে বিয়েই বা করতে চাইছ কেন? আমি জানি, তোমার বাবা তোমার মাকে বিশ্বাস করেন, অস্বীকার করতে পারবে?’

‘অস্বীকার করব কেন?’ বলল মাইকেল। ‘আমিও জানি বাবা মাকে বিশ্বাস করেন। করবেন না কেন? কিন্তু বিশ্বাস করেন মানে এই নয় যে বাবা তাঁকে সব কথা বলেন। তাছাড়া, আরও কথা আছে। বাবার বিশ্বাস অর্জনের জন্যে আমার মাকে অনেক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হতে হয়েছে। নিজের স্ত্রী বলেই নয়, মার ওপর বিশ্বাস রাখার আরও অনেক কারণ আছে বাবার। এক সময় সন্তানের জন্ম দেয়া ভীষণ কঠিন একটা ঝুঁকির ব্যাপার ছিল, সে-সময় আমাদের চার ডাই-বোনের জন্ম দিয়েছিলেন মা। বিপদের সময় বাবাকে আগলে রাখতেন তিনি।’ বাবা গুলি খেলে কে তাঁর সেবা করত? মা। মা কখনও বাবার কথার ওপর কথা বলেননি। বাবাকে শুধু ভালই বাসেননি, বাবার বিচার বুদ্ধি আর বিচক্ষণতার ওপর সম্পূর্ণ আস্থাও রেখেছেন। একটানা চল্লিশটা বছর ধরে মা’র প্রথম কাজ ছিল বাবার সেবা করা। এত সব করে তুমিও যদি আমার বিশ্বাস অর্জন করতে পারো, কেন তোমাকে দু’চারটে কথা বলতে পারব না আমি? অবশ্য তখন তুমিই শুনতে চাইবে না।’

শান্তভাবে জানতে চাইল কে, ‘আমরা কি উঠানে থাকব?’

‘হ্যাঁ,’ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল মাইকেল। ‘খারাপ লাগবে না তোমার, নিজেদের আলাদা বাড়ি থাকবে আমাদের। কেউ আমাদের ব্যাপারে নাক গলাতে আসবে না, আমার মা বা বাবা সেরকম মানুষই নন। আমাদের রুচি আর পছন্দ মত যেভাবে খুশি থাকব আমরা। তবে, সব হাঁঙ্গামা মিটে না যাওয়া পর্যন্ত ওই উঠানেই থাকতে হবে আমাদের।’

‘তার কারণ, বাইরে থাকা তোমার জন্যে নিরাপদ নয়।’

পরিচয় হবার পর এই প্রথম মাইকেলের রাগ দেখল কে। হঠাৎ ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা হয়ে গেল ও। চেহারায় এমন সূক্ষ্ম পরিবর্তন এল, প্রায় ধরাই যায় না। তার গলার স্বরও বদলাল না। বরফের ধোঁয়ার মত একটা ঠাণ্ডা ভাব উঠছে শরীর থেকে। নিজের অজান্তে শিউরে উঠল কে। ঢোক গিলল একটা। পরিষ্কার উপলব্ধি করছে, মাইকেলকে যদি বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেয় সে, তার কারণ হবে মৃত্যুর মত ডয়াল ওর এই ঠাণ্ডা ভাবটুকু।

‘যত নষ্টের গোড়া ওই সিনেমা আর খবরের কাগজগুলো,’ বলল মাইকেল। ‘আমার বাবা অথবা কর্লিয়নি পরিবার সম্পর্কে তোমার কোন ধারণাই নেই। সম্পূর্ণ

ভুল বুঝে বসে আছ তুমি। শুধু তোমার খাতিরে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করছি, কিন্তু এই শেষ, আর কখনও এ-বিষয়ে কোন প্রশ্ন কোরো না। শোনো, বুঝিয়ে দিচ্ছি।' একটু ধামল মাইকেল, ক্রমাল দিয়ে নাক মুছল। 'আমার বাবা একজন ব্যবসায়ী। তাঁর একটা পরিবার আছে। আর আছে বেশ বড় একদল বন্ধু, যারা তাঁর বিপদ আপদের সময় সাহায্য করবে। এঁদের সবার জীবিকার ব্যবস্থা করতে হয় তাঁকে। এঁরা যাতে ভাল খেয়ে পরে জীবনটাকে সুন্দরভাবে উপভোগ করতে পারে সেদিকেও তাঁর নজর রাখতে হয়। আমাদের চারদিকে যে সমাজটা দেখতে পাচ্ছি, আমার বাবা সে-সমাজের নিয়ম বা আইন মানেন না। না মানার কারণও আছে। তিনি একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান মানুষ, তাঁর অসংখ্য দুর্লভ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই সমস্ত যোগ্যতা আর উপযুক্ততা তাঁর আছে বলেই তিনি নিজের মনের মত করে বেঁচে থাকতে চান, কিন্তু প্রচলিত সমাজের নিয়ম মেনে চললে তাঁকে সেভাবে বেঁচে থাকতে দেয়া হবে না। যতটুকু প্রাপ্য তার চেয়ে কম সুযোগ-সুবিধে নিয়ে বেঁচে থাকতে রাজী নন তিনি। প্রসঙ্গক্রমে বলছি, কথাটা তোমাকে বুঝতেও হবে, আমার বাবা প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বা গভর্নরদের চেয়ে নিজেকে ছোট বলে মনে করেন না। একদল লোক নিজেদের সুবিধে করে নেবার মতলবে কিছু আইন তৈরি করে নিয়েছে, সেগুলো মেনে চললে বাবাকে নিকৃষ্ট জীবন গ্রহণ করতে হবে, তাই তা তিনি মানতে রাজী নন। অবশ্য, প্রচলিত সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়াই তাঁর অস্তিম ইচ্ছা, কিন্তু তা হবার আগে প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী হতে চান তিনি। ব্যক্তিগত ক্ষমতা না থাকলে এই সমাজ কাউকে সাহায্য করে না। সেই প্রচুর ক্ষমতা যতদিন না তাঁর হাতে আসছে, ততদিন তিনি নিজের তৈরি কিছু আইন মেনে চলবেন বলে ঠিক করেছেন। প্রচলিত সমাজের বিধি বিধান এবং আইনের চেয়ে তাঁর নিজের তৈরি বিধি-বিধান এবং আইনগুলো অনেক বেশি ন্যায্য এবং উন্নত বলে মনে করেন তিনি।'

দু'চোখে নম্র অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছে কে। 'কিন্তু তা কি করে হয়? ধরো সমাজের সবাই আমরা যদি এই কথা বলি, কল কি দাঁড়াবে? সমাজটা তাহলে টিকবে কিভাবে? উত্তর দাও। আমরা সবাই কি তাহলে গৃহবাসীদের যুগে ফিরে যাব না? উই, এ অসম্ভব! কথার কথা, তাই না? আসলে যা বললে তা নিজেও তুমি বিশ্বাস করো না, তাই না, মাইক? বিশ্বাস করো?'

হাসিতে ভরে উঠল মাইকেলের মুখ। 'আমার বাবা কি বিশ্বাস করেন তাই নিয়ে কথা বলছিলাম। তোমাকে আমি শুধু এইটুকু বোঝাতে চাই যে বাবাকে তুমি আর যাই মনে করো, দারিদ্র্যজ্ঞানহীন বলে মনে করো না—তা তিনি নন। অন্তত তাঁর নিজের তৈরি সমাজে নন। মোটেও তিনি একদল উন্মাদ মেশিনগানধারী খুনে গুণাদের পাভা নন। তাঁর সম্পর্কে এসব তোমার একেবারেই বাজে চিন্তা। আমার বাবার মত দারিদ্র্যজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ আমি আর দেখিনি।'

'বেশ বুঝলাম,' শান্ত গলায় বলল কে। 'কিন্তু নিজের ব্যাপারটা তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ কেন? তোমাকে নিয়েই তো আমার আধাবাধা। তুমি কিসে বিশ্বাস করো সেটা আমাকে জানতে হবে।'

‘আমি তোমাকে বিশ্বাস করি,’ বলল মাইকেল। ‘তুমি আর আমি মিলে একটা পরিবার গড়ে তুলতে পারি, আমার বিশ্বাস স্ট্রোর ওপর। যদি বিশ্বাস করতাম এই সমাজ আমাদেরকে রক্ষা করবে তাহলে হয়তো ভাল হত। কিন্তু সমাজের ওপর আমার আস্থা নেই। ভাওতা আর ধোঁকা দিয়ে একদল লোকের ভোট যোগাড় করতে পারাটাই যাদের একমাত্র কৃতিত্ব তাদের ওপর আমার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে আমি রাজী নই। আমাকে ভুল বুঝো না। যা বলছি তা শুধু এখনকার পরিস্থিতির কথা ভেবেই বলছি। পরিস্থিতি বদলাচ্ছে, আরও বদলাবে। আমার বাবার কাল এই তো শেষ হয়ে গেল। অনেক বিশ্বয়কর কাজ শেষ করেছেন তিনি, কিন্তু ভয়ঙ্কর সব ঝুঁকি না নিয়ে সে-ধরনের কাজ এখন আর করা সম্ভব নয়। আমরা চাই বা না চাই, একদিন প্রচলিত সমাজেই ঢুকতে হবে কর্নিয়নি পরিবারকে। কিন্তু বাবার মত আমারও ইচ্ছা, যখন ঢুকবে অগাধ ক্ষমতার অধিকারী হয়েই ঢুকবে। তার মানে আগে আমাদেরকে কোটি কোটি টাকা আর সয়সম্পত্তি, শ্রদ্ধা আর সম্মান অর্জন করতে হবে। দশজনের দলে ভিড়ে সবার নিয়তির সাথে নিজেদেরকে এক সুতোয় গাঁথবে নেবার আগে আমি চাই আমার সন্তানেরা যতটা পারা যায় সম্মত আর ক্ষমতাবান হয়ে উঠুক।’

‘কিন্তু আমি অন্তত জানি প্রচলিত সমাজের বাইরে তুমি কোনদিন ছিলে না,’ বলল কে। ‘স্বৈচ্ছায় যুদ্ধে গেছ তুমি। দেশের জন্যে লড়াই করে বীর খেতাব পেয়েছ। হঠাৎ তুমি সমাজের হাত গলে পরিবারের মুঠোয় গিয়ে পড়লে কিভাবে? কি এমন ঘটল যে এতটা বদলে গেলেন তুমি?’

‘এসব আসলে সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছু নয়,’ বলল মাইকেল। ‘তোমাদের গা-গ্রামে গোড়া কিছু রক্ষণশীল মানুষ আছে, আমি হয়তো তাদেরই একজন। নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ সবচেয়ে আগে দেখি। একটু ভাবো, বুঝতে পারবে কোন সরকারই তার নাগরিকদের জন্যে তেমন কিছু করে না; কিন্তু তাও আসলে সত্যি নয়। তোমাকে শুধু একটা কথা জানাতে পারি—বাবা আমার সমর্থন পাবেন। তাঁর পক্ষ নিতে হবে আমাকে। আর তোমাকেও সিদ্ধান্ত নিতে হবে তুমি আমার পক্ষ নেবে কিনা।’ হাসছে মাইকেল। ‘বিয়ে করার প্রস্তাবটা এখন আর তেমন সুবিধের মনে হচ্ছে না, তাই কি?’

বিছানার ওপর হাত দিয়ে চাপড় মারল কে। ‘বিয়ের কথা জানি না।’ ধৈর্য হারিয়ে চেষ্টা করে উঠল সে। ‘বিয়েটা বিয়ে নাকি মরণ তাতে আমার কিছুই এসে যায় না। আমি শুধু জানি দু’দুটো বছর পুরুষমানুষ ছাড়া জীবন কাটিয়েছি—এখন যত পায়তারা কষো, সহজে তোমাকে আমি ছাড়ছি না। অ্যাঁই, স্বার্থপর, এদিকে এসো। কি হলো! এলে!’

‘আলো নিভিয়ে বিছানায় গেল আবার ওরা। মাইকেলের কানে ঠোট ঠেকিয়ে ফিস ফিস করে কথা বলছে কে। ‘তুমি চলে যাবার পর আমি আর কোন পুরুষের কাছে যাইনি। কথাটা বিশ্বাস করো?’

‘করি।’

‘আরও নরম গলায় জানতে চাইল কে। ‘তুমি?’

‘আমি গেছি,’ বলল মাইকেল। হঠাৎ শক্ত কাঠ হয়ে গেল কে-র শরীর, অনুভব করল ও। ‘গত ছয়মাসের মধ্যে নয় অরুণ্য।’ সত্যি কথাই বলল। আপনোনিনিয়া মারা যাবার পর এই প্রথম কারও সাথে প্রেম করেছে মাইকেল।

চার

লাস ভেগাস।

জমকালোভাবে সাজানো হোটেলের একটা সুইট। দেয়াল-জোড়া জানালার সামনে দাঁড়ালে নিচে নকল রূপকথার দেশ দেখা যায়। অন্য জায়গা থেকে তুলে নিয়ে এসে লাগানো তাল গাছগুলো সার সার দাঁড়িয়ে আছে। কমলা রঙের আলোর লতা উঠেছে সেগুলোর গা বেয়ে। খানিক দূরে প্রকাণ্ড আকারের দুটো সুইমিং পুল, গাঢ় উজ্জ্বল নীল পানিতে টাইটুম্বর। মরুভূমির ভারাজুলা রাতে ওখানে সঁতার কাটবে হোটেলের বোর্ডাররা।

উপত্যকার মাঝখানে নিয়নের আলোয় ঝলমল করছে লাস ভেগাস শহর। চারদিকের দূর দিগন্তরেখার কাছে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বালি আর পাথরের তৈরি পাহাড় সারি। সূক্ষ্ম কারুকাজ করা জানালার ভারি পর্দা নামিয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল জনি ফটেন।

জুয়া খেলার বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে সুইটে। একজন ‘পিট বস্’ একজন ‘ডিলার’, একজন অতিরিক্ত সাহায্যকারী, আর একজন প্রায় নগ্ন ওয়েট্রেস—এই চারজন গোটা ব্যাপারটা সামলাচ্ছে। সুইটের একটা অংশে, লিভিংরুমে, সোফায় শুয়ে আছে নিনো ভ্যালেন্টি, হাতে পানির একটা গ্লাস। তাতে পানি নেই, রয়েছে নির্জলা হাইকি। লোকগুলো ক্যাসিনো থেকে এসেছে, ব্ল্যাক জ্যাক জুয়ার টেবিল সাজাচ্ছে তারা, একদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে তাই দেখছে নিনো। টেবিলটার কাঠামো ঘোড়ার খুরের মত দেখতে, সেটাকে ঘিরে বসানো হয়েছে যথা নিয়মে গদিমোড়া ছয়টা চেয়ার। পুরোপুরি মাতাল নয় এখনও নিনো, তবু গলার স্বর জড়িয়ে যাচ্ছে তার।

‘খাসা! চমৎকার!’ বলল নিনো। ‘এই শালা, জনি, ইধার আও! তুই আজ আমার হয়ে জুয়া খেলবি। যাবড়াও মাত্, আমার পয় আছে। শালা বান্টাউগুলোকে হারিয়ে একেবারে ফকির বানিয়ে ছাড়ব—আয়, চলে আয়।’

আরাম কেদারার উল্টো দিকে, একটা পা রাখার টুলে বসে আছে জনি ফটেন। ‘তুই তো জানিস, ওসব আমি খেলি না। এখন তোর শরীর কেমন তাই বল।’

নিঃশব্দে হাসল নিনো। ‘শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই নয়—খাসা লাগছে, দোস্ত, তাজা ঝরঝরে হয়ে গেছে শরীরটা। রাত বারোটা বাজতে কত দেরি আর? কয়েকটা মেয়েমানুষ আসবে, জানিস তো? তারপর সাপার খাব। তারপর আবার ব্ল্যাক জ্যাক খেলব। এই তো জীবন, দোস্ত! মেয়েমানুষ, মদ, আর জুয়া। চুটিয়ে উপভোগ করছি, ঠিক কিনা বল?’ জনির দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকল সে

যেন উত্তরটার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে তার। কিন্তু জনি চুপ করে আছে দেখে নিজেই আবার বকবক করতে শুরু করল। ‘জানিস, ক্যাসিনো থেকে কত জিতেছি? পঞ্চাশ হাজার ডলার। সেজন্যেই তো ছুঁড়িগুলো পুরো এক হপ্তা ধরে আমার পিছু ছাড়ছে না।’

শান্তভাবে বলল জনি, ‘একটা কথা জিজ্ঞেস করি। টাকা তো আর কম কামালি না। তারপর জুয়া খেলছিস, তাতেও হারার নাম নেই—বলি, এত টাকা দিয়ে যাবি কাকে? মানে, যদি মরেই যেতে হয়?’

লম্বা একটা চুমুক দিয়ে গ্লাসটা খালি করে ফেলল নিনো। পাল্টা প্রশ্ন করল সে, ‘আমি তো ভেবেই পাই না, উড়নচণ্ডী বলে নাম কিনলি কিভাবে তুই। তুই জ্যান্ত একটা মানুষ কিনা সে-ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার। পুরুষমানুষ হবে তেজী ঘোড়ার মত, তুই ঠিক তার উল্টো। হ্যারে, সন্ধ্যাসী হয়ে যাবি নাকি? তোর পায়ে পড়ি, দোস্ট, ওরকম কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসিস না। যারা এই শহর দেখতে আসে তারাও তোর চেয়ে বেশি মৌজ লোটে। তোর ব্যাপারটা কি বল দেখি?’

‘ঠিক,’ বলল জনি। ‘নিজে যেতে পারবি, নাকি ব্ল্যাক জ্যাক টেবিলে তুলে নিয়ে যেতে হবে তোকে?’

সাথে সাথে উঠে বসার চেষ্টা করল নিনো। নিজের সাথে ধস্তাধস্তি করে কোন রকমে উঠে বসতে পারল সে, পা দুটো নামান কার্পেটের ওপর, তারপর টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। খুব সাবধানে, ধীর পায়ে এগোচ্ছে ব্ল্যাক জ্যাক টেবিলের দিকে। ডিলারের সাহায্যকারী লোকটা একটু তফাতে একটা চেয়ারে বসে আছে, নিনো ইঙ্গিত করামাত্র যাতে দেখতে পায়। গদিমোড়া চেয়ারে বসল নিনো, টেবিলে বিছানো সবুজ পশমী কাপড়ের ওপর আঙুলের গাঁট দিয়ে টোকা মারল সে, বলল, ‘চিপ দাও।’

পকেট থেকে একটা প্যাড বের করল ‘পিট বস্’, খস খস করে একটা চিরকুটে কি যেন লিখল সে, তারপর কলমসহ সেটা নিম্নের সামনে রেখে বলল, ‘নির্ন, মি. ড্যানেলি। প্রথম বার বরাবর যা নিয়ে থাকেন, পাঁচ হাজার।’

চিরকুটে নাম সই করল নিনো। সেটা পকেটস্থ করল ‘পিট বস্’, তারপর ডিলারের দিকে ফিরে চেষ্টা করে মাথা ঝাঁকাল।

বিশ্ময়কর দক্ষতার সঙ্গে টেবিলে বসানো খোপের ভেতর থেকে সোনালী আর কালো চিপ বের করছে ডিলার। পাঁচ সেকেন্ড পর দেখা গেল নিনোর সামনে একশো ডলার চিপের পাঁচটা সমান থাক সাজানো হয়ে গেছে। প্রত্যেক থাকে দশটা করে চিপ। টেবিলে সবুজ বনাভের ওপর ছয়টা চতুষ্কোণ আঁকা রয়েছে। আকারে খেলার তাসের চেয়ে সামান্য একটু বড়। রঙটা সাদা। সব খেলোয়াড়ের চেয়ারের সামনে এই রকম একটা করে চতুষ্কোণ। একাই খেলছে নিনো, কিন্তু একসাথে তিনটে খোপে বাজি ধরল সে। প্রত্যেকটি খোপে একটা করে চিপ রেখেছে। তার মানে প্রতিটি হাতে একশো ডলার বাজি ধরে খেলার সূচনা করল সে।

তিন হাতেই ‘হিট’ দিতে রাজি হলো না ও, কারণ ডিলারের হাতে একটা ‘ছয় আপ’ রয়েছে। ওটা একটা ‘বাস্ট কার্ড’। শেষে দেখা গেল ডিলার চিড়ির। আঁকশি দিয়ে জেতা চিপগুলো নিজের দিকে টেনে আনল নিনো। ‘দেখলি তো? ঠিক

এইভাবে শুরু করতে হয় রাতটা, জনিকে বলল সে।

হাসল জনি।

খেলার সময় চিরকুটে সই করা নিনো ড্যালেন্টির মত জুয়াড়ীর পক্ষে মোটেও স্বাভাবিক নয়। বড় বড় বাজি ধরে খেলে যারা তাদের মুখের কথাই যথেষ্ট, সই করার দরকার হয় না। কিন্তু দৈদার মদ খায় বলে নিনোর ওপর ভরসা রাখতে পারে না ওরা, তাই কোন রকম ঝুঁকি নেয় না। ওরা তো আর জানে না যে যত মাতালই হোক, কিছু ভুলে যাবার বান্দা নিনো ড্যালেন্টি নয়।

পরের দান জিতল নিনো, তারপরের দানও। তিন দান খেলা শেষে আঙুল বাঁকা করে ওয়েট্টেসকে ইশারা করল সে। বারটা কামরার আরেকটা প্রান্তে, সেখান থেকে পানির গ্লাসে রাই হইস্কি ভরে নিয়ে এল মেয়েটা। গ্লাসটা ধরল নিনো, তারপর হাত বদল করল সেটা, যাতে মেয়েটার কোমর জড়িয়ে ধরতে পারে। ‘আমার পাশে বসো, সোনা মানিক। ক’হাত খেলো, দেখি তুমি পয় আনতে পারো কিনা।’

ওয়েট্টেস মেয়েটা অসাধারণ সুন্দরী। কিন্তু জনি ফন্টেন পরিষ্কার বুঝতে পারছে, এ মেয়ে ঠাণ্ডা বরফ, মরা সাপের মত নিরীষ। সজীবতা দেখাবার চেষ্টা অবশ্য পুরোমাত্রায় রয়েছে, নিনোর চোখাচোখি হলে এমন ডাব দেখাচ্ছে যেন তাতেই ওর চরম পুলক পাওয়া হয়ে যাচ্ছে। আসলে কিন্তু ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বানোয়াট। নিনোর দিকে ঢুলুঢুলু চোখে তাকিয়ে হাসলেও ওর লোভাতুর দৃষ্টি কিন্তু কালো আর সোনালী চিপসের দিকে, একটা পাবার জন্যে লালায়িত কুণ্ঠী হয়ে উঠেছে। আহা, ডাবল জনি ফন্টেন, এই মেয়েই যদি যৌন-মিলনের জন্যে ওরকম লালায়িত হয়ে উঠত, কি মজাই না হত তাহলে। রীতিমত বিস্ময়কর একটা খেল দিতে পারত ও। কিন্তু তা হবার নয়। মরা সাপ কখনও সাপুড়ের বাঁশি শুনে দোল খায় না।

নিনোর পাশে বসে রাজ্যের ন্যাকামি জুড়ে দিয়েছে মেয়েটা। উদ্দেশ্যটা যে কি, বুঝতে পারছে জনি। একটা চিপ বাগানো। দুতোরি ছাই, নিজেকে তিরস্কার করল জনি। না হয় দু’একটা চিপ নিলোই মেয়েটা, আর নেবে নাই বা কেন? নিক বা না নিক, সেটা কোন ব্যাপারই নয়। ওর মন খারাপের একমাত্র কারণ হলো, এত টাকা রোজগার করেও যাকে বলে ভালভাবে বেঁচে থাকা তা নিনোর কপালে জুটল না। একটা জিনিসও ভাল পেল না বেচারী।

কয়েক দান খেলল মেয়েটা। তার হাতে একটা চিপ গুঁজে দিয়ে নিতম্বে এক থাবড়া মেরে টেবিল থেকে তাকে সরিয়ে দিল নিনো।

মেয়েটাকে ডেকে খানিকটা মদ চাইল জনি। বাস, শুরু হয়ে গেল নাটক। মদ এনে দিল সে, কিন্তু এমন ডঙ্গি আর কায়দা কসরৎ করে আনল যে দেখলেও বমি পায়। জনি ভেবেই পায় না এই সব মেয়েরা কি মনে করে নিজেদেরকে। তাকে দেখে মনে হলো, দুনিয়ার সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ছায়াছবির সবচেয়ে রোমাঞ্চকর চরিত্রে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর দৃশ্যে অভিনয় করছে এই মুহূর্তে। বিখ্যাত জনি ফন্টেনের ওপর তার সবটুকু মোহিনী মায়া ঢেলে দিয়ে জাদু করার চেষ্টা করছে মেয়েটা। হেসে ফেলল জনি। বলল, ‘ধন্যবাদ।’

পরের দৃশ্যটা আরও অবিশ্বাস্য। জনির সহাস্য ধন্যবাদ শুনে এমন একটা শিহরণ বয়ে গেল মেয়েটার শরীরে, যেন আরেকটু হলোই তীব্র একটা যৌন ঝংকার শোনা যেত। চোখ দুটো আশ্চর্য ধোয়াটে হয়ে এল, শক্ত হলো শরীরটা। ক্রমশ সরু হয়ে আসা লম্বা পা দুটো সোজা হয়ে আছে, কোমরের ওপরের অংশটা পিছন দিকে হেলিয়ে দিল—যেন জনি ফটেন ধন্যবাদ জানিয়েছে বলে সাথে সাথে চরম তৃপ্তি লাভ হলো তার।

সুন্দর অভিনয়, এর আগে এমনটি দেখেনি জনি। কিন্তু সবটাই ওই জিনিস, অভিনয়, তার বেশি কিছু না। এ-ধরনের অভিনেত্রীরা বিছানায় খুব কমই ভাল হয়। গ্লাসে ছোট ছোট চুমুক দিতে দিতে জনি দেখল ফিরে যাচ্ছে মেয়েটা নিজের চেয়ারে। চোখ ফিরিয়ে নিল জনি। দেখার সাধ মিটে গেছে ওর। আজ যদি মাতান হত ও তাহলে আলাদা কথা ছিল। মন-মেজাজও আজ ভাল নেই।

পরাজয় স্বীকার করতে আরও এক ঘণ্টা সময় নিল নিনো ড্যালেন্টি। প্রথমে একদিকে হলে পড়ল সে, কিন্তু কৌনমতে সামলে নিয়ে সোজা হলো আবার, তারপরই একেবারে সটান ঝপ করে মেঝেতে। তবে ‘পিট বস’ আর ডিলারকে আগেই সাবধান করে দেয়া হয়েছিল, তারা সাথে সাথে ধরে ফেলল নিনোকে। চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে গেল তাকে ওরা। পাশেই শোবার কামরা, সেখানে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেয়া হলো তাকে।

ওদের পিছু পিছু শোবার ঘরে এল জনি। নিনোকে নয় করার কাজে পুরুষদের চেয়ে বেশি তৎপর হয়ে উঠতে দেখা গেল ওয়েট্রেস মেয়েটাকে। লেপ দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো ওর শরীর। তারপর আবার ওরা সবাই খেলার ঘরে ফিরে এল।

নিনোর চিপগুলো গুল, ‘পিট বস’, তারপর কি যেন লিখে রাখল চিরকুটে। টেবিল আর ডিলারের চিপগুলো পাহারা দিচ্ছে সে।

‘কতদিন ধরে এইরকম চলছে?’ জানতে চাইল জনি।

শ্রাগ করল ‘পিট বস’। ‘আজ তো খুব তাড়াতাড়ি জ্ঞান হারালেন,’ বলল সে। ‘প্রথমবার হোটেলের ডাক্তারকে ডাকতে হয়েছিল। তিনি মি. ড্যালেন্টিকে কি সব ওষুধ খাওয়ালেন, অমনি মি. ড্যালেন্টি চাঙা হয়ে উঠলেন তারপর ডাক্তার তাকে একটা ছোট্ট বক্তৃতা শোনালেন। কিন্তু ডাক্তার চলে যাবার পর মি. ড্যালেন্টি আমাদেরকে নিষেধ করে দিয়ে বললেন, আবার যদি তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন কখনও, কেউ যেন ডাক্তারকে খবর না দেয়। অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ধরে শুধু শুইয়ে দিলেই চলবে, পরদিন সকালে আবার তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। সেই থেকে তাই করি আমরা। ভাগ্যটা কিন্তু দারুণ, তাই না? এই দেখুন না, আজ রাতেও উনি তিন হাজার ডলার জিতলেন।’

‘সে যাই হোক,’ বলল জনি, ‘আমি যখন এখানে আছি, ডাক্তার ডাকতেই হবে। হোটেলের ডাক্তারকে একটা খবর পাঠান। ক্যাসিনোতে লোক পাঠাতে হলেও অবহেলা করবেন না।’

পনেরো মিনিট পর ঘরে এসে ঢুকল ডাক্তার জুলস্ সীগল। তার সাজ-পোশাক দেখে মনে মনে সাংঘাতিক বিরক্ত হলো জনি। ছোকরা যেন রঙচঙে সঙ সেজে

থাকে, দেখে ডাক্তার বলে মনেই হয় না। জুলসের পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখেছে ও। টিলেটানা নীল পোলো শার্ট পরেছে, তাতে আবার সাদা পাড় বসানো। পায়ে মোজার বালাই নেই, সাদা সুয়েডের জুতো গলিয়েছে। হাতে ডাক্তারের চিরাচরিত কালো ব্যাগ। সব মিলিয়ে হাস্যকর লাগে।

‘দরকারী জিনিস-পত্র গলফের একটা খেলতে ডরে আনলেই তো পারেন,’ বলল জনি। ‘আপনার রঙচঙে পোশাকের সাথে সেটাই বোধহয় বেশি মানাবে, না কি বলেন? খলেটা কেটে একটু ছোট করে নেয়া যেতে পারে।’

সাথে সাথে তাকে সমর্থন করল জুলস। বলল, ‘খাটি কথা। ডাক্তারের এই কালো ব্যাগ দেখেই রুগীর বুক ছ্যাৎ করে ওঠে, ভয়েই বেচারি আধমরা হয়ে যায়। আমি মনে করি, রঙটা তো অবশ্যই বদলানো দরকার।’ খাটের দিকে এগিয়ে গেল জুলস, নিনোর সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাগ খুলছে। ‘আপনার পাঠানো কনসালটেশন ফী-র চেকটা পেয়েছি,’ বলল সে। ‘সেজন্যে ধন্যবাদ। তবে, টাকার অঙ্কটা বেশি হয়ে গেছে। কিই বা করেছিলাম আমি।’

‘করেনমি? তা বটে!’ হাসল জনি। ‘সে যাক, ওসব বাসি হয়ে গেছে। নিনোর ব্যাপারটা কি ধলুন তো?’

নিনোর হাটের অবস্থা, পালস আর রাড প্রেশার পরীক্ষা করল জুলস। একটা ইঞ্জেকশন বের করে হাতে পুশ করল। ঘুমাচ্ছে নিনো কিন্তু চেহারা থেকে ফ্যাকাসে ভাবটুকু দূর হয়ে গেল প্রহ্ল সাথে সাথেই। বেড়ে গেছে রক্ত চলাচল।

‘প্রথমবারই ভাল করে পরীক্ষা করেছিলাম ওকে,’ বলল জুলস। ‘রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষা করে তখনই বুঝতে পেরেছিলাম ডায়াবিটিস হয়েছে ওর। মাইন্ড অ্যাডাল্ট স্ট্যাবিলাইজ। মুখ বেছে চললে আর ওষুধ-পত্র খেলে এটা কোন রোগই নয়। কিন্তু মুশকিল হলো, আমার কথা কানে তোলার পাত্র নন তিনি। ওঁর প্রতিজ্ঞাটা সম্পর্কে কিছু জানা আছে আপনার?’ চোখে প্রশ্ন নিয়ে জনির দিকে তাকাল জুলস। কিন্তু জনি নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে দেখে আবার শুরু করল সে, ‘মি. ভ্যালেন্টি পণ করেছেন, মদ খেয়ে মারা যাবেন তিনি। এ এক ধরনের আত্মহত্যার প্রবণতা লিভারটা প্রায় পচে গেছে, মগজটাও যেতে বসেছে। এখনকার এই অসুস্থতা আর কিছু নয়, ডায়াবিটিসের কোমা। আমার পরামর্শ চাইলে বলব ভদ্রলোককে কোথাও আটকে রাখার ব্যবস্থা করুন।’

খানিক স্বস্তিবোধ করল জনি। যাক, সিরিয়াস কিছু নয় তাহলে। জানতে চাইল, ‘আটকে রাখার কথা কি যেন বললেন? বদ্ধ মাতালদের চিকিৎসা করা হয় যেখানে সেখানে পাঠাতে বলছেন ওকে?’

নিঃশব্দে বারের দিকে এগোচ্ছে জুলস। গ্লাসে নিজের জন্যে খানিকটা হুইস্কি ঢালল। তারপর ঘুরে দাঁড়াল জনির দিকে। ‘না। আমি ওকে বন্দী করে রাখার কথা বলছি। পাগলা গারদে।’

‘কি! আপনি খেপলেন নাকি, ডাক্তার?’

‘না। কথাটাকে ঠাট্টা বলে উড়িয়ে দেবেন না। মানসিক রোগের ব্যাপারে আমি বিশেষজ্ঞ নই তা ঠিক, কিন্তু কিছুটা অন্তত বুঝি আমি, পেশার খাতিরে খানিকটা

বুঝতেই হয়। নিভারের খুব বেশি ক্ষতি না হয়ে থাকলে আপনার বন্ধুকে কিছুটা সুস্থ করে তোলা হয়তো সম্ভব। তবে নিভারের অবস্থা বোঝার জন্যে ময়না তদন্ত করতে হবে। কিন্তু ভদ্রলোকের রোগটা মাথায়, মানে, মানসিক ব্যামোতে ভুগছেন তিনি। যতটুকু বুঝতে পেরেছি, মৃত্যুকে ডেকে নিয়ে আসার অদ্ভুত একটা তাগিদ অনুভব করছেন মি. ভ্যালেন্টি। কে জানে, উনি বোধহয় আত্মহত্যা করিতে চান। সবচেয়ে আগে ওর এই রোগটা সারাতে হবে। তবেই আশা আশ্ব, তা না হলে হাল ছেড়ে দেয়াই ভাল। আর যদি চিকিৎসা করতে চান, ঘোষণা করে দিন মি. নিনো ভ্যালেন্টি পাগল হয়ে গেছেন—তাহলে প্রয়োজনীয় মানসিক চিকিৎসা করা সম্ভব হবে। এর আর কোন বিকল্প নেই।’

নক হলো দরজায়। ভেতরে ঢুকল লুসি ম্যানচিনি। ছুটে জনির গায়ের ওপর এসে পড়ল সে, জনিকে চুমো খেয়ে হাসল একগাল। বলল, ‘জনি! ও জনি! কি খুশিই যে হয়েছি তোমাকে দেখে।’

‘হ্যাঁ,’ বলল জনি। ‘অনেকদিন পরে দেখা হলো।’ লক্ষ করল লুসি আর সেই আগের লুসি নেই। মেদ ঝরে গেছে শরীর থেকে, কাপড়-চোপড়গুলো শুধু দানী নয়, সেগুলো পরেছেও সুন্দর করে। মুখের কাটিংয়ের সাথে ছেলেদের মত ছোট করে ছাঁট্টি ঢুল চমৎকার মানিয়েছে। আরও অনেক সুন্দর আর বয়সটাও খুব কম দেখাচ্ছে। ক্ষীণ একটা আশা জাগল জনির মনে, এখানে বেড়াতে এলে লোভনীয় সঙ্গিনী হতে পারে লুসি। এমন একটা মেয়েকে সাথে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোতেও আনন্দ। কিন্তু হঠাৎ উপলব্ধি করল, তা হবার নয়। লুসি এখন ডাক্তারের বান্ধবী, হাত বাড়িয়ে কোন লাভ নেই। তাই লুসিকে গৃহস্থ করার কোন চেষ্টাই করল না ও। ব্রেক বন্ধুত্বের মিষ্টি হাসি দিয়ে দায় সারল। বলল, ‘ব্যাপারটা কি? এত রাতে নিনোর ঘরে এসেছ কি মনে করে?’

মুঠো পাকিয়ে জনির কাঁধে একটা কিল মারল লুসি। ‘নিনোর অসুখ, জুলস্ দেখতে এসেছে, শুনেই চলে এলাম। যদি কোন কাজে লাগি। কেমন আছে এখন ও?’

‘ভাল। ভালই আছে।’

‘না, ভাল নেই,’ সোফার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বলল জুলস্। জনির দিকে নয়, লুসির দিকে তাকিয়ে কথা বলছে সে। ‘তোমাদের দেশী বন্ধুর জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত এনো সবাই জেগে বসে থাকি আমরা। তারপর ওকে বোঝাব, রাজী করাব আটক থাকতে। ওর যা অবস্থা, চিকিৎসা করতে হলে পাগলা গারদে পাঠাতে হবে। তোমাকে ও খুব পছন্দ করে, লুসি, তাই না? তুমি হয়তো আমাকে সাহায্য করতে পারো।’ জনির দিকে ফিরল জুলস্, তাকে বলল, ‘আপনি যদি সত্যি মি. নিনো ভ্যালেন্টির ভাল চান তাহলে আমার দুল থাকুন। ঠিক যেভাবে বলছি সেভাবে যদি ওর চিকিৎসা না হয়, কাঁধ ঝাঁকাল সে, স্থলপ করে বলতে পারি কোন মেডিক্যাল কলেজের ন্যাবরেটরিতে ওর পচা নিভার প্রদর্শনীর জন্যে সাজানো অবস্থায় দেখতে পাবেন আপনারা।’

কথাগুলো ওরুতর, কিন্তু জুলস্ হালকা সরে বলছে, ব্যাপারটা লক্ষ করে মনে

মনে সাম্বাভিক চটে উঠছে জনি। কি মনে করে নিজেকে লোকটা? কড়া কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল জনি, এই সময় বিছানা থেকে নিনোর গলা পাওয়া গেল, 'দে না, ভাই, কেউ একটা মদ দে না আমাকে!'

ফিরে তাকাল সবাই। বিছানার ওপর উঠে বসেছে নিনো। নুসির দিকে চেয়ে হাসছে সে। হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এসো গো মেয়ে, এসো, নিনোবুড়োর কোলে এসো।'

হাসতে হাসতে এগিয়ে গিয়ে খাটের ওপর বসল নুসি, জড়িয়ে ধরল নিনোকে। অসুস্থ বলে মনেই হচ্ছে না তাকে। আঙুল মটকাল, জনির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আই, শালা জনি, তুই করছিসটা কি? আমাকে এক গ্লাস হইস্কি দিতে পারিস না? এই তো সব সন্ধ্যা, এরই মধ্যে আউট হয়ে যাওয়া চলে নাকি? হ্যারে, আমার ব্ল্যাক জ্যাক, টেবিলটা কোন্ চুলোয় গেল বল দেখি?'

'মদ খাওয়া নিষেধ আপনার,' নিজের গ্লাসে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে বলল জুলস্। 'আপনার ডাক্তারের নির্দেশ।'

ভুরু কুঁচকে উঠল নিনোর। মুখ ভেঙেচে বলল, 'জুতো মারো ডাক্তারের মুখে!' পরমুহূর্তে চেহারায় একটা নাটুকে অনুতাপের ভাব ফুটিয়ে বলল, 'দুঃখিত! দুঃখিত! আমার ডাক্তার যে আপনি সের-কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। ডাক্তার, তুমি কিছু মনে কোরো না। ধরে নাও, তুমি এখন, এই মুহূর্তে এখানে উপস্থিত নও। আই, জনি শালা, কি বললাম তোকে? কথা কানে যায় না, না? এই শেষ বার জিজ্ঞেস করছি, মদ এনে দিবি কিনা? না দিলে আমি নিজে উঠে গিয়ে নিয়ে আসব।'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল জনি। উঠে দাঁড়িয়ে বার-এর দিকে এগোচ্ছে। পিছন থেকে মৃদু গলায়, উদাসীন ভঙ্গিতে বলল জুলস্, 'আমি কিন্তু বলেছি, ওসব খাওয়া উচিত নয় ওর।'

কেন কে জানে, জুলস্কে দেখলেই মেজাজ বিগড়ে যায় জনির। লোকটার চেহারা, হাবভাব, কথাবার্তা কিছুই ওর ভাল লাগে না। তার একটা কারণ সম্ভবত এই হতে পারে যে যত গুরুতর ব্যাপারই হোক না কেন, লোকটা কখনও উত্তেজিত হতে জানে না। গলার সুরটা সব সময় শান্ত, ভাষাটা আশ্চর্য নিরপেক্ষ, যেন কিছুতেই কিছু এসে যায় না ওর। কাউকে যদি সাবধান করে দেবার ইচ্ছে হয়, নিজের মতামতটাই শুধু জানায়, অনুরোধ বা নির্দেশের সুরে কিছু বলে না। লোকটার এই নির্লিপ্ত ভাবটাই সহ্য করতে পারে না ও। নিনোর মদ খাওয়া উচিত নয়, কথাটা এমন সুরে বলল যে শুনেই একটা জেদ চেপে গেল ওর। ভেবেছিল সামান্য একটু মদ টেলে দেবে নিনোকে, কিন্তু তা না করে পুরো গ্লাস ভর্তি করে হইস্কি আনল সে। গ্লাসটা নিনোর হাতে ধরিয়ে দেবার আগে জুলসের দিকে তাকাল একবার, জানতে চাইল: 'বলো, ডাক্তার। এটুকু খেলে নিনো ড্যালেন্টি কি মারা যাবে?'

'না, তা যাবে না,' শান্তভাবে বলল জুলস।

কামরার ভেতর একটা উত্তেজনা বেড়ে উঠছে, টের পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল নুসি। জুলসের দিকে ফিরে কি যেন বলতে গিয়েও চূপ করে গেল সে। ইতিমধ্যে

গ্রাসের মদটুকু গলায় ঢেলে দিয়েছে নিনো।

আপন মনে হাসছে জনি। তার ধারণা, ডাক্তার ব্যাটাকে উচিত শিক্ষা দেয়া গেছে।

হঠাৎ কোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল নিনো। নাল মুখটা নীল হয়ে গেছে তার। নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে। তারপর মাছের মত লাফিয়ে উঠল তার শরীরটা। চোখ দুটো কোটর ছেড়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। দ্রুত উঠে দাঁড়ান জুনস্, ঘুরে খাটের আরেক দিকে চলে গেল। নিনোর গলাটা এক হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল ও, তারপর কাঁধ আর গলার মাঝখানে দক্ষ হাতে একটা ইঞ্জেকশন পুশ করল। সাথে সাথে ওর আলিঙ্গনের মাঝে স্থির হয়ে গেল নিনো। ধীরে ধীরে তাকে বালিশের উপর শুইয়ে দিল জুনস্। চোখ দুটোয় ঘুম নেমে আসছে নিনোর, বন্ধ হয়ে গেল পাতা দুটো।

নিঃশব্দ পায়ে বসার ঘরে ফিরে এল ওরা তিনজন। মস্ত কফি টেবিলটাকে ঘিরে বসল। হাত বাড়িয়ে হালকা নীল টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিল লুসি, স্যাণ্ডউইচ আর কফির অর্ডার দিল ও। নিঃশব্দে আবার উঠে দাঁড়ান জনি, বার-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। একটা গ্রাসে হইকি চানল, তাতে অল্প একটু পানি মেশান। তারপর দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাল জুনসের দিকে। 'আপনি জানতেন হইকি খেলে নিনো অসুস্থ হয়ে পড়বে?' তীব্র গলায় জানতে চাইল সে।

প্রাণ করল জুনস। 'আশঙ্কা করেছিলাম।'

'তাহলে সাবধান করেননি কেন আমাকে? বাধা দেননি কেন?'

'দিয়েছিলাম। আপনি কানে তোলেননি,' মৃদু গলায় বলল জুনস।

অনেক কষ্টে মেজাজটাকে সংযত রেখেছে জনি। কিন্তু ওর চেহারা দেখে রাগের প্রচণ্ডতা টের পেতে অসুবিধে হচ্ছে না কারও। বলল 'ওকে সাবধান করা বলে? আশ্চর্য মানুষ তো আপনি! একজন ডাক্তারের কাছ থেকে এমন আচরণ আশা করি না আমি। কিছুতেই যেন কিছু এসে যায় না আপনার, তাই কি? নিনোকে পাগলা গারদে পাঠাতে বদলেন, কেন স্যানাটোরিয়াম বা ওই ধরনের কোন ভাল শব্দ উচ্চারণ করতে পারতেন না? মানুষের আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলতে খুব ভাল লাগে বুঝি আপনার?'

হাত দুটো কোলে ফেলে সেগুলোর দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে আছে লুসি।

কিন্তু জুনসের মধ্যে ভাবের কোন পরিবর্তন নেই। জনির দিকে তাকিয়ে আছে সে। হাসছে। হাসতে হাসতেই বলল, 'আরও কড়া ভাবে নিষেধ করলেও আপনাকে ঠেকানো যেত না, মদটুকু আপনি মি. ড্র্যানেটিকে দিতেই। আমাকে আপনি কেয়ার করেন না, এটা প্রমাণ করার জন্যে আপনি একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। আপনি বিখ্যাত জনি ফটেন, সবাই আপনাকে তোয়াজ করে, ওই জিনিসটা পাবার একটা লোভ জন্মে গেছে আপনার মধ্যে। জানি, আপনার সাথে আমার ভাল বনিবনা হবে না। তাই আপনার ওই গলার ব্যাপারটার পর আপনি যখন আপনার ব্যক্তিগত ফিজিশিয়ানের পদে চাকরি দিতে চাইলেন আমাকে, হেসেই উড়িয়ে দিলাম প্রস্তাবটা, গ্রহণ করার কথা একবার ভেবেও দেখলাম না। আসল কথা

কি জানেন? আপনি বিখ্যাত হতে পারেন, কিন্তু একজন ডাক্তারের বিখ্যাত হবার দরকার করে না। ডাক্তার মনে করে সে একজন গড, আধুনিক সভ্যতার মহাপুরোহিত—তার কাজের ওটা একটা পুরস্কার। কিন্তু আপনি আমার সাথে সেরকম আচরণ করবেন না। আপনার চাকরি করলে আমাকে হতে হত পা-চাটা গড। হলিউডে ওরাই তো আপনাদের দেখাশোনা করে। কোথেকে জোগাড় করেন ওদেরকে, বলুন তো? খ্রীস্ট, আসলেই কি ওরা কিছু জানে না, নাকি অবহেলা করে? জানে না একথা আমি বিশ্বাস করি না। মি. নিনোর অবস্থা যে হয়ে এসেছে নিশ্চয়ই জানে ওরা। কিন্তু সত্যিকার চিকিৎসার ধার দিয়ে না গিয়ে ওঁকে ওধুমাত্র খাড়া করে রাখার জন্যে একের পর এক ওষুধ খাইয়ে যাচ্ছে। গায়ে শিক্তের কোট চাপিয়ে ওরা সবাই আপনাদের পা চাটে। আপনারা ফিল্ম লাইনের কেউকেটা কিনা, সাংস্কৃতিক জগৎটাকে উদ্ধার করছেন, দুনিয়ার সব ব্যাপারেই আপনাদের স্বচ্ছ ধারণা আছে, তাই ওই খুনেগুলোকে মনে করেন মুশকিল আসান, বিপদের একমাত্র বন্ধু, পরম ত্রাতা। আসলে যে ওরা আপনাদেরকে স্নো পয়জন করছে সে-কথা একবারও কেউ ভেবে দেখেন না। ওদেরকে ডেকে পাঠিয়ে বলেন, “শো বিজনেস, ডাক্তার, ক্ষমা ঘেন্না করে কড়াকড়ি একটু শিখিল করো”! ঠিক বলিনি? আসলে আপনারা মরলেন কি বাঁচলেন তাতে ওদের কিছুই এসে যায় না। আমার ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। আমার আবার একটা বাজে “হবি” আছে। অনেকের কাছে সেটা হয়তো ক্ষমার যৌগ্য নয়?’

এতক্ষণে একটু গম্ভীর হলো জুলস। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর আবার বলল, ‘হবিটা হলো মানুষকে আমি বাঁচিয়ে রাখতে চাই। মি. নিনোকে আপনি মদ দিলেনই, আমিও তেমন কড়া ভাবে নিষেধ করলাম না, কারণ ওঁর অবস্থা কতটা খারাপ সেটা আমি আপনাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছিলাম।’ হঠাৎ জ্বনির দিকে ঝুঁকে পড়ল সে, চেহারা এবং কণ্ঠস্বর আবার আগের মত সংযত আর শান্ত হয়ে এসেছে তার। ‘মন দিয়ে শুনুন, মি. জনি ফন্টেন। আপনার বন্ধুর প্রায় হয়ে এসেছে। কি বলছি বুঝতে পারছেন? উপযুক্ত চিকিৎসা আর কড়া ডাক্তারি নিয়মে ওঁর যদি সেবা যত্ন করতে পারেন তবেই একটা সুযোগ পাবেন তিনি, তা না হলে কোন আশাই নেই। ব্লাড প্রেশার, তার ওপর ডায়াবিটিস, তারপর বদভ্যাসগুলো একটাও তিনি ছাড়ছেন না—দেখবেন, বলে রাখছি, মগজটা স্নেফ ফেটে যাবে ওঁর।’ জুলসের ভাবলেশহীন চেহারায় একটু অসহায় ভাব ফুটে উঠল। ‘এর চেয়ে পরিষ্কার করে আর কি বলব? হ্যাঁ, বলেছি, পাগলা গারদ বলেছি। না বলে উপায় ছিল? না বললে আপনার টনক নড়ত? এবার আরও সোজা করে বলছি, বন্ধুকে যদি সত্যি ভালবাসেন, ওঁকে পাগল সাব্যস্ত করে কোথাও বন্দী করার ব্যবস্থা করুন, তবেই যদি ওঁকে বাঁচাতে পারেন। তা না হলে ওঁর গালে চুমু খেয়ে পরা গলায় বলুন—বন্ধু বিদায়!’

জুলস থামতেই ফিস ফিস করে বলল লুসি, ‘ওরুতুটা বুঝিয়ে দিলেই তো হলো, জুলস। এত কড়া কথা বলার দরকার কি?’

উঠে দাঁড়াল জুলস। এতক্ষণে শান্ত ভাবটা অদৃশ্য হয়ে গেছে চেহারা থেকে।

ব্যাপারটা লক্ষ করে আশ্চর্য একটা সন্তুষ্টি বোধ করল জনি ফটেন। জুলসের ওই প্রশান্ত ভাবটাই তো যত রাগের কারণ তার। লোকটাকে খেপিয়ে দিতে পেরে আপন মনে হাসছে সে এখন।

‘আপনার বুঝি ধারণা, এই রকম একটা পরিস্থিতিতে এই প্রথম আপনার অত একজন লোককে এই ধরনের কথা বলছি আমি? জী না, বোকার দল দুনিয়ায় কম নেই, আর আমাকেও রোজ এই সব কথা বারবার করে বলতে হয়। কড়া কথা বলতে নিষেধ করছে লুসি—কি যা-তা বকছে তা ও নিজেই জানে না। শুনুন তাহলে। সবাইকে কি বলতাম জানেন? বলতাম, “অত খেয়ো না, মারা যাবে, অত খেটো না, মারা যাবে, অত ধোঁয়া গিলো না, মারা যাবে; অত মদ খেয়ো না, মারা যাবে”। কেউ কানেই তোলে না আমার কথা। কারণ কি, জানেন? কারণ “কালকেই মরবে” একথা বলি না ওদেরকে। কিন্তু মি. নিনোর ব্যাপারে কোন দ্বিধা না করেই বলতে পারি, ও যদি আগামীকালই মারা যায় আমি মোটেও আশ্চর্য হব না।’

কাঁধ ঝাঁকাল জুলস, এগিয়ে গেল বার-এর দিকে, নিজের গ্লাসে আরও একটু হুইস্কি ঢালল সে। তারপর আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাল জনির দিকে। ‘কি ঠিক করলেন, মি. ফটেন? পাগল সাব্যস্ত করবেন বন্ধুকে?’

‘ঠিক বুঝতে পারছি না।’

‘কি জানেন, একজন মানুষ ধূমপানের ফলে মরতে পারে, বেশি খাটাখাটনির ফলে মরতে পারে, মদ খেয়ে মরতে পারে, এমনকি বেশি বেশি খেয়েও মরতে পারে। এগুলো সম্ভব। কিন্তু ডাক্তারির দিক থেকে একটা জিনিস সম্ভব নয়। সেটা কি জানেন? রমণ করে করে মরা। কেউ রমণ করতে করতে মারা গেছে, ডাক্তারি শাস্ত্র এ-কথা স্বীকার করে না। অথচ ওটার বেলাতেই সবার যত আপত্তি।’ মদের গ্লাসে চুমুক দিল জুলস। ‘কিন্তু সে হলো পুরুষদের বেলায়। মেয়েদের বেলায় তাতেও বিপদ। এমন অনেক মেয়ে আসতো আমার কাছে যাদের আর ছেলেপুলে হবার কথা নয়। বলতাম, “এবার হওয়াতে বিপদ আছে” জামাতাম, “খুব বেশি ঝুঁকি আছে, আপনি মারা যেতে পারেন”। সেই মেয়েই মাসখানেক পর আবার আমার কাছে এসে হাজির। একমুখ হাসি নিয়ে আমাকে শোনাতে “ডাক্তার, ফের বোধহয় আমি অন্তঃসত্ত্বা”। ঘটলও তাই। রাগ চেপে বলতাম “কিন্তু এতে যে অনেক ঝুঁকি”। তখনকার দিনে গলার সুরে আমার ভাব প্রকাশ পেত। কিন্তু মেয়েগুলো নির্লজ্জের মত হাসত, বলত, “কিন্তু আমরা যে গৌড়া ক্যাথলিক”।’

নক হলো দরজায়। চাকা লাগানো ট্রেতে খাবার আর কফি নিয়ে কামরায় ঢুকল দু’জন ওয়েটার। একটা পোর্টেবল টেবিলের ভাঁজ খুলে সেটারে দাঁড় করল তারা, খাবার সাজিয়ে দিয়ে চলে গেল। গরম স্যাণ্ডউইচ আর ধূমায়িত কফি শেষ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল জনি। একটা সিগারেট ধরাল। জুলসের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তার মানে, আপনি মানুষের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু গর্ভপাত ঘটানো তো ঠিক তার উল্টো ব্যাপার, সেটা করতেন কিভাবে?’

‘মেয়েরা বিপদে পড়লে জুলস শুধু তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করত,’ এই প্রথম

মুখ খুলল নুসি। ‘তা নাহলে ওরা যে আত্মহত্যা করে বসবে। অথবা নিজেরাই জগৎ নষ্ট করতে গিয়ে সাম্প্রতিক কিছু একটা ঘটিয়ে বসবে...’ জুলস ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে দেখে চুপ করে গেল নুসি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জুলস। ‘উহঁ, ব্যাপারটা অত সহজ নয়,’ বলল সে। ‘যাই হোক, অবশেষে সার্জন হলাম আমি। একজন খেলোয়াড়কে যেমন বলা হয়, ডান খেলে, আমাকেও তেমনি বলা হত খুব ডান কাটা-চেরা করে। বড়াই করছি না, আমার হাত সত্যি খুব ডান, এতই ডান যে আমি নিজেই ডয় পেতাম। এক হতভাগার পেট কেটে সাথে সাথে বুঝে ফেললাম, তার আর কোন আশা নেই। বাচবে না। অপারেশন করতাম ঠিক, কিন্তু মনে মনে জানতাম, টিউমার বা ক্যানসারটা আবার গজাবে। তবু একমুখে হেসে, একরাশ মিথ্যে সাহুনা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিতাম তাকে। ক্যানসার বাধিয়ে হয়তো এক বেচারী মেয়ে এল, তার একটা স্তন কেটে ফেলে দিলাম। পরের বছর আবার এল সে। এবার দ্বিতীয় স্তনটা কেটে বাদ দিলাম। এক বছর পর আবার আসবে ওই মেয়ে, জানতাম। এলও তাই। এবার পৈপের ভেতর থেকে যেভাবে বিচি চেঁছে বের করে দেয় সেভাবে ওর বুক থেকেও পচামাংস চেঁছে বের করে দিলাম। এতসব করছি কিন্তু অযথা, মরে যে যাবে সে তো আর অজানা কোন ব্যাপার নয়। ওদিকে ওদের স্বামীরা দিনে অমন হাজার বার টেলিফোন করে জানতে চায়, “ডাক্তার সাহেব, টেস্ট থেকে কি বোঝা গেল?”

‘তাই বাস্তব হয়ে একজন লোক রাখতে হলো আমাকে, টেলিফোন এলে সে-ই কথা বলত। রোগীকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম আমি। সমস্ত পরীক্ষা শেষ হবার পর রোগী যখন অপারেশনের জন্যে তৈরি, তার স্বামীকে ডেকে পাঠিয়ে দু’মিনিট কথা বলার সুযোগ করে দিতাম। জানতাম, “এটাই টার্মিনেল, মানে শেষ চেষ্টা।” কিন্তু আমার কথা শুনেও পেরে না ওরা। মানেটা যে বুঝতো না তা নয়, বিশ্বাস করত না। প্রথমদিকে মনে করতাম, বোধহয় শুনে পায়নি। ডাকতাম, কথাটা বলার সময় নিজের অজান্তেই হয়তো গলাটা খাদে নেমে গিয়েছিল। পরের দিকে তাই স্পষ্টভাবে, গলার জোর এনে উচ্চারণ করতাম। উহঁ, তবু শুনে পেরে না ওরা। এক লোক তো আমাকে ধমকই মেরে কল, “কি যা-তা বকছেন, জার্মিনেল আবার কি?”’ হাসছে জুলস। তা সে জার্মিনেলই হোক, আর টার্মিনেলই হোক, কিছু কি এসে যায়? যায় না। ওরা মরবেই, ওদেরকে বাঁচাবার সাধ্য আমার নেই। তাই, গর্ভপাত শুরু করলাম। একেবারে পানির মত সহজ কাজ, কেউ এখানে ভুল বোঝে না, বরং সবাই মহাখুশি। বাসন-পেয়াদা ধুয়ে সিঁক সাঁক করে রাখার মত, অল্পেই কামেলা-মুক্ত হওয়া যায়। প্রথম থেকেই ভাল লেগে গেল কাজটা। গর্ভপাতক হওয়া বেশ মজারই তো ব্যাপার, অস্বীকার করব কেন? দু’মাসের জগৎ, ওকে আমি জ্যান্ত মানুষই বলি না। তার মানে, বিবেকের দিক থেকে আমার কোন সমস্যা ছিল না। কম বয়েসী মেয়েরাই বেশি আসত, সবাই অবিবাহিত। আবার বিবাহিত মেয়েরাও আসত, এদের বয়স বেশি। ওদের সবাইকে আমি সাহায্য করছিলাম, সেই সাথে দু’হাতে টাকাও কামাচ্ছিলাম। কিন্তু কাজটা করতে গিয়ে কিছুটা সম্মান হারাতে

হয়েছিল আমাকে। প্রথম সারি থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল। তাই যখন ধরা পড়লাম, মনে হলো যেন ফেরারী আসামীকে ধরে আনা হলো। কিন্তু আমার কপালটা বরাবরই ভাল, এবারও কিভাবে যেন ছাড়া পেয়ে গেলাম। আমার এক বন্ধু সুপারিশ করল তাতেই কাজ হলো। তবে, এখন আমি কোন বড় হাসপাতালে কাজ করার সুযোগ পাই না। সেজন্যই আজ আমাকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। আবার আমি নিজের স্বভাব মত সবাইকে সং পরামর্শ দিচ্ছি, কিন্তু আমার কথা কেউ কানেই তুলছে না। ঠিক সেই আগের অবস্থা, কিছুই বদলায়নি।

‘আমাকে ভুল বুঝছেন আপনি,’ বলল জনি। ‘আপনার পরামর্শ কানে তুলছি না, এ-কথা ঠিক নয় ভেবে দেখছি এখনও।’

অনেকক্ষণ পর আবার কথা বলল লুসি, এবার প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যে। জনির দিকে ফিরল সে, বলল, ‘এই, জনি, ভেগাসে কেন এসেছ তা তো বললে না? ছুটি নিয়ে, নাকি কাজে?’

‘মাইকেল কেন যেন আমার সাথে দেখা করতে চেয়েছে,’ বলল জনি। ‘আজ রাতের প্লেনেই আসছে ও। সাথে টমও থাকবে। টেলিফোনে টম বলল, সে তোমার সাথেও দেখা করবে। ব্যাপারটা কি, কিছু জানো না কি?’

‘আমি শুধু জানি কাল রাতে আমরা সবাই এক সাথে বসে ডিনার খাব,’ বলল লুসি। ‘ফ্রেডিও থাকবে আমাদের সাথে। সম্ভবত হোটেলের কোন ব্যাপারে আলোচনা। শুনছি, ক্যাসিনো নাকি লোকসান দিচ্ছে, অথচ প্রচুর লাভ হবার কথা। গড ফাদার বোধহয় মাইকেলকে খোঁজ নিতে পাঠাচ্ছেন।’

‘জনলাম মাইক নাকি তার মুখটাকে মেরামত করিয়েছে,’ বলল জনি।

‘অনেক জেদাজেদি করে কে-ই বোধহয় রাজী করিয়েছে ওকে,’ বলল লুসি। ‘বিয়ের সময় সবাই অত করে বলল, কই, রাজীই হলো না। কে জানে কেন! নাক দিয়ে সব সময় সর্দি গড়াত, কি বিচ্ছিরি! আরও আগে সারিয়ে নিলেই পারত।’ একটু থেমে জনির দিকে তাকাল লুসি, বলল, ‘অপারেশনটার জন্যে কর্নিয়নি পরিবার থেকে ডাকা হয়েছিল জুলসকে। কন্সালট্যান্ট হিসেবে।’

‘আমিই তো ওর নামে সুপারিশ করেছিলাম।’

‘তাই? জানতাম না তো। সে যাই হোক, মাইক নাকি জুলসের জন্যে কিছু করতে চায়। সেজন্যেই ডিনারে ডেকেছে আমাদের।’

‘মাইকেলের কথা বলছ?’ বলল জুলস। ‘কারও ওপর বিশ্বাস নেই ওর। আমাকে অনুরোধ করেছে, আমি যেন সবার ওপর চোখ রাখি। ওর অপারেশনটা কিন্তু একেবারে সাদামাঠা ব্যাপার ছিল। যে-কোন সার্জন করতে পারত।’

পাশের শোবার কামরা থেকে একটা শব্দ ভেসে এল। সবাই একযোগে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পর্দার দিকে।

আবার জ্ঞান ফিরে পেয়েছে নিনো। কামরায় ঢুকে খাটের ওপর তার পাশে বসল জনি। ক্ষীণ, দুর্বল ভাবে একটু হাসল নিনো। বলল, ‘চিন্তার কিছু নেই, আমি আর অবাধ্য হব না। সত্যি, শরীরটা খুব খারাপ লাগছে রে।’ কথা শুরু করে নিনোর আর থামার লক্ষণ নেই, বকবক করে চলেছে সে, ‘এই, জনি, মনে আছে তো?’

সেই যে বছর খানেক আগে পাম স্প্রিংসে গিয়েছিলাম দুটো মেয়ের সাথে? মন থেকে বলছি, সেদিন ওখানে যা ঘটেছিল আমার তাতে দুঃখ হয়নি। বিশ্বাস কর, একটুও হিংসা হয়নি আমার। যীশুর কিরে, খুশিই হয়েছিলাম আমি। তুই আমার কথা বিশ্বাস করছিস তো?’

‘করছি,’ অবিশ্বাসের সুরে বলল জনি।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল জুলস্। এ কি শুনেছে তারা? জনি ফন্টেন, বিখ্যাত জনি ফন্টেন তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর কাছ থেকে মেয়ে ভাগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল? এ যে একেবারেই অবিশ্বাস্য, অসম্ভব ব্যাপার। জনিকে চেনে ওরা, ওর সম্পর্কে শুনেছেও অনেক কথা, তারপরও এমন অকল্পনীয় একটা অভিযোগ ওরা বিশ্বাস করে কিভাবে? অথচ, অভিযোগটা মিথ্যেও হতে পারে না, নিনো ভ্যালেন্টি তো আর জনির অনুপস্থিতিতে কথাটা বলছে না। এর মধ্যে আরও একটা বিস্ময়কর ব্যাপার রয়েছে। যা ঘটে গেছে, ঘটে গেছে, ঝাড়া এক বছর ধরে সে-কথা মনেই বা রেখেছে কেন নিনো? তবে কি এক বছর আগে সেই মেয়েটা তাকে ছেড়ে চলে যাবার দুঃখ আজও ভুলতে পারেনি সে? সেজন্যে কি জীবনের ওপর এত বিতৃষ্ণা তার, সেই বিতৃষ্ণার কারণেই কি দেদার মদ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে ও?

নিনোকে আরেকবার পরীক্ষা করল জুলস্। ‘আজ রাতে এখানে থাকার জন্যে একজন নার্সকে ডাকছি আমি,’ বলল সে। ‘আপনি কিন্তু অন্তত দুটো দিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবেন না। কোন ওজর আপত্তি চলবে না।’

‘আপনি যা বলবেন তাই হবে, ডাক্তার,’ মৃদু হেসে বলল নিনো। ‘কিন্তু সাবধান, নার্সটা যেন খুব বেশি সুন্দরী না হয়।’

টেলিফোনে নার্সের ব্যবস্থা করল জুলস্। তারপর লুসিকে সাথে করে বিদায় নিল

খাটের পাশে একটা চেয়ারে বসে রয়েছে জনি, কখন নার্স আসবে তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

আবার ঘুম পাচ্ছে নিনোর। চেহারায় ক্লান্তির গভীর ছাপ। একা একা বসে নিনোর বলা কথাগুলো চিন্তা করছে জনি। পাম স্প্রিংসে এক বছর আগে যা ঘটে গেছে সে ব্যাপারে নিনোর মনে কোন দুঃখ নেই, ঈর্ষা নেই। এটুকু জানে জনি।

কিন্তু জনির মনে সন্দেহটা উকিই দেয়নি যে নিনোর মনে ঈর্ষা হতে পারত।

পাঁচ

এক বছর আগের কথা।

সিনেমা কোম্পানীর মালিক জনি ফন্টেন। তার সাজানো অফিস কামরায় বিমগ্ন মনে বসে আছে একাকী। প্রথম ছবিটাই সুপারহিট হয়েছে তার, সাফল্যের শিখরে উঠে এসেছে সে, কিন্তু তবু বেঁচে থাকায় কোন স্বাদ পাচ্ছে না। ভাল লাগছে না কিছুই। সে নিজেই তার প্রথম ছবির নায়ক, সেটায় নিনোরও একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। জোয়ারের মত টাকা নিয়ে আসছে ছবিটা। কাজ শেষ করতে কোথাও

হুকান-উটকো ঝামেলায় পড়তে হয়নি তাকে। শিল্পী, কর্মী, টেকনিশিয়ান সবাই ফেয়ার কাজ সূচারুভাবে শেষ করেছে। খরচও বাজেট ছাড়ায়নি। ছবিটা থেকে সবাই দৈদার টাকা কামাচ্ছে, আরও কামাবে, আর সেই সাথে দশ বছর বেড়ে যাবে জ্যাক ওল্টসের বয়স।

আরও দুটো ছবিতে হাত দিয়েছে জনি। প্রথমটার নায়ক নিজেই, কিন্তু দ্বিতীয়টার নায়কের ভূমিকা ছেড়ে দিয়েছে নিনোকে। দর্শকরা পর্দায় দারুণ পছন্দ করেছে ওকে। আর যাই হোক, চেহারাটা খাসা, ঠিক যেন পাকা আপেল, এমন নেশায় পাওয়া গিষ্টি চেহারার নায়কদেরকেই তো বুকে জড়িয়ে ধরতে ভালবাসে মেয়েরা। নিনোর চেহারায় অদ্ভুত একটা সরলতাও আছে, ঠিক যেন হারিয়ে যাওয়া ছোট ছেলে। জনির কপালই ভাল, হাতটা যেন পরশ পাথর হয়ে উঠেছে, ধুনো ছুলেও সোনা হয়ে যাচ্ছে। ঘরে টাকা আসার কোন বিরাম নেই। ওদিকে ব্যাংকের মাধ্যমে গড ফাদারও নিজের ন্যায্য ভাগ ঠিক মত পেয়ে যাচ্ছেন। এ আরেক আনন্দের ব্যাপার। গড ফাদার তার ওপর এতটা বিশ্বাস রাখেন, সে-বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পেরে জনিও গর্বিত। কিন্তু এসব স্মরণ করেও মনটাকে আজ বশ মানাতে পারছে না ও।

আজ সে একজন সফল, সার্থক, স্বাধীন চিত্র-প্রযোজক। গাইয়ে হিসেবে যত প্রতিপত্তি ছিল, তার সমান নয়, আরও অনেক বেশি খ্যাতি অর্জন করেছে সে ছবি তৈরি করে। গলা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় যা কিছু হারিয়েছিল, তার সবই ফিরে এসেছে তার হাতের মুঠোয়। সুন্দরী মেয়েরা আবার তার পিছু নিয়েছে, একজন দু'জন নয়, ঝাকে ঝাকে। কে কার আগে তার গায়ে আছড়ে পড়তে পারে তারই যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে ওদের ভেতর। আগেও এমন হয়েছে, কিন্তু সেবার কারণটা ছিল ওর ওপর ভক্তি। এখন তা নয়। এখনকার ব্যাপারটা আরও অনেক বেশি বৈষয়িক।

নিজে ব্যবহার করার জন্যে প্লেন কিনেছে জনি। রাজ-রাজড়াদের মত জীবন কাটায়, বিলাসিতার সমস্ত স্বাদ উপভোগ করছে। ইনকাম ট্যাক্স-এর ব্যাপারে আজকাল নানা ধরনের সুবিধে পায় সে, আগে যা কখনও পেত না। তাহলে মন খারাপের কি হলো জনির?

কোন কারণ নেই, তবু মন খারাপ, ব্যাপারটা তা নয়। মাথার সামনের দিকে, কপালে ব্যথা অনুভব করছে সে। নাকের ভেতর নালিওলোতে যন্ত্রণা। আর গলা খুস খুস। এই গলা খুস খুস ভাবটাই সবচেয়ে বেশি জ্বালাচ্ছে তাকে। ওটা চুলকে আরাম পাবার একমাত্র উপায় গান গাওয়া। কিন্তু কিভাবে গাইবে জনি? সাজাতিক ভয় করে তার। ডাক্তার জুলস সীগলকে ফোন করে জানতে চাইল, 'কবে নাগাদ গাইতে পারব, ডাক্তার?'

উত্তরে জুলস জাম্মাল, 'যখন ইচ্ছে গাইতে পারেন আপনি।'

সাহস পেয়ে গাইতে চেষ্টা করল জনি। চেষ্টা না করলেই ভাল ছিল। গাধার মত হেঁড়ে সুর বেরুল গলা থেকে, নিজের কণ্ঠস্বর বলে চিনতেই পারল না ও। চোখে পানি এসে গেল তার। খানিক চেষ্টা করার পর হাল ছেড়ে দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল

মদের বোতলের দিকে। তার পরদিন সে কি ব্যথা গলায়। আঁচিলগুলো চোঁছে ফেলে দেবার আগে যে-ধরনের ব্যথা অনুভব করত এটা সে-ধরনের নয়, অন্যরকম। এতে জ্বালা ভাবটা বেশি, যেন কাটা ঘায়ে লবণের ছিটে পড়েছে। ভয়ানক একটা আশঙ্কা ছিল মনে গলাটা বোধহয় আর কোনদিন ভাল হবে না। কিন্তু অপারেশনের পর সেইদিন প্রথম গাইতে চেষ্টা করে পরিষ্কার বুঝল জনি, গলাটা তার চিরকালের জন্যে গেছে।

গানই তো ছিল তার জীবন। গান ছাড়া আর কি জিনিস আছে যাকে সে ভালবেসেছে? সেই গানই যদি গাইতে না পারে, কি লাভ বেঁচে থেকে? সাফল্য, টাকা, খ্যাতি—গাইতে না পারলে এসবের এক পয়সাও দাম নেই। অন্তর দিয়ে একটা কাজই করতে পারত জনি, করেছেও তাই—গান। একটা বিশেষ ধরনের গান গাইত সে, সে বিষয়ে দুনিয়ায় তার চেয়ে ভাল আর কেউ কিছু জানে না। এতদিন ভাল বোঝেনি, কিন্তু আজ গলা হারিয়ে টের পায় কত ভাল গাইত সে। দীর্ঘ অনেক বছরের অভিজ্ঞতা, শেষদিকে খাঁচি পেশাদার শিল্পী হয়ে উঠেছিল সে। কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল তা জিজ্ঞেস করতে হত না কাউকে, ও নিজেই সব বুঝতে পারত। চর্চা করে যখন গলাটাকে শানিয়ে নিয়ে এসেছে, ঠিক তখনই সেটা নষ্ট হয়ে গেল। মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়ে ভাবে জনি, এখনও সে আত্মহত্যা করেনি কেন? এতবড় দুঃখ কিভাবে সহ্য করেছে সে? এ যে কি ক্ষতি, কত বড় ক্ষতি, কাউকে তা বলে বোঝাতে পারবে না সে।

গুক্রবার। জনি ঠিক করল দিনটা আজ ডার্মিনিয়া আর মেয়েদেরকে সঙ্গ দিয়ে কাটাবে। ওখানে যাবার আগে প্রতিবার ফোন করে জানায় সে। আজও তাই করল। এর কারণ, ডার্মিনিয়াকে আপত্তি করার একটা সুযোগ দেয়া। কিন্তু জিনি কখনও আপত্তি করেনি। বিয়েটা ভেঙ্গে যাবার পর কয়েকদিন তো গত হলো না, কিন্তু তবু যখনই মেয়েদেরকে দেখতে যেতে চেয়েছে জনি, সাথে সাথে রাজী হয়েছে জিনি, প্রতিবাদ করেনি। এ-ব্যাপারে জিনিও একটা নীতি মেনে চলে—বাপ তার মেয়েদের দেখতে চাইলে তাতে সে বাধা দেবে না, সে অধিকার নিজেকে সে দেয় না। জিনির কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ উতলা হয়ে উঠল জনির মন। জিনিয়ার মত মেয়ে হয় না, নতুন করে কথাটা স্বীকার করল আজ আবার। এমন একটা মেয়েকে বিয়ে করতে পেরেছিল, আজও তার সাথে সদ্ভাব রাখতে পেরেছে, এটা তার নেহায়েত সৌভাগ্য। কিন্তু সে সাথে আবার এ-কথাও ঠিক যে জিনিয়ার সাথে কখনই আর ঘর-সংসার করা সম্ভব নয়। জিনি ওকে স্বামী হিসেবে মেনে নিতে পারবে না, সেও জিনিকে স্ত্রী হিসেবে মেনে নিতে পারবে না। দু'পক্ষ থেকেই তা আর সম্ভব নয়। তবে যখন পঁয়ষট্টি বছর বয়স হবে ওদের, সবাই যে বয়সে অবসর নেবার কথা চিন্তা করে, তখন হয়তো দু'জনে এক সাথে অবসর জীবনটা কাটাতে পারবে।

কিন্তু তিষ্ঠ বাস্তব মনটাকে শান্ত না করে আরও অস্থির করে তুলল। ওখানে পৌঁছেই টের পেল জনি, জিনিয়ার মেজাজ ভাল নেই। মেয়েরাও বাপকে দেখে আগের মত নেচে উঠল না। তার কারণ, বাস্কবীদের সাথে ক্যালিফোর্নিয়ায় বেড়াতে যাচ্ছে ওরা, শনি-রবি দুটো দিন ঘোড়ায় চড়ে কাটাবে সেখানে। জিনির বোধহয়

একটু আপত্তি রয়েছে, তাই মুখটা ভার। জনি তাকে শান্ত করার চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত মায়ের অনুমতি পেল মেয়েরা। জনিও তাদের চুমো খেয়ে বিদায় দিল। মেয়েদের মনের অবস্থা বুঝতে অসুবিধে হয়নি তার। খিটখিটে বাবাকে ফেলে কোন্ ছোট মেয়ে ঘোড়ায় চড়তে না যায়? বিশেষ করে যে বাবা তাদের সাথে থাকে না, নিজের ইচ্ছেমত যায় আসে?

‘দু’টোক গিলে গলাটা ভিজিয়ে নিই,’ জিনিকে বলল জনি, ‘তারপর আমিও বিদায় নেব।’

জিনির মেজাজ যে ভাল নেই সেটা তার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। সাধারণত এমন হয় না। মেজাজ যতই খারাপ থাকুক, জনি এলে চেহারাটা হাসিখুশি করে রাখার চেষ্টা করে ও। আজ কিন্তু উল্টোটা ঘটছে। মৃদু গলায় সংক্ষেপে জবাব দিল, ‘আচ্ছা।’

মনে মনে স্বীকার করল জনি, যেভাবে জীবন কাটাচ্ছে জিনি, অর্থাৎ যেভাবে জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে, সেটা মোটেও সুখের নয়। সেজন্যে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হলো তার।

জনির দিকে তাকিয়ে আছে জিনি। লক্ষ করল, গ্লাসে কানায় কানায় মদ ঢেলে নিল জনি। একটু বেসুরো গলায় জানতে চাইল সে, ‘তোমার আবার মন খারাপের কি হলো? তুমি যে আবার এত ভাল ব্যবসাও করতে পারবে, স্বপ্নেও ভাবিনি আমি। তোমার তো এখন পোয়াবারো অবস্থা।’

ওর দিকে ফিরল জনি, মৃদু হাসল। ‘টাকা রোজগারটা কোনদিনই তেমন কঠিন কাজ নয়।’ বলেই বুঝল, জিনির মন খারাপের কারণ এটাই—ওর সাফল্য।

মনের মানুষ বা কাছের মানুষ খুব বেশি সাফল্য লাভ করুক, মেয়েরা তা চায় না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সাফল্য ওদের বিরক্ত করে তোলে। বিয়ে, প্রেম, যৌন-অভ্যাস এই সব চোখা চোখা অস্ত্র দিয়ে পুরুষদের ওরা কাবু করে রাখতে বেশি পছন্দ করে। পুরুষদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করাটাই ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য, সেখানেই ওদের সার্থকতা বলে মনে করে ওরা। সেই পুরুষ যদি খুব বেশি সাফল্যের মুখ দেখে, ওদের মনে অনিশ্চয়তা জেগে ওঠে—ভয় হয়, আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।

বুদ্ধি করে নিজের দুঃখের কথাটা পাড়ল জনি। দুঃখটা কলজেছেঁড়া হলেও প্রসঙ্গটা তুলল যতটা না ~~সুখানুভূতি~~ পাবার আশায়, তারচেয়ে অনেক বেশি জিনির মন ভাল করে দেবার আন্তরিক কামনায়।

‘কি হবে এসব দিয়ে?’ বলল জনি। ‘গাইতে পারি না, সেটাই আসল কথা। জিনি, বিশ্বাস করো, আমার আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না। গান ছাড়া আমার অস্তিত্বের দাম কি, বলো?’

জিনির চেহারা এবং কণ্ঠস্বরে একরাশ বিরক্তি প্রকাশ পেল। ‘এ আবার কি কথা, জনি? এখনও তুমি কচি খোকা আছ নাকি? বয়স কত হলো খেয়াল আছে? পঁয়ত্রিশ ছাড়িয়ে গেছ। গান? দূর, ও দিয়ে কি হবে? গাইতে পারো না, তাতে তোমার এত দুঃখ পাবার কি আছে, আমি তো ভেবে পাই না। ছবির ব্যবসাতে কম

টাকা কামাচ্ছ তুমি?’

একদৃষ্টিতে জিনির দিকে তাকিয়ে রইল জনি। কয়েক সেকেন্ড পর বলল, ‘আমি গাইতে ভালবাসি। আমি একজন গায়ক। গান আমার জীবন। তার সাথে বয়স হওয়ার কি সম্পর্ক?’

উত্তেজিত হয়ে উঠল ভার্জিনিয়া। ‘কি জানি, বাপু! সত্যি বলছি, আমার কিন্তু কোনকালেই তোমার ওই গান গাওয়া ভাল লাগেনি। তুমি যে ভাল ছবি করতে পারো তা তো প্রমাণ করেই দিয়েছ। আমার কাছে এটাই ভাল মনে হয়।’ তারপরই ভয়ঙ্কর কথাটা বলল জিনি, ‘তুমি যে আর গাইতে পারো না সেজন্যে আমি খুব খুশি।’

মূহূর্তে বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেল জনি। তারপরই প্রচণ্ড রাগ হলো তার। ‘কি বললে? এমন একটা বিচ্ছিরি, জঘন্য কথা বলতে পারলে তুমি?’ আঘাতটা মর্মে গিয়ে লেগেছে ওর। ভেবেই পাচ্ছে না, এমন কথা মুখে আনল কিভাবে জিনি! তাকে জিনি এতটা ঘৃণা করেই বা কিভাবে? কিভাবে তা সম্ভব!

ওর রাগ আর অভিমান লক্ষ করে হাসল জিনি। ‘আমার ওপর রাগ করা অন্যায্য হয়ে যাচ্ছে তোমার,’ অনেকটা স্মরণ করিয়ে দেবার সুরে বলল সে, ‘একবার ভেবে দেখো। ভাল গায়ক হিসেবে তোমার যখন নাম ডাক ছিল তখন রাজ্যের মেয়েরা তোমার পিছনে ছুটত—ভেবে দেখেছ কেমন লাগত তখন আমার?’ জিনির চোখে চোখ রেখে স্পষ্ট করে বলছে জিনি। ‘উদ্যম শরীরে আমি যদি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতাম, আর রাজ্যের পুরুষরা আমার পিছনে ছুটত—ভেবে দেখেছ, কেমন লাগত তখন তোমার? তুমি ভাল গাইতে পারতে, সেটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। আমি চাইতাম, মনেপ্রাণে চাইতাম, তোমার গলা যেন নষ্ট হয়ে যায়—তুমি যেন আর গাইতে না পারো। কিভাবে যেন ঠিক তাই ঘটে গেল—সেজন্যে আমি খুশি হয়েছিলাম।’ একটু থামল জিনি, তারপর আবার বলল, ‘তবে, এখন তুমি গাইতে পারো না পারো তাতে আমার কিছু এসে যায় না। ওসব আমাদের বিয়ে ভাঙার আগেকার ব্যাপার—এখন আর কিছুতেই কিছু এসে যাবে না।’

ঘন ঘন ঢোক গিলে গ্রাসটা নিঃশেষ করল জনি। ‘একটুও বুদ্ধি নেই তোমার,’ ঠাণ্ডা গলায় বলল সে। ‘কিছুই বোঝো না তুমি।’ ঘুরে দাঁড়াল সে, কিচেনে চলে এল। ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল নিনোর নাম্বারে। পাম স্প্রিংসে গিয়ে শনি-রবি দুটো দিন কাটাবার প্রস্তাব শুনে অপরপ্রান্তে আনন্দে লাফিয়ে উঠল নিনো। জনি একটা মেয়ের ফোন নাম্বার দিল তাকে। কুমারী একটা মেয়ে। অদ্ভুত সুন্দর দেখতে। বয়সও কম। গত কয়েকদিন ধরেই তার সাথে যোগাযোগ করার কথা ভাবছিল ও।

নিম্নোকে বলল, ‘ওই মেয়েই তোমার জন্যে একজন সজ্জিনী যোগাড় করে নিয়ে আসবে। তোমার বাড়িতে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পৌঁছে যাব আমি।’

বিদায় দেবার সময়ও মুখ ভার করে থাকল জিনি। কিন্তু জনিও গম্ভীর হয়ে থাকল, ভদ্রতা দেখিয়ে একটু হাসল না পর্যন্ত। সহজে জিনির ওপর রাগ করে না সে।

কিন্তু আজ জিনি সৈত্য়ি রাগিয়ে দিয়েছে তাকে। মন থেকে সমস্ত বিষাদ ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করছে সে। ধ্যেত্তেরি ছাই, কে কি বলল তাতে কিছুই এসে যায় না তার—শনি রবিবারটা তো চুটিয়ে ফুটি করা যাবে, সেটাই এখন সবচেয়ে বেশি দরকার।

যা আশা করেছিল, পায়ম স্প্রিংসে চমৎকার কাটল সময়টা* ওখানে নিজের বাড়ি আছে জনির, সেখানেই উঠল চারজন। বছরের এই একটা সময়, যখন বাড়িটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে খালি রাখা হয়। কাজের লোকেরা তৈরি হয়েই থাকে, জানে, যে কোন সময় বাড়িতে এসে উঠতে পারে মনিব।

মেয়ে দুটো একেবারে কচি, ফুলে দারুণ ফুটি করা গেল ওদের নিয়ে। এখনও স্বার্থটাকে বড় করে দেখতে শেখেনি ওরা, নিজেদের জন্যে সুবিধে করে নেবার লোভটা এখনও আসন গেড়ে বসেনি মগজে। ডিনারের আগে পর্যন্ত সুইমিং পুলের ধারে বসে সময় কাটাল ওরা। কিছু বন্ধু এসে জুটল ওখানে। তারা বিদায় নেবার পর নিনোও তার সঙ্গিনীকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে এল—সাপারের জন্যে তৈরি হতে হবে। রোদের আঁচ লেগে গরম হয়ে গেছে গা, এই সুযোগে মেয়েটার সাথে খানিকটা প্রেমও করা যাবে।

কিন্তু জনির মেজাজ আজ অন্যরকম। সঙ্গিনীটির নাম টিনা। একমাথা সোনালী চুল তার। মিষ্টি হেসে তাকে শাওয়ারে গোসল করার জন্যে পাঠিয়ে দিল জনি। সময়টা হয়তো ভালই কাটবে, কিন্তু ও জানে, মেয়েটার সাথে জঁমবে না তার।

ভার্জিনিয়ার সাথে ঝগড়া হলে অন্য মেয়ের সাথে প্রেম করতে পারে না জনি।

বসবার ঘরটা কাঁচ দিয়ে মোড়া। একধারে একটা পিয়ানো ঘরে ঢুকেই কি এক দুর্বীর আকর্ষণ অনুভব করল সে, ধীর পায়ে এগিয়ে গেল সেদিকে। এককালে ব্যাণ্ডে ছিল জনি, গান করত, স্ট্রেক মজা বা অনস সময় কাটাবার জন্যে পিয়ানো নিয়ে টুংটাং করত। সে সব দিনের কথা কখনও ভুলবে না ও পুরানো গানের সুর তুলত পিয়ানোতে। সে সব সুর কি কোমল আর জ্যোৎস্না মাখা!

ঘরে কেউ নেই, তাই পিয়ানোর টুংটাঙের সাথে দু'কলি গাইছে জনি। ঘরটা নিচু করে রেখেছে, বাড়তে দিচ্ছে না। যে গানের যে ক'টা ছাড়া ছাড়া কথা মনে পড়ছে বা গলায় আসছে তাই গুন গুন করছে সে, ঠিক গাইছে বলা চলে না তাকে। পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকেছে টিনা, টেরই পায়নি জনি। গ্লাসে মদ ঢালল টিনা, পানি মেশাল—তবু তার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন নয় জনি। তারপর ওর পাশে এসে বসল টিনা। নিজের অজান্তেই গানটা থেমে গেল জনির। এখন শুধু পিয়ানোয় টুংটাং আওয়াজ তুলছে। তারপর একটা সুর তুলতে শুরু করল। সেই সুরের সাথে গলা মিলিয়ে গুন গুন করছে টিনা।

টিনাকে পিয়ানোর সামনে বসে থাকতে বলে শাওয়ার সারতে চলে গেল জনি। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে কথা বলার মত ভঙ্গিতে আরও কয়েকটা গানের কলি আওড়াল সে। তারপর কাপড়চোপড় পরে নিচে নেমে এসে দেখে টিনা এখনও পিয়ানো সামনে নিয়ে একা বসে আছে তার জন্যে। নিনো বোধহয় সঙ্গিনীকে নিয়ে ব্যস্ত, অথবা কে জানে, কোথাও বসে হয়তো মদ খেয়ে মাতাল হবার সাধনা

করছে।

আবার সেই দুর্বীর আকর্ষণ জনিকে টেনে নিয়ে এল পিয়ানোর সামনে। উঠে দাঁড়িয়ে জায়গা ছেড়ে দিল টিনা। ঘরের ভেতর ঘুরছে সে, সুইমিং পুল দেখছে।

পুরানো একটা গান ধরল জনি।

একটু অবাকই হলো, কই, গলা তো জ্বালা করছে না! সুরগুলো বেরিয়ে আসছে গলা থেকে, একটু যেন চাপা সুরে, কিন্তু কোথাও এতটুকু অবাস্তবিত্ব খাদ নেই, পরিপূর্ণ নিটোল হয়ে বেরিয়ে আসছে আওয়াজ।

চোখ তুলে বারান্দার দিকে তাকাল জনি। ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে টিনা। কাঁচের জানালা বন্ধ, কিছুই গুনতে পাচ্ছে না সে। কেউ ওর গান শোনে, কেন কে জানে, তা চায় না জনি।

নতুন করে পুরানো একটা ব্যালাড ধরল ও। এবার গলাটাকে চেপে রাখল না। গলা ছেড়ে গাইছে ও, যেন শোভাদেবীর সামনে গাইছে।

গলাটাকে পুরোপুরি ছেড়ে দিয়ে, নিজেকে মুক্ত করে দিয়ে গাইছে ও, আর অপেক্ষা করছে কখন শুরু হবে পরিচিত জ্বালাটা। কিন্তু সেটার অস্তিত্বই টের পাচ্ছে না সে।

অনেকদিন পর নিজের গানের গলা গুনছে জনি। কেমন যেন অন্যরকম শোনাচ্ছে, কিন্তু খারাপ লাগছে না। কণ্ঠস্বর আরও গাঢ় লাগছে—পুরুষ মানুষের গলা এটা, ছেলেমানুষের নয়। সন্দেহ হলো, গলায় একটা বিস্ময়কর সমৃদ্ধি এসেছে। সন্দেহটা ধীরে ধীরে বিশ্বাসে পরিণত হচ্ছে—হ্যাঁ, এখন আর কোন সন্দেহ নেই ওর মনে, এটা একটা সুগভীর সমৃদ্ধ কণ্ঠস্বর। নিশ্চিত মনে থামল জনি। পাথরের মত নিশ্চল বসে আছে পিয়ানোর সামনে। নড়বে, সে শক্তি নেই যেন শরীরে। চুপচাপ বসে ভাবছে।

‘মন্দ নয়,’ আচমকা পিছন থেকে নিনোর গলা পেল ও। ‘অন সেকেণ্ড থট—কিসের মন্দ নয়? অপূর্ব! বিস্ময়কর! এ কার গলা, দোস্তু?’

ঝট করে ঘুরে বসল জনি। দরজায় নিনোকে একা দেখে স্বস্তি বোধ করল সে। নিনো গুনছে শুনুক, তাতে তার আপত্তি নেই। ওর সঙ্গিনীটা না গুনলেই হলো।

‘দেখা যাক,’ বলল জনি। ‘মেয়ে দুটোকে নিয়ে কি করা যায় বল তো? ওদেরকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া যায় না?’

‘তুই ব্যবস্থা কর,’ বলল নিনো। ‘এত কচি আর এত ভাল, ফুল ছুঁড়েও ওদের মনে কষ্ট দিতে পারব না আমি। আমার মেয়েটার সাথে দুবার প্রেম চালানো, এখন যদি ওকে না খেতে দিয়ে ফেরত পাঠাই, আমাকে কি ভাববে বল দেখি?’

ধোঁতেরি, না হয় গুনলই ওরা! বিচ্ছিরি গলা তো কি হয়েছে। মেয়েগুলোকে বিদায় করবার দরকার নেই, মনস্থির করে পরিচিত এক ব্যাণ্ড লীডারকে ফোন করল জনি। পাম স্প্রিংসেই থাকে সে। তার কাছ থেকে একটা ম্যাগোলিন চাইল সে। কিন্তু ব্যাণ্ড লীডার প্রতিবাদের সুরে বলল, ‘ম্যাগোলিন? ম্যাগোলিন দিয়ে কি হবে? পাম স্প্রিংসে কেউ ম্যাগোলিন বাজায় না।’

‘জানি,’ চিৎকার করে বলল জনি। ‘তোমাকে যা বলছি তাই করো। একটা

ম্যাণোলিন পাঠিয়ে দাও।’

রেকর্ড করার যন্ত্রপাতিতে বাড়িটা ভর্তি, সুতরাং সেদিক থেকে কোন সমস্যা দেখা দিল না। মেয়ে দুটোকে থাকতে দেয়ায় সুবিধেই হলো। ওদেরকে যন্ত্র অন-অফ করা, শব্দ কমানো বাড়ানো রপ্ত করিয়ে নিল জনি।

খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে কাজে বসল ও। ম্যাণোলিন নিয়ে সঙ্গত করছে নিনো। এক এক করে তার সব পুরানো গান গাইছে জনি। গাইল গলা ছেড়ে, একটুও দয়া মায়া করল না গলাটাকে। গলার অবস্থা চমৎকার, এত ভাল আশা করেনি সে, মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে গেয়ে যেতে পারবে।

কতদিন, কত মাস গাইতে পারেনি সে! গাইতে পারেনি, কিন্তু গানের ভাবনা ছাড়তে পারেনি কখনও। কল্পনায় ভেবেছে, আবার যদি গাইতে পারত, অল্প বয়সে যেভাবে গেয়েছে সেভাবে গাইত না, অন্যভাবে গাইত। এতদিন আওয়াজ করে গাইতে পারেনি জনি, মনে মনে গেয়েছে। কল্পনাটা এখন বাস্তব হয়ে উঠছে। যেভাবে গাইলে গান আরও ভালভাবে ফুটে বলে মনে করত সেইভাবে গাইছে এখন, আরও বেশি ওস্তাদি আর স্বর-সংঘাত আরোপ করে। তা করতে গিয়ে মাঝে মধ্যেই গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। মাথার ভেতর যেমন গুনতে পেত কাজের বেলায় সেই ভাবে গাইতে গিয়ে ঠিক সুরটি বেরুচ্ছে না।

মনে মনে ঠিক করল, আরও জোরে, আরও অনেক খোলা গলায় গাইতে হবে তাকে। এখন আর নিজের গলা গুনছে না জনি। সম্পূর্ণ মনোযোগ চলে গেছে গানের ওস্তাদির দিকে। তাল বজায় রাখতে গিয়ে ঠেকে যাচ্ছে এখানে সেখানে—কিন্তু ও কিছু না, অনেকদিন চর্চা না থাকলে অমন হতেই পারে। ‘মেট্রোনোম’ ওর মাথার ভেতরই আছে, ফলে কখনও ভুল হয় না তার। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে, একটু চর্চা করলেই হবে।

অবশেষে থামল জনি। উজ্জ্বল, উদ্ভাসিত মুখে এগিয়ে এসে তার মুখে একটা চুমু খেয়ে বলল টিনা, ‘আজ বুঝলাম কেন তোমার প্রত্যেকটা ছবি দেখতে যায় মা!’ উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কথাটাই বলে ফেলেছে টিনা। ঠিক এই বিশেষ মুহূর্তটি ছাড়া অন্য কোন সময় কথাটা বলা ভুল হত। হাসছে ওরা।

টেপটা বাজিয়ে শোনার পানা এবার। পুরো মন লাগিয়ে নিজের গানগুলো গুনল জনি। আশ্চর্য বদলে গেছে গলাটা, প্রায় সম্পূর্ণ বদলে গেছে, কিন্তু এ যে জনি ফন্টেনেরই কণ্ঠস্বর তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। তার আগের ধারণাটাই ঠিক। আগের চেয়ে আরও অনেক সমৃদ্ধি এসেছে গলায়। আরও গাঢ় হয়েছে স্বর। আগের গলায় একটা ছেলেমানুষির পাতলা ভাব ছিল, এখন সেটা পুরুষ মানুষের পরিণত গলায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই নতুন গলায় আবেগ আরও যথার্থভাবে ফুটেছে, অনুভব করার জন্যে এর ভেতর অনেক বেশি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কৌশলগত বিচারেও এর আগে কখনও এত ভাল গায়নি জনি। এ যাকে বলে গুণীর কাজ। চর্চা নেই, তাতেই যদি এত ভাল গাইতে পেরে থাকে, চর্চা করলে তো আরও কত ভাল গাইতে পারবে।

হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল জনির মুখ। নিনোর দিকে ফিরল সে। ‘কি রে,

কেমন বুঝছিস? যতটা ভাল মনে করছি, আসলেই কি ততটা ভাল?’

প্রত্যাশায় ভরাট জনির মুখের দিকে তাকাল নিনো। চিন্তিত ভাবে বলল, ‘ততটা কিংবা হয়তো তারচেয়েও ভাল। কিন্তু দেখা যাবে কাল কি রকম গাইতে পারিস।’

নিনো খুব একটা উৎসাহ পায়নি লক্ষ করে মন খারাপ হয়ে গেল জনির। গাল মন্দ শুরু করে দিল সে। ‘শালা, বেজম্মা! খুব ভালই জানা আছে তোরা, আমার মত গাইতে পারবি না কখনও তুই। কালকের কথা কালকে দেখা যাবে। আমি কিন্তু সাম্প্রতিক উত্তেজিত হয়ে পড়েছি।’

কিন্তু সে রাতে আর গাইল না জনি। নিনো আর মেয়ে দুটোকে সাথে নিয়ে একটা পার্টিতে গেল। এক বিছানায় রাত কাটালেও জনিকে দিয়ে আশা পূরণ হলো না টিনার। বেচারি হতাশই হলো। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আবার একটু মন খারাপ হয়ে গেল জনির। তারপর ভাবল কি আশ্চর্য, এক দিনেই সব আশা করলে হয় নাকি!

সকালে ঘুম ভাঙতেই দৃষ্টিভ্রায় উতলা হয়ে উঠল জনি। সত্যি গলা ফিरे পেয়েছে সে? নাকি স্বপ্ন দেখেছে কাল রাতে? আতঙ্কিত হয়ে পড়ল সে। তারপর সব কথা মনে পড়ে গেল, বুঝল স্বপ্ন নয়। কিন্তু একটা দৃষ্টিভ্রা দূর হলো তো আরেকটা আসন গেড়ে বসল মনে। ভাল হয়ে যাওয়া গলা আবার যদি নষ্ট হয়ে যায়? ধীর পায়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। ভয়ে ভয়ে একটু ওন ওন করে পরখ করল গলাটাকে। কিন্তু এইটুকুতে কিছুই বোঝা যায় না। রাতের পাজিমা খোলার ধৈর্য হলো না, তাড়াতাড়ি নেমে এল নিচে। বসবার ঘরে ঢুকেই সোজা এগিয়ে গেল পিয়ানোর দিকে। প্রথমে হালকা একটা সুর বাজাল, একটু পর তার সাথে গান ধরল একটা।

গলাটাকে ইচ্ছে করেই বাড়তে দিল না জনি। দুরু দুরু করে উঠল বুকটা। কিন্তু কই, গলায় তো কোন ব্যথা নেই। বেসুরোও শোনাচ্ছে না আওয়াজটা। গলা ছেড়ে দিল এবার জনি।

পরিপূর্ণ, নিখুঁত সুর বেরিয়ে আসছে, কোথাও কখনও জোর খাটাতে হচ্ছে না। পুলকিত হয়ে উঠল ও, বুঝতে পারছে দুঃখের দিন শেষ হয়েছে তার। যা কোনদিন ফিরে পাবে বলে আশা করেনি তাই ফিরে পেয়েছে। এখন আর কোন কিছুর তোয়াক্কা করে না সে। কেউ যদি তাকে ভাল না বাসে কিছু এসে যাবে না তার। ছবি করতে গিয়ে এখন যদি সে মার খায় তাতেও কিছু এসে যাবে না। টিনা কাল নিরাশ হয়েছে, কিই-বা এসে যায় তাতে? সমস্ত ব্যর্থতা, সমস্ত দুঃখ ভুলে যেতে পারে এখন জনি, কারণ সব চেয়ে বড় আনন্দ ফিরে এসেছে তার জীবনে। আবার গাইতে পারছে সে, সেজন্যে বোধহয় মন খারাপ হয়ে যাবে জিনিয়ার, তাতেও কিছু এসে যায় না জনির।

মুহূর্তের জন্যে একটু খেদ অনুভব করল শুধু তার মেয়েদের কথা ভেবে। আহা, গলাটা যদি মেয়েদের জন্যে গাইতে গিয়ে ফিরে পেত সে, কি ভালই না হত তাহলে!

চাকা লাগানো ট্রে-র মৃদু আওয়াজ শুনে অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে এল জনি ফন্টেন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল একজন নার্স ঢুকছে কামরায়, সাথে করে ওষুধ-পত্র

নিয়ে এসেছে সে।

উঠে দাঁড়ান জনি। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নিনোর দিকে। নিনো কি ঘুমাচ্ছে? নাকি সত্যি বাঁচার কোন আশা নেই ওর, মারা যাচ্ছে? জনি জানে, তার গলা ফিরে আসায় এতটুকু ঈর্ষা হয়নি নিনোর মনে। কিন্তু অন্য একটা ব্যাপারে সাংঘাতিক ঈর্ষা হয়েছে। ও বুঝতে পারছে, নিনোর সেই তীব্র ঈর্ষার কারণ, জনির আনন্দ। গলা ফিরে পেয়েছে বলে এত কেন খুশি হবে জনি? গোটা ব্যাপারটা থেকে ঐক্যপূর্ণে একটা সত্যই প্রকটভাবে প্রকাশ পাচ্ছে—নিনো ভ্যালেন্টিন দুনিয়ার কোন কিছুকেই এতটা ভালবাসে না যে তার জন্যে বেঁচে থাকার তাগিদ অনুভব করবে। তার কাছে কোন আনন্দই আনন্দ নয়, কোন পাওয়াই পাওয়া নয়। জীবনকে নিনো ভ্যালেন্টিনের মত এমন ঘৃণা করতে আর কাউকে দেখেনি জনি ফটেন।

ছয়

বেশ রাত করে লাস ভেগাসে পৌঁছুল মাইকেল কর্নিয়নি। ওর নিষেধ ছিল, তাই অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে এয়ারপোর্টে যায়নি কেউ। সাথে মাত্র দু'জনকে নিয়ে এসেছে মাইকেল। টম হেগেন আর অ্যালবার্ট নেরি। অ্যালবার্ট নেরি ওর নতুন বডিগার্ড।

হোটেলের সবচেয়ে সৌখিন সুইটটা আলাদা করে রাখা হয়েছে ওদের জন্যে। যাদের সাথে দৈখা করতে চেয়েছে মাইকেল তারা সবাই অনেক আগেই এখানে পৌঁছে গেছে।

ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে অভ্যর্থনা করল ফ্রেডি। শরীরে মেদ জমেছে ফ্রেডির, চেহারায়ে আগের চেয়ে অনেক বেশি অমায়িক ভাব। মেজাজটা সদা প্রফুল্ল, পোশাক-আশাক অত্যন্ত মূল্যবান আর সৌখিন। নিখুঁতভাবে কাটা অ্যাশ কালারের রেশমী সুট পরেছে, তার সাথে মিল রেখে টাই, মোজা ইত্যাদি চুল ছেঁটেছে ক্ষুর দিয়ে, তাতে ফিল্ম-স্টারদের মত উদ্ভাসিত হয়ে থাকে চেহারাটা। সমস্তে কামিয়েছে দাড়ি-গোঁফ, ঝক ঝক করছে মুখটা। ওর হাতের নখের যত্ন নেয় বিউটি পারলারের প্রফেশনালরা। চার বছর আগে নিউইয়র্ক থেকে রপ্তানি করা ফ্রেডি, আর এই ফ্রেডির মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে ফ্রেডি, ছোট ভাই মাইকেলের দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে আছে, ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি। 'মুখটাকে সারিয়ে নিয়ে খুব ভাল করেছ। নিশ্চয়ই কে রাজি করিয়েছে তোমাকে? কেমন আছে ও? এদিকে বেড়াতে আসবে না?'

মৃদু হাসল মাইকেল। বলল, 'আরে, তোমাকে তো চেনাই যাচ্ছে না! কে? ও তো এবারই আসতে চেয়েছিল, কিন্তু ওর যে আরেকটা বাচ্চা হবে, তার ওপর বড়টার ঝর্কি পোহাতে হয়। তাছাড়া, আমার এবারের আসাটা বেড়াতে আসা নয়, ফ্রেডি। কাজ সেরে কাল রাতের প্লেনেই ফিরতে হবে আমাকে, খুব বেশি দেরি হয়ে গেলে পরও সকালে।'

‘সে দেখা যাবেখন,’ বলল ফ্রেডি। ‘আগে কিছু মুখে দাও। আমাদের হোটেলে এমন একজন বাবুর্চি আছে যার তুলনা হয় না, একবার খেলে তার হাতের রান্না ভুলতে পারবে না তুমি।’ এখানেই সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে, কিন্তু তার আগে কাপড়-চোপড় ছেড়ে গোসল সারো। ওরা সবাই তৈরি হয়েই আছে, তুমি ডাকলেই দেখা করতে আসবে।’

সহজ, শান্তভাবে বলল মাইকেল, ‘মো গ্রীনকে সবার শেষে ডেকো, কেমন? জনি আর নিনো খাবে আমাদের সাথে। লুসি আর ডাক্তারও। ওদের সাথে খেতে বসেই কথা বলব আমি।’ টম হেগেনের দিকে তাকাল ও। ‘আর কাউকে ডাকতে চাও, টম?’

কথা বলল না টম, এদিক ওদিক মাথা নাড়ল শুধু। যতটুকু প্রাপ্য তার চেয়ে অনেক কম খাতির করেছে তাকে ফ্রেডি। কারণটা অবশ্য বুঝতে পারছে হেগেন। ফ্রেডির বাবা ছেলের ওপর সাম্প্রতিক চটে আছেন, তাঁর রাগ দূর করার জন্যে কনসিলিয়রি হিসেবে হেগেন যদি চেষ্টা না করে বা চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় তাহলে তো তাঁর ওপর ফ্রেডি অসন্তুষ্ট হবেই। গড ফাদারের রাগ দূর করার চেষ্টা খুশি মনেই করত হেগেন, কিন্তু ছেলের ওপর তাঁর রাগের কারণটাই জানা নেই ওর। কারও ওপর অসন্তুষ্ট হলে বা কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তা উচ্চারণ করেন না ডন কর্নিয়নি। তাঁর আচরণেই শুধু অসন্তোষ প্রকাশ পায়।

রাত বারোটায় মাইকেলের সুইটে ডিনার খেতে বসল ওরা। ঘরে ঢুকেই মাইকেলকে জড়িয়ে ধরে ওর গালে চুমো খেল লুসি ম্যানচিনি। কিন্তু অপারেশন করিয়ে মুখটাকে কেমন দেখাচ্ছে সে-বিষয়ে কোন মন্তব্য করল না। ডাক্তার জুলস সীগনের মাঝে কোন ইতস্তত ভাব বা জড়তা দেখা গেল না। সবাইকে এক রকম ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মাইকেলের সামনে এসে দাঁড়াল সে। ওর মুখটা পরীক্ষা করল, টিপেটিপে দেখল মাংসের ভেতর হাড়টা, তারপর বলল, ‘বাহ, চমৎকার! চমৎকার জোড়া লেগেছে। সাইনাস নিয়ে আর কোন অসুবিধে নেই তো?’

‘কোনও অসুবিধে নেই,’ হাসি মুখে বলল মাইকেল। ‘আপনার সহযোগিতার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ, ডাক্তার।’

বিশেষভাবে আয়োজিত এই ডিনারের মধ্যমণি মাইকেল। ওর কথা, তাকানো, হাবভাব—সব কিছুর ভেতর ডন কর্নিয়নির সাদৃশ্য দেখতে পাচ্ছে ওরা। কেন, কিভাবে কে জানে, ওকে দেখে সেই একই ভক্তি, সেই একই ধরনের ভয় ভয় ভাব জাগছে সবার মনে। সন্দেহ নেই, এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। কেননা মাইকেলের আচার-ব্যবহারে এতটুকু অস্বাভাবিকতা নেই। কেউ যাতে কুষ্ঠা বা অপ্রতিভ বোধ না করে সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে ও।

ডন-এর সাথে উপস্থিত থাকার সময় যে নিয়ম পালন করে টম হেগেন, এখনও সেই একই নিয়ম মেনে চলছে সে, মাইকেলকে সামনে রেখে নিজে খানিকটা পিছনে সরে রয়েছে। একজন নতুন লোককে দেখছে সবাই, তার সম্পর্কে ওদের কারও কিছু জানা নেই। খাবার পরিবেশনের আগে সে জানাল, তার খিদে নেই। কথাটা বলে ঘুরে দাঁড়াল সে, এগিয়ে গেল দরজা পর্যন্ত, কিন্তু কামরা থেকে বেরিয়ে গেল

না। দরজার কাছেই একটা আরাম কেদারায় নিঃশব্দে বসল, চোখের সামনে মেনে ধরল একটা স্থানীয় খবরের কাগজ।

কয়েক দফা মদ খাবার পর ডিনারে বসল ওরা, তারপর বিদায় করে দেয়া হলো ওয়েটারদের।

‘শুনলাম,’ জনির দিকে ফিরে বলল মাইকেল, ‘তোমার গলা ঝুঁকি ডাল হয়ে গেছে? আগের চেয়ে ভাল? আরও শুনলাম, তোমার আগের ডক্তরা নাকি দল আরও ভারি করে ফিরে এসেছে তোমার কাছে? খুশির খবর। কংগ্যাচুলেশনস।’

ধন্যবাদ দিল জনি। কৌতূহলে অস্থির হয়ে পড়েছে সে। মনে মনে ভাবছে, ওর সাথে দেখা করতে চাওয়ার কারণ কি মাইকেলের? ওর কাছ থেকে না জানি কি চাইবে ওরা!

সবাই তাকিয়ে আছে মাইকেলের দিকে। সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল, এখনও কেউ তার কথা শোনার জন্যে তৈরি হতে বাকি আছে কিনা, তারপর ধীরে ধীরে শুরু করল মাইকেল, ‘কর্নিয়নি পরিবার এই লাস ভেগাসে উঠে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জলপাই তেলের ব্যবসাতে আমাদের সমস্ত অংশ বিক্রি করে দিয়ে আমরা এখানে এসে নতুন করে ব্যবসা এবং বসবাস শুরু করব। আমরা তিনজন—ডন, আমি আর টম হেগেন—এ বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা করেছি। কর্নিয়নি পরিবারের ভবিষ্যৎ এখানেই নিহিত, এ-ব্যাপারে আমরা তিনজনই একমত। তল্লিতল্লা ওটিয়ে এখনি বা আসছে, বছরই উঠে আসছি আমরা, ব্যাপারটা তা নয়। সব কিছু ওছিয়ে নিয়ে ব্যবস্থা করতে হবে, তার জন্যে সময় দরকার। দুই, তিন, এমন কি চার বছরও লেগে যেতে পারে। তবে, তোমাদেরকে জানানো হলো মোটামুটি এই রকম একটা পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে, এবং ধীরে ধীরে তা বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। আমাদের বন্ধুরা এখানের এই হোটেল আর ক্যাসিনোর কিছু শেয়ারের মালিক, লাস ভেগাসে সেটাই হবে আমাদের ভিত্তি। মো গীনের কাছ থেকে আমাদের বন্ধুরা তার শেয়ারগুলো কিনে নেবে, তার মানে বন্ধুরা দুটোরই একচ্ছত্র মালিক হবে।’

ফ্রেডির গোল চাঁদের মত মুখে দুচ্ছিত্তার ছায়া পড়ল। ‘এর আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এই ব্যবসাটাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে মো গীন, তার শেয়ার সে বিক্রি করে দিতে রাজী হবে কেন?’

‘হবে,’ বিরক্ত বা উত্তেজিত না হয়ে শান্তভাবে বলল মাইকেল। ‘যাতে রাজী হয় সেইরকম প্রস্তাবই দেয়া হবে তাকে।’

কথাগুলো সহজ আর স্বাভাবিকভাবে বলা হলেও, মুহূর্তে বদলে গেল কামরার পরিবেশ, কেমন যেন থমথমে হয়ে উঠেছে সবার চেহারা। তার কারণটা সম্ভবত এই যে, মাইকেল এই মুহূর্তে যা বলল ঠিক সেই কথাগুলোই ওই একই ভঙ্গিতে প্রায়ই বলে থাকেন ডন কর্নিয়নি।

‘এখানে আমাদের পারিবারিক ব্যবসাটাকে চালু করার জন্যে,’ জনি ফটেনের দিকে তাকিয়ে বলল মাইকেল, ‘তোমার কাছ থেকে খানিকটা সাহায্য আশা করছেন ডন। আমাদের জানানো হয়েছে, লোককে জুয়া খেলার দিকে টানতে হলে

লোভনীয় আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করতে হয়। ডন আশা করে আছেন, তুমি আমাদের সাথে পাঁচ বছরের জন্যে একটা চুক্তি সই করবে। সেই চুক্তিতে উল্লেখ থাকবে, বছরে অন্তত পাঁচবার আমাদের মধ্যে দেখা দেবে তুমি, প্রতিবার হয়তো পাঁচ দিনের জন্যে। আমরা আরও আশা করছি, সিনেমা লাইনে তোমার যত বন্ধু আছে তাদেরকেও তুমি ওই ধরনের চুক্তি সই করায় রাজী করাতে পারবে। এতদিন তো তারা তোমার কাছ থেকে শুধু উপকারই পেয়ে এসেছে, এবার তোমার জন্যেও কিছু করুক ওরা।’

‘একশোবার, মাইক,’ বলল জনি। ‘আমার গড ফাদারের যে কোন নির্দেশ মাথা পেতে নেব আমি।’ বলল বটে, কিন্তু কষ্টস্বরে ক্ষীণ একটু অনিশ্চয়তার আভাস পাওয়া গেল।

মুদু একটু হাসল মাইকেল। ‘চুক্তির ফলে তোমার বা তোমার বন্ধুদের ঠকতে হবে না,’ বলল ও। ‘তোমরা সবাই শেয়ার পাবে হোটেলের। শুধু তাই নয়, তোমার খাতিরের লোক আরও কেউ যদি থাকে, যাদেরকে দিয়ে কাজ হবে বলে মনে করো, তাদেরকেও শেয়ার দেয়া হবে। তুমি হয়তো আমার ওপর ঠিক বিশ্বাস রাখতে পারছ না, তাই তোমাকে জানাচ্ছি, কথাটা আমার নয়—ডন নিজে এ-কথা বলেছেন।’

লাল হয়ে উঠল জনির মুখ। দ্রুত বলল সে, ‘তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না, ব্যাপারটা তা নয়, মাইক। কিন্তু একটা খবর তুমি বোধ হয় জানো না, এদিকে আরও গোটা দশেক হোটেল আর ক্যাসিনো তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেছে। কর্লিয়নি পরিবার যখন আসবে, তখন হয়তো দেখা যাবে বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে, তার আগেই বাজার দখল করে নিয়েছে অন্যেরা। আমি যতদূর জানি, কর্লিয়নি পরিবার একচেটিয়া ব্যবসাতে বিশ্বাস করে। কিন্তু তোমরা যদি দেরি করে আসো, সেটি হবার জো নেই।’

মাইকেল নয় জনির কথার উত্তর দেবার জন্যে এবার মুখ খুলল টম হেগেন, ‘নতুন যে হোটেলগুলো তৈরি হচ্ছে তার বেশির ভাগই কর্লিয়নি পরিবারের বন্ধুদের টাকায় তৈরি হচ্ছে।’ তার মানে, সাথে সাথে বুকে নিল জনি, ওগুলোর মালিকও কর্লিয়নি পরিবার। বোঝা যাচ্ছে যত পার্সেন্টাই শেয়ার দেয়া হোক সবাই খুব ভাল টাকা পাবে।

‘ঠিক আছে,’ বলল জনি। ‘এখন থেকেই শুরু করে দিচ্ছি আমি।’

লুসি আর ডাক্তার জুলস সীগল পাশাপাশি বসে আছে, এবার তাদের দিক্রে মনোযোগ দিল মাইকেল। জুলসকে বলল, ‘ডাক্তার, আপনি ঋণী করে রেখেছেন আমাকে, সে ঋণ আমি শোধ দিতে চাই। জানতে পেরেছি, আপনি নাকি আবার মানুষ কাটাকাটি করতে চান, অথচ হাসপাতালগুলো আপনাকে কোন সুযোগ দেবে না বলে ঠিক করে রেখেছে। কারণটা সম্ভবত সেই অ্যাবরশন সংক্রান্ত গোলমাল। সে যাক! এখন আপনার মুখ থেকে আমার জানা দরকার, সত্যিই কি তাই চান আপনি?’

মুদু হাসল জুলস। বলল, ‘চাই তো বটেই। কিন্তু ডাক্তারি দুনিয়ার পরিবেশটা কি রকম তা আপনার জানা নেই। যার যত ক্ষমতাই থাকুক না কেন, ওরা সেটা গ্রাহ্য করে না। এ ব্যাপারে আপনি আমার জন্যে কিছু করতে পারবেন বলে আমি

মনে করি না।’

অন্যমনস্কভাবে মাথা দোলাল মাইকেল। তারপর বলল, ‘হয়তো আপনার কথাই ঠিক। আমার প্রসঙ্গটা একটু অন্যরকম। যথেষ্ট নামডাক আছে এমন কিছু লোক লাস ভেগাসে খুব বড় একটা হাসপাতাল তৈরি করতে যাচ্ছে, তারা আমাদের বন্ধু। এখনই তো অনেক বড় হয়ে গেছে শহরটা, তার ওপর এটাকে বাড়াবার যে পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে, তাতে এখানে একটা আধুনিক হাসপাতালের দরকার হবেই, তাই না? ওদেরকে আমরা যদি অনুরোধ করি, ওরা হয়তো আপনাকে ওদের অপারেশনরুমে কাজ করার অনুমতি দেবে। ওদের জন্যে তো সৈটা হবে সোনায়ে সোহাগা। এই মরুভূমির মাঝখানে আপনার মত দক্ষ সার্জন ওরা পাবে কোথায়? আপনার মত বা আপনার তুলনায় অর্ধেক ভাল? আপনাকে কাজ করতে দৈবার অনুরোধ করা মানে ওদের একটা মস্ত উপকার করে দিতে চাওয়া। তাই বলছি, ওসব ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হবে না। ভাল কথা, শুনলাম আপনি নাকি বিয়ে করছেন লুসিকে?’

‘আগে বউ পোষার সামর্থ্য হোক তো।’

ছটফট করে উঠে বলল লুসি, ‘মাইকেল, লক্ষ্মী ভাই আমার, তুমি যদি হাসপাতালটা তৈরি না করো, চিরকাল আইবুড়ো থাকতে হবে আমাকে।’

লুসির কথায় হাসতে শুরু করল সবাই, কিন্তু জুলস হাসছে না। ‘বেশ। কিন্তু এই চাকরির সাথে কোন শর্ত থাকবে না তো?’

অদ্ভুত ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে জুলসের দিকে তাকাল মাইকেল। অস্বাভাবিক শান্ত গলায় বলল, ‘না, কোনও শর্ত থাকবে না। আপনার কাছে ঋণী আমি, সৈটা শোধ করার প্রস্তাব দিচ্ছি শুধু, তার বেশি কিছু নয়।’

মৃদু গলায় বলল লুসি, ‘তুমি কিছু মনে কোরো না, মাইক।’

লুসির দিকে তাকাল মাইকেল, হাসল। ‘না, মনে করার কি আছে?’ জুলসের দিকে তাকাল ও, বলল, ‘আপনি কিন্তু বোকার মত কথা বললেন। কর্লিয়নি পরিবার আপনাকে কিছুটা সাহায্য করার সুযোগ পেয়েছিল, তা করতে পেরে খুশিই হয়েছিলাম, কারও উপকার করার সুযোগ পেলে কর্লিয়নি পরিবার গর্ববোধ করে। আমাকে কি আপনি এতই বোকা মনে করলেন যে তারপর আপনাকে এমন কাজ করতে বলব যা করতে ধ্বংস লাগবে আপনার? আর যদি বলিই তাতেই না আপনার মনে করার কি আছে? আপনি যখন বিপদে পড়লেন, আমরা ছাড়া আর কে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে গিয়েছিল, বলুন? আপনার হয়ে একটা শব্দ উচ্চারণ করেছিল কেউ? তুলেছিল কেউ একটা আঙুল? যখন শুনলাম আবার আপনি অপারেশন থিয়েটারে কাজ করতে চান, আপনার জন্যে কি ব্যবস্থা করা যায় তাই নিয়ে প্রচুর মাথা ঘামালাম আমি। আপনি কর্ত্তনাও করতে পারবেন না, এর পিছনে কতটা সময় ব্যয় করতে হয়েছে আমাকে। যাই হোক, দশম পর্যন্ত বুঝলাম, আপনাকে সাহায্য করা সম্ভব। কিন্তু তার বিনিময়ে আপনার কাছ থেকে কিছু চাইতে হবে, তা আমি ভাবিনি পর্যন্ত। তবে আপনি আমাদের বন্ধু থাকবেন, এটুকু আশা করেছি। আপনার আচরণে বন্ধুত্ব প্রকাশ পেলে আমিও তাহলে বুঝব, আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের জন্যে

আপনি যা করে থাকেন, আমার জন্যেও তাই করবেন। শর্ত যদি কিছু থাকে, ওইটুকুই। আপনার আপত্তি থাকলে আপনি তা অস্বীকারও করতে পারেন।’

মাথা নিচু করে চুপিসাড়ে একটু হাসল টম হেগেন। স্বয়ং ডনও এমন চমৎকারভাবে বলতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

লাল হয়ে উঠল জুলস সীগলের মুখ। ‘দেখুন, আমি ঠিক তা বোঝাতে চাইনি। আপনার বাবা এবং আপনার কাছে ঋণী আমি, সে ঋণ অস্বীকার করব, এ হতে পারে না। যাই হোক, আমার প্রশ্নটা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি। কি বলেছি, ভুলে যান।’

মাথা ঝাঁকিয়ে বলল মাইকেল, ‘ফাইন। হাসপাতানটা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত আজ থেকে আপনি এই হোটেল, ক্যাসিনো আর যে হোটেলগুলো তৈরি হয়ে এসেছে তার সবগুলোর মেডিক্যাল ডিরেক্টর হিসেবে কাজ শুরু করে দিন। লোকজন যা লাগে, বহাল করুন। কেনাকাটার একটা ফর্দ তৈরি করে ফেলুন। আর হ্যাঁ, এখন থেকে আপনি এতগুলো প্রতিষ্ঠানের মেডিক্যাল ডিরেক্টর হিসেবে বেতন পাবেন। বেতন, আনুষঙ্গিক সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে পরে আপনি এক সময় টমের সাথে আলোচনা করে সব ঠিকঠাক করে নেবেন।’ এবার লুসির দিকে তাকাল মাইকেল। ‘তোমার জন্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা ভেবে রেখেছি আমি। হোটেলগুলোর গ্রাউণ্ড ফ্লোরে অনেক দোকান হবে, সেগুলো যাতে একটা নিয়মের মধ্যে বিলি করা হয় এবং ভাড়া আদায় থেকে শুরু করে সমস্ত রক্ষা পর্যন্ত সমস্ত কাজ যাতে সুষ্ঠু ভাবে সারা যায় সেদিকে নজর রাখতে হবে তোমাকে। মোট কথা, তুমিই হবে ওদিকটার সর্বেসর্বা। টাকা পয়সা তুমিই সব আদায় করবে। তার ওপর আরও কাজ আছে তোমার। ধরো, ক্যাসিনোর বিভিন্ন কাজে প্রচুর মেয়ে দরকার হবে, তাদের নিয়োগ করার দায়িত্ব নিতে হবে তোমাকে। ব্যাপারটা কি দাঁড়াল তাহলে?’ হাসল মাইকেল। ‘ডাক্তার জুলস সীগল তোমাকে যদি বিয়ে নাও করে, তুমি অন্তত একজন ধনী আইবুড়ো হতে পারবে।’

পরিবেশটা হালকা হয়ে গেছে, আবার হাসছে সবাই। কিন্তু ফ্রেডি হাসছে না।

মুখটা থমথম করছে ওর, ঘন ঘন চুরুট ফুকছে সে। তার দিকে আরেকবার তাকাল মাইকেল, মৃদু গলায় বলল, ‘দেখো, ফ্রেডি, আমার ওপর রাগ করা উচিত নয় তোমার। আমি ডনের স্নেহ একজন মেসেঞ্জার, তার বেশি কিছু না। তোমাকে কি করতে হবে না হবে তা তুমি নিশ্চয়ই জানতে পারবে ডনের কাছ থেকে। আমার ধারণা, তোমার পছন্দ হবে না এমন কাজ তোমাকে করতে বলবেন না তিনি। বিশেষ করে সবাই যখন বলছে তুমি এখানে দারুণ কাজ দেখাচ্ছ।’

খানিকটা আশ্বস্ত বোধ করলেও, মনটা খঁত খঁত করছে ফ্রেডির। ‘তাই যদি হয়, ডন আমার ওপর চটে আছেন কেন? ক্যাসিনোটা লোকসান দিচ্ছে বলে কি? কিন্তু ক্যাসিনোর ওদিকটা আমার দেখবার কথা নয়, ওটা মো গীনের দায়িত্ব। আমার কাজ তো আমি ঠিকমতই করে যাচ্ছি, ওই বুড়ো ভদ্রলোককে খুশি করার জন্যে আর কি করতে পারি আমি?’

‘ওসব ভেবে মন খারাপ কোরো না,’ বলল মাইকেল। ভাইয়ের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল ও, তাকাল জনির দিকে। জানতে চাইল, ‘কত আশা করলাম, দেখা

হবে নিনোর সাথে। কোথায় সেন্স?

শ্রাগ করল জনি। 'দেখা করার অবস্থা তার থাকলে তো! সাম্প্রতিক অসুস্থ ও, নার্সের হাতে ছেড়ে দিয়ে এসেছি। এদিকে আমাদের ডাক্তার কি বলেছেন জানো? ওকে নাকি পাগল সাব্যস্ত করে কোথাও আটকে রেখে তারপর ওর চিকিৎসা করতে হবে, তা না হলে ওর সুস্থ হবার কোন আশা নেই। ও নাকি একরকম আত্মহত্যার চেষ্টা করছে। আমাদের নিনো!'

অবাক হয়ে গেল মাইকেল। চিন্তিতভাবে কয়েক মুহূর্ত জনির দিকে তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'নিনো নিজেকে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে? এ আবার কি ধরনের কথা! কারও মনে আঘাত দিয়েছে বা কোন নীচ কাজ করেছে বলে তো শুনি নি কখনও। সবকিছু হেসে উড়িয়ে দেয়াই ওর স্বভাব, কিছুতেই যেন কিছু এসে যায় না তার। একটু যা দুর্বলতা আছে বলে জানতাম ওই মদের ওপর।'

'ওই মদই তো কাল হয়েছে ওর,' বলল জনি। 'মিছিলের মত টাকা আসছে ওর পকেটে। শুধু ছবিতে গান গেয়েই লক্ষ লক্ষ ডলার কামাতে পারে ও। একটা ছবিতে অভিনয়ের জন্যে এখন পঞ্চাশ হাজার ডলার করে পাচ্ছে। একটা কানাকড়িও থাকে না, সব উড়িয়ে দেয়। সেই ছোটবেলার বন্ধু ও আমার, একটা খারাপ কাজ করতে দেখিনি কখনও। জানি না কি ভূতে ধরেছে হারামজাদাকে, মদ খেয়ে মরার পণ করেছে শালা।'

কি যেন বলাতে যাচ্ছিল জুলস, এই সময় নক হলো দরজায়। দরজার সবচেয়ে কাছে বসে খবরের কাগজ পড়ছে অপরিচিত লোকটা, সবাই আশা করল সেই দরজা খুলে দেবে, কিন্তু এক চুল নড়তে পর্যন্ত দেখা গেল না তাকে। যেমন কাগজ পড়ছিল তেমনি পড়তে লাগল। ব্যাপারটা লক্ষ করে অবাক হলো জুলস। দরজা খুলে দিল টম হেগেন।

হেগেনকে একরকম ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল মো গীন। লম্বা লম্বা পা ফেলে কামরার ভেতর ঢুকল সে। পিছনে দু'জন বডিগার্ড।

গুণ্ডা হিসেবে তো বটেই, সুদর্শন সুপুরুষ হিসেবেও নামডাক আছে মো গ্রীনের। ছয় ফিটের ওপর লম্বা, হাড়গুলো চওড়া, প্রচণ্ড শক্তি রাখে শরীরে। ব্রুকলিনে একটা সংঘবদ্ধ অপরাধী দল ছিল, তাদের ভাড়াটে খুনি হিসেবে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল সে। তারপর বেশি রোজগারের আশায় জুয়ার ব্যবসা শুরু করেছিল। ভালই আয় করছিল জুয়ার আশ্রয় বসিয়ে, কিন্তু আরও টাকার লোভে আমেরিকার পশ্চিমে চলে আসে সে। সে-ই সবার আগে টের পেয়েছিল অপরাধীদের জন্যে লাস ভেগাস সাম্প্রতিক সম্ভাবনাময় একটা জায়গা। প্রথম দিকে হাতে গোণা যে ক'টা হোটেল ক্যাসিনো হয়েছে এদিকে তার একটা ওর নিজেরই তৈরি। ওর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দিক হলো, হঠাৎ করে প্রচণ্ড রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। মাথায় রক্ত চড়ে গেলে কাউকে গ্রাহ্য করে না সে। সেজন্যেই হোটেলের সবাই যমের মত ভয় করে তাকে। তাদের মধ্যে ফ্রেডি, লুসি, জুলস সীগলও বাদ যায় না। এরা সবাই যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে রগচটা মো গীনকে।

ঠিক এই মুহূর্তে প্রচণ্ড রেগে আছে মো গীন, কিন্তু অন্যান্য সময় নিজেকে সে

সামনে রাখার কোন চেষ্টা করে না, এখন করছে। সুদর্শন চেহারাটা কেমন যেন কদর্য বীভৎস হয়ে উঠেছে। সোজা এগিয়ে এসে মাইকেল কর্নিয়নির সামনে দাঁড়াল সে, হাত রাখল দু'কোমরে। 'কখন তোমার সময় হবে আমার সাথে কথা বলার, সেজন্যে অপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হলো না, মাইকেল,' ভরাট, কর্তৃত্বের সুরে বলল মো গ্রীন। 'কাল জরুরী কিছু কাজ আছে আমার, তাই ভাবলাম, এখনই ধরব তোমাকে। কিছু বলার আছে তোমার?'

নিঃশব্দে মো গ্রীনের দিকে তাকিয়ে আছে মাইকেল। ওর চেহারায় বিস্ময় এবং বন্ধুভাব, দুটোরই ছায়া ফুটে উঠেছে। মৃদু হাসল ও। 'খুব ভাল করেছ তুমি, গ্রীন,' টম হেগেনের দিকে তাকাল মাইকেল। 'গলা, ভেজাবার জন্যে ওকে কিছু এনে দাও, টম।'

মাইকেল হুকুম করছে টম হেগেনকে, ব্যাপারটা দৃষ্টি এড়াল না মো গ্রীনের।

খবরের কাগজের ওপর দিয়ে মো গ্রীনের দিকে তাকিয়ে আছে অ্যালবার্ট নেরি, দু'চোখে স্থাপদের মত ঠাণ্ডা দৃষ্টি। ওর কাছেই দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মো গ্রীনের বডিগার্ডরা, তাদের দিকে ভুলেও একবার তাকাচ্ছে না নেরি। জানে, হিংসাত্মক ঘটনা ঘটার কোন সম্ভাবনা নেই, অন্তত নাস ভেগাসে নেই। এ-ব্যাপারে কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা আছে। কেউ যদি সেই নিষেধ অমান্য করে কোন গোলমাল করে, তার বিচার হবে না, কিন্তু শাস্তি হবে। এত কড়াকড়ির কারণ হলো, ভেগাসে কোন গোলযোগ হলে পুলিশের বদনাম হবে, আর পুলিশের বদনাম হলে তারা অপরাধী এবং বেআইনী ব্যবসায়ীদেরকে আইনের প্রশ্রয় দিতে পারবে না। নাস ভেগাসকে জুয়াড়ীদের তীর্থস্থান করার সমস্ত স্বপ্ন বানচাল হয়ে যাবে।

ঘাড় ফিরিয়ে নিজের বডিগার্ডদের দিকে তাকাল মো গ্রীন। হাত নেড়ে পাইকারীভাবে কয়েকজনকে দেখিয়ে বলল, 'এদের সবার জন্য কিছু চিপের ব্যবস্থা করো, এরা সবাই হোটেলের খরচায় জুয়া খেলবে এখন।' সবাই বুঝল জুলস, লুগি, জনি ফন্টেন আর মাইকেলের বডিগার্ড অ্যালবার্ট নেরিকে কামরা থেকে বেরিয়ে যেতে বলছে সে।

ব্যাপারটা হাসিমুখেই মেনে নিল মাইকেল। 'চমৎকার!' সায় দিয়ে বলল ও।

মাইকেল কি বলে শোনার জন্যে অপেক্ষা করছিল অ্যালবার্ট নেরি, এবার সে উঠে দাঁড়িয়ে সদাঁর পিছু পিছু বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

কামরায় রইল ফ্রেডি, টম হেগেন, মো গ্রীন আর মাইকেল।

মদের গ্লাসটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল মো গ্রীন। অনেক কষ্টে রাগ চেপে রেখেছে সে, কিন্তু মুখটা তার টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। ভরাট গলায় জানতে চাইল, 'এসব কি শুনিছ আমি, মাইকেল? এত বড় স্পর্ধা হতে পারে কারও, এ তো আমি ভাবতেই পারি না। তোমরা নাকি আমার হোটেলের শেয়ারগুলো সব কিনে নিতে চাও? শোনো তাহলে,' নিঃশব্দে হাসছে মো, 'তোমার বাপকে গিয়ে প্রস্তাব দাও, আমিই তোমাদের সব শেয়ার কিনে নিতে চেয়েছি। যত্নোসব! আমার শেয়ার কেনার স্বপ্ন দেখছে, হুঁহু!'

এতটুকু উত্তেজিত হলো না মাইকেল, শান্তভাবে যুক্তি দেখাবার সুরে কথা

বলছে সে, 'কেন তুমি শেয়ারগুলো বেচতে চাও না, সেটা আমাকে বুঝতে দাও, মো। যে-ই খেলতে আসে ক্যাসিনোতে, সেই প্রচুর টাকা জিতে নিয়ে যাচ্ছে, অন্তত সেই রকম হিসেবই দিয়েছ তুমি আমাদের। প্রতিটি বাজিতেই লোকসান দিচ্ছে ক্যাসিনো। গলদটা কোথায়, ঠিক জানি না আমরা, কিন্তু গলদ যে একটা আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, তাই না? যে ব্যবসায় প্রাতি সেকেন্ডে লোকসান দিচ্ছে, সেটাকে আঁকড়ে ধরে রাখার পেছনে তোমার উদ্দেশ্য কি? তারচেয়ে পুরোটা ছেড়ে দাও আমাদের হাতে, আমরা চেষ্টা করে দেখি গলদটা দূর করতে পারি কিনা।'

চাপা, কর্কশ শব্দে হেসে উঠল মো গীন। 'যত শালার ভুঁইফোড় আমার কপালে এসে জুটেছে! তোমাদের অবস্থা যখন খারাপ, দম বেরিয়ে যায় যায়, তখন উপকার করার জন্যে ফ্রেডিকে নিলাম আমি, আর তার বিনিময়ে তোমরা এখন আমারই পাছায় লাথি মেরে ভাঙতে চাইছ। নিজেদেরকে কি মনে করেছ তোমরা? শোনো, আমাকে যা তা ধরে নিয়ে কিছু করতে যেয়ো না, তাতে পরে তোমাদের পস্তাতে হবে। আমি আমার শেয়ার বিক্রি করছি না, কেউ আমাকে এখান থেকে তাড়াতেও পারছে না। কর্লিয়নিদের সাথে টক্কর দিতে পারে এমন কিছু বন্ধু-বান্ধব আমারও আছে। তারা আমাকে সমর্থন করবে।'

এখনও উত্তেজিত হচ্ছে না মাইকেল। গলায় আওয়াজ চড়ল না ওর, চেহারা য় রাগের কোন ছাপ ফুটল না, শান্তভাবে বলল, 'ফ্রেডিকে তুমি আমাদের উপকার করার জন্যে নাওনি, কর্লিয়নি পরিবার তোমাকে মোটা টাকা দিয়েছিল বলে নিয়েছিল। তুমি তখন তোমার হোটেলের জন্যে ফার্নিচার কিনতে পারছিলে না, ভুলে গেলে এরই মধ্যে? ক্যাসিনো চালু করার জন্যে মোটা টাকার দরকার ছিল অথচ একটা পয়সা ছিল না তোমার কাছে। এসব ভুলে যাচ্ছ কেন, সেটা কি তোমার উচিত হচ্ছে? আরও ব্যাপার আছে। ফ্রেডির জামিন হয়েছিল মলিনারি পরিবার, তাই তুমি ওকে নিতে রাজী হওয়ায় তারা তোমাকে কতরকম সুবিধে করে দিয়েছে তার হিসেব করে দেখেছ কখনও? কর্লিয়নি পরিবার তোমার কাছে সামান্য একটু ঋণী যদি হয়েও থাকে অনেকদিন আগেই তা শোধ করে দিয়েছে। যাই হোক, তোমার এত রাগ করার কি আছে তা কিন্তু বুঝতে পারছি না আমি। তুমি কি ভাবছ আমরা তোমাকে ঠকাবার মতলব করেছি? সে রকম কোন ইচ্ছে আমাদের নেই, মো। ন্যাথ্য একটা দাম বলো তুমি, আমরা ঠিক সেই দামেই কিনে নেব তোমার শেয়ারগুলো। এতে অন্যায়টা কোথায়? তোমার ক্যাসিনো যদি লাভের ব্যাপার হত তাহলে প্রস্তাবটাই তুলতাম না আমরা, কেননা কারও রুজির ওপর হাত দেয়া আমাদের নীতি নয়। কিন্তু ক্যাসিনো তো প্রতি মুহূর্তে লোকসান দিচ্ছে। এটাকে বিক্রি করে দেয়াই তো তোমার জন্যে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। একটু চিন্তা করে দেখলেই বুঝবে, আমরা আসলে তোমার উপকার করতে চাইছি।'

দ্রুত মাথা নাড়ল মো গীন। তাচ্ছিল্যের সাথে বলল, 'কর্লিয়নি পরিবারের এখন ডুবন্ত অবস্থা, সে গায়ের জোর এখন আর নেই তোমাদের। যা খুশি তাই করে বেড়ানো এখন আর তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। গড ফাদার সুস্থ হলে আলাদা কথা ছিল। অন্যান্য পরিবারগুলো তোমাদেরকে নিউ ইয়র্ক থেকে ভাগিয়ে দিচ্ছে।

সেজনেই তোমরা মতলব ফেঁদেছ এখানে পালিয়ে এসে সবার মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাবে। কিন্তু সে ওড়ে বালি, সুবিধে করতে পারবে না তোমরা। বরং আমার পরামর্শটা গ্রহণ করো, মাইকেল, অন্য কোথাও আশ্রয় খোঁজো, এখানে তোমাদের জায়গা নেই। যদি ভাল চাও তো মন থেকে আমার শেয়ার কেনার কথা মুছে ফেল।’

মৃদু গলায় বলল মাইকেল, ‘তবে কি এই সব কথা ভেবেই তুমি সাহস পেয়েছ ফ্রেডিকে সবার সামনে অপমান করার?’

চমকে উঠল টম হেগেন। ঝট করে তাকাল সে ফ্রেডির দিকে।

লাল হয়ে উঠেছে ফ্রেডির মুখ। তাড়াতাড়ি বলল সে, ‘আহা, মাইক, ওসব ব্যাপার টেনে আনার দরকারটা কি! ওটা কোন ব্যাপারই নয়। যা ঘটে গেছে, ঘটে গেছে—আমি বা মো কেউ কিছু মনে করিনি। ইঠাৎ একজন মানুষের রাগ তো হতেই পারে, মো-রও তাই হয়েছিল। এমনিতে ওর সাথে আমার খুব ভাল সম্পর্ক, আমাদের মধ্যে কোন ব্যাপারে ঝগড়া নেই। কি বলো, মো?’

চেহারায়ে অদ্ভুত একটা আক্রোশ ফুটে উঠেছে মো গ্রীনের ফ্রেডির দিকে তাকাল সে, বলল, ‘ঠিক।’ পরমুহূর্তে মাইকেলের দিকে ফিরল। ‘ভাল করে একটা ব্যবসা চালাতে হলে লোকজনদের পাছায় লাগি না মারলে চলে না। ফ্রেডির ওপর খেপে গিয়েছিলাম আমি, কারণ হোটেলের সব মেয়ের সাথে প্রেম করতে শুরু করে দিয়েছিল ও, ককটেল-ওয়েট্রেসদেরও বাদ দিচ্ছিল না। ফলে ওরা যে কাজে গাফিলতি করবে সে তো জানা কথা। সাবধান করতে গেলাম, উল্টে আমার সাথে তর্ক জুড়ে দিল। তাই বাধ্য হয়ে ওর গালে চড় মেরেছি আমি। উচিত শিক্ষা দেবার জন্যে দরকার ছিল ওটার।’

ভাবের কোন চিহ্নমাত্র নেই মাইকেলের চেহারায়ে। বড় ভাইয়ের দিকে তাকাল ও, জানতে চাইল, ‘উচিত শিক্ষা হয়েছে তোমার, ফ্রেডি?’

মুখ হাঁড়ি করে ছোট ভাইয়ের দিকে তাকাল ফ্রেডি, কিন্তু জবাব দিল না।

নিঃশব্দে হাসছে মো গ্রীন। ‘ও শালার কাণ্ড শুনুলে মাথা ঘুরে যাবে তোমার, মাইকেল। গুয়োরটা একসাথে দুটো মেয়েকে নিয়ে শুতো, পুরানো সেই স্যাণ্ডউইচের নিয়মে।’ ফ্রেডির দিকে তাকাল সে। ‘তবে, হ্যাঁ, একশো বার স্বীকার করব আমি, মেয়েগুলোকে সত্যি তুমি একেবারে মজিয়ে ফেলেছিলে, যাকে বলে পুরোপুরি ক্রীতদাস বানিয়ে ফেলা। আমার বিশ্বাস, তুমি ছেড়ে দিলে আর কারও পক্ষে ওদেরকে সুখী করা সম্ভব নয়।’

আশ্চর্য হয়ে হেগেনের দিকে তাকাল মাইকেল। দু’জনেই বুঝল ফ্রেডির ওপর এটাই ডনের রাগের কারণ। যৌন ব্যাপারে রীতিমত গোড়া তিনি, দু’জন মেয়েকে বিছানায় নিয়ে শোয়াটাকে চরম দুর্নীতি ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেন না। ফ্রেডির ওপর অসন্তুষ্ট হবার আরও বড় কারণ এখন জানতে পারল হেগেন। মো গ্রীনের মত একজন লোকের হাতে ব্যক্তিগত অপমান সহ্য করলে কর্লিয়নি পরিবারের অসম্মান হয়।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মাইকেল। তার কথায় বিদায়ের সুর বেজে উঠল,

‘কালই নিউ ইয়র্কে ফিরে যাচ্ছি আমি, তার মানে রাতেই ভেবে ঠিক করে রেখো কত দাম চাইবে তুমি শেয়ারগুলোর। কাল সকালে জানতে হবে আমাকে।’

‘শুয়োরের বাচ্চা! ভেবেছিস এভাবে আমাকে খসাতে পারবি?’ হিংস্র ভঙ্গিতে বলল মো গ্রীন। ‘ওগামি ছেড়ে দেবার আগে তোর চেয়ে ঢের বেশি মানুষ খুন করেছি আমি। নিউ ইয়র্কে যাব আমি। স্বয়ং ডনের সাথে কথা বলব। আমার একটা প্রস্তাব আছে তার কাছে।’

ভয় পেয়ে গেল ফ্রেডি, অসহায়ভাবে হেগেনের দিকে তাকাল সে। ‘তুমি তো কনসিলিয়রি, টম, ডনের সাথে কথা বলে তাকে তুমি পরামর্শ দিতে পারো।’

ঠিক এই সময় মাইকেলের হিম-শীতল ব্যক্তিত্বের ক্ষুরধার স্পর্শ অনুভব করল ভেগাসের লোক দু’জন। নিচু গলায়, কিন্তু তীক্ষ্ণস্বরে বলল মাইকেল, ‘ডন কর্নিয়নি আধা-অবসর নিয়েছেন। পারিবারিক ব্যবসা এখন আমার হাতে। টম হেগেনকে আমি কনসিলিয়রির পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছি। এখন থেকে আমার উকিল ও। কিছুদিনের মধ্যেই সপরিবারে চলে আসছে এখানে, আইনগত সমস্ত ঝামেলা ও-ই সামলাবে। সুতরাং কারও যদি কিছু বলার থাকে, আমাকেই বলতে হবে। এখন আমিই সব।’

কামরার ভেতর জমাট নিস্তব্ধতা। কেউ কথা বলছে না।

মৃদু গলায় আবার বলল মাইকেল, ‘ফ্রেডি, তুমি আমার বড়, তাই তোমার ওপর আমার শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু আজ এই প্রথম আর শেষবারের মত তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি আমি, আর কখনও বাইরের কারও সাথে একজোট হয়ে পরিবারের বিরুদ্ধে কথা বলতে যেয়ো না। আজ যা করেছ তুমি তা আমি ডনের কাছে উল্লেখ পর্যন্ত করব না।’ মো গ্রীনের দিকে ফিরল মাইকেল। ‘কেউ যদি তোমাকে সাহায্য করতে চায়, তাকে কখনও অপমান করতে নেই। শুনেছিলাম তোমার রাগ একটু বেশি। কিন্তু যুক্তির বিরুদ্ধেও তুমি রাগ দেখাতে কুণ্ঠিত হও না, তা আমার জানা ছিল না। এই রাগ পুষে না রেখে যদি ক্যাসিনো কেন লোকসানে চলছে সেদিকে একটু নজর দিতে, নিজেরই সেবা করা হত সেটা। কর্নিয়নি পরিবার বিস্তর টাকা ঢেলেছে ওতে, কথাটা তুমি ভুলে যেতে চাইলেও আমরা তোমাকে ভুলতে দেব না। এত সব কথা আমাকে তুমি বলতে বাধ্য করলে, কিন্তু তোমাকে গালমন্দ করার জন্যে এখানে আমি আসিনি। তোমাকে সাহায্য করার জন্যে আমার হাত এখনও বাড়িয়ে রেখেছি—তুমি যদি সেই হাতে খুতু ফেল, সেটা তোমার ব্যাপার, তুমি বুঝবে। বলার আর কিছু নেই আমার।’

একবারও গলা চড়ায়নি মাইকেল, কিন্তু কথাগুলো শুনে ফ্রেডি আর মো গ্রীন একেবারে চুপসে গেল। পালা করে ওদের দু’জনের দিকে তাকাল মাইকেল, তারপর সরে গেল টেবিলের কাছ থেকে। তার মানে বিদায় হতে বলছে ওদেরকে।

উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল টম হেগেন। আনুষ্ঠানিক বিদায় অর্থাৎ ওড নাইট না বলেই কামরা থেকে বেরিয়ে গেল মো গ্রীন আর ফ্রেডি।

পরদিন সকালেই মো গ্রীন খবর পাঠাল মাইকেলের কাছে। না, যত দামই দেয়া হোক না কেন, সে তার শেয়ার বিক্রি করবে না। খবরটা দিয়ে গেল ফ্রেডি। শাগ

করল মাইকেল। বলল, 'নিউ ইয়র্কে ফিরে যাচ্ছি আমি, তবে তার আগে নিনোকে দেখতে চাই একবার।'

নিনোর সুইটে পৌঁছে ওরা দেখল সোফায় শুয়ে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে জনি ফন্টেন। বেডরুমের পর্দা ফেলা রয়েছে, সেখানে ডাক্তার জুলস সীগল পরীক্ষা করছে নিনোকে। খানিক পরই তুলে দেয়া হলো পর্দা।

নিনো ভ্যালেন্টির চেহারা দেখে হতবাক হয়ে গেল মাইকেল। চোখের সামনে এই মুহূর্তেও যেন ভেঙে পড়ছে লোকটা। ঢিল পড়েছে পেশীতে, প্রায় বুড়োই দেখাচ্ছে তাকে। ধীরে ধীরে তার বিছানার পাশে বসল মাইকেল। বলল, 'নিনো, কেমন আছ তুমি? শেষ পর্যন্ত তোমার দেখা মিলল, সেজন্যে ভীষণ খুশি হয়েছি আমি। ডন তোমার কথা সব সময় জানতে চান।'

নিঃশব্দে হাসল নিনো, সেই দাঁত বের করা পুরানো হাসি। 'গড ফাদারকে বোলো, আমি মারা যাচ্ছি। তাঁকে জানিয়ো এই নাচ-গানের ব্যবসাটা তাঁর জলপাই তেল ব্যবসার চেয়েও অনেক বেশি বিপজ্জনক।'

'তুমি সেরে উঠবে, নিনো,' বলল মাইকেল। 'কোন ব্যাপারে তোমার কি কোন দৃষ্টিভঙ্গি আছে? বা তোমার জন্যে কি কিছু করার আছে কর্লিয়নি পরিবারের? আমাকে বলতে পারো। তেমন কিছু আছে, ভাই?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল নিনো ভ্যালেন্টি। 'নেই, কিছুই নেই।'

কয়েক মিনিট গল্প করে বিদায় নিল মাইকেল।

এয়ারপোর্টে ওদের সাথে এল ফ্রেডি। তবে মাইকেলের অনুরোধে প্লেন ছাড়ার আগেই এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে গেল সে। টম হেগেন, মাইকেল আর অ্যালবার্ট নেরি প্লেনে চড়ল।

'ওকে ভাল করে মেনে নিয়েছ তো?' নেরির দিকে ফিরে জানতে চাইল মাইকেল।

নিজের মাথায় তর্জনী দিয়ে একটা টোকা মারল নেরি। 'মো গ্রীনকে ওছিয়ে নম্বর দিয়ে রেখেছি এখানে!'

সাত

নিউ ইয়র্কে ফিরছে মাইকেল কর্লিয়নি। শরীরটা ঢিল করে দিয়ে একটু ঘুমাবার চেষ্টা করছে সে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। বার বার এদিক ওদিক ছুটে যাচ্ছে মনটা। ওর জীবনের সবচেয়ে বিপজ্জনক সময় কাছে এসে পড়েছে। কি হয় না হয় কিছুই বলা যায় না, গোটা ব্যাপারটা একেবারে মর্মান্তিকও হয়ে উঠতে পারে।

সমস্ত প্রস্তুতি শেষ করা হয়েছে। সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। প্রচুর সময় নিয়ে নিখুঁত, নিশ্চিত করা হয়েছে পরিকল্পনার প্রতিটি খুঁটিনাটি। এক দুই করে কেটে গেছে চব্বিশটা মাস, দুটো বছর। আর দেরি করা সম্ভব নয়।

গেল হুগোয় ডন তাঁর ক্যাপোরেজিমিদের ডেকে বসিয়েছিলেন, সেখানে প্রায় সবাই উপস্থিত ছিল। আনুষ্ঠানিক ভাবে নিজের অবসর নেবার কথা ঘোষণা করেছেন

তিনি। বাপের মুখে সংকল্পটার কথা শোনা মাত্র বুঝে নিয়েছে মাইকেল, বাবা তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে ছোট ছেলেকে জানিয়ে দিলেন, সময় হয়েছে এবার।

তিন বছর হলো সিসিলি থেকে ফিরেছে মাইকেল। ওর সাথে কে-এর বিয়ে হয়েছে আজ দু'বছর। গত তিন বছর ধরে লেগে থেকে পারিবারিক ব্যবসাটা রপ্ত করে নিয়েছে ও। বেশির ভাগ সময়টা কেটেছে টম হেগেন আর ঝিনের সাথে আলোচনা করে। এতদিন পরিবারটি সম্পর্কে সত্যিকার কোন ধারণাই ছিল না মাইকেলের। কর্লিয়নিরা কত ধনী, তাদের কত শক্তি জানতে পেরে রীতিমত স্তম্ভিত হয়েছে ও। নিউ ইয়র্ক শহরের মাঝখানে বহু মূল্যবান স্থাবর সম্পত্তি আছে ওদের, এক-আধটা নয়, অনেকগুলো। প্রকাণ্ড সব অফিস বিল্ডিং। ওয়াল স্ট্রীটের দুটো দালানি ব্যবসার অংশীদার ওরা, এরপর আছে লং আইল্যান্ডে ব্যাংকের শেয়ার, রেডিমেড পোশাক তৈরি কারখানার শেয়ার। এসব ছাড়া বেআইনী জুয়া ব্যবসা তো আছেই।

ব্যবসা শিখতে গিয়ে সবচেয়ে মজার শিক্ষাটা পেল মাইকেল পরিবারের পুরানো দলিলপত্র ঘাঁটার সময়। যুদ্ধ মাত্র থেমেছে, সেই সময়ের ঘটনা। কর্লিয়নি পরিবারের অনুমতি নিয়ে, তাদেরকে নিয়মিত মোটা টাকা দিয়ে একদল জালিয়াত গানের রেকর্ড নকল করত। বিখ্যাত গায়ক-গায়িকাদের জাল ফোনোগ্রাফ রেকর্ড তৈরি করে কৌশলে সেগুলো পাচার করে দিত, একবারও কেউ তারা ধরা পড়েনি। জানা কথা, এই জাল রেকর্ড বিক্রির টাকার এক পয়সাও গাইয়েরা বা বৈধ রেকর্ড পরিবেশকরা পেত না। মাইকেল দেখল, এতে করে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল জনি ফটেন। কারণ, সে সময় জনির রেকর্ডই সবচেয়ে বেশি বিক্রি হত।

কৌতূহলী হয়ে উঠে হেগেনকে একদিন প্রশ্ন করল মাইকেল, জেনেগেনে তাঁর ধর্মপুত্রকে কেন ঠকতে দিয়েছিলেন ডন?

শ্রাগ করেছিল হেগেন। বলেছিল, 'এ হলো ব্যবসার কথা, আর কিছুর সাথে এর তেমন কোন সম্পর্ক তো না থাকাই স্বাভাবিক। তাছাড়া, তখন জনি খুব বেচাল চলছিল। সেই ছোটবেলা থেকে যাকে ভালবাসে তাকে বিয়ে করে আবার ত্যাগ করল কেন? মাগটি অ্যাশটনকে বিয়ে করতে হবে। ওর ওপর খুব চটে গিয়েছিলেন ডন।'

'কিন্তু হঠাৎ লোকগুলো তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দিল কেন? পুলিশের তাড়া খেয়ে বুঝি?'

এদিক ওদিক মাথা নেড়েছিল হেগেন। 'না। ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেল। ডন তাঁর সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়ায়। কনির বিয়ের পরপরই।'

পরে এ-ধরনের আরও অশেষ ঘটনা লক্ষ করেছে মাইকেল। এসব থেকে ডনের বিচিত্র চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। কারও ওপর অসন্তুষ্ট হলে তার কিছুটা ক্ষতি করতে ইতস্তত করেন না, আবার কিছুদিন পরই দেখা যায় সেই লোকেরই উপকার করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন তিনি। তাঁর এই আচরণের মধ্যে কোন রকম ধূর্ততা বা মতলব থাকে না, তাঁর বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গিই এর কারণ। অথবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়মই এই, সেটাকে তিনি লক্ষ্য করতে চান না। ভালয় মন্দে জড়িয়ে থাকাটাই তো সেই নিয়ম, আর সব নিয়মের চেয়ে সেটাই তো স্বাভাবিক।

ওদের বিয়ে হয়েছে নিউ ইংল্যান্ডে। নিরিবিলিতে সারা হয়েছে কাজটা। শুধু কে-র বাড়ির লোকজন আর কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব উপস্থিত ছিল। বিয়ের পর থেকে উঠানের একটা বাড়িতে উঠে এসেছে ওরা। শ্বশুর শাশুড়ীর সাথে, উঠানের আর সব বাসিন্দাদের সাথে নিজেকে সুন্দরভাবে মানিয়ে নিয়েছে কে, ব্যাপারটা লক্ষ করে গর্ব অনুভব করে মাইকেল, আবার অবাকও হয়। সেকেন্দ্রে অর্থে ভাল ইতালীয় বউদের মত কয়েকটা দিন যেতে না যেতেই অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ল কে। ফলটা তাতে ভালই হয়েছে। দু'বছরের মধ্যে দুই সন্তানের সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে বাড়ির সবাই মহাখুশি। এ যেন একেবারে সোনার সোহাগা।

মাইকেল জানে, ওর জন্যে এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করবে কে। অনেক বলেও তার এই অভ্যাসটা ছাড়াতে পারেনি ও। কোথাও থেকে মাইকেল ফিরে এলে একেবারে ছেলেমানুষের মত খুশি হয়ে ওঠে কে। মাইকেল খুব খুশি হয়। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা অন্যরকম।

আজকের এই যাত্রার শেষ মানেই এতদিন ধরে যে কাজের প্রস্তুতি চলছে, তার শুরু। ওর জন্যে অপেক্ষা করে আছেন ডন। ওর জন্যে অপেক্ষা করে আছে ক্যাপোরেজিমিরা। ওর ঘাড়ের চাপবে এখন সমস্ত দায়-দায়িত্ব। মাইকেল কর্লিয়নির সামনে অগ্নিপরীক্ষা। নির্দেশ এখন তাকেই দিতে হবে। সিদ্ধান্ত এখন তাকেই নিতে হবে। সেই নির্দেশ আর সিদ্ধান্তের ওপরই নির্ভর করছে তার নিজের আর পরিবারের ভাগ্য।

রোজই খুব ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে খোকার জন্যে খাবার তৈরি করতে হয় কে অ্যাডামসকে। প্রায় রোজই তার চোখে পড়ে কর্লিয়নিদের মা, তার শাশুড়ী, সাথে বডিগার্ড নিয়ে গাড়ি করে কোথায় যেন যাচ্ছেন। ফিরে আসেন ঘণ্টাখানেক পর। ক'দিন পর কে জানতে পারল রোজ সকালে তিনি প্রার্থনা করার জন্যে গির্জায় যান।

গির্জা থেকে ফিরে রোজই বুড়ি ভদ্রমহিলা একবার ছোট ছেলে মাইকেলের বাড়িতে আসেন। উদ্দেশ্য নতুন নাটিকে দেখা। সেই সুযোগে বৌ-মার হাতের এক কাপ কফি খাওয়াও হয়ে যায়। বাড়িতে পা দিয়ে প্রায় প্রতিদিনই তিনি জানতে চান, এখনও কেন ক্যাথলিক হবার কথা ভাবছে না কে? মনেই থাকে না তাঁর যে এরই মধ্যে প্রটেষ্ট্যান্ট মতে দীক্ষা দেয়া হয়ে গেছে কে-র ছেলেকে। সেজন্যেই ভাবল কে, দু'একটা প্রশ্ন করলে সেটা দোষের ব্যাপার হবে না জানতে চাইল, 'প্রত্যেকদিন কেন গির্জায় যান তিনি? ক্যাথলিক হলে তাই বুঝি যেতে হয়?'

কে-র কথা শুনে শাশুড়ী ভাবলেন, রোজ গির্জায় যাবার ভয়েই বোধহয় ক্যাথলিক হচ্ছে না কে। বউকে তাড়াতাড়ি বললেন, 'না না! এমন অনেক ক্যাথলিক আছে যারা বছরে মাত্র দু'বার, ঈস্টারের সময় আর বড়দিনে গির্জায় যায়। এর কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই, যখনই মন চায় তখনই যেতে হয়।'

হাসছে কে। বলল, 'আপনি তাহলে রোজ যান কেন?'

অত্যন্ত সহজভাবে মিসেস কর্লিয়নি বললেন, 'স্বামীর জন্যে যেতে হয় আমাকে।' হাতের তর্জনী ঘরের মেঝের দিকে তাক করলেন তিনি। 'ওঁকে যাতে

এই নিচের দিকে নামতে না হয় তার জন্যে।' কে-র মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। তারপর বললেন, 'ওঁর আত্মার জন্যে রোজ প্রার্থনা করি আমি,' তারপর তিনি তর্জনীটা তুলে আকাশের দিকটা দেখালেন, 'যাতে ওই ওপরের দিকে যেতে পারেন আমার স্বামী।' কথাগুলো বলার সময় তাঁর চেহারা দুটামির হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল, যেন চুপিসারে স্বামীর গোপন মতলব ফাঁস করে দিচ্ছেন, যেন কোন পরাজিত পক্ষকে জিতিয়ে দিতে চাইছেন। পরিহাসের মতই শোনাল কথাগুলো, কিন্তু ভঙ্গিটা ইতালীয় বুড়িদের মতই গুরুগম্ভীর। তাছাড়া, ডন কাছেপিঠে না থাকলে যা প্রায়ই দেখা যায়, আজও তাই লক্ষ করল কে, শাশুড়ীর কথাবার্তা আর ভাবভঙ্গিতে ডনের প্রতি কিছুটা অশ্রদ্ধা প্রকাশ পেল।

'বাবা কেমন আছেন আজ?' ভদ্রতা করে জানতে চাইল কে।

কাঁধ ঝাঁকালেন শাশুড়ী। 'গুলি খাবার পর থেকে ওঁকে আর পুরোপুরি সুস্থ বলা যায় না,' বললেন তিনি। 'আগের সেই মনও নেই আর। কাজ তো সবই এখন মাইকেলকে দিয়ে করান। নিজে আজকাল বাগানে খেলা করে সময় কাটান। ওঁর খেলনা হলো লক্ষা আর টমেটো গাছগুলো। দেখে কে বলবে, শহুরে লোক? এখনও যেন সেই চামীর ছোট্ট ছেলেটি। কিন্তু, আসল ব্যাপার কি জানো, পুরুষরা এই রকমই হয়।'।

বেলা আরেকটু চড়লে দুই ছেলেমেয়েকে সাথে নিয়ে গল্প করার জন্যে আসে কনি কর্লিয়নি। কনিকে খুব ভাল লাগে কে-র। হাসি-খুশি মেয়ে, এতটুকু ঈর্ষা বা গর্ব নেই, মেজাজ করে না, আর মাইকেলকে যে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে তা দেখলেই পরিষ্কার বোঝা যায়। কনির কাছ থেকেই কিছু কিছু ইতালীয় রান্না শিখেছে কে। কিন্তু খালি হাতে বড় একটা আসে না কনি, নিজের রান্না করা খাবার মাইকেলের জন্যে নিয়ে আসে খানিকটা।

যখনই আসে কনি, একটা বিশেষ কথা জিজ্ঞেস করতে কখনও ভুল হয় না তার। প্রশ্নটা আজও করল সে। তার স্বামী কার্লো সম্পর্কে কি ধারণা মাইকেলের? মাইকেল কি পছন্দ করে কার্লোকে? নিজেই আবার মন্তব্য করে, দেখে তো তাই মনে হয়।

বেশ কিছুদিন শ্বওর বাড়ির লোকজনদের সাথে সম্পর্ক ভাল ছিল না কার্লোর। তবে, একটা করে বছর গেছে, সম্পর্কটাও একটু একটু করে ভাল হয়ে উঠেছে। দৈনন্দিন মনে হয়, সমস্ত মন-কষাকষি মিটে গেছে। শ্রমিক সংঘে একটা ভাল কাজ দেয়া হয়েছে কার্লোকে, সেখানে খুব মন দিয়ে কাজ করছে সে। তবে খাটনিটা একটু বেশি, সেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। কনির মুখ থেকে সব সময়ই শোনা যায়, কার্লো সত্যি খুব পছন্দ করে মাইকেলকে। অবশ্য, কেই বা পছন্দ করে না ওকে? কনির বাবা যেমন সবার প্রিয়পাত্র, তেমনি মাইকেলও সবার প্রিয়পাত্র। মাইকেল যে অবিকল আরেকজন ডন, তা অস্বীকার করার উপায় নেই কারও। ওকে দেখে ডন ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। কার্লোও তো সেকথা বলে। মাইকেল যে ওদের পারিবারিক জলপাই তেলের ব্যবসার দায়িত্ব নেবে এর চেয়ে আনন্দের খবর আর কিছু হতে পারে না।

কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ করে অবাক হয়ে যায় কে। কনি যখনই তার স্বামীর কথা তোলে, কেমন যেন ভয়ে ভয়ে আশা করে, তার সম্পর্কে দু'একটা ভাল কথা বলা হোক। কার্লোর প্রশংসা শোনার জন্যে কেমন যেন মুখিয়ে থাকে সে। ঠিক আগ্রহ নয়, আশ্চর্য্য একটা আতঙ্ক নিয়ে অপেক্ষা করে সে। প্রসঙ্গটা একদিন মাইকেলের কাছে তুলল কে। সেই সাথে আরও একটা প্রশ্ন জুড়ে দিল সে। সনি কর্নিয়নির নাম পর্যন্ত মুখে আনে না কেউ—কেন? অন্তত কনির সামনে তো নয়ই। কারণটা কি? একদিনের কথা মনে আছে কে-র। সনির প্রসঙ্গ তুলে দুঃখ প্রকাশ করতে গিয়ে কেমন অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিল কে। ডন আর তাঁর স্ত্রী প্রায় অভদ্রের মত চুপ করে ছিলেন, হুঁ-হাঁ পর্যন্ত করেননি। দু'জনেই যেন কালা হয়ে গিয়েছিলেন। কোন প্রসঙ্গ এভাবে উপেক্ষা করা যায়, ভারতেই পারে না কে। শুধু এদেরকেই নয়, কনির সাথেও সনি কর্নিয়নির সম্পর্কে আলাপ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে কে। কৌশলে কনিও এড়িয়ে গেছে প্রসঙ্গটা।

প্রসঙ্গটা মাইকেলও এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কে-র জেদের কাছে পেরে উঠেনি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সনির মৃত্যুটা ব্যাখ্যা করেছিল সে। সে রাতে যা যা ঘটেছিল, সবই জানিয়েছিল ওকে। স্বামী কার্লোর হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে লং বীচে টেলিফোন করেছিল, কনি। ফোন ধরেছিল সনি। তারপর রাগে অন্ধ হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল সে। সনির ওই রাগ আর বাড়ি ছেড়ে বেরোবার ব্যাপারে দায়ী হলো ওই টেলিফোনটা। সেজন্যেই কনি আর কার্লোর ভয়, কর্নিয়নিরা বোধহয় সনির মৃত্যুর জন্যে পরোক্ষভাবে কনিকে দায়ী বলে মনে করে। তার মানে, সনির মৃত্যুর জন্যে কার্লোকে দোষ দেয়। তবে, আসলে ব্যাপারটা তা নয়। ওরা যে কেউ কার্লোকে খারাপ চোখে দেখে না তার প্রমাণ হলো, ওদেরকে উঠানে জায়গা দেয়া হয়েছে। শ্রমিক সংঘে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া, কার্লোও তো আজকাল বদলে গেছে। পুরোপুরি শুধরে গেছে সে। মদ তো সে ছোঁয়ই না। মেয়েমানুষের নেশাও ছুটে গেছে তার। কোন ব্যাপারে বেশি চালাকি করার প্রবণতাও দেখা যায় না তার মধ্যে। আর স্ত্রীর গায়ে তো ভুলেও একবার হাত তোলেনি সেই থেকে। জীবনে আর কখনও তুলবে বলেও মনে হয় না। গত দু'বছর ধরে কার্লোকে লক্ষ করেছে কর্নিয়নি পরিবার, তারা ওর ব্যবহারে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট, তার বিরুদ্ধে ওদের কারও কোন অভিযোগ নেই। যা ঘটে গেছে—তা নিয়ে কেউ আর মাথাও ঘামায় না এখন, কেউ দোষীও ভাবে না কার্লোকে। সব চুকেবুকে গেছে।

‘তাই যদি হয়,’ বলেছিল কে, ‘ওরা যে অহেতুক ভয় পাচ্ছে, সেটা তুমি ভেঙে দিচ্ছ না কেন? ওদেরকে একদিন দাওয়াত করে ডেকে এনে আশ্বস্ত করে দিলেই তো হয়। কনিকে বললেই চলবে। সব সময় ভয়ে কুঁকড়ে থাকে বেচারী, ওর স্বামী সম্পর্কে কি না কি ধারণা করে বসে আছ তোমরা। তারচেয়ে সব কথা খুলে জানিয়ে দিলেই পারো।’

‘না, তা সম্ভব নয়,’ বলেছিল মাইকেল। ‘আমাদের বাড়ির আলাদা একটা নিয়ম আছে, এসব বিষয় আলোচনা করা হয় না।’

‘তুমি অনুমতি দিলে তোমার হয়ে আমি বলতে পারি কনিকে ।’

চিন্তিত দেখাচ্ছিল মাইকেলকে । কে বুঝতেই পারছিল না এই ধরনের একটা সহজ কর্তব্য পালন করতে গিয়ে এত কি চিন্তা করার আছে ।

‘কিছু বোধহয় না বলাই উচিত, কে,’ বলল মাইকেল । ‘তাতে কোন লাভ হবে না । কনি ব্যাপারটা নিয়ে দৃষ্টিভ্রান্তি করবেই । এ এমন একটা ব্যাপার, বাইরে থেকে কিছু করা যায় না ।’

অবাক হয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল কে । হঠাৎ মনে পড়ল, আর সবার সাথে যেরকম স্নেহ ব্যবহার করে মাইকেল, কনির সাথে তো সেরকম করে না । জানতে চাইল, ‘তবে কনির মৃত্যুর জন্যে কনিকে দায়ী করো তুমি?’

একটা নিঃশ্বাস ফেলল মাইকেল । ‘কক্ষনও না । কনি আমার একমাত্র ছোট বোন, ওকে আমি ভালবাসি । ওর কথা ভেবে দুঃখ পাই আমি । কার্লো আগের চেয়ে অনেক ভাল হয়ে গেছে, কিন্তু এ কথা তো ঠিক যে কনির উপযুক্ত স্বামী সে নয় । মাঝে মাঝে এরকম বেখাপ্পা ব্যাপার ঘটতে দেখা যায়, কি আর করা যাবে বলো ! আর নয়, কেমন? এবার এসব কথা ভুলে যাওয়া যাক ।’

ঘ্যানর ঘ্যানর করা স্বভাব নয় কে-র, মাইকেল ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে চাইছে বুঝতে পেরে চুপ করে গিয়েছিল সে । কথা বাড়ায়নি আর । এরই মধ্যে জানা হয়ে গেছে তার, মাইকেলের ওপর কোন ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করা যায় না । সে রকম কিছু করতে গেলে মাইকেলের ব্যবহার কেমন যেন স্নেহ, মাধুর্য আর গীতিশূন্য হয়ে পড়ে । জানে, যে কোন ব্যাপারে একমাত্র সেই পারে মাইকেলের মতের পরিবর্তন ঘটতে, সেই সাথে এও জানে যে এই ক্ষমতাটা বারবার কাজে লাগালে সেটার ধার কমে যাবে, একসময় আর কোন কাজেই লাগবে না । দীর্ঘ দু’বছর ওর সাথে ঘর-সংসার করার পর, মাইকেলের ওপর তার প্রেম আরও গাঢ় হয়েছে, আরও গভীর হয়েছে—সব ব্যাপারে এখন আর খুঁত খুঁত করে না মনটা ।

বিয়ের আগে মাইকেলের ওপর প্রচণ্ড একটা আকর্ষণ বোধ করত কে, এখন সেটা অন্ধ প্রেমে পরিণত হয়েছে । যত দিন যাচ্ছে ততই মাইকেলের ওপর ভালবাসা বেড়ে যাচ্ছে তার । এর একটা কারণ আছে । মাইকেলের ন্যায় ব্যবহারই সেই কারণ । শুধু কে-র সাথে নয়, সবার সাথে আশ্চর্য ভাল ব্যবহার করে মাইকেল । পরিষ্কার বোঝা যায়, কারও সাথে খারাপ ব্যবহার করবে না বলে মনে মনে শপথ নিয়ে রেখেছে ও । ছোট বড় সবার সাথে আশ্চর্য একটা সদ্ভাব বজায় রেখে চলে ও । কারও মনে আঘাত দিয়ে কখনও কিছু বলে না । সারাদিন কোন না কোন কাজে ব্যস্ত থাকে, কত লোক দেখা করতে আসে ওর সাথে, কারও সাহায্য চাই, কারও পরামর্শ দরকার । সবাই শ্রদ্ধা করে মাইকেলকে, সমীহ করে কথা বলে । দিনে দিনে প্রতিপত্তি বাড়ছে ওর । সেই সাথে বিবেচক হয়ে উঠছে ও, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটছে! এসব তো আছেই, অন্য আরেকটা কারণে মাইকেলের ওপর ভালবাসা দিনে দিনে বেড়ে উঠছে কে-র ।

সিসিলি থেকে ফিরে এসেছিল মাইকেল ভাঙা মুখ নিয়ে, সেই থেকে সবাই তার পিছনে লেগেছে, ত্রুটিটা অপারেশন করে সারিয়ে ফেল । বিশেষ করে মাইকেলের

মা একেবারে নাছোড়বান্দার মত হয়ে উঠলেন। মাইকেলের কানের কাছে অনবরত টিক টিক করতেন তিনি। এক রবিবারের কথা মনে পড়ে কে-র, সেদিন বাড়ির সবাই একসাথে বসেছে ডিনার খাবে বলে, মাইকেলের মা চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন।

‘আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখিস একবার,’ মাইকেলের সামনে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বললেন তিনি, ‘ঠিক যেন সিনেমার গুণ্ডা যীশু আর তোর স্ত্রীর কথা ভেবে অন্তত মুখটা সারিয়ে নে। সারিয়ে নিলে আইরিশ মাতালদের মত নাক দিয়ে ওই রকম বিচ্ছিরি পানিও ঝরবে না আর। কত আর বলব তোকে?’

মায়ের সাথে তর্ক করা স্বভাব নয় মাইকেলের। আর এ এমন একটা বিষয় যা নিয়ে কোন কথা বলতেই রাজী নয় ওঁ। মাথা নিচু করে চুপ করে থাকল শুধু। একটা উত্তর পর্যন্ত দিল না।

টেবিলের একধারে বসেছিলেন ডন। এতক্ষণ সবই তিনি লক্ষ্য করছিলেন নিঃশব্দে। কে-র দিকে ফিরে হঠাৎ জানতে চাইলেন, ‘তোমার খারাপ লাগে, কে?’

দ্রুত মাথা নাড়ল কে।

ডন স্ত্রীর দিকে তাকালেন। বললেন, ‘মাইকেল এখন তোমার হাতে নেই, ব্যাপারটা নিয়ে তুমি মাথা না ঘামালেই তো পারো।’

স্বামীর কথার ওপর বুড়ি ভদ্রমহিলা কথা বললেন না। ডনকে তিনি ভয় করে চলেন, ব্যাপারটা তা নয়, সবার সামনে তাঁর সাথে তর্ক জুড়ে দিলে তাঁর অসম্মান করা হয়।

সন্তানদের মধ্যে কনিকে সবচেয়ে বেশি আদর করেন ডন, সে তখন কিচেনে ছিল, আলোচনার বিষয়টা কি জানতে পারার সাথে সাথে ডাইনিংরুমে এসে ঢুকল সে, বলল, ‘আমিও বলি, অপারেশন করে ফ্রুটিটা সারিয়ে নেয়া উচিত মাইকেলের। আমাদের মধ্যে ওই তো সবচেয়ে সুন্দর ছিল দেখতে, আর এখন হয়েছে যাচ্ছে-তাই। মাইক, লক্ষ্মী ভাইটি আমার, বলো অপারেশন করাবে তুমি?’

চেহারায় নির্লিপ্ত একটা ভাব ফুটিয়ে তুলে কনির দিকে তাকাল মাইকেল। সবার মনে হলো, কনি কি বলেছে শুনতেই পায়নি সে। উত্তর দেবার তো কোন চেষ্টাই করল না।

কিন্তু কনিও সহজে ছাড়বার পাত্রী নয়। দ্রুত পা চালিয়ে বাবার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। বলল, ‘তুমি বললে শুনবে ও, বাবা। তুমি ওকে আদেশ করো।’ বাবার মন পাবার জন্যে তাঁর গলাটা জড়িয়ে ধরল সে। ধীরে ধীরে হাত বুনিয়ে দিচ্ছে বাবার কাঁধে।

ছেলেমেয়েদের মধ্যে বাবার এত কাছাকাছি একমাত্র ওই যেতে পারে। ডনের প্রতি ওর ভালবাসা দেখে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। এত বড়টি হয়েছে, কিন্তু বাবার সাথে এমন আচরণ করে যেন এখনও কচি খুকী। ডন মেয়ের হাতে মৃদু চাপড় মারলেন কয়েকবার, তারপর বললেন, ‘এই, পাগলী, খিদেতে যে বাপের পেট জুলে গেল সেদিকে খেয়াল আছে? টেবিলে আগে স্প্যাগেটি নিয়ে আয়, তারপর যত পারিস বকবক করিস।’

বাবা তাকে নিরাশ করায় এবার কনি স্বামীর শরণাপন্ন হলো। বলল, ‘কার্লো,

তুমি মাইকে একটু বুঝিয়ে দেখো না, প্লীজ।' কথাগুলো এমন ভাবে বলল কনি, যেন কার্লোর সাথেই মাইকেলের সবচেয়ে বেশি বন্ধুত্ব।

রোদে পোড়া চেহারা কার্লোর, শরীরটা প্রকাণ্ড, সোনালী চুল পরিপাটি করে ছাঁটা, আঁচড়েছেও যত্ন করে। তার হাতে বাড়ির তৈরি এক গ্লাস মদ। গ্লাসটায় চুমুক দিল সে, বলল, 'মাইক নিজের কথায় চলে।' উঠানে আসার পর থেকে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে গেছে কার্লো। কর্লিয়নি পরিবারে তার আসন কোথায় সেটা বুঝে নিয়ে সেই রকম আচরণ করে সে।

গোটা ব্যাপারটার মধ্যে এমন কিছু একটা আছে, যা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না কে। ব্যাপারটা খুবই সূক্ষ্ম, কখনই প্রকট হয়ে ওঠে না। কিন্তু হাজার হোক সে নারী, আর নারীর একটা চোখে থাকে রাজ্যের চাতুরী, সে চাতুরীর সাহায্যে দেখতে পায় কে, বাবাকে খুশি করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে কনি। তার এই কাজে কোন খুঁত থাকে না, তার কারণ কনি অন্তর থেকেই করে সেটা। কিন্তু তবু যেন সেটাকে স্বতঃস্ফূর্ত বলা যায় না। বোঝা যায়, বাবার সমর্থন আদায় করাটা তার কাছে খুবই জরুরী একটা ব্যাপার। এ ধরনেরই চেষ্টা অন্যভাবে কার্লোও করে। তবে ডনকে নয়, মাইকেলকে খুশি করার চেষ্টা করে সে। সেদিন যেমন উত্তর দেবার সময় নিজের কপালে আঙুল দিয়ে টোকা মেরেছিল সে। কিন্তু মাইকেলকে দেখে মনে হলো এসব যেন দেখতেই পায়নি ও।

কে কিন্তু মাইকেলের চেহারার বিকৃতি নিয়ে কখনোই মাথা ঘামায় না। ওতে ওর কিছুই এসে যায় না। তবে, ওটা সারানো হচ্ছে না বলেই মাইক সাইনাসের কষ্টে ভুগছে, সেটাই ওর একমাত্র দুশ্চিন্তার কারণ। ডাক্তাররা আগেই জানিয়েছে অপারেশন করে মুখের হাড় ঠিকমত বসিয়ে নিলে সাইনাসের উপদ্রবটা বন্ধ হয়ে যাবে। মুখ ফুটে কিছু বলে না কে, কিন্তু মনে মনে চায় হাসপাতালে ভর্তি হয়ে ঝামেলাটা চুকিয়ে ফেলুক মাইকেল। তবে এও পরিষ্কার বুঝতে পারে ও, কি এক দুর্বোধ্য কারণে মুখের ওই ঝুটিটাকে পুষে রাখতে চায় তার স্বামী। কে-র বিশ্বাস, কথাটা ডনও বুঝতে পেরেছেন।

ওরা ওদের প্রথম সন্তানের মুখ দেখার পর, ও-কে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ একদিন জানতে চাইল মাইকেল, 'মুখের এই ঝুটিটার ব্যাপারে তুমি কি মনে করো, কে? চাও এটা আমি সারিয়ে নিই?'

মাথা দুলিয়েছিল কে। 'নিজের কথা ভেবে নয়, মাইক, ছেলেটার কথা ভেবে তাই চাই। ছেলেপুলেরা কেমন হয় জানোই তো, একটু জ্ঞান-বুদ্ধি হলেই বুঝতে শিখবে যে তুমি দেখতে স্বাভাবিক নও, মনে খুব আঘাত পাবে তখন ও। আমার ছেলে তার বাপের ভাঙা মুখ দেখুক, এ আমি চাই না। কিন্তু আমার কথা যদি জিজ্ঞেস করো তুমি, মাইকেল, সেটাই আমার কাছে একমাত্র সত্য, মাইকেলের মুখ ভাঙা কি হাত কাটা, তাতে আমার কিছুই এসে যায় না।'

স্ত্রীর চোখে চোখ রেখে মৃদু হেসেছিল মাইকেল। 'ঠিক আছে। অপারেশন করাব।'

হাসপাতাল থেকে কে বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করল মাইকেল, তারপর

হাসপাতালে ভর্তি হলো নিজেই। নির্বিঘ্নে হয়ে গেল অপারেশন। মুখটা যে এই মাত্র ক'দিন আগেও বিচ্ছিন্নভাবে ভুবড়ে ছিল তা আর এখন বোঝাই যায় না।

বাড়িতে আনন্দ আর ধরে না কারও। বিশেষ করে কনি তো মহাখুশি। রোজ তার একবার করে হাসপাতালে মাইকেলকে দেখতে যাওয়া চাই। মাইকেল যেদিন বাড়ি ফিরল, ওকে জড়িয়ে ধরে সে কি চুমো খাওয়া! তার দু'চোখে আনন্দ উথলে উঠেছিল। 'ওরে, কে কোথায় আছিস দেখে যা, এই তো সুন্দর রাজপুত্র ভাইটি আমার!' চিৎকার করে আবার মাইকেলের মুখে চুমো খেয়েছিল সে।

একমাত্র ডনের ওপর এর কোন প্রভাব পড়তে দেখা যায়নি। সবাই যখন প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তিনি তখন মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিলেন, 'কি আর এমন তফাৎ হলো!' কেমন যেন একটা উদাস ভাব লক্ষ করা গেল তার মধ্যে।

সবচেয়ে কৃতজ্ঞ বোধ করল কে। আর কেউ জানুক বা না জানুক, সে তো জানে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজটা করেছে মাইকেল। কে ওকে অনুরোধ করেছিল, তাই। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাইকেলকে কেউ যদি কোন কাজ করতে পারে, সে শুধু কে। আর কারও অনুরোধ, এমন কি স্বয়ং ডনের আদেশও অমান্য করার মত সংসাহস রাখে মাইকেল কর্নিয়নি।

আট

ভোগাস থেকে বিকেলে ফিরল মাইকেল কর্নিয়নি।

নিমুসিন গাড়ি নিয়ে উঠানে ঢুকল রকো ল্যাম্পনি। স্বামীকে তুলে আনার জন্যে এয়ারপোর্টে যাবে কে। বেড়িয়ে বা কাজ সেরে কোথাও থেকে মাইকেল ফিরলে তাকে নিয়ে আসার জন্যে এয়ারপোর্টে যাবেই ও, কেউ বাধা দিয়ে রাখতে পারে না তাকে। কাছে মাইকেল না থাকলে সাম্প্রতিক অসহায়, নিঃসঙ্গ বোধ করে ও তাছাড়া বাড়িটা তো একটা গা ছমছম দুর্গের মত, মাইকেলের উপস্থিতি ছাড়া দম বন্ধ হয়ে আসতে চায় তার।

মাইকেলের নতুন বডিগার্ড অ্যালবার্ট নেরিকে প্লেন থেকে নামতে দেখল কে। তারপর দেখা গেল মাইকেলকে। সবার শেষে মাইকেলের ঠিক পিছনেই দেখা যাচ্ছে টম হেগেনকে। মাইকেলের মুখের দিকে অপলক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল কে। সাথে সাথে ধরতে পারল, মাইকেলের মুখটা শুকনো, বোধহয় মন খারাপ। মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল কে। চোখের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সামনের লোকটার ওপর। অ্যালবার্ট নেরিকে তেমন পছন্দ হয় না কে-র। ওকে দেখলেই লুকা ব্রাসি নামে সেই ভয়ঙ্কর লোকটার কথা মনে পড়ে যায় ওর। এর চেহারার মধ্যেও ফুটে আছে আশ্চর্য একটা চাপা হিংস্র ভাব। তাকালেই কেন যেন নিজের অজান্তে শিউরে ওঠে কে।

মাইকেল প্লেন থেকে নেমে কয়েক পা মাত্র এগিয়েছে, হঠাৎ স্ট্যাং করে পিছিয়ে গেল নেরি, দ্রুত মাথা ঘুরিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিচ্ছে চারদিকটা। এয়ারপোর্টে যারা উপস্থিত রয়েছে তাদের একজনও তার চোখ ফাঁকি দিতে পারল না। কে-কে

সেই দেখতে পেল প্রথম। মাইকেলের কাঁধে একটা হাত রাখল সে, কিন্তু ঠোট নেড়ে কিছু বলল না। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে কে-কে দেখতে পেল মাইকেল।

এক ছুটে স্বামীর আলিঙ্গনের ভেতর গিয়ে ঢুকল কে। দ্রুত একটা চুমো খেয়ে স্ত্রীকে সরিয়ে দিল মাইকেল। পাখি যেভাবে ডানা মেলে দিয়ে বাচ্চাকে আড়াল করে রাখে ঠিক তেমনি আড়াল করে রেখেছে মাইকেলকে টম হেগেন। অ্যালবার্ট নেরি এরই মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। নির্মুসিনে প্রথমে চড়ল মাইকেল। তারপর কে। সবশেষে হেগেন। কে জানতেই পারল না যে নেরি আরও দু'জন লোকের সাথে অপর একটা গাড়িতে চড়ে ওদের অনুসরণ করে সোজা উঠানে এসে ঢুকল।

মাইকেলের কাজকর্ম কেমন হলো, এ-ধরনের কোন প্রশ্ন কখনও জিজ্ঞেস করে না কে। ভদ্রতা দেখিয়ে জানতে চাইলেও মাইকেল অস্বস্তি বা অপ্রতিভ বোধ করতে পারে ভেবে মৌন থাকার নীতিই গ্রহণ করেছে সে। জানে, প্রশ্ন করা হলে ভদ্রতা রক্ষা করার স্বার্থে উত্তর না দিয়ে পারবে না মাইকেল। কিন্তু প্রশ্নটা তুললেই হয়তো দু'জনেরই মনে পড়ে যাবে যে ওদের দাম্পত্য জীবনে মস্ত একটা নিষিদ্ধ এলাকা আছে, সেটা চিরকালই নিষিদ্ধ থেকে যাবে। তবে এ নিয়ে আজকাল আর মন খারাপ করে না কে। কিন্তু মাইকেল আজ নিজেই জানাল, রাতেই ওকে বাবার সাথে দেখা করতে হবে, ভেগাসে যা যা ঘটেছে সব এখুনি জানাতে হবে ডনকে। মনটা সত্যি সত্যি আজ খারাপ হয়ে গেল কে-র। কথাটা মুখ ফুটে মাইকেলকে জানাতেও দ্বিধাবোধ করল না সে।

‘বিশ্বাস করো, খারাপ আমারও লাগছে,’ সান্ত্বনা দেবার সুরে বলল মাইকেল, ‘ঠিক আছে, কাল তোমাকে আমি নিউ ইয়র্কে নিয়ে যাব। ছবি দেখাব। ডিনার খাওয়াব। খুশি?’ কে-র পেটে একটা হাত রেখে ধীরে ধীরে চাপড় মারছে মাইকেল। ও এখন পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। ‘বাচ্চা হলেই তো আবার তুমি আটকা পড়ে যাবে বাড়ির ভেতর। আই বাপ! তুমি দেখছি যত না আমেরিকান তার চেয়ে বেশি ইতালীয়। জোড়া বছরে জোড়া বাচ্চা।’

‘আর তুমি?’ ঝাঁঝের সাথে বলল কে। ‘তুমি তো যত না ইতালীয় তার চেয়ে বেশি আমেরিকান। বাইরে থেকে ফিরে একটা দিন বাড়ি থাকবে, তা না, আবার কাজের ভেতর নাক গুঁজতে ছুটছ। শুধু ব্যবসা আর ব্যবসা। ঘরে যে আরও একজন আছে, সে কথা ভুলে গেলেই তো পারো!’ কথায় ঝাঁঝ থাকলেও, বলার সময় হেসে ফেলেছে কে। ‘অ্যাঁই, জবাব দাও, ঠিক কখন পাব তোমাকে বিছানায়? বেশি দেরি করলে কিন্তু ভাল হবে না।’

‘মাঝরাতের আগেই পাবে,’ মুচকি হেসে বলল মাইকেল। ‘কিন্তু তাই বলে রাত জেগে বসে থেকো না আবার।’

‘না, থাকব না!’

ডন কর্লিয়নির লাইব্রেরি।

পরামর্শ সভা বসেছে। উপস্থিত রয়েছেন ডন নিজে, মাইকেল, টম হেগেন, কার্লো, দুই ক্যাপোরেজিমি ক্রেমেজা আর টেসিও।

পরিবেশে আগের সেই আন্তরিক হৃদয়তার ছোঁয়া নেই। কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে আবহাওয়াটা। এর আগে ডন তাঁর আধা অবসরগ্রহণের কথা ঘোষণা করেছেন, জানিয়েছেন পারিবারিক ব্যবসার দায়িত্ব মাইকেলের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। সেইদিন থেকেই ধমধম করছে পরিবেশটা। তার অবশ্য একাধিক কারণও আছে।

মাফিয়া পরিবারগুলোর জন্যে একটা বিশেষ নিয়ম আছে, সে নিয়ম কর্লিয়নি পরিবারের জন্যেও প্রযোজ্য, তা হলো, পারিবারিক ব্যবসা পরিচালনার ভার উত্তরাধিকার সূত্রে বাপের কাঁধ থেকে ছেলের কাঁধে নাও বর্তাতে পারে। অন্য কোন পরিবার হলে এখানকার পরিস্থিতি অন্যরকম হত, হয়তো ক্রুমেজা বা টেসিও হত পরবর্তী ডন, বর্তমান ডন অবসর নেয়ার সাথে সাথে সেই হত সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। নিদেনপক্ষে ওদেরকে যার যার আলাদা পরিবার গড়ে তোলার স্বাধীনতা দেয়া হত। সেটাই নিয়ম। উপযুক্ততা থাকা সত্ত্বেও কাউকে দাবিয়ে রাখার নীতি সাধারণত অবলম্বন করা হয় না।

পরিবেশটা ঠাণ্ডা মেরে যাবার আরেকটা কারণ হলো, ডন কর্লিয়নি শান্তি চুক্তি করার পর থেকে কর্লিয়নিদের শক্তি কমতে শুরু করেছে। আজ আর কেউ কর্লিয়নি পরিবারকে সর্বশ্রেষ্ঠ, বা সবচেয়ে ক্ষমতাবান বলে দাবি করে না। নিউ ইয়র্কের সেরা পরিবার, সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী বলতে এখন একমাত্র বার্জিনি পরিবারকেই বোঝায়, এ নিয়ে কোন তর্ক ওঠে না। টাটাল্লিয়াদের সাথে জোট বেঁধে তারাই এখন কর্লিয়নি পরিবারের আসনটা দখল করে নিয়ে শ্রেষ্ঠ পরিবার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কর্লিয়নিদের ক্ষমতা এখানে সেখানে যাও বা এক-আধটু আছে, সে-সব জায়গাতেও হেঁ মেরে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করে নিচ্ছে তারা। কর্লিয়নিদের জুয়ার ব্যবসার ওপর হানা দেয়া একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানেই একটু দুর্বলতা দেখছে, সেখানেই নিজেদের বুকমেকার ঢুকিয়ে দিচ্ছে তারা।

ডন অবসর নিতে যাচ্ছেন, খবরটা শুনে বার্জিনি আর টাটাল্লিয়ারা তো আনন্দে বগল বাজাচ্ছে। সবার ধারণা যত ক্ষুরধার বুদ্ধিমানই হোক মাইকেল কর্লিয়নি, বাপের মত দুর্জয় প্রভাবশালী হয়ে উঠতে এখনও এক যুগ সময় লাগবে ছোকরার। কর্লিয়নি পরিবারের অবস্থা যে পতনের দিকে, এ-ব্যাপারে কারও মনে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

এসব ছাড়াও বেশ কয়েকটা বড় বড় দুর্ভাগ্যের শিকার হতে হয়েছে কর্লিয়নি পরিবারকে। শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হয়ে গেল ফ্রেডি কর্লিয়নি হাবাগোবা টাইপের হোটেলওয়ালা আর মেয়েদের ক্রীতদাস ছাড়া কিছু নয়। ইতালীয় ভাষায় একটা শব্দ আছে যেটার অনুবাদ সম্ভব নয়, তবে কথাটার কাছাকাছি মানে হলো, ত্তন চোষা পেটুক খোকা—এককথায় পৌরুষহীন।

অবশ্য সর্বনাশ যা হবার তা আগেই হয়ে গিয়েছিল। কর্লিয়নিদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য সনির মৃত্যু। নিউ ইয়র্কের পাঁচ পরিবারের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যে ভয় করত না সনিকে। ভয়ঙ্কর একটা প্রাকৃতিক শক্তি বলে মনে করত সবাই তাকে,

তাচ্ছিল্য করার সাহস পেত না। তবে, এ-কথা ঠিক, ড্রাগস ব্যবসায়ী সলোযো আর পুলিশ ক্যাপটেন ম্যাকক্লাস্টিকে খতম করার জন্যে ছোট ভাই মাইকেলকে পাঠিয়ে বোকার মত একটা কাজ করেছিল সে। তখনকার পরিস্থিতিতে ওটা একটা প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত বলে মনে হলেও দূরদর্শী পরিকল্পনার দিক থেকে ওটা ছিল একটা গুরুতর ভুল। সনি এই ভুল না করলে রোগশয্যা থেকে উঠে আসতে হত না ডন কর্লিয়নিকে। তাছাড়া, দীর্ঘ দু'বছরের অভিজ্ঞতা আর বাপের কাছ থেকে হাতে-কলমে শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ, এই দুটো জিনিস থেকে বঞ্চিত হতে হত না মাইকেলকে। শুধু সনি নয়, অনেক আগে এরচেয়েও অনেক বড় একটা ভুল করেছিলেন ডন নিজে। এটাই তাঁর জীবনের একমাত্র ভুল। একজন আইরিশ লোককে কনসিলিয়রির পদে বসানো উচিত হয়নি তাঁর। ধূর্তামি বা চাতুর্যের দিক থেকে কোন আইরিশের সাধ্য কি একজন সিসিলিয়র সমান হয়। অন্তত আর সব পরিবারগুলো তাই বিশ্বাস করত, ফলে কর্লিয়নদের চেয়ে বার্জিনি-টাটাল্লিয়াদেরকেই বেশি তোয়াজ করে আসছিল তারা। আর মাইকেল কর্লিয়নি সম্পর্কে ওদের ধারণা হলো, প্রাণ চাঞ্চল্য আর শক্তির দিক থেকে সনির সাথে ওর তুলনাই হয় না। সনি ছিল ভয়ঙ্কর, তার ভয়াবহতা মাইকেলের মধ্যে কোনদিনই দেখা যাবে না। তবে, মাইকেলের বুদ্ধিসূক্ষ্মি বেশি, তাও বাপের সমান নয়। কর্লিয়নি পরিবারের উত্তরাধিকারী হিসেবে মাইকেল মোটামুটি মাঝারি মানের। ওকে তেমন ভয় না করলেও চলবে।

শক্তি তো কমেছেই, সেই সাথে আরও একটা কারণে কর্লিয়নদের সম্মানও কমে গেছে বেশ খানিকটা। ডন শান্তি চুক্তি করায় সবাই তাঁকে দুর্বল ভাবল। তাঁর কূটনীতিকে শ্রদ্ধা করলেও, ছেলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিলেন না বলে এদের রাজ্যে কর্লিয়নদের মর্যাদা একেবারে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল। সবাই বিশ্বাস করল, ডনের এ-ধরনের কূটনীতির মূল কারণ দুর্বলতা।

আজ যারা ডন কর্লিয়নির লাইব্রেরিতে জড়ো হয়েছে তারা সবাই এসব ব্যাপার বিশদভাবে জানে। শুধু তাই নয়, এদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো সে-সব বিশ্বাসও করে।

মাইকেলকে কার্লো যে অপছন্দ করে তা নয়, কিন্তু কেমন যেন ভয় করে। অবশ্য সনিকে যেমন ভয় করত, মাইকেলকে তার একশো ভাগের এক ভাগও ভয় করে না। এ-কথা ক্রেমেঞ্জার বেলাতেও খাটে। সলোযো আর পুলিশ ক্যাপটেন ম্যাকক্লাস্টিকে খুন করার সময় মাইকেল যে বাহাদুরি দেখিয়েছিল, ক্রেমেঞ্জা সেটার উচ্ছৃঙ্খিত প্রশংসা করলেও, তার ধারণা ডন হবার জন্যে যে কঠোর মনোভাব দরকার, তা মাইকেলের নেই। ওর মনটা বড় নরম। অনেকদিন থেকেই আশা করে আছে ক্রেমেঞ্জা, আলাদা ভাবে নিজের পরিবার প্রতিষ্ঠা করার অধিকার দেয়া হবে তাকে। কিছুদিন আগে তার সেই আশাটা আরও বেড়ে উঠেছিল। নিজের সাম্রাজ্য কিভাবে গড়ে তুলবে সে-সম্পর্কে নানা পরিকল্পনা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেছিল সে। কিন্তু কিভাবে যেন সেটা টের পেয়ে গেলেন ডন কর্লিয়নি, তাই আভাসে-ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন, তা হবার নয়। অপরদিকে, গড ফাদারকে এত বেশি শ্রদ্ধা-

ভক্তি করে ক্লেমেঞ্জা যে তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করার কথা ভাবতে পর্যন্ত পারে না সে।

যদি না গোটা পরিস্থিতিটা একেবারে অসহ্য হয়ে ওঠে।

মাইকেল সম্পর্কে এদের সবার চেয়ে ভাল ধারণা পোষণ করে টেসিও। তুলনায় এদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান সে, সেটাই এর কারণ। মাইকেলের ভেতর অদ্ভুত একটা শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করে সে। মাইকেল সেটাকে অত্যন্ত কৌশলে গোপন করে রাখে, সাধারণ কাউকে জানতেই দেয় না সেই গোপন শক্তির অস্তিত্ব। এটা বাপের কাছ থেকে পেয়েছে ও। ডন কর্লিয়নির পুরানো শিক্ষা—বন্ধুরা যেন তোমাকে, তোমার গুণকে খাটো করে দেখে, আর শত্রুরা যেন তোমার দোষ-ত্রুটি বড় করে দেখে।

মাইকেল সম্পর্কে অবশ্য ডন কর্লিয়নির মনে কোন সংশয় নেই। তার সম্পর্কে টম হেগেনের মনেও নেই কোন বিভ্রান্তি। মাইকেল আবার কর্লিয়নি পরিবারকে তার পুরানো শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, এই বিশ্বাস আছে বলেই অবসর নিয়েছেন ডন, তা না হলে কখনোই সরে দাঁড়াতেন না। আর ওর বুদ্ধি এবং যোগ্যতা সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল খবর রাখে টম হেগেন। কেননা, সেই তো গত দু'বছর ধরে মাইকেলকে প্রশিক্ষণ দেবার দায়িত্ব পালন করে আসছে। পারিবারিক ব্যবসার অত্যন্ত জটিল নীতিমালা আর হিসাবগুলো এক নজর দেখেই সব কিছু বুঝে নেয় মাইকেল, ব্যাপারটা লক্ষ করে বিস্মিত না হয়ে পারে না হেগেন। ছেলেটা ঠিক যেন একেবারে বাপের মতই হয়েছে।

মাইকেল সম্পর্কে ক্লেমেঞ্জা আর টেসিওর ধারণা আলাদা হলেও, ওরা দু'জনেই ওর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে আছে। অসন্তুষ্ট হবার কারণও আছে ওদের। দুটো দলকেই ভেঙে একেবারে ছোট করে দিয়েছে মাইকেল, তাছাড়া, সনির দলটাকেও নতুন করে গড়ে নি আর।

খুব কম লোক নিয়ে মাত্র দুটো দল রয়েছে এখন কর্লিয়নিদের। দল ছোটো করাটাকে আত্মহত্যার সামিল বলে মনে করে ক্লেমেঞ্জা আর টেসিও। বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে তো এই পদক্ষেপ আত্মঘাতীক উন্মত্ত প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়, কেননা কর্লিয়নিদের সাম্রাজ্যে বার্জিনি-টাটাল্লিয়ারা হরহামেশাই অনধিকার প্রবেশ করে যেখানে যা পাচ্ছে খাবলা মেরে নিয়ে যাচ্ছে। আজকের ওরুত্বপূর্ণ বৈঠকে এই সব তুল সংশোধন করা হবে বলে আশা করছে ওরা।

প্রথমে ভেগাস যাত্রার ফলাফল ব্যাখ্যা করল মাইকেল। শেয়ার বিক্রি করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে মো গ্রীন, এই কথাটা পিঠে একটা আশ্বাসবাণী জুড়ে দিল ও, 'তবে, এবার এমন একটা প্রস্তাব দেয়া হবে তাকে, প্রত্যাখ্যান করার কথা ভাবতেই পারবে না সে।' একটু থেমে একে একে সবার দিকে একবার করে তাকাল ও, তারপর গুরু করল, 'কর্লিয়নি পরিবারকে পশ্চিমে তুলে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত হয়েছে, এ-কথা সবাই তোমরা জানো। ভেগাসের স্ট্রিপে চারটে হোটেল আর ক্যাসিনোর মালিকানা নিচ্ছি আমরা। তবে, এখনি রাতারাতি সব কিছু নিয়ে উঠে যাচ্ছি না। সব কিছু ওড়িয়ে নিতে বেশ একটু সময় লাগবে।' ক্লেমেঞ্জার দিকে

সরাসরি তাকাল মাইকেল, বলল, ‘পীট, তোমাকে আর টেসিওকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি আমি, তোমরা শুধু একটা বছর কোন রস্ম প্রশ্ন না তুলে, কোন আপত্তি না জানিয়ে আমার কথামত কাজ করো। বছরের শেষ দিকে কর্নিয়নি পরিবার থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে যার যার নিজের পরিবার প্রতিষ্ঠিত করবে তোমরা।’ সকৌতুক হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মাইকেলের চেহারা। ‘আশা করি এ-কথা না বললেও চলবে যে তোমরা আলাদা পরিবার গড়ে তুললেও আমাদের বন্ধুত্ব আর প্রীতির সম্পর্কটা চিরকালই বজায় থাকবে। সে যাক, আসল কথায় ফিরে আসি। অনুরোধটা আবার তোমাদের করছি আমি। এই একটা বছর চোখ-কান বুজে আমার নির্দেশ মেনে চলো তোমরা। মনে কোরো না অন্য কিছু ভাবছি আমি। তা ভাবলে তোমাদেরকে, বাবার প্রতি তোমাদের আনুগত্যকে অপমান করা হয়, সেটা আমি জানি। কিন্তু এই একটা বছর অন্ধের মত অনুসরণ করো আমাকে, এই আমি চাই। জানি, অনেক ব্যাপারে দৃষ্টিভ্রান্তি আছে তোমাদের। কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, এমন সব পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে, যার ফলে তোমরা যে-সমস্যাগুলোর সমাধান হচ্ছে না বলে মনে করছ সেগুলোরও সঠিক সমাধান হয়ে যাবে। একটু ধৈর্য ধরে থাকো, ব্যাস, তোমাদের কাছ থেকে আর কিছু চাই না আমি।’

‘আমার একটা বক্তব্য আছে,’ মুখ খুলল টেসিও। ‘মো গ্রীন তোমার বাবার সাথে দেখা করে কথা বলতে চাইছে, বেশ তো, বলুক না, তাতে অসুবিধেটা কোথায়? ডন কবে কাকে রাজি করাতে পারেননি, বলো? ওঁর যুক্তির সামনে কেউ কোনদিন দাঁড়াতে পেরেছে?’

মাইকেল নয়, টেসিওর প্রশ্নের উত্তর দিলেন ডন নিজেই। বললেন, ‘এসবের মধ্যে কিন্তু আমি নেই। তোমরা তো জানোই, আমি অবসর নিয়েছি। তারপরও যদি মাইকেলের ব্যাপারে নাক গলাই, ওকে অসম্মান করা হয়। তাছাড়া, বিশেষ করে ওই লোকটার সাথে কথা বলার কোন ইচ্ছে আমার নেই।’

ফ্রেডির চড় খাওয়া সম্পর্কে একটা গুজব টেসিওর কানেও গেছে, সেটা এখন মনে পড়ে গেল তার। কেমন যেন সন্দেহ জাগল মনে। কথা আর না বাড়িয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল সে। ব্যাপারটা মোটামুটি আঁচ করতে পারছে, সম্ভবত এরই মধ্যে খরচের খাতায় নাম উঠে গেছে মো গ্রীনের। কর্নিয়নি পরিবার তাকে আর রাজি করাতে চায় না।

কার্লো মুখ খুলল এরপর, মাইকেলের কথা যেন ঠিক ধরতে পারেনি সে। ‘কর্নিয়নি পরিবার তবে কি তাদের নিউ ইয়র্কের সমস্ত ব্যবসা উঠিয়ে দেবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে?’

মাথা দুলিয়ে মাইকেল বলল, ‘হ্যাঁ। জলপাই তেলের ব্যবসাটাও বিক্রি করে দিচ্ছি আমরা। সবটা নয়, কারণ যতটুকু পারা যায় ক্লেমেঞ্জা আর টেসিওকে দিয়ে দেয়া হচ্ছে। তবে... ভাল কথা, কার্লো, তুমি আবার তোমার চাকরির কথা ভেবে দৃষ্টিভ্রান্তি কোরো না। তোমার জন্যে ভাল একটা ব্যবস্থার কথা ভেবে রেখেছি আমি। তুমি মানুষ, হয়েছ নেভাডায়, ওখানকার লোকজন আর হালচাল সম্পর্কে তোমার মত অভিজ্ঞতা আর কারও নেই—সুতরাং তোমার যদি আপত্তি না থাকে, আমি আশা

করে আছি আমরা ওখানে শিকড় গেড়ে বসলে তুমিই হবে আমার ডান হাত।’

চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল কার্লো। আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তার চেহারা। যাক, ভাবছে সে, এতদিনে তাহলে ভাগ্য খুলল। এই ধরনের কিছু একটার আশাতেই তো অপেক্ষা করে ছিল সে, সেই আশাতেই তো কর্লিয়নি পরিবারের নিরস মেয়েটাকে বিয়ে করেছে। এখন তার হাতে ক্ষমতা আসবে।

‘কনসিলিয়রির পদে টম হেগেন আর থাকছে না,’ বলছে চলেছে মাইকেল। ‘ভেগাসে ওকে আমি আমাদের উকিল হিসেবে চাই। দু’মাসের মধ্যে সম্প্রদায়ের ওখানে চলে যাচ্ছে ও, ওখানেই পাকাপাকি ভাবে বসবাস করবে। শুধু আইন, তাছাড়া অন্য কোন বিষয়ে মাথা ঘামাবে না ও। আমার কথাই অর্থ সবাই বুঝতে পারলে কি? তার মানে, এখন থেকে কেউ কোন কাজ নিয়ে ওর কাছে যাবে না তোমরা। টমের ব্যাপারে কোন ইঙ্গিত দেবার জন্যে কথাগুলো বলছি আমি তা ভেব না কেউ। প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা ব্যবস্থা করেছি, শুধু সেগুলো জানিয়ে দিচ্ছি। টমকে এখানে আমার কোন দরকার নেই। আর যদি পরামর্শেরই দরকার হয়, বাবা তো রয়েছেই, তাঁর চেয়ে ভাল পরামর্শ কে আর দিতে পারবে আমাকে?’

হেসে ফেলল সবাই।

কিন্তু শেষ কথাটা ঠাট্টার সুরে বললেও, মাইকেলের মূল বক্তব্য বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না কারও, ক্ষমতাহীন হয়ে গেল টম হেগেন। এক কথায়, বাদ দেয়া হলো তাকে। প্রত্যেকে একবার চোরা চোখে ওর দিকে তাকাল।

ভাবের কোন চিহ্নমাত্র নেই টম হেগেনের চেহারায়।

সাম্প্রদায়িক মোটা ক্রেমেঞ্জা নড়েচড়ে বসে ভারি গলায় জানতে চাইল, ‘তার মানে, এক বছর পর আমরা যে যার নিজেরটা বুঝে নিয়ে সরে যাব, তুমি ঠিক এই কথাটাই বলতে চাইছ, নাকি?’

সৌজন্য দেখাতে কার্পণ্য করল না মাইকেল। ‘এক বছর নাও লাগতে পারে। তার আগেই সব ব্যবস্থা করে ফেলার সুযোগ পাবে তোমরা। তবে, আমাদের মধ্যে কেউ যদি চাও চিরকাল কর্লিয়নি পরিবারের সাথে থেকে যাবে, তাতেও কোন বাধা নেই। কিন্তু আমাদের ক্ষমতার কেন্দ্র এবং উৎস হবে পশ্চিমে, সেখানে তোমরা হয়তো নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে পারবে না। আমার তো মনে হয় স্বাধীনভাবে পরিবার গড়লেই ভাল করবে তোমরা।’

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার মুখ খুলল টেসিও। ‘তাই যদি হয়, তাহলে দলে নতুন লোক ভর্তি করার অনুমতি দাও আমাকে। বেজম্মা শয়তান বার্জিনিরা আমার এলাকায় ঢুকে রোজই থাবা মারছে। ভদ্রতা কাকে বলে তা একটু শিখিয়ে দেয়া দরকার ওদেরকে।’

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল মাইকেল। ‘না,’ বলল ও। ‘দল বড় করে লাভ নেই কোন। থাবা মারছে, মারুক, মারতে দাও—কোনরকম অস্বাভাবিক তৎপরতা দেখাতে যেয়ো না। ভেব না তোমাদেরকে অসহায় বা দুর্বল অবস্থায় এখানে ফেলে রেখে যাব আমরা। সবদিক বিবেচনা করে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে, তোমাদের সমস্ত

সমস্যা মিটিয়ে দেয়া হবে আমরা চলে যাবার আগেই।’

কিন্তু টেসিওকে এত সহজে সন্তুষ্ট করতে পারল না মাইকেল। ওকে অসন্তুষ্ট করলে ঝুঁকি নেয়া হয়ে যায়, এ-কথা জানা সত্ত্বেও ঝুঁকিটা নিল টেসিও। মাইকেলের দিকে তাকালই না, সরাসরি ফিরল ডনের দিকে। বলল, ‘গড ফাদার, অপরাধ হয়ে গেলে মাফ কোরো আমাকে। কিন্তু দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্বের দায়িত্বের কথা মনে রেখে কথাটা আমাকে বলতেই হচ্ছে। আমি মনে করি, নেভাডায় চলে যাবার ব্যাপারে তুমি আর তোমার ছেলে ভুল সিদ্ধান্ত নিচ্ছ। তোমাদের পেছনে যদি এখানের জোবাল শক্তি না থাকে সেখানে গিয়ে সাফল্যের আশা করো কি করে? শক্তি আর সাফল্য, একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটাকে কল্পনা করা যায় না। তাছাড়া, তোমরা এখানে না থাকলে বার্জিনি আর টাটাগ্লিয়া জোটের সাথে কোনমতেই এঁটে উঠব না আমরা। পীট আর আমি একেবারে পানিতে পড়ে যাব। এই আমি বলে রাখছি, দেখো, দু’দিন আগে আর পরে, শেষ পর্যন্ত ওদের হাতের মুঠোয় গিয়ে পড়তে হবে আমাদের। ওদের বশ্যতা স্বীকার করাও যা, আত্মসমর্পণ করাও তাই, কিছুদিন পর আমাদের অস্তিত্বই থাকবে না।’ একটু দম নিল টেসিও। তারপর আবার বলল, ‘বার্জিনি লোকটাকে আমি সহ্যই করতে পারি না। কিন্তু সেটা প্রসঙ্গ নয়। আমি বলতে চাই, একান্তই যদি কর্নিয়নি পরিবারকে জায়গা বদল করতে হয়, সেটা যেন আমাদের জোর আছে বলেই করা হয়, দুর্বলতার জন্যে নয়। ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের উচিত ক্রমেজ্ঞা আর আমার দল দুটোকে নতুন করে গড়ে তোলা, সৈনিকের সংখ্যা আরও বাড়ানো, তারপর অন্তত স্টেটেন আইল্যান্ডের হারানো জায়গাগুলোকে আবার কজা করা।’

শান্তি ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন ডন কর্নিয়নি। বললেন, ‘আমি ওদের সাথে শান্তি চুক্তি করেছি, মনে নেই? একবার কথা দিয়েছি, সে কথা আমি আর ভাঙতে পারব না।’

কিন্তু টেসিওকে কার সাধ্য থামায় আজ। ‘শান্তি চুক্তি করেছ, কিন্তু তারপরও কি বার্জিনিরা তোমাকে কম খুঁচিয়েছে? সবাই জানে, ওদের জুলায় অতিষ্ঠ হয়ে আছি আমরা। শান্তি চুক্তি লঙ্ঘন করার জন্যে এর চেয়ে বড় কারণের দরকার হয় না। তুমি কথার খেলাপ করতে চাও না, বেশ, নাই করলে—কিন্তু মাইকেল যদি পরিবারের নতুন নেতা হয়ে থাকে, ওদের বিরুদ্ধে সে কেন ব্যবস্থা নিতে পারবে না? মাইকেল যদি কোন পদক্ষেপ নেয়, তার দায়দায়িত্ব তো আর তোমাকে বইতে হবে না।’

তীক্ষ্ণ গলা শোনা গেল মাইকেলের। চেহারাটা শান্ত দেখাচ্ছে ওর, কিন্তু আশ্চর্য একটা কর্তৃত্বের ভাব ফুটে উঠেছে চোখে-মুখে। নেতাসুলভ একটা কাঠিন্য লক্ষ করল সবাই ওর কণ্ঠস্বরে। ‘একটু ধৈর্য ধরো, তোমার সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে তুমি। একটু আগেই তো বললাম, সব দিক বিবেচনা করে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। দৃষ্টিভ্রান্তি করার কোন কারণই নেই তোমার। আমার মুখের কথা যদি যথেষ্ট বলে মনে না হয়, তোমার ডনকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।’

এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে টেসিও, বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে সে। ডনকে এখন

কিছু জিজ্ঞেস করতে যাওয়া মানে মাইকেলের শ্রুতি অর্জন করা। শাগ করল সে, বলল, 'নিজের জন্যে নয়, কর্লিয়নি পরিবারের ভালর জন্যেই কথাটা বলছিলাম আমি। নিজের ব্যবস্থা করে নিতে কোন অসুবিধে হবে না আমার।'

ডনকে প্রশ্ন না করে মাইকেলের সম্মান রক্ষা করেছে টেসিও, তাতে খুশি হয়ে আন্তরিকতার সাথে হাসল মাইকেল। 'তোমাকে আমি কোনদিন অবিশ্বাস করিনি, টেসিও। আজও করছি না। কিন্তু আমি চাই, তুমিও আমার ওপর বিশ্বাস রাখো। এ তো জানা কথা যে তোমার বা পীটের সমান কোনদিনই হতে পারব না আমি। কিন্তু অবসর নিলেও, হাজার হোক বাবা তো বেঁচে রয়েছেন, চাইলে সব রকম পরামর্শই তো তাঁর কাছ থেকে নিতে পারব, ঠিক কিনা? তুমি যেরকম ভয় পাচ্ছ সেরকম দূরবস্থায় পড়ব না আমরা—পরিণাম সবার জন্যেই ভাল হবে, দেখো।'

এর খানিক পরই শেষ হয়ে গেল বৈঠক। আজকের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হলো, দুই ক্যাপোরেজিমি যার যার আলাদা পরিবার প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি পাবে। ঠিক হয়েছে, ককলিনের জুয়ার আঙাগুলো আর জাহাজঘাটা থাকবে টেসিওর দখলে, ক্রেমেঞ্জা পাবে লং আইল্যাণ্ডে ঘোড়দৌড় জুয়ায় কর্লিয়নি পরিবারের অংশ আর ম্যান হাটনের জুয়ার আঙাগুলো।

ক্যাপোরেজিমিরা বিদায় নিয়ে চলে গেল, কিন্তু দু'জনের কেউই পুরোপুরি সন্তুষ্টি বোধ করছে না। মাইকেলের কথা কতটুকু বিশ্বাস করা যায় সে-ব্যাপারে সংশয় রয়েছে ওদের মনে।

ক্যাপোরেজিমিরা চলে যাবার পরও লাইব্রেরি রুমে থেকে গেল কার্লো। তার ধারণা, এতদিনে তাকেও পরিবারের একজন বলে মনে করার সময় হয়েছে। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই টের পেল সে মাইকেল এখনও ঠিক তা মনে করছে না। ডন, হেগেন এবং মাইকেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ক্ষুণ্ণ মনে সেখান থেকে বেরিয়ে এল সে। তাকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল অ্যালবার্ট নেরি। আলোকিত উঠান পেরোবার সময় হঠাৎ একবার পিছন ফিরে তাকাল কার্লো, দেখল, এখনও তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নেরি।

এতক্ষণে পরিবেশটা ঘরোয়া হয়ে এল। দীর্ঘদিন একই পরিবারে আছে এরা, হৃদয়ের টান আছে পরস্পরের প্রতি, এক সাথে হলে অদ্ভুত একটা স্বস্তিবোধ করে তিনজনই। ডনকে "অ্যানিসেট" ঢেলে দিল মাইকেল, হেগেনের হাতে ধরিয়ে দিল হুইস্কি ভর্তি গ্লাস। আজকাল এমনিতে মদ-টদ খায় না বললেই চলে, তবু নিজেও আজ একটু হুইস্কি নিল মাইকেল।

'এবার বলো, মাইকেল।' প্রথম মুখ খুলেই সরাসরি জানতে চাইল টম হেগেন, 'সব কাজ থেকে আমাকে কি মনে করে বাদি দিচ্ছ তুমি?'

মুহূর্তের জন্যে চমকে উঠল মাইকেল কর্লিয়নি। কিন্তু দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'ভেগাসে তুমিই তো হবে আমার ডান হাত। সিদ্ধান্ত হয়েছে, ওখানে আমরা প্রতিটি বিষয়ে অত্যন্ত কড়া কড়িভাবে আইন মেনে চলব, তাই ঘাও একজন আইন-উপদেষ্টা দরকার হবে আমার। এই পদের জন্যে যাকে-তাকে নির্বাচন করা চলে না, কারণ তাকে বিশ্বস্তও হতে হবে। আমার জানামতে দুটো ব্যাপারেই তুমি

সবার সেরা। তাই ওই পদে তোমাকে নির্বাচন করেছি। এর চেয়ে সম্মানজনক আর গুরুত্বপূর্ণ পদ আর কি হতে পারে?’

ম্যান একটু হাসি ফুটল হেগেনের মুখে। ‘তুমি আমার কথা ধরতে পারোনি,’ বলল সে। ‘আমি রকো ল্যাম্পনির কথা বলছি। আমাকে না জানিয়ে গোপন একটা দল গড়ছে সে। আমি অ্যালবার্ট নেরির কথা বলছি। ক্যাপোরেজিমিদের বা আমার মাধ্যমে নয়, তুমি নেরির সাথেও সরাসরি কাজকারবার করছ। রকো কি করছে তা তুমি জানো না, এ আমি বিশ্বাস করি না।’

‘রকো ল্যাম্পনি দল গড়ছে তা তুমি জানলে কিভাবে?’ নিচু গলায় জানতে চাইল মাইকেল।

শ্রাণ করল হেগেন। ‘চিহ্নিত হবার কিছু নেই, ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যায়নি, আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। আমি কিভাবে জানলাম?’ একটু হাসল হেগেন। ‘এমন একটা পদে বসে আছি আমি, যেখানে বসে থাকলে না চাইলেও সমস্ত খবর চলে আসে আমার কাছে। জীবিকার আলাদা ব্যবস্থা করে দিয়েছ তুমি রকোকে, স্বাধীনতাও দিয়েছ বেশ অনেকটা। ফলে খুদে একটা সাম্রাজ্য পেয়ে গেছে হাতে। সাম্রাজ্যটা পরিচালনার জন্যে লোক দরকার হচ্ছে তার। কিন্তু যে-লোককেই চাকরি দিচ্ছে সে, প্রত্যেকের বিশদ পরিচয় এসে পৌঁচাচ্ছে আমার হাতে। যে-লোক যে-পদের জন্যে উপযুক্ত, রকো তাকে তার চেয়ে ভাল পদে বসচ্ছে, বেতন আর অন্যান্য সুবিধেও দিচ্ছে অস্বাভাবিক বেশি রকম। অবশ্য, নেরির ব্যাপারটা অন্যরকম। ওকে বেছে নিয়ে অত্যন্ত বুদ্ধিমানের কাজ করেছ তুমি। ওর কাজে কোন খুঁত নেই। এক কথায় চমৎকার।’

মন খারাপ করে মাইকেল বলল, ‘তোমার চোখে ধরা পড়ে গেছে, তার মানে নিশ্চয়ই কাজে খুঁত আছে ওর। না, আমি ওকে বেছে নেইনি, কৃতিত্বটা বাবার।’

‘বেশ,’ বলল হেগেন। ‘কিন্তু আমাকে কেন বাদ দেয়া হচ্ছে?’

ধীরে ধীরে হেগেনের দিকে তাকাল মাইকেল। কোনরকম কুণ্ঠা দেখা গেল না ওর মধ্যে, শান্ত ভাবে কিন্তু সরাসরি স্পষ্ট গলায় বলল, ‘যুদ্ধকালীন উপদেষ্টা হবার যোগ্য তুমি নও, টম। যে পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছি আমরা, পরিস্থিতি তাতে সঙ্গীন হয়ে ওঠার আশঙ্কা রয়েছে। আমাদেরকে হয়তো শেষ পর্যন্ত লড়তে হতে পারে। তা যদি হয়, তোমার মন্ত্রণা কাজে লাগবে না আমাদের। তাছাড়া, কে জানে কি হয়, তোমাকে বিপদের সামনে থেকে সরিয়ে দিতে চাই আমরা।’

লাল হয়ে উঠেছে হেগেনের মুখ। কথাগুলো যদি ডন বলতেন শত্রুর সাথে মেনে নিত সে। কিন্তু এইরকম একটা চরম সিদ্ধান্ত মাইকেল কিভাবে নেয়?

‘বেশ,’ একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল হেগেন। ‘কিন্তু একদিক থেকে টেসিওর সাপে আমিও একমত। আমারও ধারণা, ভুল নিয়মে কাজ করছ তুমি। শক্তি আছে বলে নয়, করছ দুর্বল বলে। এর পরিণাম কখনও ভাল হয় না। বাজিনিকে চিনতে ভুল কোরো না। সে একটা হিংস্র নেকড়ে বাঘ, তোমাদেরকে ছিড়ে টুকরো টুকরো করার জন্যে যখন ঝাঁপিয়ে পড়বে, অন্য পরিবারগুলো থেকে কেউ তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্যে একটা আঙুলও তুলবে না।’

এতক্ষণে মুখ খুললেন ডন। 'তোমাকে জানানো দরকার, টম, সিদ্ধান্তটা মাইকেলের একার নয়। পরামর্শটা আমিই ওকে দিয়েছি। এমন কিছু কাজ করার দরকার হতে পারে, যার দায়-দায়িত্ব নিতে রাজি নই আমি। তোমার কথা যদি ওঠে, তোমাকে আমি কখনোই অযোগ্য কনসিলিয়রি বলে মনে করিনি। সান্তিনোর আত্মা শান্তি পাক, তাকে আমি অযোগ্য ডন বলে মনে করতাম। মনটা ভাল ছিল, কিন্তু আমি শয্যাশায়ী হবার পর পরিবারের নেতা হবার যোগ্যতা তার ছিল না। তারপর, কে জানত ফ্রিডোর মগজের সাথে মেয়েদের আঙুলে সুতো বাঁধা থাকবে? দেখো, টম, মন খারাপ কোরো না। মাইকেলের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখি আমি, তোমার ওপরও রাখি। কিন্তু তোমার অজ্ঞাত কয়েকটা কারণে কিছু ঘটনা ঘটানো সম্ভাবনা রয়েছে, সে-সবের মধ্যে তোমার জড়িয়ে পড়া উচিত হবে না বলে মনে করেছি আমরা। ভাল কথা, মাইকেলকে আমি আগেই বলেছিলাম, ল্যাম্পনি দল গড়ছে, এটা তোমার কাছে লুকিয়ে রাখা যাবে না। তোমার ওপর আমার কতটা আস্থা, বুঝতে পারছ তো?'

'বিশ্বাস করো,' হেসে ফেলে বলল মাইকেল, 'আমি কল্পনাও করিনি যে তোমার চোখে সব ধরা পড়ে যাবে।'

সান্তুনা দেয়া হচ্ছে তাকে, বুঝতে পেরে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল হেগেন। মাইকেলের দিকে তাকাল সে। বলল, 'ভেবে দেখো, আমি হয়তো কোন সাহায্যে আসতে পারি।'

দৃঢ় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মাইকেল। 'না, টম,' বলল ও, 'তোমাকে বাদ দেয়া হয়েছে।'

নিঃশব্দে হুইস্টিটুকু শেষ করল হেগেন। তারপর বিদায় নেবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। যাবার আগে নরম গলায়, কিন্তু ক্ষীণ বিদ্রোহের সুরে বলল, 'তুমি প্রায় তোমার বাবার মতই কৌশলী হয়ে উঠেছ, মাইকেল। কিন্তু একটা বিষয় গিথতে এখনও বাকি আছে তোমার।'

'কি সেটা?' ভদ্রতার স্বাতিরে জানতে চাইল মাইকেল।

'কিভাবে "না" বলতে হয়।'

গম্ভীর হয়ে উঠল মাইকেল। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিকই ধরেছ। কথাটা মনে রাখব আমি।'

চলে গেল হেগেন। রসিকতার ছলে বাবাকে প্রণাম করল মাইকেল, 'সবই তাহলে আমাকে শিখিয়েছ তুমি, শুধু একটা ছাড়া? এবার শেখাও, কিভাবে "না" বললে খুশি হয় মানুষ?'

ডন উঠে গিয়ে তাঁর মস্ত ডেস্কের পিছনে, রিভলভিং চেয়ারটায় আরাম করে বসলেন। 'গোপন মন্ত্রটা হলো, যাদেরকে তুমি ভালবাস, তাদেরকে "না" বলা যায় না, অন্তত বারবার নয়। তবু যদি উপায় না থাকে, "না" বলতেই হয়, সেক্ষেত্রে নিয়ম হলো, কথাটা এমন ভাবে বলবে তুমি যেন সেটা "হ্যাঁ" এর মত লাগে। অথবা তাকে দিয়ে "না"-টি বলিয়ে নিতে হয়। কাজটা অপ্রীতিকর, তাই একটু সময় নিতে হয়, বেশ একটু কষ্ট স্বীকার করতে হয়। কিন্তু আমি সেকেন্দ্রে মানুষ, তোমরা

নতুন যুগের নতুন মানুষ, আমার কথায় কান দিয়ো না।’

হাসল মাইকেল। বলল, ‘ঠিক। কিন্তু টমকে বাদ দেয়ার ব্যাপারে তুমি আমাকে সমর্থন করছ তো?’

‘ওকে কোনভাবেই এর মধ্যে জড়ানো চলে না,’ মাথা নেড়ে বললেন ডন।

‘এবার তোমাকে একটা কথা বলতে চাই আমি,’ মৃদু কণ্ঠে বলল মাইকেল। ‘কথাটা জানাবার সময় হয়েছে তোমাকে। যা করতে যাচ্ছি, তা শুধু অ্যাপলোনিয়া আর সনির বদলা নেবার জন্যে নয়। কাজটা করাই উচিত। বার্জিনিদের সম্পর্কে টেসিওর কথাটাই ঠিক।’

উপর নিচে মাথা দোলালেন ডন। ‘ঠাণ্ডা হলে প্রতিশোধ জিনিসটা মিঠে হয়। শান্তি না করলে তুমি জীবিত অবস্থায় বাড়ি ফিরে আসতে পারবে না, এটা আমি জানতাম। সেজন্যেই তো শান্তি চুক্তি করতে হলো। কিন্তু তারপরও বার্জিনিরা চেষ্টা করল দেখে সত্যি অবাক হয়ে গেছি আমি। সম্ভবত শান্তি চুক্তির আগেই তোমাকে সরাবার একটা ব্যবস্থা করা হয়ে গিয়েছিল, পরে সেটাকে আর সময় পায়নি রদ করার। তোমাকেই ওরা মারতে চেয়েছিল, ডন টমাসিনোকে নয়—ঠিক জানো তো?’

‘ভাবটা ওই রকমই দেখাতে চেয়েছিল। যেন ডন টমাসিনোকেই মারতে চেয়েছে ওরা,’ বলল মাইকেল। ‘মোট কথা ওদের তরফ থেকে কোন খুঁত ছিল না কাজে। আমি মারা গেলে তুমি পর্যন্ত টের পেতে না বা সন্দেহ করতে না। কিন্তু আমি বেঁচে যাওয়ায় সব ভেসে গেল ওদের। আমি নিজের চোখে পালিয়ে যেতে দেখেছি ফ্যাব্রিয়িয়াকে।’

‘রাখালটার খবর পেয়েছে ওরা?’ জানতে চাইলেন ডন।

‘আমি পেয়েছি,’ বলল মাইকেল। ‘বছরখানেক আগে। নতুন নাম নিয়েছে, জাল পাসপোর্ট, ভুয়া পরিচয়। চুটিয়ে ব্যবসা করছে ফ্যাব্রিয়িয়াকে।’

নিঃশব্দে উপরে-নিচে মাথা দোলালেন ডন। খানিক পর বললেন, ‘তাহলে আর অপেক্ষা করার দরকার নেই। কবে রওনা হবে তুমি?’

‘তোমাদের বউমার ডেনিভারি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাই,’ বলল মাইকেল। ‘কিন্তু তার আগেই টমকে আমি ভেগাসে ওড়িয়ে বসা অবস্থায় দেখতে চাই। গোলমাল যদি কিছু ঘটেই, তার সাথে যেন ওর কোন সম্পর্ক না থাকে। এখন থেকে এক বছর পর, ধরো।’

ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে নিলেন ডন কর্লিয়নি। সাদা দেয়ালের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মৃদু গলায় জানতে চাইলেন, ‘কিভাবে কি করবে সব ঠিক করেছ?’

‘কিন্তু এর মধ্যে তুমি থাকবে না,’ নরম সুরে বলল মাইকেল। ‘যা ঘটবে তাতে তোমার কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না। সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছি আমি। এমন কি ভেটো দেবারও অধিকার পাচ্ছ না তুমি। অন্তত এই ব্যাপারে তা যদি করতে চাও, পরিবার ছেড়ে বেরিয়ে চলে যাব আমি। এর মধ্যে তোমার কোন ভূমিকা থাকবে না।’

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকলেন ডন কর্লিয়নি। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস

ফেলে বললেন, 'বেশ, তবে তাই হোক। বোধহয় সেজন্যেই অবসর নিয়েছি আমি, সে জন্যেই সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছি তোমার হাতে। একটা জীবনে যা যা করণীয় ছিল আমার, তার সবগুলো করেছি। অতিরিক্ত আরও কিছু দায়িত্ব এখনও হয়তো কাঁধে নিতে পারি, কিন্তু এখন আর সে মন নেই। তাছাড়া, 'মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে উঠে আবার প্রসঙ্গে ফিরে এলেন তিনি, 'এমন কিছু কর্তব্যও থাকে যেগুলোর ভার মানব-শ্রেষ্ঠও নিতে পারে না। বেশ। তবে তাই হোক!'

বছর শেষ হবার আগেই কে অ্যাডামস্ কর্নিয়নি তার দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিল। এটাও পুত্রসন্তান। খুব সহজেই প্রসব করে কে, গোলমাল হয় না। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলে রাজেন্দ্রাণীর মত অভ্যর্থনা করা হলো তাকে।

খোকার পরার জন্যে সুন্দর এক সেট কাপড় দিয়েছে কনি কর্নিয়নি। কাপড়গুলো বেশমের, সেলাই করা হয়েছে ইটালিতে। খুবই দামী জিনিস। কনি তার ভাইবউকে জানাল, 'অনেক খুঁজেপেতে বের করেছে ওগুলো কার্নো।' 'তোমার ছেলের জন্যে অসাধারণ একটা উপহার চাই, তাই সমস্ত নিউ ইয়র্ক টুন্ডে এটা আবিষ্কার করেছে ও! আমার চোখে তো ভাল জিনিস পড়লই না।'

মৃদু হেসে ধন্যবাদ জানাল কে। তখন মনে মনে ঠিক করে ফেলল, এত বড় একটা আনন্দের কথা অবশ্যই জানাতে হবে মাইকেলকে। কর্নিয়নি পরিবারে এসে সে-ও পুরোপুরি সিসিলিয়ান বনে গেছে।

ওই বছরই মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে মারা গেল নিনো ভ্যালেন্টি। নিনোকে নায়ক করে যে ছবিটা তৈরি করেছে জনি ফন্টেন সেটা মুক্তি পাবার পরপরই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল, ট্যাবলয়েড পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে ছাপা হলো ওর মৃত্যু সংবাদ। সদ্য মুক্তি পাওয়া ছবিটা রাতারাতি অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করল। সমালোচকরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করল, নিনোর অভিনয় প্রতিভার তুলনা হয় না। খবরের কাগজগুলো লিখল, বন্ধুর অভ্যেষ্ঠিক্রিয়ার সমস্ত দায়িত্ব জনি ফন্টেন নিয়েছে সমাধিস্থ করার দিন পরিবারের লোকজন আর নিনো ভ্যালেন্টির ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা ছাড়া আর কেউ উপস্থিত থাকবে না। এক সাংবাদিক তো বেপরোয়া সাহস দেখিয়ে এতদূর পর্যন্ত দাবি করল যে জনি ফন্টেন নাকি এক সাক্ষাৎকারে তার কাছে স্বীকার করেছে, বন্ধুর মৃত্যুর জন্যে সেই দায়ী। তার উচিত ছিল বন্ধুকে ডাক্তারের হাতে তুলে দেয়া। কিন্তু সাক্ষাৎকারটা এমন চতুর ভাষায় লেখা হয়েছে, জনির কথাগুলো কোন মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় স্পর্শকাতর নিরীহ দর্শকের আত্মগ্লানির মত শোনাচ্ছিল নিনো ছিল তার বাল্যবন্ধু, সেই বাল্যবন্ধুকে সে শ্রেষ্ঠ তারকা পর্যন্ত বানিয়ে দিয়েছিল--সবই স্বীকার করল, একজন বন্ধুর জন্যে এর বেশি আর কি করা যায়।

ক্যালিফোর্নিয়ায় সমাধিস্থ করা হলো নিনোকে। কর্নিয়নি পরিবারের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত হলো শুধু ফ্রেডি। আর এল লুসি ম্যানচিনি, জুলস সীগল। ডন কর্নিয়নি নিজে আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হঠাৎ করে হার্টের অসুখটা বেড়ে গেল, ডাক্তাররা এক মাস বিছানা থেকে নামতে বারণ করায় তাঁর আর আসা হয়নি। প্রকাণ্ড একটা ফুলের রীদ পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি। নেরিও এল পশ্চিমে, সম্ভবত

পারিবারিক ব্যবসার নতুন পরিচালক মাইকেল কর্লিয়নির প্রতিনিধি হিসেবে।

সমাধিস্থ করা হয়ে গেল নিনোকে। এর দু'দিন পরের ঘটনা। চিত্রতারকা প্রণয়নীর বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে মো গ্রীন, এই সময় কে যেন তাকে গুলি করে মেরে ফেলল। এর প্রায় এক মাস পর আবার নিউ ইয়র্কে দেখা গেল অ্যালবার্ট নেরিকে। ক্যারিবিয়ান সাগরের বেলাভূমিতে দীর্ঘ ছুটি কাটিয়ে এসেছে সে, শরীরটাকে রোদে পুড়িয়ে একেবারে কালো করে এনেছে।

মাইকেল কর্লিয়নি তাকে অভ্যর্থনা করল হাসিমুখে। দু'একটা প্রশংসার কথা বলে তাকে জানাল, এখন থেকে নেরি বাড়তি কিছু ভাতা পাবে। ইস্ট সাইডের একটা বুক মেকারের ঘাটির সবটুকু আয়। সবাই জানে, তাও চাটখানি কথা নয়।

অ্যালবার্ট নেরি মহাখুশি। এই রকম একটা জগৎই দরকার তার, যেখানে কর্তব্যপালনের পরিবর্তে মুনাফা পাওয়া যায়। কর্লিয়নি পরিবারের সাথে বসবাস করতে পেরে সন্তুষ্ট সে

সম্ভাব্য সব ঘটনার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করেছে মাইকেল কর্লিয়নি। সবচেয়ে আগে নিশ্চিত, নিশ্চিত করেছে নিজের নিরাপত্তা। ওর পরিকল্পনাতেও কোন খুঁত নেই কোথাও। ঋণ ধরে বসে আছে ও, মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বছরের পুরোটা সময় প্রস্তুতি নেবে। কিন্তু পুরো একটা বছর কপালে জুটল না ওর। অপ্রত্যাশিতভাবে ভাগ্যই বাধা দিল ওকে। গড ফাদার নিজে, মহান ডন স্ময়ং, পরিকল্পনা রদবদল করতে বাধ্য করলেন মাইকেলকে। ছেলে শর্ত দিয়েছিল, তার পরিকল্পনায় নাক গলাতে পারবেন না তিনি। কিন্তু আশ্চর্য এক চাল চলে ছেলের পরিকল্পনায় নিজের খানিকটা অবদান রাখলেনই ডন।

রোববারের রোদ ঝলমলে সকাল। বাড়ির মেয়েরা সবাই গির্জায় গেছে। বাগান করার উর্দি গায়ে চড়ালেন ডন কর্লিয়নি। ছাই রঙের টিলেঢালা প্যান্ট, রঙ-ওঠা নীল শার্ট, মাথায় ভোবড়ানো, নোংরা ফিডরা টুপি। টুপিটায় আবার রেশমি ফিতে পরানো রয়েছে

আগের চেয়ে অনেক মোটা হয়ে গেছেন ডন। তাঁর বক্তব্য, টমেটো-লতার যত্ন নেন স্বাস্থ্যের কারণে। কিন্তু আসল কারণটা জানতে আর বাকি নেই কারও।

আসল কারণ বাগান করতে ভালবাসেন তিনি। ভোরে ঘুম থেকে উঠে বাগানে এলে, শরীর এবং মনে আশ্চর্য একটা পবিত্রতা অনুভব করেন। মুহূর্তে ফিরে যান যাট বছর পিছনের জীবনে, সিঁদিলিতে সেই তাঁর শৈশবে। বাবার বীভৎস মৃত্যু আর শোকের স্মৃতিটুকু সাবধানে মন থেকে সরিয়ে দেন। কিছুক্ষণ সুখ-স্মৃতি রোমন্থন করেন।

সারি সারি শিম গাছের ডগায় কচি সাদা ফুল ধরেছে, তাদের ঘিরে রেখেছে পেঁয়াজ-গাছের শক্ত সবুজ বোঁটা। বাগানের এক ধারে মুখ বন্ধ একটা বিরাট পিপে দেখা যাচ্ছে, পিপেটা যেন পাহারা দিচ্ছে বাগানকে। গোবরের সার রয়েছে ওটায়, এর চেয়ে ভাল সার আর হয় না। বাগানের আরেক দিকে কাঠের চার কোণা ফ্রেম বানিয়ে রেখেছেন ডন, তার উপরই লতিয়ে উঠেছে টমেটো গাছগুলো।

পানি দিতে হবে বলে একটু ব্যস্তভাবে আজ বাগানে ঢুকেছেন ডন। রোদটা তেতে ওঠার আগেই পানি দেবার নিয়ম, তা নাহলে পানি গরম হয়ে গিয়ে লেটুস গাছের কচি পাতাগুলোকে সেক করে ফেলে। পানির চেয়ে রোদের আঁচ বেশি, কিন্তু রোদ আর পানি যখন একসাথে মেশে তখন পানির গুরুত্ব বেড়ে যায়। দুটো জিনিসকে মেশাবার সময় সাবধানে বুদ্ধি খরচ করে কাজ না করলে গাছগুলোর সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে।

বাগানে পিপড়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন ডন। পিপড়ে থাকলেই ধরে নিতে হবে, এঁটেল পোকা ধরেছে, সেগুলোর খোঁজেই এসেছে পিপড়েরা। সেক্ষেত্রে পোকা ধ্বংস করার জন্যে পিচকিরি দিয়ে শুষ্ক ছড়াতে হবে।

সময় মতই গাছের গোড়ায় পানি দেয়া হলো। এরই মধ্যে তেতে উঠতে শুরু করেছে রোদটা। 'বিবেচনা, বিবেচনা,' মনে মনে ভাবছেন ডন কর্লিয়নি। 'সব কাজ বিবেচনা করে করতে হয়।' আবার নিচু হলেন তিনি। শেষ সারির কয়েকটা গাছকে কাঠিতে তুলে দেয়া হয়নি এখনও, ঠিক করলেন, এটা শেষ করেই ফিরে যাবেন ঘরে।

অকস্মাৎ হতভম্ব হয়ে গেলেন ডন। তাঁর মনে হলো, হঠাৎ মাথার একেবারে কাছে নেমে এসেছে সূর্যটা, পরমুহূর্তে লক্ষকোটি সোনালী কণা দেখতে পেলেন তিনি, চোখের সামনে নাচছে সেগুলো। বাগানে ঢুকে পড়েছে মাইকেলের বড় ছেলেটা, খিল খিল হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছেন তিনি, ছুটে আসছে দাদুর দিকে। পরমুহূর্তে চোখ ঝলসানো হলুদ আলোয় ঢাকা পড়ে গেল সে। পাকা অভিজ্ঞ মানুষ ডন, তাকে এত সহজে ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়। সবই বুঝতে পারলেন তিনি। ওই চোখ-ঝলসানো হলুদ আলোর পিছনে লুকিয়ে আছে পরম শত্রু, টের পেয়ে গেলেন তিনি। তাঁর ওপর ঝাপিয়ে পড়ার অপেক্ষায় রয়েছে মৃত্যু।

হাত নেড়ে নাটিকে কাছে আসতে নিষেধ করলেন ডন। আরেকটু দেরি করলে সময় পেতেন না। হঠাৎ হাতুড়ির ঘা পড়ল বুকের ভেতর। মুখ খুবড়ে পড়ে গেলেন তিনি। দম বন্ধ হয়ে আসছে তাঁর।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ছেলেটা, তারপরই ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটল বাপকে ডাকতে। ফটকের কাছে যারা ছিল তাদের সাথে ছুটে এসে মাইকেল দেখল, উপুড় হয়ে শুয়ে মুঠো মুঠো মাটি খাবলাচ্ছেন ডন। ধরাধরি করে বাগান থেকে তুলে নিয়ে এসে শোয়ানো হলো বারান্দায়। বাপের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল মাইকেল, একটা হাত ধরল তাঁর। ইতিমধ্যে ডাক্তার আর অ্যাম্বুলেন্স ডাকার জন্যে লোক পাঠানো হয়ে গেছে।

অনেক কষ্টে, প্রাণপণে চেষ্টায় আরেকবার চোখ মেলে সরাসরি ছোট ছেলের দিকে তাকালেন ডন কর্লিয়নি। লালচে মুখটা নীল হয়ে গেছে তাঁর। মাইকেল বুঝতে পারছে, খুব কষ্ট পাচ্ছেন বাবা। খুব বড় ধরনের হার্ট অ্যাটাক, কি হয় না হয় ভাবতেও ভয় করছে।

কিন্তু ডনের মনে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি জানেন, এই তাঁর অন্তিম মুহূর্ত। বাগানের সুগন্ধ ভেসে এল তাঁর নাকে। ফুরফুরে বাতাসে এলোমেলো

হয়ে গেল তাঁর পাতলা চুলগুলো। চারদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আবার ছেলের চোখে স্থির হলো তাঁর দৃষ্টি। ফিস ফিস করে তিনি বললেন, 'আহ, জীবন কি সুন্দর!'

মেয়েদের চোখের পানি দেখতে হলো না, তারা গির্জা থেকে ফেরার আগেই মারা গেলেন তিনি। ডাক্তার, অ্যাম্বুলেন্সের জন্যেও অপেক্ষা করলেন না। শেষ সময়ে পাশে শুধু পুরুষরাই ছিল। প্রিয়তম ছোট ছেলের হাত ধরে চোখ বুজলেন ডন কর্লিয়নি।

গান্ধী আৰ রাজকীয় আড়ম্বরের সাথে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হলো। পাঁচ পরিবারের ডন আর তাদের ক্যাপোরেজিমিদের কেউ বাকি থাকল না আসতে। এল টেসিও আর ক্লেমেঞ্জার পরিবার। মাইকেলের নিষেধ সত্ত্বেও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে মহান গড ফাদারের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে এল জনি ফন্টেন। বড় বড় হরফে ছাপা হলো সে খবর ট্যাবলয়েড পত্রিকায়। কোন রকম অপপ্রচারের তোয়াক্কা না করেই জনি ফন্টেন ঘোষণা করল, ডন ভিটো কর্লিয়নি তার ধর্মবাপ ছিলেন। অনেক মানুষ দেখেছে সে তার জীবনে, কিন্তু ভিটো কর্লিয়নির মত আর একজনও দেখল না। এমন মহৎ-হৃদয় একজন মহান ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার সুযোগ পেয়ে নিজেকে সম্মানিত বোধ করছে সে। একথা স্বীকার করায় কে কি মনে করল না করল তাতে তার কিছুই এসে যায় না।

প্রাচীন প্রথা অনুসারে উঠানে নিশি-পালন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো। তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ দেখান আমেরিগো বনাসেরা। একজন মা যেভাবে তার মেয়েকে বিয়ের সাজে সাজায়, ঠিক তেমনি যত্ন আর আন্তরিকতার সাথে সে তার পুরানো বন্ধুকে, তার গড ফাদারকে সাজাল। জীবনের সমস্ত ঋণ শোধ করার এই সুযোগ পেয়ে সে মহাখুশি। তার তুলনাহীন দক্ষতা লক্ষ করে সবাই এক বাক্যে স্বীকার করল, মৃত্যুও ডন কর্লিয়নির ক্লাট থেকে আভিজাত্যের উজ্জ্বলতা আর মহত্বের মহিমা হরণ করতে পারেনি। এসব মন্তব্য শুনে গর্বে আর আশ্চর্য্য একটা শক্তির উপলব্ধিতে চিত্ত পূর্ণ হয়ে উঠল আমেরিগো বনাসেরার। আর কেউ না জানুক, তার অন্তত জানতে বাকি নেই, মৃত্যুর করাল স্পর্শ কি সর্বনাশ ঘটিয়েছে ডনের চেহারায়ে।

ডনের মৃত্যু সংবাদ বিদ্যুৎ বেগে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে পুরানো বন্ধু আর শিষ্য, অনুচর আর ভক্তেরা, যে যেখানে ছিল, ছুটে আসতে শুরু করল। লাস ভেগাস থেকে এল লুসি অ্যানচিনি আর তার স্বামী জুলস সীগল। এল নাজোরিনি, তার স্ত্রী, স্বামীসহ ওদের মেয়ে আর তার ছেলেপুলেরা। এল টম হেগেনের স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা। সান ফ্রান্সিস্কো, লস অ্যাঞ্জেলেস, বস্টন আর ক্লীভল্যান্ড থেকে এল ডনেরা। শবাধার বয়ে নিয়ে গেল রকো ল্যাম্পনি আর অ্যালবার্ট নেরি। এদের সাথে, বলা বাহুল্য, ক্লেমেঞ্জা আর টেসিও থাকল, থাকল ডনের দুই ছেলে। মস্ত উঠান আর উঠানের সবগুলো বাড়ি ফুলে ফুলে ভরে গেল।

এমন একটা ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করার জন্যে দলে দলে এসে জুটল সাংবাদিক আর ক্যামেরাম্যানরা। উঠানের প্রকাণ্ড গেটের বাইরে ভিড় জমাল তারা। ছোট একটা ট্রাক দেখা গেল তাদের সাথে। সবাই বুঝল, ওই ট্রাকের ভেতর মুভি ক্যামেরা আছে, অবিশ্বরণীয় ঘটনাটাকে জ্যাস্ত ধরে রাখার জন্যে চেষ্টা করছে

ওরা। নিমন্ত্রণ করা হয়নি এমন কয়েকজন সাংবাদিক চেষ্টার কোন ফ্রটি করল না উঠানের ভেতর ঢোকার। কিন্তু উঠানের সব ক'টা প্রবেশ পথ আর পাঁচিলের চারদিকে হাতে হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে সিকিউরিটি গার্ড। তবে, কোনরকম অসৌজন্য দেখানো হয়নি সাংবাদিকদের সাথে। গলা ভেজাবার জন্যে প্রচুর দামী গদ পাঠিয়ে দেয়া হলো ওদেরকে। কিন্তু ভেতরে কাউকে ঢুকতে দেয়া হলো না। মেহমানরা বেরিয়ে আসার সময় শেষ একটা সুযোগ নিল সাংবাদিকরা, এর তার সাথে কথা বলে কিছু তথ্য আদায় করার চেষ্টা করল, কিন্তু মেহমানরা উত্তর দেয়া তো দূরের কথা, এমন অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকাল যেন কেউ কিছু বুঝতে পারছে না, প্রত্যেকে কালা আর বোবা। কেউ নিজের ঠোট পর্যন্ত নাড়েনি।

আজকের প্রায় পুরো দিনটাই সেই কোণার লাইব্রেরি রুমে কাটাল মাইকেল, সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আপনজনেরা রয়েছে। টম হেগেন আর ফ্রেডি মাইকেলকে ছেড়ে বড় একটা বের হলো না কামরা থেকে। সমবেদনা জানাবার জন্যে মেহমানদেরকে নিয়ে আসা হচ্ছে এখানেই সৌজন্যের সাথে সবাইকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে মাইকেল। অনেকেই ওকে গড ফাদার, কেউ কেউ এমন কি ডন বলেও সম্বোধন করছে। উদ্ভ্রতা বজায় রেখে হাসছে মাইকেল। শুধু ওর স্ত্রী কে অ্যাডামস কর্লিয়নির দৃষ্টিতে ধরা পড়ল, সম্বোধনগুলো শুনে অসন্তোষে কঠিন হয়ে উঠছে মাইকেলের মুখের চেহারা।

খানিক পর ওদের সাথে এসে জুটল টেসিও আর ক্রেমেঞ্জা। চেয়ার ছেড়ে উঠে ওদের দু'জনকে নিজের হাতে পানীয় ঢেলে দিল মাইকেল। ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে হালকা কিছু কথাবার্তা হলো। প্রসঙ্গক্রমে মাইকেল বলল, উঠান আর উঠানের ভেতরের সবগুলো বাড়ি একটা গৃহ-নির্মাণ সংস্থার কাছে বেচে দেয়ার সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে। এতে প্রচুর লাভ করছে কর্লিয়নি পরিবার। ডন যে অসাধারণ একটা প্রতিভা ছিলেন, এটা তার আরেক দৃষ্টান্ত।

পরিষ্কার হয়ে গেল কর্লিয়নি পরিবার পশ্চিমে উঠে যাচ্ছে, নিউ ইয়র্কে তাদের সংগঠনই থাকবে না। ডনের অবসর গ্রহণ অথবা মৃত্যুর জন্যে সিদ্ধান্তটা স্থগিত রাখা হয়েছিল এতদিন।

উঠান আর বাড়িগুলো লোকে লোকারণ্য। এর আগে শেষবার এই রকম লোক সমাগম হয়েছিল আজ থেকে দশ বছর আগে। কে যেন বলল, কনি আর কার্লোর বিয়ের পর এক এক করে দশটা বছর কেটে গেছে। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল মাইকেল। বাইরে বাগানটা দেখা যাচ্ছে। মনে পড়ছে ওর, আজ থেকে দশ বছর আগে কে-র সাথে ওই বাগানে বসেছিল সে, সেদিন স্বপ্নেও ধারণা করেনি ভাগ্য তাকে এখানে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়ে দেবে। কোথেকে কোথায় চলে এসেছে সে, ভাবতেও অদ্ভুত লাগে। চোখ বোজার আগে বাবার বলা শেষ কথাটা এখনও কানে ঝঞ্জছে তার। যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন কানে লেগে থাকবে কথা ক'টা—‘আহ, জীবন কি সুন্দর’। তারপর মাইকেল স্মরণ করার চেষ্টা করল...না, বাবা কখনও মৃত্যু সম্পর্কে কোন কথা বলেছেন বলে মনে পড়ে না। সাথে সাথে উপলব্ধি করল, মৃত্যুকে অত্যন্ত শঙ্কার চোখে দেখতেন বাবা, তাই সে বিষয়ে

তত্বকথা আওড়াতে পারতেন না।

কবরস্থানে যাবার সময় হয়ে এসেছে। মহান ডনকে এবার মাটিতে শোয়াতে হবে। মাইকেলের হাত ধরে তাকে বাগানে বের করে আনল কে। ওদের পিছু পিছু ক্যাপোরেজিমিরা, পিছনে তাদের সৈনিকরা। সৈনিকদের পিছনে দীন-দুঃখী সাধারণ মানুষেরা, যাদের মাথার ওপর সবসময় নিরাপত্তার ছাতা ধরে রাখতেন গড ফাদার, যাদেরকে তিনি আশীর্বাদ করতেন। এদের মধ্যে রয়েছে সেই রুটি ওয়ালা নাজোরিনি, রয়েছে সেই বিধবা কলম্বো আর তার ছেলেরা, রয়েছে আরও অগণতি মানুষ, যারা গড ফাদারের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ, জীবিতকালে কখনও না কখনও এদের সবার উপকার করেছেন গড ফাদার। এরা সবাই বাস করত তাঁর হেফাজতে, এদের ওপর তাঁর শাসন ছিল কড়া, কিন্তু ন্যায্য। এরা ছাড়াও এমন অসংখ্য লোক এসেছে, যারা তাঁর প্রতিপক্ষ দলের প্রতিনিধিত্ব করছে, কিন্তু তারাও আজ তাঁর প্রতি শেষ সম্মান দেখাবার সুযোগটা হাতছাড়া করেনি।

সবই দেখেছে মাইকেল। মুখে একটু আড়ষ্ট, কিন্তু মার্জিত হাসি। তবে কিছুই তাকে প্রভাবিত করতে পারছে না। বাবার সেই শেষ কথাটা ওর সমস্ত অস্তিত্বে জড়িয়ে গেছে। ভাবছে, কিছুতেই কিছু এসে যায় না, তবু মৃত্যুর সময় আমি যদি বলতে পারি 'জীবন কি সুন্দর'! কথাটা বলে নিজের ওপর বাবার কি প্রচণ্ড আস্থা ছিল তার দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন, সে-ও যদি সেই রকম আস্থার সাথে বলতে পারে, 'জীবন কি সুন্দর' জাহলে আর কিছুর দরকার হবে না।

তারপর ভাবল, এখন থেকে বাবার অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্যে তাকে জীবন উৎসর্গ করতে হবে। ঠিক যে পথে এগোচ্ছিলেন বাবা, তাকে সেই পথ অনুসরণ করতে হবে। যত্ন নিতে হবে নিজের ছেলেমেয়েদের, নিজের পরিবারের, নিজের এলাকার। তবে, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে তার ছেলেমেয়েরা অন্য আরেক জগতে মানুষ হবে। ডাক্তার, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, গভর্নর, প্রেসিডেন্ট হবে ওরা। সব হতে পারবে। তাকে শুধু লক্ষ রাখতে হবে যে ওরা যেন মানবজাতির বৃহৎ গোষ্ঠীর বাইরে না পড়ে থাকে।

কিন্তু সেই সাথে এ-ও ঠিক যে, একজন ক্ষমতাশীল, বিবেচক অভিভাবকের মত বৃহৎ গোষ্ঠীর ওপর তীক্ষ্ণ, সতর্ক নজর রাখবে মাইকেল কর্নিয়নি।

দশ

গতকাল কবর দেয়া হয়েছে ডন ভিটো কর্নিয়নিকে।

কর্নিয়নি পরিবারের সমস্ত প্রভাবশালী পদাধিকারীরা উঠানে এসে জড়ো হয়েছে। ডনের খালি বাড়িতে বারোটোর একটু আগে প্রবেশ করেছে তারা। তাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে মাইকেল কর্নিয়নি নিজে।

কোণের লাইব্রেরি রুমটা লোকজনে ভরে গেছে। গম্ভীর চেহারা নিয়ে উপস্থিত রয়েছে দুই ক্যাপোরেজিমি ক্লেমেঞ্জা আর টেসিও। রয়েছে রকো ল্যাম্পনি, তার চালচলনে আশ্চর্য দক্ষতা আর নিপুণ ব্যবহার-জ্ঞান প্রকাশ পাচ্ছে। রয়েছে কার্লো,

একেবারেই চুপচাপ, যেন নিজের সম্মানজনক পদ সম্পর্কে ভীষণ সচেতন সে। রয়েছে টম হেগেন, ওকালতি ছেড়ে পারিবারিক সঙ্কট মোকাবিলা করার জন্যে ছুটে চলে এসেছে সে-ও। রয়েছে অ্যালবার্ট নেরি, যতটা সম্ভব নতুন ডনের কাছাকাছি থাকতে চেষ্টা করেছে সে, মাইকেলের সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছে, ককটেল তৈরি করে দিচ্ছে—কর্নিয়নি পরিবারের সাম্প্রতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও তার আচরণে পরিবারের প্রতি পূর্ণ অবিচল আস্থা প্রকাশ পাচ্ছে।

পরিবারের ওপর প্রচণ্ড একটা আঘাত হয়ে লেগেছে মহান ডনের মৃত্যু। সবাই ধরে নিয়েছে তাঁর মৃত্যুর ফলে কর্নিয়নি পরিবারের অর্ধেক ক্ষমতা কমে গেছে। বার্জিনি-টাটোগ্লিয়াদের বিরুদ্ধে দর কষাকষির যে ক্ষমতা দু'দিন আগেও ছিল, তার সবটুকু হারিয়ে ফেলেছে এরা। মাইকেলের সামনে এই মুহূর্তে যারা বসে রয়েছে, তারা সবাই অন্তত তাই বিশ্বাস করে। সবাই একটা উদ্দেশ্যেই এসেছে, অপেক্ষাও করছে তার জন্যে—মাইকেলের কথা শুনতে চায়। মাইকেল এখনও তাদের কাছে ডন হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। ওদের কাছ থেকে পদমর্যাদা, সে উপাধি পেতে হলে কাজ দেখাতে হবে মাইকেলকে। শুধু মুখের কথা আর ব্যক্তিত্ব দেখিয়ে পাবার নয় ও জিনিস। বৈঁচে থাকলে ছেলেকে উত্তরাধিকারী হিসেবে নির্বাচন করে যেতে পারতেন গড ফাদার। কিন্তু তা যখন যাননি, এখন উত্তরাধিকারী কে হবে তা নিয়ে কথা উঠতে পারে। বাপের অনুপস্থিতিতে ছেলেই ডন হবে, এমন কোন বাঁধাধরা আইন নেই।

সবার হাতে মদের গ্লাস ধরিয়ে দিচ্ছে নেরি। তার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল মাইকেল, তারপর শুরু করল, 'সবাইকেই বলছি। তোমাদের কার কি মনের অবস্থা, বুঝতে পারছি আমি। জানি, আমার বাবাকে সবাই তোমরা কত শ্রদ্ধা করতে। একথাও ঠিক, এখন থেকে তোমাদের সবাইকে যার যার নিজের পরিবারের কথা ভাবতে হবে। তোমরা হয়তো ভাবছ, বাবা বৈঁচে থাকতে যে পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল। তার কি হবে। ভাবছ, আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তার কি হবে। সবরকম সন্দেহের অবসান ঘটাবার জন্যে পরিষ্কার করে বলছি আমি, যাকে যা কথা দিয়েছি তা রক্ষা করা হবে, বাবা মারা যাওয়ায় কোন কিছুই বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হবে না।'

মোষের মত প্রকাণ্ড ঝাঁকড়া মাথাটা দোলাচ্ছে ক্লেমেঞ্জা। গম্ভীরভাবে বলল, 'আমি বার্জিনি-টাটোগ্লিয়াদের কথা বলছি, মাইক। ওরা এবার আমাদেরকে চেপে ধরবে। আমার মনে হয়, ওদের সার্থে বসে কথা বলতে হবে তোমাকে।' উপস্থিত সবাই লক্ষ করল, মাইকেলকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্বোধন করল না ক্লেমেঞ্জা, ডন বলে সম্বোধন করা তো দূরে থাকুক।

'অপেক্ষা করে দেখা যাক কি হয়,' বলল মাইকেল। 'শান্তি ওদেরকেই আগে ভাঙতে দাও।'

'শান্তি ওরা এরই মধ্যে ভেঙেছে, মাইক,' নরম গলায় বলল টেসিও। 'এখানে আসার আগে খবর পেলাম, আজ সকালেই ওরা ব্রুকলিনের দুটো আড়তে হানা দিয়েছে। বুঝতে পারছি, মাসখানেকের মধ্যে ব্রুকলিন আমার হাতছাড়া হয়ে যাবে।

একটা টুপি ঝুলাবার পর্যন্ত জায়গা পাব না ওখানে।’

চিন্তিতভাবে টেসিওর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল মাইকেল, তারপর জানতে চাইল, ‘পাল্টা কোন ব্যবস্থা নিয়েছ নাকি?’

‘না,’ টেসিও তার ছোট মাথাটা নেড়ে বলল, ‘তোমার জন্যে আরেকটা সমস্যা সৃষ্টি করা হবে, ভেবে হাত-পা ওটিয়ে বসে আছি।’

‘খুব ভাল করেছ,’ বলল মাইকেল। ‘তোমাদের সবাইকে ওই কথাটাই বলতে চাই আমি। সবাই যে যার হাত-পা ওটিয়ে বসে থাকো। ওরা যে খোঁচা মারবে সে তো জানা কথা, কিন্তু আমাদের তরফ থেকে কেউ কোন পাল্টা জবাব দিতে যেয়ো না। স্নেহ চেপে বসে থেকো। সব গুছিয়ে নিতে কয়েক হপ্তা সময় দরকার আমার, ইতিমধ্যে দেখতে হবে বাতাস কোন দিকে বইছে। তারপর, যাই ঘটুক না কেন, যেমন কথা দিয়েছি, তোমাদের সবার জন্যে যথাসম্ভব ভাল ব্যবস্থা করে দেব আমি। তোমাদের ব্যবস্থা করার পর শেষ আলোচনা সভা ডাকব একটা, সেই সভায় বেশ কয়েকটা সিদ্ধান্ত নেব।’

মাইকেলের শেষ কথাটা শুনে সবাই অবাক হয়ে গেল। কিন্তু ওদের বিশ্বাসের ভাবটা দেখেও যেন দেখতে পেল না মাইকেল। মীটিং শেষ হয়ে গেছে, সবাইকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছে অ্যালবার্ট নেরি।

‘টম, তুমি থাকো,’ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল মাইকেল।

দাঁড়িয়ে পড়ল টম হেগেন। তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে দাঁড়াল জানালার সামনে।

একে একে দুই ক্যাপোরেজিমি, কার্লো, আর রকো ল্যাম্পনিকে উঠান পার করিয়ে একেবারে ফটকের বাইরে পৌঁছে দিয়ে এল অ্যালবার্ট নেরি। এতক্ষণে ঘুরে দাঁড়াল টম হেগেন।

‘সমস্ত রাজনৈতিক যোগাযোগের সুতো শক্তভাবে বেঁধে নিয়েছ?’ মাইকেলের চোখে চোখ রেখে জানতে চাইল সে।

একটু বিষণ্ণ ভঙ্গিতে বলল মাইকেল, ‘সবগুলো পারিনি এখনও। আরও চারমাস সময় দরকার ছিল আমার। ওই সুতো বাঁধার কাজই করছিলাম আমি আর ডন। তবে, আশার কথা হলো, বিচারকরা সবাই আমাদের হাতে আছে। ওই কাজটাই করা হয়েছে সবার আগে। তাছাড়া, কংগ্রেসের প্রভাবশালী সদস্য যারা আমাদের সাথে ছিলেন, তারা সবাই আমাদেরকে সমর্থন দেবেন বলে তৈরি হয়ে আছেন। এরপর বাকি থাকল, এখানের, নিউ ইয়র্কের দলীয় নেতারা—তাদেরকে নিয়ে কোন সমস্যা নেই। মানুষ যা মনে করে, কর্লিয়নি পরিবার তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। তবু, আমি ঠিক করেছিলাম, এতটুকু ফুটো রাখব না কোথাও। কিন্তু তা আর হলো না। সব দিক নিশ্চিত করতে এখনও কিছু সময়ের দরকার, কিন্তু তা আমার কপালে নেই।’ হঠাৎ হাসল মাইকেল, আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল হেগেনের দিকে, বলল, ‘তুমি বোধহয় একই মধ্যে গোটা পরিকল্পনাটাই আঁচ করে নিয়েছ?’

‘তা আর এমন শক্ত কি!’ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল হেগেন। ‘তবে, আমাকে বাদ দেয়া হলো কেন, প্রথমে সেটা বুঝিনি। কিন্তু যেই মাথায় সিসিলীয় টুপি পরলাম,

অমনি সব পরিষ্কার হয়ে গেল।’

হাসছে মাইকেল। ‘বাবা আমাকে বলে দিয়েছিলেন, তুমি সব বুঝে নেবে কিন্তু এখন আর আমার ওসব বিলাসিতা করা সাজে না। এখানে তোমাকে আমার দরকার। অন্তত কয়েকটা হুণ্ডা আমার সাথে থাকো তুমি। ভেগাসে ফোন করে তোমার স্ত্রীকে কথাটা জানিয়ে দাও।’

‘ঠিক কিভাবে তোমার ওপর হামলা করবে ওরা, কিছু আন্দাজ করতে পেরেছ?’ চিন্তিতভাবে জানতে চাইল হেগেন।

‘আমার আন্দাজ করার দরকার হয়নি,’ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল মাইকেল, ‘বাবাই সেটা ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, আপনজন কারও সাহায্য নেবে ওরা। বার্জিনি অত্যন্ত ধুরন্ধর ব্যবসায়ী, এমন কারও সাহায্য নেবে সে, যাকে সন্দেহ করার কথা আমি কল্পনাও করতে পারব না।’

‘আমার মত কেউ,’ মাইকেলের চোখে চোখ রেখে হাসছে হেগেন।

হাসছে মাইকেলও। বলল, ‘তুমি আইরিশ, সুতরাং তোমার ওপর ওদের আস্থা নেই।’

‘আইরিশ নই, জার্মান-আমেরিকান।’

‘তার মানেই ওদের কাছে তুমি আইরিশ,’ বলল মাইকেল। ‘ওরা তোমার সাহায্যও নেবে না, নেরির সাহায্যও নেবে না, কারণ নেরি আবার এক সময় পুলিশের চাকরি করত। তাছাড়া, তোমরা দু’জন আবার আমার খুব বেশি কাছের মানুষ। তোমাদের কারও সাহায্য চাইতে গেলে ব্যাপারটা ফেঁসে যেতে পারে, অত বড় ঝুঁকি নেবে না ওরা। ঐরূপ ধরো রকো ল্যাম্পনি—সে আবার যথেষ্ট কাছের নয়। উঁহঁ, ...ক্লেমেঞ্জা, টেসিও, অথবা কার্লো, এদের মধ্যে থেকে কাউকে বেছে নেবে ওরা।’

‘যদি বার্জি ধরতে বলো, আমি বলব কার্লোই ওদের লোক,’ নিচু গলায় বলল হেগেন।

‘দেখা যাক,’ বলল মাইকেল। ‘খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না।’

পরদিন সকাল। টম হেগেনকে নিয়ে ব্রেকফাস্ট খেতে বসেছে মাইকেল। খবর এল, ফোন এসেছে।

উঠে গেল মাইকেল। লাইব্রেরি রুমে এসে ফোনটা রিসিভ করল ও। কিচেনে ফিরে এসে নিঃশব্দে নিজের চেয়ারে বসল আবার। তাকাল হেগেনের দিকে। ‘সব ব্যবস্থা হয়ে গেল,’ হেগেনকে বলল ও। ‘আজ থেকে এক হুণ্ডা পর বার্জিনির সাথে বসে কথা বলতে হবে আমাকে। আমাকেই যেতে হবে বার্জিনির কাছে। ওরা বলছে, ডন মারা গেছেন, তাই নতুন করে শান্তি করতে হবে,’ হেগেনের চোখে চোখ রেখে হাসছে মাইকেল।

‘কে ফোন করল তোমাকে?’ চাপা, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল হেগেন। ‘কে যোগাযোগ করল ওদের সাথে?’ দু’জনেই জানে ওরা, কর্লিয়নি পরিবার থেকে যে-ই যোগাযোগ করে থাকুক, সে-ই বিশ্বাসঘাতক।

হাসন একটু হাসল মাইকেল। আশ্চর্য একটা বিষয়তা ফুটে উঠল ওর চেহারা।
স্বথেকে, ছোট্ট করে উচ্চারণ করল নামটা, 'টেরিও।'

মাথা নিচু করল দু'জনেই, আর কোন কথা না বলে নিঃশব্দে শেষ করল
খাওয়াটা। অনেকক্ষণ পর কফির কাপে একটা ছোট্ট চুমুক দিয়ে বলল হেগেন, 'কসম
থেয়ে বলতে পারতাম, কার্লোই বিশ্বাসঘাতক। তা না হলে ক্রেমেঞ্জা। টেরিওর কথা
আমি কল্পনাও করিনি। ওদের মধ্যে ওই সবচেয়ে ওলী।'

'সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও,' বলল মাইকেল 'বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে যেটাকে
সবচেয়ে ভাল বলে মনে হয়েছে ওর, সেটাই করেছে। আমাকে বার্জিনির হাতে
তুলে দিয়ে কর্নিয়নি পরিবারের উত্তরাধিকারী হতে চায় ও। আমার ওপর আস্থা
রাখতে পারেনি, ভেবেছে, আমার সাথে থাকা মানে দুর্বল একটা লোকের সাথে
থাকা—কখন কে ওকে খতম করে দেয়, কে জানে। ও ধরে নিয়েছে, আমি হেরেই
আছি!'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল হেগেন, তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও জানতে চাইল, 'ধরে
নেয়াটা কতটুকু ঠিক হয়েছে ওর?'

শ্রাগ করল মাইকেল। বলল, 'বাইরে থেকে দেখে মনে হবে কর্নিয়নি পরিবারের
অবস্থা খুব খারাপ। শুধু আমার বাবা জানতেন, দশ দশটা দলের সমান ক্ষমতা রাখে
রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা। যতদূর বুঝতে পারছি ডনের রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রায়
সবটাই চলে এসেছে আমার হাতে। তবে, আমি ছাড়া আর কেউ তা জানে না।'
হেগেনের চোখে চোখ রেখে হাসল মাইকেল। তাকে আশ্বস্ত করে বলল, 'আমাকে
ডন বলে ডাকতে বাধ্য করব ওদেরকে আমি। কিন্তু টেরিওর কথা ভেবে মনটা
খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

'বার্জিনির সাথে দেখা করতে রাজি হয়েছে তুমি?'

'অবশ্যই। আজ থেকে এক হপ্তা পর। কোথায় জানো? ককলিনে। টেরিওর
জায়গায়, যেখানে আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ।' আবার ঘূঁন একটু হাসি খেলে গেল
মাইকেলের ঠোটে।

'এই ক'দিন সাবধানে থেকো,' বলল হেগেন।

এই প্রথম মাইকেলের আচরণে ঠাণ্ডা একটা ভাব লক্ষ করা গেল। স্থির দৃষ্টিতে
হেগেনের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'এ ধরনের পরামর্শের জন্যে কনসিলিয়রির
দরকার হয় না আমার।'

সাবধানতা অবলম্বন কার্কে বলে হেগেনকে তা দেখিয়ে দিল মাইকেল। পুরোটা হপ্তা
উঠানের বাইরে একবারও পা ফেলল না ও। পাশে নেরি না থাকলে কারও সাথেই
দেখা করল না। এর মধ্যে একটা মাত্র জটিলতার উদ্ভব হলো, 'অনিচ্ছাসত্ত্বেও
ব্যাপারটা মেনে নিতে হলো মাইকেলকে। কনির বড় ছেলে 'ব্যাপটাইজড' হবে,
সেজন্যে একটা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনুরোধ করা হলো, ছেলেটার গড
ফাদার হতে হবে মাইকেলকে। অনুরোধটা এল কে-র তরফ থেকে। তবু প্রথমে
সেটা প্রত্যাখ্যানই করল মাইকেল।

‘তোমার কাছ থেকে কখনও কিছু চাইনি আমি,’ বলল কে, ‘শুধু আমার মুখ চেয়ে এই অনুরোধটা রাখো তুমি, লক্ষ্মীটি। বড় আশা করে আছে কনি। কার্লোও ধরেছে আমাকে। ব্যাপারটাকে সামাজিক ওরুতু দিচ্ছে ওরা। গ্লীজ, মাইক!’

অনুরোধ তো করল কে, কিন্তু মাইকেলের চেহারা বিরক্তি ফুটে উঠতে দেখে ভয় হলো, কথাটা বোধহয় রাখবে না সে। কিন্তু মাইকেল যখন মাথা নেড়ে রাজী হয়ে গেল, একটু অবাকই হলো সে।

‘ঠিক আছে,’ বলল মাইকেল, ‘কিন্তু উঠানের বাইরে যেতে পারব না আমি। ওদেরকে বলে দাও, পাদ্রীকে বাড়িতে ডেকে এখানেই যেন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে। খরচ যা লাগে, আমি দেব। গির্জার লোকেরা ব্যাপারটা নিয়ে ঝামেলা করতে পারে, কিন্তু ওদেরকে বলে দাও, হেগেন ওসব ঠিক সামলে নেবে।’

বার্জিনির সাথে আগামীকাল বৈঠকে বসবে। মাইকেল, কনি আর কার্লোর ছেলের গির্জায় আস্থাবান হবার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছে আজ। ভাগ্যে অসম্ভব দামী সোনার একটা হাতঘড়ি উপহার দিল মাইকেল। ছোটখাট একটা প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়েছে কার্লোর বাড়িতে। দাওয়াত পেল ক্যাপোরেজিমিরা, হেগেন, ল্যাম্পনি, ডনের বিধবা স্ত্রী এবং উঠানের অন্যান্য বাসিন্দারা। আনুষ্ঠানিকভাবে ওদের ছেলের গড ফাদার হলো মাইকেল।

সবাই খুব খুশি। আবেগে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছে কনি কর্লিয়নি। সারাটা সন্ধ্যা ভাই আর ভাবীকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়ে দু’জনকেই অস্থির করে তুলল সে। এমন কি কার্লোকেও ভাবাবেগে আত্মতৃপ্ত হতে দেখা গেল, সুযোগ পেলেই ওদের সেকেলে নিয়মে মাইকেলের হাত ধরে ঝাকিয়ে দিয়ে ওকে গড ফাদার বলে সম্বোধন করছে সে।

মাইকেলের মধ্যেও আশ্চর্য একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছে সবাই। আজকের মত মিশুক আর অমায়িক বলে এর আগে কখনও মনে হয়নি তাকে।

ফিসফিস করে ভাবীকে বলল কনি, ‘আজ বোঝা গেল, কার্লোর সাথে খুব সম্ভাব হবে মাইকের। দেখো, এই আমি বলছি, দু’জন দু’জনের প্রাণের বন্ধু হয়ে উঠবে। এ-ধরনের এক একটা উপলক্ষ থেকেই তো মানুষের সাথে মানুষের ভাব হয়।’

ননদের হাতে একটু চাপ দিয়ে বলল কে, ‘কি খুশিই যে হয়েছি আমি।’

এগারো

অ্যালবার্ট নেরির পরিচয়।

স্কুলে পড়ে মেয়েটা, নাম রিটা। অসম্ভব লাজুক চেহারা, কুচকুচে কালো চুল, অত্যন্ত গৌড়া ইতালীয় পরিবারের মেয়ে। রাত দশটার পর মেয়েকে আর বাইরে থাকতে দেয় না বাপ-মা। মেয়েটার সরলতা, সততা, মিষ্টি চেহারার কোমলতা আর কালো চুল—এক সাথে সবগুলোর প্রেমে পড়ে গেল অ্যালবার্ট নেরি। সবেমাত্র পুলিশে চুকেছে সে। কিন্তু বিয়ে করতে দেরি করল না।

প্রথম দিকে স্বামীর প্রেমে রিটাও পড়ল। নেরির গায়ের জোর দেখে আশ্চর্য হয়ে যায় সে। লক্ষ করে, স্বামীর এই গায়ের জোর আর ন্যায়-অন্যায় বোধের জন্যে লোকে তাকে যমের মত ভয় করে। বিয়ের কিছুদিনের মধ্যে আরও আবিষ্কার করল রিটা, কারও মন জুগিয়ে চলার ধার দিয়েও যায় না নেরি। কারও সাথে যদি মতের মিল না হয়, হয় বোবার মত চুপ করে থাকে সে, নাহয় ভীষণ ককর্শ ভঙ্গিতে প্রতিবাদ জানায়। নরমভাবে সম্মতি জানানোর পাত্র সে নয়। আর সব লোকের মেজাজের সাথে ওর মেজাজের তুলনা হয় না। চণ্ডালের মত রাগ তার, খাঁটি সিসিলির জিনিস। তবে রিটার সাথে কখনও রাগারাগি করে না সে। স্ত্রীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, যথেষ্ট সমীহ করে চলে তাকে।

পাঁচ বছরের মধ্যে নিউ ইয়র্ক শহরের সবচেয়ে রগচটা পুলিশ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করল নেরি। লোকে তাকে উৎকট বিপদ ধরে নিয়ে সাজাতিক ভয় করে। শুধু তাই নয়, নেরির মত সং, আদর্শ পুলিশ কর্মচারী নিউ ইয়র্কে আর একটাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু ওকে নিয়ে অসুবিধেটা হলো, আইন প্রয়োগ করার নিজস্ব একটা নিয়ম মেনে চলে ও। গুণা ছোকরাগুলোকে দু'চোখে দেখতে পারে না। রাতের বেলা রাস্তার মোড়ে পথচারীদের ওপর ছোকরাগুলো অত্যাচার করে, কিন্তু নেরির চোখে তা একবার পড়লে হয়, সাথে সাথে হিংস্র বাঘের মত তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে। একবার যদি তার হাতে ধরা পড়ে যায় কেউ, বেচারার রেহাই নেই। তবে, প্রথমবার সবাইকেই সাবধান করে দেয় নেরি। সেই প্রথম এবং শেষ সতর্কবাণী কেউ যদি কানে না তোলে, তাহলেই বিপদ। গায়ে অসাধারণ শক্তি রাখে নেরি, তার এই আসুর্ষিক শক্তি সম্পর্কে নিজেরও পরিষ্কার ধারণা নেই তার।

এক রাতের ঘটনা। সেন্ট্রাল পার্ক ওয়েস্ট। পেট্রল-কার থেকে লাফ দিয়ে নামল নেরি। কালো রেশমি কোট পরা ছয়জন গুণাকে এক লাইনে দাঁড় করাল সে। ওর সাথে একজন সহকারী রয়েছে, নেরিকে সে ভাল-করেই চেনে, জানে তার রাগের সামনে দাঁড়াবার সাধ্য নেই কারও, তাই যা ঘটতে যাচ্ছে তার সাথে নিজেকে জড়ানোর কোন ইচ্ছে হলো না। গাড়ি থেকে নামলই না সে, বসে থাকল ড্রাইভিং সীটে।

ছোকরাগুলোর কারও বয়সই কুড়ির বেশি হবে না। রাস্তার লোকজনদের পথরোধ করে তাদের কাছ থেকে সিগারেট চাইছিল ওরা। চাওয়ার মধ্যে হুমকি, শাসানি ইত্যাদি থাকলেও কারও গায়ে হাত তোলেনি ওরা। তবে, এরই সাথে আরেকটা অপরাধ করছিল। কোন মেয়েকে আসতে দেখলেই অশ্লীল যৌন ইঙ্গিত ইশারা করে বিরক্ত করছিল তাদেরকে। ফ্রান্সে এরকম দৃশ্য হরহামেশা দেখা গেলেও আমেরিকায় এ-ধরনের ঘটনা বিরল।

সেন্ট্রাল পার্ক আর এইটথ্ এভিনিউয়ের মাঝখানে একটা পাথরের পাঁচিল আছে, সেটার সামনে দাঁড় করিয়েছে ওদেরকে নেরি। সূর্য ডুবে গেছে, কিন্তু লালচে আলো রয়েছে এখনও আকাশের গায়ে। কিন্তু এরই মধ্যে মস্ত একটা টর্চলাইট হাতে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমেছে নেরি। কারণটা আর কিছুই নয়, এটা তার একটা অত্যন্ত প্রিয় অস্ত্রও বটে। রাগে অন্ধ হয়ে পকেট থেকে রিভলভার বের করেছে নেরি, এ

কথা কেউ বলতে পারবে না তার সম্পর্কে। তার কোন প্রয়োজনই হয় না। রেগে গেলে হিংস্র পাষাণে পরিণত হয় সে, চেহারায ভীতিকর একটা পাশবিক ভাব ফুটে ওঠে, তার ওপর গায়ে চড়ানো থাকে পুলিশের ইউনিফর্ম, গুণাপাণ্ডারা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সাজাতিক ঘাবড়ে যায়। এই মুহূর্তে লাইন-বন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে যারা তারাও নেরির বীভৎস চেহারা দেখে হতভম্ব হয়ে গেছে।

কালো রেশমি কাপড়ের কোট পরা প্রথম ছেলেটাকে প্রশ্ন করল নেরি, 'নাম কি?'

নাম শুনে নেরির মনে হলো, ছেলেটা আইরিশ। 'আর কোন রাতে তোমাকে যদি রাস্তায় দেখি, সাবধান করে দেব না, ধরে সোজা ঝুলিয়ে দেব ত্রুশে।' টর্চ নেড়ে নেরি ইঙ্গিত করতেই হনহন করে হেঁটে পালিয়ে বাঁচল ছেলেটা।

পরবর্তী দুটো ছেলের সাথে একই ধরনের আচরণ করল নেরি তারাও যথাসম্ভব দ্রুত কেটে পড়ল।

চতুর্থ ছেলেটা নেরির প্রশ্ন শুনে একটা ইতালীয় নাম বলল, আর মুচকি মুচকি হাসতে লাগল ওর দিকে তাকিয়ে, ভাবটা যেন আপনিও ইতালীয়, আমিও ইতালীয়, অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক আমাদের।

নেরি যে ইতালীয় তা তার চেহারার দিকে তাকালেই পরিষ্কার বোঝা যায়। ছেলেটার কথা শুনে একটু হাসল নেরি, জানতে চাইল, 'তাই নাকি? তুমি ইতালীয়?'

ঘন ঘন মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল ছেলেটা, চেহারায একটা নিশ্চিত ভাব ফুটে উঠেছে তার। তারপর কিভাবে কেন ঠিক কি ঘটল, বলতে পারবে না সে। বিদ্যুৎ খেলে গেল নেরির হাতে। ছেলেটার মাথায় প্রচণ্ড একটা ঘা বসিয়ে দিল সে হাতের টর্চটা দিয়ে। সাথে সাথে কপালের চামড়া কেটে গেল। ক্ষতটা গভীর হয়েছে, হড়হড় করে বেরিয়ে আসছে রক্ত। ভাগ্য ভাল বলতে হবে ছেলেটার, আঘাতটা হাড় পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়নি। 'শালা বেজম্মা। ইতালীয়দের কলঙ্ক তুই। তোদের জন্যেই তো এত বদনাম আমাদের। ওঠ, শালা, সিধে হ।' ছেলেটার গায়ে একটা লাথি মারল নেরি। লাথিটা খুব জোরে মারল না, আবার খুব আস্তেও নয়। 'যা-শালা, এখান থেকে সোজা বাড়ি ফিরে যা। আবার যদি রাস্তায় ঘুর ঘুর করতে দেখি তোকে, মেরেই ফেলব। আর শোন, ফের যদি এই কালো কোটটা গায়ে দিস, আর আমার চোখে পড়ে যাস, যীশুর কিরে, তোর কপালে খারাবি আছে। তোর ভাগ্য ভাল যে আমি তোর বাবা নই।'

বাকি ছেলে দুটোর সাথে কোন কথাই বলল না নেরি। তাদের কোমরে লাথি মারতে মারতে অনেকটা পথ পার করে দিয়ে এল শুধু।

এ-ধরনের ঘটনা যখন ঘটে, ঝামেলা মিটিয়েই সেখান থেকে সরে যায় নেরি। দেরি করলেই লোকজন জমবে, তার আচরণের প্রতিবাদ জানাবে। সহকারী তৈরি হয়েই থাকে, নেরি লাফ দিয়ে উঠে বসলেই গাড়ি ছেড়ে দেয় সে। তবে কখনও-সখনও ত্যাগোড় কিসিমের দু'একটা ছোকরার দেখা পাওয়া যায়, নিজেকে খুব দুঃসাহসী মনে করে লড়তে আসে, এমন কি ছোরা-ছুরি পর্যন্ত বের করে। এদের অবস্থা চোখের জলে নাকের জলে করে ছাড়ে নেরি। কয়েক মুহূর্তের জন্যে অন্ধ

পিশাচে পরিণত হয়ে যায় সে, অ্যায়াস মার মারে যে, ছেড়ে দে বাপ, ছেড়ে দে বাপ করে চোঁচাতে থাকে ছোকরাগুলো। কিন্তু নেরির তখন একটাই উদ্দেশ্য, চোঁচানিটা থামানো। তাই যত বেশি চোঁচায় ওরা, ওর হাতও তত বেশি চলে। যতক্ষণ না রক্তাক্ত শরীর নিয়ে তারা জ্ঞান হারায় ততক্ষণ নির্দয়ভাবে হাত চালিয়ে যায় সে। তারপর অজ্ঞান শরীরটা গাড়িতে তুলে নেয়। পুলিশের লোককে আক্রমণ করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় তাকে। তবে হাসপাতাল থেকে ছাড়া না পাওয়া পর্যন্ত বিচার স্থগিত রাখতে হয়।

থানার সার্জেন্টকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে না নেরি, তাই তাকে বদলি করে দেয়া হলো। ইউনাইটেড নেশনস্-এর বাড়িটা তার আওতাধীন নতুন এলাকার মধ্যে পড়ে। ইউনাইটেড নেশনস্-এর কর্মচারীদের রয়েছে রাষ্ট্রদূতদের সমান স্বাধীনতা। আইনের ধার ধারে না তারা, যেখানে ইচ্ছা গাড়ি পার্ক করে যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। কয়েকদিন ব্যাপারটা লক্ষ করল নেরি, তারপর থানায় রিপোর্ট করল। পরিষ্কার জানিয়ে দেয়া হলো তাকে, এ নিয়ে সে যেন পানি ঘোলা না করে, স্রেফ চোখ বুজে থাকতে হবে তাকে।

এক রাতের ঘটনা। রাস্তার প্রায় মাঝখানে গাড়ি রাখার ফলে ছোট একটা গোটা এলাকায় যানবাহন চলাচল একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। রাত তখন বারোটা। টর্চ হাতে নিয়ে কর্তব্য পালনে নেমে পড়ল নেরি। রাস্তায় যে ক'টা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সবগুলোর উইণ্ডস্ক্রীনের কাঁচ ভেঙে দিল সে। গাড়ির মালিকরা সবাই গণ্যমান্য ব্যক্তি হলেও কাঁচ পাল্টাতে সময় এবং কিছু টাকা ব্যয় করতে বাধ্য হলো তারা, তবে এ ধরনের বর্বরতার বিরুদ্ধে চুপ করে থাকল না কেউ, ফলে স্রোতের মত অভিযোগ আসতে শুরু করল থানায়।

কিন্তু এরপরও পুরো হুগা জুড়ে প্রতিদিন গাড়ির কাঁচ ভাঙার ঘটনা ঘটতে লাগল। অবশেষে আসল কারণ বুঝতে পেরে টনক নড়ল কর্তৃপক্ষের। সাথে সাথে হার্নেমে বদলি করে দেয়া হলো অ্যালবার্ট নেরিকে।

এর কিছুদিন পর এক রোববারে সস্ত্রীক বেড়াতে এল নেরি তার বোনের বাড়ি। আর সব সিসিলীয়দের মত বোনকে সাজাতিক ভালবাসে সে, সম্ভাব্য সব রকম বিপদ-আপদ আর আঘাত থেকে তাকে রক্ষা করতে চায়। দু'মাস অন্তর একবার করে এসে দেখে যায় বোন কেমন আছে। বোনের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট সে, বছর কুড়ি বয়সের একটা বোন-পো আছে তার। নাম টমাস, মাথার ওপর বাপের শাসন না থাকায় ভালমানুষ মায়ের ওপর খুব অত্যাচার করে সে। এরই মধ্যে ছোটখাট দু'একটা অঘটন ঘটিয়েছে। আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে দিনে দিনে। একবার ছোট একটা চুরির কেসে ফেঁসেই গিয়েছিল টমাস, সহকারীদের ধরে তার রেহাই পাবার ব্যবস্থা করে দিল মেরি। সেবার প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল তার। কিন্তু স্বভাব অনুযায়ী প্রথমবার বলে গায়ে হাত তোলেনি, তবে শেষবারের মত সাবধান করে দিয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে আরও বলেছিল, দেখো, টমি, এখন তুমি বড় হয়েছ। মায়ের সাথে কি রকম আচরণ করা উচিত তা তোমার জানা আছে বলেই বিশ্বাস করি। ফের যদি শুনি তুমি আমার বোনের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছ, নিজে এসে

তোমাকে সিধে করব আমি।' কথাটা ভয় দেখাবার জন্যে বলেনি নেরি, বলেছিল ভায়ের প্রতি মামার শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুসুলভ পরামর্শের সুরে। ব্রুকলিনের এই গুণাপাড়ায় যত ছোকরা আছে তাদের মধ্যে টমাসই সবচেয়ে বেপরোয়া আর অকুতোভয়, কিন্তু মামাকে সে ভয় করে জুজুর মত।

রোববার সকালে বোনের বাড়ি এসে নেরি শুনল গতরাতে প্রায় ভোরের দিকে বাড়ি ফিরেছে টম, তাই এত বেলাতেও ঘুম ভাঙেনি তার। মা ছেলের কামরায় ঢুকে খানিকটা চেষ্টামেচি করে এল। বলল, 'তোমার মামীকে নিয়ে মামা বেড়াতে এসেছে, ওদের সাথে খাবি আয়।'

কামরার মাঝখানের দরজা খোলা, তাই টমের উত্তরটা পরিষ্কার শুনতে পেল নেরি। টম কর্কশ সুরে বলল, 'এসেছে তো আমার কি! এখান থেকে যাও, আমি এখন ঘুমাব।'

ছেলের খমক খেয়ে মুখ কালো করে বেরিয়ে এল মা।

টমকে বাদ রেখেই খেতে বসল ওরা। বোনকে একটা প্রশ্ন করল নেরি, ইদানীং টম তার ওপর আগের মত অত্যাচার করছে কিনা। এদিক ওদিক মাথা নাড়ল টমের মা।

বিকেলের দিকে বিদায় নিচ্ছে নেরি, এই সময় বিছানা থেকে উঠল টম। দায়সারা গোছের একটা 'হ্যালো' বলে কিচেনে গিয়ে ঢুকল সে। তারপর সেখান থেকে চিৎকার করে বলল, 'এই মা, আমার কথা কানে যাচ্ছে? খিদে পেয়েছে, তাড়াতাড়ি কিছু একটা রেখে দাও।' কথার সুরটা অনুরোধের মত নয়, আদুরে ছেলের আবদারের মত শোনাল।

গলায় ঝাঁঝ এনে জবাব দিল মা, 'লাটসাহেব ছেলে আমার, সারা রাত হারামীপনা করে এসে উনি ঘুম থেকে উঠলেন এই বিকেল বেলা! এখন ওঁকে আমার রেঁধে দিতে বয়ে গেছে। আরও ঘুমাও, একেবারে সেই রাতে খেয়ো।'

অপ্রীতিকর একটা দৃশ্য, অনেক সংসারেই এই রকম ঘটতে দেখা যায়। কিন্তু এই মাত্র ঘুম থেকে উঠে টমের মেজাজ ভাল নেই, মামার উপস্থিতি ভুলে গিয়ে একটা মারাত্মক অন্যায় করে বসল সে। 'তোমাকে আর তোমার খ্যাচখ্যাচানিকে ইয়ে করি আমি,' চিৎকার করে অশ্রাব্য একটা গালি দিল সে। 'বাইরে গিয়েই খেতে পারি, বুঝেছি?' কথাগুলো বলেই বুঝতে পারল টম, মারাত্মক একটা ভুল করে ফেলেছে সে।

শিকারী বিড়ালের মত ভায়ের ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ল নেরি। মাকে টম এমন জঘন্যভাবে অপমান করল বলে যতটা না, তার চেয়ে হলো নেরির বাড়িতে কেউ না থাকলে টম তার মায়ের সাথে আরও খারাপ আচরণ করে বুঝতে পেরে। এর আগে কখনও মামার সামনে এভাবে মায়ের সাথে কথা বলেনি ও। বাজে কথাগুলো মুঁখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে আজ। কপালে খারাবি থাকলে যা হয়।

ঘরে দু'জন মেয়েলোক উপস্থিত রয়েছে, কিন্তু তারা বাধা দেয়া তো দূরের কথা, 'আতঙ্কে পিছু হটতে হটতে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। একটা কথাও বেরুল না তাদের মুখ থেকে। বিস্ফারিত চোখে শুধু দেখছে মার কাকে বলে। ভায়ের পা

থেকে মাথা পর্যন্ত অত্যন্ত যত্নের সাথে পেটাল নেরি। খুব বেশি ব্যস্ততা দেখান না সে, যেন কাজটায় গভীর যত্ন না নিলে নিখুঁত হবে না। শুধু দুই হাতে পেটাচ্ছে, কিন্তু আঘাতগুলো যেখানে পড়েছে সেখানের গাংস সাথে সাথেই ফুলে উঠেছে। প্রথম দিকে আত্মরক্ষার একটু চেষ্টা করল টম, কিন্তু তা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে করুণা ভিক্ষা করতে শুরু করল। নেরি সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দিল টমের মুখের ওপর। একের পর এক চড় মেরে গেল যতক্ষণ না ঠোট ফেটে রক্ত গড়াতে শুরু করল। তারপর টমের মাথার দিকে মনোযোগ দিল। মাথাটা ধরে টুকে দিতে লাগল শুরু দেয়ালে। তারপর ভাগের পেটে গোটাকতক ঘুসি মারল। পড়ে গেল টম। নেরি যেন এরই জন্যে অপেক্ষা করছিল, টম পড়ে যেতেই তার মুখটা ঘষে দিল গালিচার সাথে 'তোমরা এখানে অপেক্ষা করো,' মহিলাদেরকে বলল নেরি। তারপর রক্তাক্ত ভাগ্যকে ধাক্কা মারতে মারতে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে এসে সোজা তুলল নিজের গাড়িতে। স্টার্ট দিল না, ভাগের পাশে বসে তার উদ্দেশ্যে গালমন্দ শুরু করে একেবারে ভূত ভাগিয়ে দিল। 'ফের কখনও যদি জানতে পারি তোর মায়ের সাথে ওভাবে কথা বলছিস, তখন কি করব তা আমার মনই জানে। শুধু এইটুকু বলে রাখি,' আজকের এই মারধরটাকে তখন মেয়েদের চুমো বলে মনে হবে তোর কাছে। যা এবার, সোজা বাড়িতে ঢুকে তোর মামীকে বল, তার জন্যে এখানে আমি অপেক্ষা করছি।'

এই ঘটনার পর দু'মাস কেটে গেছে। একদিন বাড়ি ফিরে অ্যানবার্ট নেরি দেখল তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছে। ফোন করল সে। রিসিভার তুলল ওর শ্বশুর, বলল, নেরিকে সাম্প্রতিক ভয় করে তার মেয়ে, তাই চলে এসেছে। রিটা জানিয়ে দিয়েছে, এমন চণ্ডালের মত রাগী লোকের সাথে ঘর-সংসার করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

নেরি তো একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল, রিটা তাকে ভয় করে, একথা সে বিশ্বাসই করতে পারছে না। স্ত্রীর গায়ে কখনও হাত তোলেনি সে, এমনকি বকাঝকাও করেনি কখনও। স্ত্রীকে ভালবাসে সে, তাকে ভয় দেখাবার কথা ভাবতেই পারে না। স্তম্ভিত ভাবটা কেটে যেতে কয়েকটা দিন সময় লাগল। তারপর নেরি ঠিক করল, শ্বশুর বাড়ি গিয়ে রিটার সাথে কথা বলতে হবে তাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরদিন রাতেই ডিউটিতে গিয়ে বিপদে পড়ে গেল সে। রিটার কাছে আর যাওয়া হলো না তার।

সাহায্যের ডাকটা এল হার্নেম থেকে। নিজের পেট্রল-কারের অ্যারনেসের মাধ্যমে সাড়া দিল নেরি। তাকে জানানো হলো, ভয়ঙ্কর ধরনের খুনোখুনি ব্যাপার, অকুস্থলে দ্রুত পৌঁছতে পারলে কিছুটা সামাল দেয়া যেতে পারে। তীর বেগে গাড়ি হাঁকিয়ে সেখানে পৌঁছে গেল নেরি, টচটা হাতে নিয়ে নেমে পড়ল লাফ দিয়ে। মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে, তবু জায়গাটা খুঁজে বের করতে বেগ পেতে হলো না। বস্তী এলাকা, একটা বাড়ির সামনে ভিড় দেখে সেদিকে এগোল নেরি। 'একজন লোক বাচ্চা একটা মেয়েকে মেরে ফেলছে,' নিগ্রো একটা মেয়েলোক বলল নেরিকে।

দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল নেরি। হলঘরের উল্টোদিকের দরজাটা খোলা,

সেখান থেকে আলো আসছে। একটা গোঙানির আওয়াজও পাচ্ছে নেরি। খোলা দরজাটার দিকে এগোল সে। চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকেই আরেকটু হলে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। দুটোই নিথো মেয়ে, একজনের বয়স পঁচিশের মত, আরেকজনের টেনেটুনে বারো হবে। মেয়ে দুটোর শরীরের নানা জায়গায়, বিশেষ করে মুখে ধারাল ক্ষুর দিয়ে পৌঁচ মারা হয়েছে। সিটিংরুমে অপরাধীকেও দেখতে পাচ্ছে নেরি। খুব ভাল করে চেনে লোকটাকে সে। নাম ওয়াল্ট বেনস্, বেশ্যাদের একজন নীচ দালাল, তাছাড়া গুণ্ডামি আর বেআইনী ড্রাগসের ব্যবসাও করে থাকে। এই তো মাত্র এক হপ্তা আগের ঘটনা, রাস্তায় একটা বেশ্যা মেয়েকে মারধর করার অপরাধে নেরি তাকে অ্যারেস্ট করেছিল। অবশ্য তার পরদিনই জামিন পেয়ে গিয়েছিল বেনস্।

নিথোদেরকে মোটেই পছন্দ করে না নেরি। হার্লেম নিথোদেরই এলাকা, এখানে কাজ করতে এসে নিথোদের ওপর তার বিরক্তি আর ঘৃণা আরও বরং বেড়ে গেছে। নিথোদের স্বভাব আর আচার আচরণই এর জন্যে দায়ী। নিথো মেয়েরা প্রায় সবাই চাকরি করে, দেহ বিক্রি করে টাকা কামায়, কিন্তু পুরুষগুলো খাটা-খাটনির ধার দিয়ে যায় না—শুধু মদ খেয়ে নেশা করে। একে নিথোদেরকে দু'চোখে দেখতে পারে না, তার ওপর বেনস্ এমন সীমা ছাড়িয়ে আইন অমান্য করেছে দেখে মাথায় রক্ত চড়ে গেল নেরির। ক্ষুর দিয়ে ফালা ফালা করা ছোট মেয়েটাকে দেখে বমি পাচ্ছে তার। অত্যন্ত শান্তভাবে, ঠাণ্ডা মাথায় আশ্চর্য একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেনল অ্যালবার্ট নেরি—ওয়াল্ট বেনস্কে গ্রেফতার করবে না সে।

বাড়ির ভেতর ইতিমধ্যে সান্ধীদের ভিড় জমে গেছে, বেশিরভাগই বস্তীর বাসিন্দা, তাদের সাথে পেট্রল-কার থেকে নেরির সহকারীও এসেছে। 'এই ব্যাটা, বেনস্, ছুরি ফেলে দে, গ্রেফতার করা হলো তোকে,' বলল নেরি।

বিধী শব্দ করে হেসে উঠল বেনস্, বলল, 'এতই সহজ? আমাকে গ্রেফতার করতে হলে রিভলভার লাগবে,' হাত তুলে ছুরিটা দেখাল সে। 'কিংবা হয়তো এটা দরকার তোমার?'

বিদ্যুৎ খেলে গেল নেরির শরীরে, চোখের নিমেষে নিথো লোকটার কাছে চলে এল সে। পকেট থেকে রিভলভার বের করার সুযোগই পেল না লোকটা, কিন্তু আশ্চর্য ক্ষিপ্ততার সাথে নেরিকে লক্ষ্য করে ছুরি চালাল। তৈরি ছিল নেরি, বা হাত দিয়ে লোকটার কজি ধরে ফেনল সে। একই সাথে ডান হাতে ধরা টর্চটা দিয়ে ছোট একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে বেনসের মাথায় মোক্ষম একটা ঘা বসিয়ে দিল। নেশাগ্রস্ত বদ্ধ মাতালের মত হাস্যকর ভঙ্গিতে বসে পড়ল বেনস্। ছুরিটা পড়ে গেছে হাত থেকে। মাথায় টর্চের বাড়ি খেয়ে একেবারে অসহায় হয়ে গেছে লোকটা, সুতরাং এরপর আর তাকে মারধর করা চলে না নেরির। আইন সেটাকে সমর্থন করবে না। প্রথম আঘাতেই বারোটা বেজে গেছে বেনসের। টর্চের কাঁচ টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, এনামেল করা ঢাকনি আর বাল্ব ছিটকে চলে গেছে কামরার আরেক প্রান্তে। টর্চের ভারি শরীরটা পর্যন্ত ভুবে গেছে। ভেতরে ব্যাটারির সেলগুলো রয়েছে, তা না হলে দুমড়ে দু'ভাঁজ হয়ে যেত ওটা। মাথার খুলি ফেটে গেছে বেনসের। এই

বাড়িরই একজন বাসিন্দা, নিগ্রো দর্শক, সবিস্ময়ে বলল, 'কি শত্রু মাথারে বাবা! চুরমার হয়ে যাবার কথা, তা না, শুধু ফেটে গেছে।' তবু লোকটাকে দ্বিতীয়বার আঘাত করল নেরি। দু'ঘণ্টা পর হার্নেমের হাসপাতালে মারা গেল বেনস।

বিভাগীয় অভিযোগের সম্মুখীন হতে হলো নেরিকে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে শুনে নেরি ছাড়া আর কেউ এতটুকু আশ্চর্য হলো না। প্রয়োজনের বেশি শক্তি প্রয়োগ করার অপরাধে তাকে তো সাসপেন্ড করা হলোই, সেই সাথে কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে একটা ফৌজদারি মামলাও ঠুকে দিল। গোটা ব্যাপারটা নেরির কাছে অবিশ্বাস্য, দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয়। বুঝতেই পারে না কি অপরাধ করেছে সে। বিচারে দোষী সাব্যস্ত করা হলো তাকে, জেল হয়ে গেল দশ বছরের।

ইতিমধ্যে ব্যর্থ আক্রোশ আর গোটা সমাজের ওপর তীব্র একটা ঘৃণায় অন্তঃকরণ ভরে উঠেছে অ্যালবার্ট নেরির। কর্তব্যপালন করতে গিয়ে একটা বেশ্যার দালালকে, একটা নিগ্রো খুনীকে মেরে ফেলেছে বলে তাকে কিনা জেলে পুরে দিল! এত বড় সম্পর্ধা! এর নাম বিচার। দু'দুটো মেয়েমানুষকে ক্ষুর দিয়ে কেটে চিরকালের জন্যে পঙ্গু করে দিয়েছে বেনস, সেই বেনসকে খুন করায় তাকে সবাই ফুলের মালা পরাবে, তা না উল্টো কঠিন সাজা দিয়ে মজা দেখছে! তার মানে ভাল কাজের কোন দাম নেই সমাজে? জেল খাটাকে ভয় পায় না নেরি। তার ধারণা, হাজার হোক পুলিশে ছিলাম, ভাল ব্যবহারই করা হবে আমার সাথে। তাছাড়া, জেল কর্তৃপক্ষ আর কর্মচারীরা তার অপরাধের প্রকৃতিটাও তো দেখবে। কয়েকজন পুলিশ অফিসার ইতিমধ্যে আশ্বাস দিয়ে বলেছে, তারা তাদের বন্ধুবান্ধবকে নেরির সাথে ভাল ব্যবহার করার জন্যে অনুরোধ করবে। একমাত্র ওর স্বপ্তর, একটা মাছের বাজারের মালিক তিনি, গম্ভীর মুখে বললেন, 'জেলে বোধহয় এক বছরও বাঁচবে না নেরি। হয় কোন কয়েদী ওকে মেরে ফেলবে, নয়তো, ওর হাতে মারা পড়বে তারা কেউ।'

জামাইয়ের ওপর অদ্ভুত একটা টান ছিল ভদ্রলোকের। মেয়েটা এমন ভাল একটা স্বামীকে মেয়েলী ঢং দেখিয়ে ছেড়ে দেয়ায় নিজে তিনি অপরাধবোধে ভোগেন। কর্নিয়নি পরিবারের সাথে যোগাযোগ আছে তাঁর, বাজারটার নিরাপত্তায় জন্যে পরিবারটিকে নিয়মিত টাকা দেন তিনি। তার ওপর বড় মাছগুলো উপহার হিসেবে প্রায় রোজই তো পাঠানো হচ্ছে। একজন ন্যায়পরায়ণ জামাইয়ের স্বপ্তর হিসেবে নিজে কর্নিয়নিদের সাহায্য ভিক্ষা চাইলেন তিনি।

অ্যালবার্ট নেরির কথা এরই মধ্যে জানা হয়ে গেছে কর্নিয়নিদের। ন্যায়ের ধ্বজাধারী একজন ব্যতিক্রমী পুলিশ হিসেবে কিংবদন্তীর নায়ক হয়ে গেছে সে। সবাই বলাবলি করে, নেরি এমন একটা মানুষ যাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা চলে না। পুলিশের ইউনিফর্ম আর সাথে আয়েয়াস্ত থাকত বলে লোকে ওকে ভয় করত তা নয়, এসব ছাড়া শুধু ওর ব্যক্তিত্বই এমন যে ভয় না করে উপায় থাকে না কারও। ওর হিংস্রতার কথাটাই ধরা যাক। এতটুকু উদ্বেজিত না হয়ে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ সারার ভঙ্গিতে, শুধু খালি দুটো হাত দিয়ে অনায়াসে মানুষ মারতে পারে সে। তার জন্যে পরে কোন অনুতাপও বোধ করে না। এই জাতের লোক সম্পর্কে কর্নিয়নিরা সব

সময়ই আগ্রহ প্রকাশ করে এসেছে। নেরি যে পুলিশের লোক; এটাকে তারা তেমন গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন বোধ করল না। তাদের জানা আছে নিয়তির নির্দিষ্ট করে রাখা লক্ষ্যে অনেক যুবক ভুল পথ ধরে পৌঁছে যায়। সময় এবং ভাগ্য তাদেরকে সাহায্য করে।

গন্ধ ঝুঁকে ভাল কর্মী খুঁজে বের করার একটা আশ্চর্য গুণ আছে পীট ক্রেমেঞ্জার। টম হেগেনের নজরে নেরিকে সেই আনল প্রথমে। পুলিশের তৈরি করা বিবৃতি পড়ে আর ক্রেমেঞ্জার বর্ণনা শুনে হেগেন বলল, 'এখানে যেন আরেকটা লুকা ব্রাসির খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে?'

'আমারও ঠিক তাই মনে হচ্ছে,' উৎসাহের সাথে মাথা নেড়ে বলল ক্রেমেঞ্জা 'এদিকে একটু খেয়াল দেয়া উচিত মাইকেলের।'

অস্থায়ীভাবে একটা কারাগারে রাখা হয়েছে নেরিকে, কিছুদিনের মধ্যে অন্য রাজ্যে বদলি করা হবে তাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অশ্রুত্যাগিত একটা ঘটনা ঘটল। তাকে জানানো হলো, উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারদের পেশ করা নতুন কিছু তথ্য আর হলফনামার ওপর নির্ভর করে বিচারক তাঁর রায় রদবদল করেছেন। পুনর্বিচার করে আগের রায় বাতিল করে দিয়েছেন তিনি, নেরি খালাস পেয়েছে।

নেরি বোকা নয়, আর তার স্বপ্নের ভদ্রলোকটিও লাজুক বনফুলটি নন। সব কথা শুনল নেরি। রিটার ওপর তার দাবি-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে স্বপ্নের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করল সে। তারপর রওনা হলো লংবীচের উদ্দেশে। যারা তার এত বড় উপকার করেছে তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্যে। সব স্ববস্থা আগেই করা হয়েছে। তার সাথে লাইব্রেরিতে দেখা করল মাইকেল কর্লিয়নি।

খুব একটা গদগদ ভাব না দেখিয়ে সাধারণভাবে ধন্যবাদ জানানল নেরি। কিন্তু তার এই সামান্য ধন্যবাদকে এমন আন্তরিক সহৃদয়তার সাথে গ্রহণ করল মাইকেল, নেরি যেমন আশ্চর্য হলো তেমনি কৃতার্থও হয়ে গেল।

'আমি একজন সিসিলীয়,' তাকে বলল মাইকেল, 'আরেকজন সিসিলীয়র সাথে ওই রকম অন্যায় ব্যবহার ওদেরকে আমি করতে দেই কিভাবে? সোনার একটা মেডেল দেয়া উচিত ছিল তোমাকে, তা না দিয়ে, ওরা তোমাকে জেলে ভরে দিল এ কি সহ্য করার মত একটা ব্যাপার? আসলে কি জানো, শালার রাজনীতিকরা দলীয় চাপ ছাড়া আর কোন ব্যাপারেই মাথা ঘামায় না। সমস্ত খবর নিয়ে যখন বুঝলাম যে সত্যি সত্যি তোমার ওপর অন্যায় অবিচার করা হয়েছে, তখন আর নাক না গলিয়ে পারলাম না। তুমি যদি সত্যি অপরাধী হতে, কিছুই এসে যেত না আমার, তোমাকে নিয়ে এতটা মাথা ঘামাতাম না। তোমার বোনের সাথেও কল্যাণ বলেছে আমার লোক। শুনলাম বোনের জন্যে অনেক কিছু করেছে তুমি, তার ছেলেটাকেও জন্মের মত সিঁধে করে দিয়েছ। তোমার স্বপ্ন তো নিজে আমাকে এসে বলে গেছেন, তোমার মত ভাল মানুষ তিনি নাকি আর দেখেননি। যাই বলো, একজন মানুষ সম্পর্কে সবাই শুধু ভাল ভাল কথা বলছে, এমন বড় একটা দেখা যায় না।' নেরির স্ত্রী যে তাকে ছেড়ে চলে গেছে, বুদ্ধি করে সেটা আর উল্লেখ করল না মাইকেল।

গল্পগুজব করে খানিকটা সময় কাটান ওরা। খুব চাপা স্বভাবের লোক নেরি, ঘনিষ্ঠ লোকজনদের সাথেই বেশি কথা বলে না সে, কিন্তু সদ্য পরিচয় হলেও মাইকেলের সাথে মন খুলে কথা বলছে আজ। খুব বেশি হলে মাইকেলের চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট হবে সে, কিন্তু এমন ভাবে কথা বলছে, মাইকেল যেন তার চেয়ে অনেক বড়, তার বাপের বয়েসী।

তারপর কাজের কথায় এল মাইকেল। প্রসঙ্গটা কৌশলে পাড়ল ও, বলল, 'যাক, ভালয় ভালয় তোমাকে জেল'থেকে ছাড়িয়ে আনা গেছে, সেটাই আসল কথা। তবে, তাতেই আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে, তা ভেব না। একটা বিপদ থেকে কাউকে উদ্ধার করে তাকে আবার সাগরে ভাসিয়ে দেয়া আমার নীতি নয়। তুমি চাইলে তোমার জন্যে কিছু কাজের ব্যবস্থা করতে পারি আমি। লাস ভেগাসে আমাদের বৈষয়িক স্বার্থ আছে, তোমার যা অভিজ্ঞতা, তাতে অনায়াসে ওখানকার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে পারো তুমি। অথবা তুমি হয়তো ছোটখাট একটা ব্যবসার মালিক হতে চাও। তাতেও খুশি হব আমি! পুঁজি যদি না থাকে, ব্যাংক থেকে লোন পাবার ব্যবস্থাও করে দিতে পারব।'

কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে পড়ল নেরি। নিজেকে তার তুচ্ছ আর মাইকেলকে মহান বলে মনে হচ্ছে। অদ্ভুত একটা কুণ্ঠাবোধ করলেও গর্বের সাথে মাইকেলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল সে। তারপর বলল, 'শাস্তি থেকে রেহাই পেলেন কি হবে, ওই আদালতের নাগালের বাইরে যেতে পারব না আমি।'

'ওসব কথার কথা,' তাড়াতাড়ি বলল মাইকেল, 'আদালতের ওই নিষেধাজ্ঞা যাতে ভুলে নেয়া হয় তার ব্যবস্থা আমি করতে পারব। আর ব্যাংক থেকে যাতে কোন আপত্তি না ওঠে তার ব্যবস্থাও করা সম্ভব, পুলিশের খাতা থেকে তোমার নামটা কেটে দেয়া এমন কোন কঠিন কাজ নয়।'

এসব অত্যন্ত ঝামেলার কাজ, জানে নেরি। তার জন্যে মাইকেল এত ঝামেলা কাঁধে নিতে চাইছে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল সে। মৃদু গলায় বলল, 'ঠিক আছে। কখনও যদি সাহায্য দরকার হয়, আপনাকে জানাব।'

'খুব খুশি হলাম আমি,' বলল মাইকেল। 'এখন চলো, আমার বাড়ির লোকেরা খাবার টেবিলে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। বাবা তোমার সাথে পরিচিত হতে চেয়েছেন। এইটুকু পথ, চলো তাঁর বাড়িতে আমরা হেঁটেই যাই। তোমাকে নিয়ে যেতে দেরি করলে মা আবার রাগ করবে আমার ওপর।' হাসল মাইকেল। 'লংকা ভাজা, ডিম, সসেজ, আরও অনেক কিছু—একেবারে খাঁটি সিসিলীয় নিয়মে তৈরি করা।'

সেই কৈশোরের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে অ্যালবার্ট নেরির। তারপর থেকে আর কোন দুপুরবেলা এত আনন্দে কাটেনি তার। সেই পনেরো বছর বয়সে মা'কে হারিয়েছে, সেই থেকে আনন্দের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে সে। কিন্তু আজ সদ্য পরিচিত একটা পরিবারের সদস্যদের সাথে খেতে বসে এমন আপনজনের মত ব্যবহার পাচ্ছে, রীতিমত অভিভূত হয়ে পড়ছে মনটা। আশ্চর্য প্রসঙ্গ মেজাজে তাকে অভ্যর্থনা করলেন ডন কর্লিয়নি। নেরিকে কথা বলিয়ে তিনিই আবিষ্কার করলেন,

নেরির বাবা-মার আদি বাসস্থান থেকে তাঁদের গ্রামে যেতে সময় লাগে মাত্র কয়েক মিনিট। নেরি কর্লিয়নিদের এক রকম ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। খুব উৎসাহী হয়ে উঠলেন ডন। গল্পগুজব করার জন্যে অনেকটা সময় দিলেন তিনি নেরিকে। ভোজের ব্যাপক আয়োজন রয়েছে, খাবারগুলো আশ্চর্য উপাদেয়, গাঢ় লাল রঙের মদ, বড়ই পুষ্টিকর। কর্লিয়নিদেরকে একান্ত আগনজন বলে মনে হলো নেরির। লক্ষ করল, এদের কোন গর্ব নেই, এরা দাঙ্গিক নয়, উপকারের বিনিময়ে কিছু চায় না। উল্টে তার জন্যে আরও কিছু করতে পারে কিনা জানতে চাইছে বারবার। পরিষ্কার বুঝতে পারছে সে, আজ সে এই পরিবারে বহিরাগত মেহমান হলেও সে যদি চায়, এই পরিবারে একটা স্থায়ী আসন পেয়ে সুখী হতে পারে।

বিদায় দেবার সময় মাইকেল এবং ডন স্বয়ং যে সৌজন্য দেখালেন, জীবনে কখনও তা ভুলবে না নেরি। ওর গাড়ি পর্যন্ত হেঁটে এলেন তাঁরা। সহাস্যে ওর হাত ধরে নেড়ে দিলেন ডন। বললেন, 'তুমি খুব ভাল ছেলে, নেরি। তোমার সাথে আলাপ করে খুব খুশি হয়েছি আমি। এই যে আমার ছেলে মাইকেলকে দেখছ, জলপাই তেলের ব্যবসা শেখাচ্ছি ওকে আমি। বয়স বাড়ছে তো, এবার অবসর নিতে হবে। কিছুদিন আগে হঠাৎ আমার কাছে এসে তোমার নাম করল, বলল এই ছেলেটা খুব ভাল, দুর্ভাগ্যক্রমে সাম্প্রতিক একটা বিপদে পড়ে গেছে, সেই বিপদ থেকে একে উদ্ধার করতে হবে—বাবা, তুমি চেষ্টা করলে ছেলেটা বেঁচে যায়। আমাকে একটু স্বস্তি পেতে দেয় না, সারাক্ষণ কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করে। অবশেষে বাধ্য হয়ে তোমার ব্যাপারে নাক গলাতে হলো আমাকে। তোমাকে এত কথা বলার কারণ, এখন বুঝতে পারছি তোমার ব্যাপারে আমার সাহায্য চেয়ে খুব ভাল করেছিল ও। তোমার মত ভাল ছেলে হয় না। কখনও যদি তোমার জন্যে কিছু করতে পারি, মুখ ফুটে চেয়ো উপকারটা। আমার কথা বুঝতে পারছ তো? তোমার জন্যে কিছু করতে পারলে আমরা খুশি হব।'

মনস্থির করতে তিনদিনও সময় নিল না নেরি। ওকে তোয়াজ করা হয়েছে, বুঝতে অসুবিধে হয়নি তার। কিন্তু সেই সাথে এও বুঝল, যে কাজের জন্যে প্রচলিত সমাজ তাকে দোষী মনে করে শাস্তি দিয়েছিল, সেই কাজকে অনুমোদন করে কর্লিয়নি পরিবার। কর্লিয়নি পরিবার ওকে গুরুত্ব দেয়, ওর মূল্য বোঝে, কিন্তু সমাজ ওকে পাত্তাই দেয় না, মূল্য বোঝা তো পরের কথা। কর্লিয়নি পরিবার ওর প্রশংসা করে, সমাজ ওর নিন্দা করে। কর্লিয়নিরা নিজেদের চেষ্টায় আলাদা একটা জগৎ সৃষ্টি করেছে, সেখানে তার মত লোক সুখে থাকতে পারে আরও একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝতে পারল নেরি, বৃহৎ সমাজের চেয়ে কর্লিয়নিদের সমাজ অনেক বেশি শক্তিশালী। এদের সমাজে থাকতে পারলে তার হাতেও অনেক ক্ষমতা আসবে। টাকা, আরাম-আয়েশ, সম্মান, দাপট এসব তো আসবেই।

আবার মাইকেল কর্লিয়নির সাথে দেখা করল নেরি। খোলাখুলি সে নিজের ইচ্ছের কথাটা বলল তাকে। ভেগাসে নয়, নিউ ইয়র্কে কর্লিয়নি পরিবারের কাজ করতে চায় সে। মাইকেলের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করল সে। বলল, উপকারীর ঋণ প্রাণ দিয়ে হলেও পরিশোধ করার চেষ্টা করবে সে। কথাটা বলে নিজের

বিশ্বস্ততা সম্পর্কে নিশ্চিত করতে চাইল মাইকেলকে। মাইকেল যে মুগ্ধ হয়েছে, তাও লক্ষ্য করল নেরি। সেদিনই সব কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল। প্রথমেই শর্ত দিল মাইকেল, কর্লিয়নিদের খরচে মায়ামীতে গিয়ে লগ্না একটা ছুটি উপভোগ করে আসতে হবে নেরিকে। ওখানে কর্লিয়নিদের হোটেল আছে, সেখানে একবার গিয়ে উঠলেই হবে, নেরির আরাম-আয়েশের যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেবে তারা। সেই সাথে পুরো এক মাসের বেতন অ্যাডভান্স দিয়ে দেয়া হলো ওকে।

জীবনে এই প্রথম বিলাসিতার স্বাদ পেল অ্যালবার্ট নেরি। হোটেল কর্তৃপক্ষ সাম্প্রতিক খাতির করল তাকে। আদর-যত্নের কোন ক্রটি হলো না। ম্যানেজার, বলল, 'আপনার অযত্ন হলে রক্ষা থাকবে কারও? আপনি যে কর্লিয়নিদের বন্ধু মানুষ!' হোটেলের সবচেয়ে সৌখিন আর দামী সুইটটা দেয়া হয়েছে তাকে। ঠেকায় পড়ে বা দয়া করে যেমন গরীব আত্মীয় স্বজনকে সস্তা একটা ঘর দেয়া হয়, ব্যাপারটা সেরকম নয়। নাইট ক্লাবের ম্যানেজার নিজে এসে নিয়ে গেল একদিন নেরিকে, কয়েকটা অপূর্ব সুন্দরী মেয়ের সাথে ওকে পরিচয় করিয়ে দিল সে।

ছুটি কাটিয়ে আবার একদিন নিউ ইয়র্কে ফিরে এল নেরি। জীবন সম্পর্কে এই ক'দিনে ধারণাটা মোটামুটি বদলে গেছে তার। ক্রেমেঞ্জার দলে ভর্তি করে নেয়া হলো তাকে। কর্মী যাচাই করার ব্যাপারে ক্রেমেঞ্জার তুলনা মেলা ভার, এ ~~কম্পানী~~ ^{সে} যেমন দক্ষ, তেমনি মেজাজী। সম্ভাব্য সব উপায়ে নেরিকে পরীক্ষা করে নিল সে। হাজার হোক, পুলিশের লোক ছিল নেরি। তবে আসল কথা হলো, জন্ম সূত্রে পাওয়া একটা হিংস্রতা আছে ওর চরিত্রে। আইন মানে না এমন লোকদের হয়ে কাজ করার ব্যাপারে তার মনে একটু যদি দ্বিধা এসেও থাকে, ওর ভয়ঙ্কর হিংস্রতার জোয়ারে সব একেবারে বেমানুম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এক বছরও লাগল না, অপরাধ জগৎ সম্পর্কে একেবারে ঝানু হয়ে উঠল অ্যালবার্ট নেরি। ইতিমধ্যে পূর্ব জীবনে ফিরে যাবার পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে।

নেরির কথা উঠলেই প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে ক্রেমেঞ্জা। ওর তুলনা হয় না, ঠিক যেন লুকা ব্রাসির আধুনিক সংস্করণ। গর্ব করে ক্রেমেঞ্জা এতদূর পর্যন্ত বলে, লুকাকেও ছাড়িয়ে যাবে নেরি। নেরিকে ক্রেমেঞ্জাই আবিষ্কার করেছে, গর্ব তো একটু হ'বেই তার।

শারীরিক দিক থেকে নেরিকে শুধু বিদ্যুতের সাথেই তুলনা করা চলে। তার ক্ষিপ্ত গতি, আর সমন্বয়বোধ লক্ষ্য করে নির্দিধায় বলে দেয়া যায়, ইচ্ছে করলেই আরেকজন বেস-বল প্রতিভা জো ডিম্যাজিও হতে পারত সে। ক্রেমেঞ্জা এও জানে যে নেরির মত একটা প্রাকৃতিক শক্তিকে সামলানো তার কাজ নয়। তাই ঠিক হলো, সরাসরি মাইকেল কর্লিয়নির কাছে জবাবদিহি করবে নেরি, প্রয়োজনে টম হেগেনের মধ্যস্থতায়। নেরির সাথে আর কারও তুলনা হয় না, তাই আর সবার চেয়ে বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধে বেশি পায় সে। কিন্তু স্বতন্ত্র একটা জীবিকার ব্যবস্থা তাকে করে দেয়া হয়নি। সৈনিক পোষা বা বুকমেকিং-এর একটা ব্যবসা, এসব নয়।

কিছুদিন যেতেই সবাই লক্ষ্য করে খুশি হলো যে একমাত্র মাইকেল কর্লিয়নিকে অগাধ ভক্তি করে নেরি। মাইকেলের ব্যাপারে একেবারে অন্ধ সে। ঠাট্টা করে

একদিন হেগেন বলল মাইকেলকে, 'দুঃখ করার আর কোন কারণ নেই তোমার, মাইকেল। তোমার লুকা ব্রাসিকে পেয়ে গেছ তুমি।'

সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল মাইকেল। সন্দেহ নেই, একটা কাজের মত কাজ করা গেছে। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কর্নিয়নি পরিবারের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে নেরি। তার বিশ্বাস যাতে অবিচল থাকে তার জন্যে কৌশল প্রয়োগ করছে ওরা। বলা বাহুল্য, কৌশলটা মাইকেল তার বাবার কাছ থেকেই শিখেছে। বাবার শিষ্যত্ব বরণ করার পর একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করল মাইকেল, 'আমি তো ভেবে পাই না লুকা ব্রাসির মত একজন লোককে তুমি কিভাবে কাজে লাগালে। একটা জানোয়ার ছাড়া কি বলা যায় ওকে?'

ছেলের প্রশ্ন শুনে হাসলেন ডন কর্নিয়নি। বললেন, 'আয়, বোস : ' ছেলেকে কিছু জ্ঞান দান করতে বসলেন তিনি। বললেন, 'দুনিয়ায় এমন কিছু মানুষ আছে যারা নিজেরাই খুন হতে চায়। এ-ধরনের লোক তোমার চোখেও পড়েছে। জুয়া খেলতে বসে খামোকা ঝগড়া বাধিয়ে বসে তারা, না জেনে কেউ যদি এদের গাড়িতে একটু আঁচড় কাটে, অমনি লাফ দিয়ে নিচে নেমে মারপিট শুরু করে দেয়। নিজেদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী লোকের সাথে লড়তে যায়, তাদের আসল ক্ষমতা সম্পর্কে কিছু না জেনেই। লোকটা কে তা না জেনেই যাকে তাকে অপমান করে, ঝগড়াপট্টপত্রের অত্যাচার চালায়। একজন লোকের কথা মনে পড়ছে আমার, একদল ভয়ঙ্কর লোককে অকারণে অপমান করছিল সে, অথচ নিজের না ছিল শক্তি, না ছিল পৃষ্ঠপোষকতা। এরা হচ্ছে সেই জাতের লোক যারা দিন রাত চেষ্টাচ্ছে—“আমাকে খুন করো! আমাকে খুন করো!” মজার ব্যাপার হলো, একদল লোক ঠিকই জুটে যায় যারা এদের অনুরোধ রক্ষা করতে সাম্প্রতিক উৎসাহী। খবরের কাগজে এ-ধরনের ঘটনার কথা আমরা রোজই পড়ছি। নিজেদের তো বটেই, এরা অন্য লোকেরও প্রচুর ক্ষতি করে বেড়ায়।

লুকা ব্রাসি ছিল ওই জাতের একজন মানুষ। কিন্তু ওই জাতের মধ্যে সে ছিল অসাধারণ। তাই অনেকদিন পর্যন্ত কেউ তাকে মারতে পারেনি। এ-ধরনের লোকদের সাথে আমাদের তেমন কোন সম্পর্ক থাকে না; তবে লুকার মত একজন লোককে যদি ঠিকমত ব্যবহার করা যায়, তোমার হাতে সে একটা মারাত্মক অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। রহস্যটা হলো, মৃত্যুকে যখন ভয় পায় না সে, বরং তাকে খুঁজে বেড়ায়, তার মনে নিজেকে তোমার এমন ভাবে গড়ে নিতে হবে যাতে শুধু তোমার হাতে মরতে চাইবে না সে। তার মনে এই একটাই ভয়, সে ভয় মৃত্যু নয়—তুমি যদি তাকে মারতে চাও, সেই ভয়। তা যদি করতে পারো, ওই লোক কেনা গোলাম হয়ে থাকবে তোমার।'

মারা যাবার আগে মাইকেলকে যত জ্ঞান দিয়েছেন ডন সেগুলোর মধ্যে এটাই সবচেয়ে মূল্যবান। এবং সেই জ্ঞান ব্যবহার করেই নেরিকে লুকা ব্রাসিতে পরিণত করল মাইকেল।

বক্স। অ্যালবার্ট নেরির ফ্ল্যাট।

নেরি ছাড়া আর কেউ নেই বাড়িতে। আজ আবার অনেকদিন পর পুলিশের পোশাকটা পরতে যাচ্ছে সে। অত্যন্ত যত্নের সাথে পুরানো নীল সার্জের ইউনিফর্মটায় বুরুশ চালাচ্ছে সে। এরপর পালিশ করতে হবে হোলস্টারটা। টুপিটাকেও বাদ দেবে না আর মজবুত কালো জুতোটাকেও চকচকে না করলে নয়। মনটা আজ আশ্চর্য একটা আনন্দে ভরে আছে তার। ছোটখাট কাজগুলো করতে খুব উৎসাহ পাচ্ছে। আজ দু'বছর হলো ওকে ছেড়ে চলে গেছে রিটা, তারপর থেকে এই প্রথম কোন কাজ করে মজা পাচ্ছে নেরি। প্রত্যেক মানুষের দুনিয়ায় একটা নিজের জায়গা থাকে, সেই জায়গা কেউ খুঁজে পায়, কেউ মৃত্যুর আগে পর্যন্ত শুধু খুঁজেই বেড়ায়। নেরি তার মনের মত জায়গাটা পেয়ে গেছে। মাইকেল কর্নিয়নি তাকে একাগ্রভাবে বিশ্বাস করে। তার সেই বিশ্বাসের অমর্যাদা করবে না আজ নেরি।

বারো

একই দিনের ঘটনা।

লং বীচ। উঠানে এসে থামল দুটো গাড়ি। একটা গাড়ি কনি, তার মা, আর তার দুই ছেলেকে নিয়ে এয়ারপোর্টে যাবে। কার্লোর পরিবার ভেগাসে ছুটি কাটাতে যাচ্ছে। স্থায়ীভাবে সেখানে উঠে যাবার আগে এটা ওদের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেবার মহড়া বলা যেতে পারে। কনি অবশ্য আপত্তি করেছে, কিন্তু তা জেনেও কার্লোকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে নিজের ইচ্ছাটাকে কাজে পরিণত করেছে মাইকেল। বার্জিনির সাথে শান্তি সভায় বসার আগে সবাইকে উঠান থেকে সরিয়ে দিতে চায় ও, কিন্তু কথাটা কাউকে ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন বোধ করেনি। শান্তি সভা আয়োজন সম্পর্কে অত্যন্ত গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছে, পরিবারের অন্তর কয়েকজন মাথা ছাড়া আর কেউ জানে না ব্যাপারটা।

দ্বিতীয় গাড়িটা কে আর তার ছেলেনদের জন্যে। কে তার বাপের বাড়ি নিউ হ্যাম্পশায়ারে বেড়াতে যাচ্ছে। ওদের সাথে মাইকেল যাচ্ছে না, তার কারণ কাজের সাম্প্রতিক চাপ পড়েছে, উঠান ছেড়ে বেরুবার উপায় নেই তার।

গতরাতে লোক মারফত খবর পাঠিয়ে কার্লোকে জানিয়ে দিয়েছে মাইকেল, বিশেষ জরুরী ব্যাপারে দিন কয়েক তাকেও থাকতে হবে উঠানে। হুগার শেষের দিকে ভেগাসে গিয়ে পরিবারের সাথে মিলিত হতে পারবে সে। খবরটা শুনে ভীষণ চটে গেছে কনি। ফোনে মাইকেলকে ধরার চেষ্টা করেছিল সে গতরাতেই, কিন্তু ব্যস্ততার অজুহাতে মাইকেলের সাথে যোগাযোগই করতে দেয়া হয়নি তাকে। এই মুহূর্তে কনির দুটো চোখ চঞ্চল হয়ে খুঁজছে মাইকেলকে। কে যেন বলল টম হেগেনের সাথে গোপন পরামর্শে বসেছে ও, এখন ওর সাথে দেখা করা অসম্ভব। অগত্যা গাড়িতে উঠে বসল কনি। চোখ রাঙিয়ে স্বামীকে বলল, 'দু'দিন পর তোমাকে যদি ভেগাসে না দেখি, আমি নিজে ফিরে এসে কানটি ধরে নিয়ে যাব, মনে থাকে যেন!'

স্বামীসুলভ যৌন ঘড়মন্ত্রের একটা ভাব মেশানো হাসি দেখা গেল কার্লোর ঠোটে। 'যাবড়াও মাত, কাজ শেষ হলোই ছুটব আমি।'

জানালা দিয়ে মুখটা বাইরে বের করে দিল কনি। 'আচ্ছা, মাইকেল তোমাকে আটকে দিল কেন বলো তো?' ভুরু কুঁচকে উঠল তার দৃষ্টিভ্রায় ভুগছে। অস্বাভাবিক মোটা হয়ে গিয়ে চেহারাটা বিগী করে তুলেছে। মুখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করল কার্লোর।

'অনেক দিন থেকেই তো বলছে, আমাকে খুব বড় একটা দায়িত্ব দেবে,' বলল কার্লো। 'হয়তো সে ব্যাপারেই আলাপ করতে চায়।' যা বলল তাতে তো ওই রকম আভাসই পেলাম। 'শান্তি সভার কথা কিছুই জানেন না কার্লো।

'সত্যি?' আগ্রহের আতিশয্যে চোখ দুটো চকচক করছে কনির।

উপর-নিচে মাথা নেড়ে স্ত্রীকে আশ্বস্ত করল কার্লো। কয়েক সেকেন্ড পরই ফটক পেরিয়ে গেল গাড়িটা।

প্রথম গাড়িটা উঠান ছেড়ে চলে যাবার পর প্রায় সাথে সাথে স্ত্রী এবং ছেলেদেরকে নিয়ে বেরিয়ে এল মাইকেল। ওঁদেরকে বিদায় জানিয়ে গাড়িতে তুলে দেবে ও। এগিয়ে এল কার্লো। নৌজন্য দেখিয়ে কে-কে বলল, তার বেড়ানো! যেন উপভোগ্য হয়। দ্বিতীয় গাড়িটাও বেরিয়ে গেল উঠান ছেড়ে।

'তোমাকে ধরে রাখতে হলো, স্নেহজন্য আমি দুঃখিত, কার্লো,' মৃদু গলায় ভগ্নীপতিকে বলল মাইকেল।

'কি আশ্চর্য,' বলল কার্লো। 'এতে দুঃখিত হবার কি আছে? কাজ কাজই। আমি কিছু মনে করিনি।'

'আর, হ্যাঁ, শোনো, ফ্রান্সের কাছাকাছি থেকে ডুমি, কেমন?' বলল মাইকেল। 'হাতের কাজ শেষ করেই ডাকব তোমাকে। হাতের কাজ মানে, কয়েকটা খবর জানতে হবে আমাকে। ঠিক আছে?'

'অবশ্যই, মাইকেল, অবশ্যই,' সমীহের সাথে বলল কার্লো।

মাইকেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের বাড়িতে ফিরে এল সে। এখান থেকে ফোন করল তার রক্ষিতা মেয়েটাকে। বলল, অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ একটু বেশি রাত করে যাবে সে। এই মেয়েটার ব্যাপারে সম্ভাব্য সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করে কার্লো। অত্যন্ত গোপনে ওয়েন্ট বারির একটা ফ্ল্যাটে রেখেছে তাকে।

এক বোতল হুইস্কি নিয়ে জানালার ধারে দুলল কার্লো। মাইকেল যখন বলেছে, অপেক্ষা করতেই হবে। বসে বসে মদ খেয়ে অনেকটা সময় পার করে দিল সে। দুপুরের একটু পর থেকে উঠানের ফটক দিয়ে গাড়ি ঢুকতে শুরু করল।

একটা গাড়ি থেকে পীট ক্রুমেঞ্জাকে নামতে দেখল কার্লো। একটু পর আরও একটা গাড়ি ঢুকল উঠানে। টেনিসও নামল সেটা থেকে। একজন সেন্সিটিভ মাইকেলের বাড়িতে নিয়ে গেল দু'জনকে।

আরও কয়েকটা ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। ক্রুমেঞ্জা মাইকেলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে উঠান ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু টেনিসওকে বেরিয়ে আসতে দেখল না কার্লো।

নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে উঠানে ঘুর ঘুর করছে এখন কার্লো, নির্মল বাতাস খাচ্ছে। উঠানে যারা পাহারা দেয় তাদের সবাইকে চেনে সে, কয়েকজনের সাথে এক আধটু আলাপসানাপও আছে। মনে মনে ভাবল, ওদের সাথে গল্পওজব করে কিছুটা সময় কাটানো যেতে পারে। কিন্তু গ্রহরীদের কাছে এসে হতভম্ব হয়ে গেল সে। এরা কারা, এদেরকে তো কখনও দেখিনি কার্লো! কিছুক্ষণ বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকার পর ধীর পায়ে ফটকের দিকে এগোল সে। এখানে এসে যা দেখল, তাতে বিশ্বাসের মাত্রা আরও বেড়ে গেল তার। ফটক পাহারা দিচ্ছে রকো ল্যাম্পনি। কিন্তু ফটক পাহারা দেবার মত হানকা কাজ করার লোক নয় সে। রকো ল্যাম্পনি আরও অনেক উচুদরের কর্মচারী। তার মানে, বিদ্যুৎ চমকের মত টের পেয়ে গেল কার্লো, অস্বাভাবিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা ঘটবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বন্ধুত্বের উষ্ণ হাসি উপহার দিয়ে কার্লোকে 'হ্যালো' বলল রকো।

পেশীতে আশ্চর্য টান অনুভব করছে কার্লো। রকোকে আন্তরিকভাবে হাসতে দেখে সতর্ক হয়ে গেল সে।

'ওনলাম,' বলল রকো, 'আপনি নাকি ডনের সাথে ছুটি কাটাতে যাচ্ছেন?'

শ্রাণ করল কার্লো, বলল, 'না। ভেগাসে যাবার কথা ছিল আমার, কিন্তু মাইকেল আমাকে কি একটা দায়িত্ব দেবে বলে দু'দিন থেকে যেতে বলেছে।'

'তাই নাকি?' একটু খুশি, একটু অবাক দেখাল রকোকে। 'আমাকেও তো তাই বলেছে। তারপর ডেকে বলল ফটকের ওপর কড়া নজর রাখতে হবে আমাকে। ভাবো একবার! এর কোন মানে হয়? যাক বাবা, আমার কি, হুকুমের চাকর বৈ তো নই। মালিক যা বলে শিরোধার্য।' তার কথা শুনে মনে হলো, বলতে চায়, বাপের সাথে মাইকেলের তুলনা হয় না। কথায় একটু যেন নিন্দার সুর।

কিন্তু সুরটাকে উপেক্ষা করে গভীর ভাবে বলল কার্লো, 'সব কিছুর ভাল মন্দ জেনেই কাজ করে মাইক।'

কড় উত্তরটা মুখ বুজে গ্রহণ করল রকো। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার নিজের বাড়িতে ফিরে এল কার্লো। কিছু একটা ঘটবে ঠিকই, কিন্তু সে সম্পর্কে রকো কোন খবর রাখে না।

মাইকেলের লিভিংরুম জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। দেখতে পাচ্ছে উঠানে ঘুর ঘুর করছে কার্লো। একটা গ্লাসে হুইস্কি টেলে তার হাতে সেটা ধরিয়ে দিল টম হেগেন। কৃতজ্ঞ বোধ করল মাইকেল, চুমুক দিল গ্লাসে।

পিছন থেকে কথা বলছে হেগেন, 'মাইকেলের কানে আশ্চর্য কোমল শোনাচ্ছে তার কণ্ঠস্বর। 'সময় হয়েছে, মাইক। কাজ শুরু করো এবারে।'

বুকের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল মাইকেলের, বলল, 'এত তাড়াতাড়ি চাইনি আমি, হেগেন। বাবা আরও কিছু দিন বাঁচলে ভাল হত।'

। 'আমি যখন টের পাইনি,' বলল হেগেন, 'আর কেউ টের পাবার প্রগ্নই ওঠে না সব ঠিকঠাক মত ঘটবে, কোথাও কোন গোলমাল হবে না। চমৎকার হয়েছে তোমার পরিকল্পনাটা।'

ঘুরে দাঁড়ান মাইকেল। 'এতে বাবার অবদানই বেশি,' বলল ও। 'এত বুদ্ধি রাখেন উনি তা আগে কখনও বুঝিনি। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই জানো।'

'তার সাথে কারও তুলনা হয় না,' কোমল কণ্ঠে বলল হেগেন। 'কিন্তু এ-ও অপূর্ব। এর চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারত না। তার মানে তুমিও কম যাও না।'

'কি হয় দেখা যাক,' বলল মাইকেল। 'ক্যাপোরেজিমিরা উঠানে?'

'হ্যাঁ।'

এক চুমুকে গ্লাসটা খালি করে ফেলল মাইকেল। 'আমার কাছে পাঠিয়ে দাও ক্রেমেঞ্জাকে। আমি নিজে সরাসরি নির্দেশ দেব ওকে। আর টেসিওর মুখ দেখতে চাই না আমি। আধ ঘণ্টা পর তাকে নিয়ে বার্জিনির সাথে দেখা করতে যাব, এইটুকু শুধু বলে রাখো। তারপর ওর ভার নেবে ক্রেমেঞ্জার সৈনিকরা।'

'টেসিওকে রেহাই দেবার কোন উপায় নেই?' উদাস ভঙ্গিতে জানতে চাইল হেগেন।

'নেই।'

বাফেলো সিটি। শহরের ছোট একটা রাস্তা। রাস্তার ধারে ছোট একটা পিটসা পাইয়ের দোকান। খুব ভিড় হয় দোকানটায়, চুটিয়ে ব্যবসা করছে মালিক লোকটা। অন্যান্য দিনের মত আজও লাঞ্চের সময় পেরিয়ে যেতে ভিড় একেবারে কমে গেল। একটু পরই দেখা গেল দোকান একেবারে খালি। সিমেন্টের প্লান্টার করা উঁচু ওভেনের মাথার উপর একটা থাক রয়েছে, ট্রে থেকে অবশিষ্ট কয়েকটা পাই-এর স্লাইস সেখানে তুলে রাখল দোকানদার। আর একটা মাত্র পাই বেক হচ্ছে ওভেনে, উঁকি দিয়ে দেখে নিল সেটাকে। এখনও ফুটতে শুরু করেনি চিজটা। খদ্দেররা অনেকেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে পাই কেনে এখান থেকে। তাদের জন্যে আলাদা একটা কাউন্টার আছে। হঠাৎ চোখ পড়তেই দোকানদার দেখতে পেল, কাউন্টারে একটা হাত রেখে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন লোক। কাউন্টারের ওপর হাতের তর্জনী আর মধ্যমা দিয়ে তবলা বাজাচ্ছে সে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। চোখাচোখি হতেই একটু হাসল খদ্দের। 'এক স্লাইস দাও দেখি আমাকে।'

কাঠের খুন্টি দিয়ে এক স্লাইস ঠাণ্ডা পাই ওভেনে গরম করতে দিল দোকানদার। এখনও আঙুল দিয়ে তবলা বাজাচ্ছে খদ্দের, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওভেন থেকে বের করে গরম পাই-এর টুকরোটা কাগজের একটা প্লেটে রাখল দোকানদার, তারপর প্লেটটা বাড়িয়ে দিল খদ্দেরের দিকে। দোকানদারের চোখে চোখ রেখে প্লেটটা নিল খদ্দের। নিয়ম হলো, খেতে শুরু করার আগেই পাই-এর দাম চুকিয়ে দেয়া, কিন্তু পয়সা বের করার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না লোকটার মধ্যে। মুচকি একটু হাসল সে, যেন কতদিনের বন্ধু তারা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কি ওটা? ওই যে, তোমার শার্টের কলারের কাছে একটু দেখা যাচ্ছে? নিশ্চয়ই উকি, তাই না? মনে হচ্ছে মস্ত বড় উকি। সবটা দেখতে দেবে আমাকে? আপত্তি করলে আমি কিন্তু দুঃখ পাব।'

স্থির পাথর হয়ে গেছে দোকানের মালিক। চট করে চোখ নামিয়ে শার্টের

কলারের নিচেটা দেখে নিল সে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়তে শুরু করেছে ওর। এরই মধ্যে দুই নাকের ফুটোর নিচে, বগলের তলায়, হাতের দুই তালুতে আর কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে তার। ঢোক গেলার সময় গলাটা লম্বা হয়ে গেল তার।

‘শার্টটা খোলো না, ভাই,’ অনুরোধের সুরে বলল খদ্দের। ‘উক্কিটা দেখাও আমাকে।’

দ্রুত মাথা নাড়ল মালিক ‘আপনি ভুল করেছেন। রাতে যে লোকটা কাজ করে তার বুক উক্কি আছে। আমার নেই।’ তার কথার সুর থেকেই বোঝা গেল বিদেশী লোক সৈ।

মৃদু শব্দ করে হেসে উঠল খদ্দের। বিনয়, হাসিখুশি অনুরোধের ভাব মুছে গেছে তার চেহারা থেকে। এখনকার হাসিটা কর্কশ, ব্যঙ্গাত্মক, ঘৃণায় বিকৃত। ‘ওসব পায়তারা ছাড়ো,’ বলল সে। ‘উক্কিটা দেখতে না দিলে এখন আমি আর দুঃখ পাব না, রাগ করব। খোলো, খোলো, শার্ট খুলে দেখতে দাও আমাকে।’

একটু একটু করে পিছু হটতে শুরু করেছে দোকানের মালিক। ওভেনটা প্রকাণ্ড, ওটার পিছনে গা ঢাকা দেবার কথা ভাবছে সে। নিঃশব্দে হাসল খদ্দের। এবার ডান হাতটা তুলল সে কাউন্টারের ওপর। চকচকে নীল একটা পিস্তল দেখা গেল তার হাতে।

পিস্তলটা দেখেই অসহায় জানোয়ারের মত বিদঘুটে একটা অঁ অঁ শব্দ করে উঠল দোকানদার, সেই সাথে পিঠটা বেঁকে গেল তার, সাপের মত ভঙ্গিতে হাত দুটো তুলল কপালের সামনে, যেন মুখ আর মাথাটাকে রক্ষা করতে চাইছে।

‘এত ভয়?’ অবাক বিস্ময়ে মাথা নেড়ে বলল খদ্দের, চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেছে তার, কিন্তু দৃষ্টিতে জ্বল জ্বল করেছে রাজ্যের মজা আর কৌতুক। তারপর মাথাটা একটু সরিয়ে কান পাতার ভঙ্গি করল সে। একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছে। মুখ থেকে নেমে এসে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো দোকানদারের তলপেটের নিচে। এখনও হচ্ছে শব্দটা—ছর-ছর, ছর-ছর...। নোংরা একটা কিছু ঘটতে দেখলে মানুষ যেমন দাঁত দিয়ে জিভ কাটে, খদ্দেরও তার জিভের ডগাটা বাইরে বের করে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল ‘আরে শালা, এ যে মেয়েমানুষের বাড়ি!’ কথাটা বলে নিঃশব্দে হাসল আবার সে।

এখনও পিছু হটিছে দোকানদার। হাত তুলে পিস্তল তাক করল খদ্দের। দোকানদারের চোখের দৃষ্টি পিস্তলের নল দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেছে, গভীর কালো ফুটোটা যেন তাকে সম্মোহিত করে ফেলেছে। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা মারল তাকে প্রথম বুলেটটা, ছিটকে ওভেনের ওপর পড়ে গেল সে। কাউন্টার ঘুরে দোকানের ভেতর ঢুকল খদ্দের। মেঝেতে জমে থাকা পেছাব উপক্রে দোকানদারের সামনে দাঁড়াল সে। বুক থেকে হড়হড় করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। ঝুঁকে পড়ল খদ্দের। হাত বাড়াল শার্টের দিকে। একটা একটা করে খুলে ফেলল কয়েকটা বোতাম। বুলেটের ফুটোটা দেখা যাচ্ছে এখন। আঘাতটা মারাত্মক নয়। হার্টেও বেঁধেনি, ফুসফুসও ফুটো করেনি। পরিস্কার দেখা যাচ্ছে উক্কিটা। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আছে প্রেমিক

প্রেমিকার যুগল মূর্তি। ছোরাটা দু'জনের গায়েই বিধেছে। আরও একটা ওলি করল খন্দের। ওভেন থেকে ধাক্কা খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল মালিক। ইচ্ছে করেই আজোবাজে জায়গায় ওলি করছে সে। এখুনি নয়, আরও দু'চার সেকেণ্ড পর লক্ষ্য স্থির করে ওলি করার ইচ্ছে তার।

মুচকি হাসিটা আবার ফিরে এল খন্দেরের মুখে। মাত্র দশটা সেকেণ্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল সে, কিন্তু একজন মৃত্যুপথযাত্রী লোকের কাছে ওই দশটা সেকেণ্ড দশ যুগের সমান, কিংবা হয়তো তার চেয়েও বেশি।

'ফ্যাব্রিয়িয়ো,' বলল খন্দের অকারণে দেরি করছে সে, 'কেন কি ঘটছে, নিশ্চয়ই তা বুঝতে পারছ?'

মাথাটা কাঁপছে ফ্যাব্রিয়িয়োর। কাঁপা মাথাটা দ্রুত কয়েকবার এদিক ওদিক নাড়ল সে তারপর আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে একটা হাত তুলল মুখের সামনে। চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে তার, যেন এখুনি কেঁদে ফেলবে

'ফ্যাব্রিয়িয়ো, মাইকেল কর্নিয়ানি তোমাকে সালাম জানিয়েছে।'

কথা শেষ কবে নিঃশব্দে হাসল খন্দের, হাতটা বাড়িয়ে, দিল দোকানদারের মাথার দিকে, পিস্তলের নলটা তার চুলে ঠেকিয়ে আবার টিপে দিল ট্রিগার।

ওলি করেই ঘুরে দাঁড়াল খন্দের, একবারও পিছন দিকে না তাকিয়ে দ্রুত দোকান থেকে বেরিয়ে এল সে। ফুটপাথের ধারেই অপেক্ষা করছে একটা গাড়ি। দরজাটা খোলা। লাফ দিয়ে গাড়িতে চড়ল লোকটা। স্টার্ট দেয়াই ছিল, সাথে সাথে তীব্র একটা নাকি খেয়ে ছুটতে শুরু করল গাড়ি।

লং বীচ। উঠান

ফটকের গায়ে লোহার একটা থাম, থামের গায়ে একটা খোপ, সেই খোপের ভেতর ঝন ঝন শব্দে বাজছে টেলিফোনের বেল। ছোঁ মেরে রিসিভারটা তুলে নিল রকো ল্যাম্পানি 'রেডি,' অপর প্রান্ত থেকে বলল কেউ কট করে শব্দ হলো একটা, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল যোগাযোগ

ধীর কিন্তু বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগোচ্ছে রকো। কোনদিকে না তাকিয়ে, কোন রকম তাড়াহুড়োর ভাব না দেখিয়ে নিজের গাড়িতে চড়ল সে। স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিল। উঠান ছেড়ে বেরিয়ে গেল গাড়িটা

নিম্প্রাণ পাথরের মূর্তির মত জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মাইকেল কর্নিয়ানি। মাথাটা একটুল নড়ল না ওর, কিন্তু ঝকোর গাড়িটা যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা যায়, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে দেখল ও।

জোনস্ ব্রীজ কজায়ে এই ব্রিজের ওপর খুন হয়েছিল সনি কর্নিয়ানি। স্নাত করে ব্রিজ পেরিয়ে গেল রকোর গাড়ি। ওয়ান্টাগ্ রেল স্টেশনের কাছাকাছি এসে স্পীড কমাল সে, দাঁড় করাল গাড়ি। আগে থেকেই আরেকটা গাড়ি অপেক্ষা করছে ওখানে। দু'জন লোক বসে, রয়েছে তাতে। নিজের গাড়ি থেকে নেমে সেটায় চড়ল রকো। কোন কথা হলো না। গাড়ি চলতে শুরু করল।

ওয়ান্টাগ্ স্টেশন থেকে সান রাইজ হাইওয়েতে উঠে এল গাড়িটা। দশ মিনিট

পর একটা মোটেলের উঠানে থামল সেটা। আরোহী দু'জনকে গাড়িতে রেখেই নেমে পড়ল রকো ল্যাম্পনি। পায়ে হেঁটে এগোল ও - সামনে একটা বাংলো। এ-ধরনের বাংলো সাধারণত সুইস পাহাড়ের ওপর দেখা যায়, ধনী এবং সৌখিন লোকেরা এখান ছুটি বা অবসর কাটাতে ভালবাসে। কেউ নেই আশেপাশে। না থাকারই কপকপ বুড়ো বয়সে গোপন কাজ করার সময় কে-ই বা সাক্ষী রাখতে চায়? সোনার মত চকচকে দরজাটা দেখা যাচ্ছে। সোজা সেটার দিকেই হাঁটছে রকো। আত্মবিশ্বাসে দৃঢ় পদক্ষেপ। পাঁচ গজ দূরে থাকতে অকস্মাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে। এক ছুটে এগিয়ে গিয়ে দরজার ওপর কাঁধ দিয়ে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা মারল ও। দু'ফাঁক হয়ে গেল কবাট দুটো। কামরার ভেতর ঢুকে পড়ল রকো ল্যাম্পনি।

দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফিলিপ টাটাগ্লিয়া। সম্পূর্ণ নগ্ন। খাটের ওপর শুয়ে রয়েছে কমবয়েসী একটা মেয়ে। বড় জোর তেরো কি চৌদ্দ বছর বয়স হবে। খিক খিক করে হাসছে মেয়েটা। তার একটা হাত ধরে আছে বুড়ো টাটাগ্লিয়া, হাতটা নিজের শরীরের একটা জায়গায় ছোঁয়াবার চেষ্টা করছে সে।

দুধের মত সাদা চুল ফিলিপ টাটাগ্লিয়ার সারা গায়ে, কিন্তু মাথার চুলগুলো ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ। শরীরটা নাদুসনুদুস। মাত্র দুই সেকেন্ডেই এতসব দেখে নিল রকো ল্যাম্পনি। পর পর চারটে গুলি করল ও সবগুলোই পেটে। চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল আধ পাক, লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল কামরা থেকে।

স্টার্ট দেয়াই ছিল গাড়িতে, ছুটে এসে রকো উঠে বসতেই গাড়ি ছেড়ে দিল ড্রাইভার। রকোকে ওয়ান্টাং রেল স্টেশনে নামিয়ে দেয়া হলো। নিজের গাড়িতে চড়ল রকো। সোজা পৌছে গেল লং বীচে।

এক মিনিটের জন্যে মাইকেল কর্নিয়নির সাথে দেখা করল সে। তারপর আবার বেরিয়ে এসে ফটকে দাঁড়াল নিজের জায়গায়।

ব্রঙ্কস। আগনবার্ট নেরির ফ্ল্যাট

পুলিশের পুরানো ইউনিফর্ম পরিষ্কার করা শেষ, করল নেরি। এতটুকু ব্যস্ততা নেই ওর কাছে, খাঁর খাঁর পরছে পোশাকটা। প্রথমে প্যান্ট, তারপর শার্ট, টাই, কোট, হোলস্টার, সবশেষে রিভলভার ঝোলাবার জন্যে গানবেল্ট। পুলিশের চাকরি হারিয়ে রিভলভার জমা দিয়েছিল নেরি, কিন্তু বিভাগীয় অসহকর্তার দরুন ব্যাজটা রয়ে গেছে তার কাছে। নতুন একটা .৩৮ পুলিশ স্পেশাল দিয়েছে তাকে ক্রেমেঞ্জা। এটা যদি পুলিশের হাতে পড়েও, এর আসল মালিক বা ঠিকানা সম্পর্কে কিছু জানতে পারবে না তারা। রিভলভারটা খুলল নেরি। তেল দিল। পরীক্ষা করল ট্রিগার। তারপর আবার জোড়া লাগিয়ে ট্রিগার মেকানিজম ঠিকমত কাজ করছে কিনা দেখে নিল ভাল করে। সিলিঙারগুলো লোড করে নিয়ে উঠে দাঁড়াল এবার নেরি। এখন ওকে রওনা হতে হবে। বড় একটা এনভেলোপে পুলিশের কাপটা ভরে নিল সে, গায়ে একটা ওভারকোট চড়িয়ে ঢেকে নিল পুলিশের ইউনিফর্মটা। রিস্টওয়াচ দেখল সে। পনেরো মিনিট পর গাড়ি আসবে ওর জন্যে। সময়টা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কাটাল নেরি। ছদ্মবেশ দেখে কোন সন্দেহ জাগতে পারে না। একজন পুলিশ বলেই

মনে হচ্ছে ওকে ।

ঠিক সময়ে নিচে এসে পৌঁছুল নেরি । ওর জন্যে অপেক্ষা করছে গাড়িটা । ভেতরে বসে রয়েছে রকো ল্যাম্পনির দু'জন লোক । পিছনের সীটে একা বসল নেরি । পাড়া ছেড়ে বেরিয়ে এসে শহরের দিকে ছুটছে গাড়ি, ওভারকোট খুলে পায়ের কাছে রেখে দিল ও । এনভেলাপ থেকে কের করল পুলিশের ক্যাপটা ।

খানিক পর ফুটপাথের একধারে থামল গাড়ি ফিফটিফিফথ আর ফিফথ অ্যাভিনিউ-এর মোড় এটা । কারও সাথে কথা হয়নি নেরির । নিঃশব্দে নেমে পড়ল ও । ফিফথ অ্যাভিনিউ-এর ফুটপাথ ধরে হাঁটছে ।

সেই পুরানো অনুভূতিটা ফিরে এসেছে নেরির মনে । ভুয়া হলেও, নিজেকে একজন পুলিশম্যান বলেই মনে হচ্ছে তার । আগে যেমন রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াত, আজও তাই দিচ্ছে । রাস্তায় যানবাহন আর ফুটপাথে লোকজনের খুব ভিড় । কিন্তু দ্রুত পথ হাঁটতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না নেরির । ইউনিকর্মের একটা মস্ত গুণ আছে, দেখেই পথ ছেড়ে দেয় মানুষ । এদিক-ওদিক না তাকিয়ে হনহন করে হেঁটেই যাচ্ছে নেরি । অবশেষে রকফেলার সেন্টারের সামনে এসে পৌঁছুল ও । উল্টোদিকে দেখা যাচ্ছে সেন্ট প্যাট্রিকের বড় গির্জাটা । এদিকে গাড়ি পার্ক করার কোন জায়গা নেই । কিন্তু তবু আশপাশে কোথাও একটা গাড়ি থাকার কথা । এদিক ওদিক তাকাচ্ছে নেরি । একটা লিমুসিন গাড়ি খুঁজছে ও । চলার গতি মন্থর, কিন্তু এখনও হাঁটছে । কয়েক গজ সামনে গাড়িটাকে দেখতে পেল নেরি । এক সারি লাল রঙের 'নো পার্কিং' আর 'নো স্ট্যাণ্ডিং' লেখা সাইনবোর্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে গাড়িটা । ওই একটাই, আশপাশে আর কোন গাড়ি নেই । হাঁটার গতি আরও মন্থর করল নেরি । একটু আগেই পৌঁছে গেছে ও । দাঁড়িয়ে পড়ল ফুটপাথে, 'সমন'-এর বইটা বের করে কি যেন লিখল তাতে । তারপর কয়েক পা এগিয়ে লিমুসিন গাড়িটার পাশে এসে দাঁড়াল ও ।

গাড়ির ফেণ্ডারে হাতের বেঁটে লাঠিটা দিয়ে দুটো মৃদু বাড়ি মারল নেরি । অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল ড্রাইভার, বিস্ময় ফুটে উঠল তার চেহারায়ে । মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে পুলিশ দেখে তার বিস্ময় আরও বাড়ল বৈ কমল না । লাঠি দিয়ে 'নো স্ট্যাণ্ডিং' লেখা নোটিশটা তাকে দেখাচ্ছে নেরি ।

মুখ ফিরিয়ে আবার অন্য দিকে তাকাল ড্রাইভার । পাত্তাই দিল না নেরিকে ।

ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নেমে এল নেরি । ড্রাইভারের পাশে থোলা জানালার সামনে দাঁড়াল ও । হিংস্র গুণার মত চেহারা ড্রাইভারের, স্বাস্থ্যটা এমন, যেন ভয় কাকে বলে জানা নেই । এরকম লোককেই ভয় করতে ভালবাসে নেরি । অপমান করার ইচ্ছে নিয়েই তাকে বলল ও, 'এই, ব্যাটা, বাদরামি করার আর জায়গা পাওনি? কেটে পড়বে, নাকি দেব একটা সমন-ওজ্ঞে?'

'নতুন বুঝি?' ঠাণ্ডা ভাষিলোর সাথে বলল ড্রাইভার 'তোমার থানায় গিয়ে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে ব্যাপারটা ।' একটু থেমে আবার বলল, 'পথ চেপে থাকলে টিকেটটা দিতে পারো আমাকে, তারপর কেটে পড়ো । এখানে সুবিধে হবে না তোমার ।'

‘গাড়ি সরাও,’ শান্ত, কিন্তু গম্ভীর সুরে বলল নেরি। ‘তা না হলে টেনে নিচে নামিয়ে পিঠের ছাল তুলব তোমার।’

জাদুর মত একটা দশ ডলারের নোট চলে এল ড্রাইভারের হাতে। এক হাত দিয়েই সেটাকে চার ভাঁজ করল সে, তারপর চট করে নেরির কোটের পকেটে গুঁজে দেবার জন্যে হাত বাড়াল

পিছিয়ে এসে প্রত্যাখ্যান করল নেরি। ফুটপাথে উঠে এসে তর্জনী নেড়ে ডাকল ড্রাইভারকে। এতক্ষণে রাজ্যের বিরক্তি ফুটে উঠল লোকটার চেহারায়ে। কাঁধ ঝাঁকাল সে, নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।

‘তোমার লাইসেন্স আর রেজিস্ট্রেশন দেখাও,’ বলল নেরি। চোখের কোণ দিয়ে কয়েকজন লোককে দেখতে পেয়ে বুঝতে পারল, প্ল্যানটা রদবদল করতে হবে। ভেবে রেখেছিল, গাড়ি নিয়ে রকটার চারদিকে একবার চক্কর কাটতে বাধ্য করতে পারবে ড্রাইভারকে। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়।

প্লাজা বিন্দিং থেকে বেরিয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে তিনজন লোক। তিনজনই লম্বা-চওড়া, মোটাসেটা। মাঝখানে বার্জিনি, সামনে পিছনে বডিগার্ড। মাইকেল কর্নিয়নির সাথে দেখা করতে যাচ্ছে ওরা।

সামনের বডিগার্ডটা দ্রুত পা চালিয়ে গাড়ির কাছে চলে এল। নেরির আপাদমস্তক দেখে নিয়ে জানতে চাইল, ‘ব্যাপার কি?’

‘চিন্তার কিছু নেই, বলল ড্রাইভার। ‘থানায় নতুন এসেছে মনে হচ্ছে, আমাকে টিকেট দিচ্ছে।’

দ্বিতীয় বডিগার্ডকে নিয়ে ওদের কাছে এসে দাঁড়াল বার্জিনি। ‘আবার কি গণ্ডগোল?’ জানতে চাইল সে।

এর মধ্যে একবারও মুখ তুলে তাকায়নি নেরি। সমনের বইতে একমনে কি যেন লিখল সে। তারপর সরাসরি তাকাল ড্রাইভারের দিকে। লাইসেন্স আর রেজিস্ট্রেশনটা ফিরিয়ে দিল তাকে। তারপর সমনের বইটা সরিয়ে রাখার জন্য হিপ পকেটে হাত ভরেই এক টানে বের করে ফেলল ৩৮ পুলিশ স্পেশালটা।

পিপের মত মস্ত গোল বার্জিনির বুকে পর পর তিনটে গুলি করল নেরি। স্তম্ভিত ভাবটা কাটিয়ে উঠে আত্মরক্ষার জন্যে তখনও ডাইভ দেয়নি বাকি তিনজন। শেষ গুলিটা করে, ছিটকে সরে এল নেরি, তার সাথে বাকি তিনজনও যে যেদিকে পারল ডাইভ দিয়ে পড়ল। এক সেকেন্ডের মধ্যে ভিড়ের সাথে মিশে গেল নেরি, বাক নিয়ে হনহন করে হেঁটে চলে এল অপেক্ষারত গাড়িটার কাছে।

নেরিকে নিয়ে ফুল স্পীডে ছুটছে গাড়ি। নাইনথ অ্যাভিনিউ পর্যন্ত এসে আবার একটা বাক নিয়ে ফিরে যাচ্ছে শহরের দিকে। আরেকটা গাড়ি অপেক্ষা করছে চিলসে পার্কের কাছে। ইতিমধ্যে ইউনিফর্ম, টুপি খুলে অন্য পোশাক পরে নিয়েছে নেরি। গায়ে আবার ওভারকোটটা চড়িয়েছে। পুলিশের ইউনিফর্ম আর পিস্তল রেখে অন্য গাড়িটায় উঠল ও। প্রথম গাড়িটা সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা হবে।

এক ঘণ্টা পর। লং বীচে পৌঁছুল অ্যালবার্ট নেরি। মাইকেল কর্নিয়নির সাথে কথা বলছে সে।

লং বীচ। উঠান।

ডান ভিটো কর্নিয়নির বাড়ি। কিচেনে বসে ধূমায়িত কফির কাপে আয়েশ করে চুমুক দিচ্ছে টেসিও। তাকে নিতে এল টম হেগেন।

‘তোমার সাথে রওনা হবার জন্যে তৈরি হয়ে বসে রয়েছে মাইক,’ বলল হেগেন। ‘তুমি বরং ফোন করে বার্জিনিকেও রওনা হতে বলে দাও।’

সাথে সাথে কফির কাপ রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়াল টেসিও। দেয়ালে ঝোলানো টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে ডায়াল করতে শুরু করল। যোগাযোগ হতে বলল, ‘ব্রুকলিনে যাচ্ছি আমরা।’ হুকে রিসিভারটা বুলিয়ে রেখে ঘুরে তাকাল হেগেনের দিকে। হাসল। বলল, ‘আশা করি আজ রাতে ভাল একটা চুক্তি করে আমাদের খুব সুবিধেজনক একটা পজিশনে নিয়ে আসবে মাইক।’

‘কোনও সন্দেহ নেই,’ গম্ভীর মুখে বলল হেগেন।

কিচেন থেকে দু’জন এক সাথে বেরিয়ে এল ওরা। উঠানের ওপর দিয়ে মাইকেলের বাড়ির দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু দরজার সামনে ওদেরকে থামিয়ে দিল একজন সেন্টি।

‘বস বলেছেন,’ ওদেরকে বলল সেন্টি, ‘আলাদা একটা গাড়িতে যাবেন তিনি। আপনাদেরকে আগেই রওনা হয়ে যেতে বলেছেন।’

ভুরু কুঁচকে উঠল টেসিওর। ঝট করে ফিরল হেগেনের দিকে। ‘কি যন্ত্রণা, এমন তো কথা ছিল না! এ আবার কি ধরনের পাগলামি মাইকের শেষ মুহূর্তে প্ল্যান বদল করা সম্ভব নয় সব যে ভেঙে যাবে তাহলে!

হঠাৎ ওদের চারদিকে আরও তিনজন সেন্টিকে দেখা গেল। আশ্চর্য শান্ত আর কোমল গলায় বলল হেগেন, ‘তোমার সাথে আমি যেতে পারছি না, টেসিও।’

একপক্ষকে সব বোঝে নিল ক্যাপোরিজিমি টেসিও এবং নিয়তির অমোঘ পরিকল্পনাকে সেই মুহূর্তেই মেনে নিল নিঃশর্তে। নিমেষের জন্যে অসুস্থ, দুর্বল লাগল শরীরটা। পর মুহূর্তে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠল সে।

‘মাইককে বোলো,’ হেগেনের চোখে চোখ রেখে কথা বলছে টেসিও, ‘যা কিছু ঘটছে, সবই ব্যবসার স্বার্থে। ওর ওপর আমার কোন রাগ নেই ওকে আমার বদাবরই ভাল লেগেছে।’

ঘাড় কাত করে রাজি হলো টম হেগেন। বলল, ‘ভা সে বোঝে

সুন্দর হয়ে খানিক দাঁড়িয়ে থাকল টেসিও, তারপর ধীর, নরম গলায় জানতে চাইল, ‘তুমি আমাকে রেহাই দিতে পারো না, টম? অনেক দিনের পুরানো বন্ধুত্ব...’

ধীরে ধীরে এদিক ওদিক মাথা দোলাল হেগেন। ‘পারি না।’

তাকিয়ে আছে হেগেন, দেখছে সেন্টির ঘিরে ফেলে একটা গাড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছে টেসিওকে। গাড়িতে উঠছে টেসিও। ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকাল সে হেগেনের দিকে। কিন্তু কিছু আশা করে নয়। সাথে সাথে সিঁধে করে নিল মাথা, উঠে পড়ল গাড়িতে। অসুস্থবোধ করছে হেগেন। গলার ভেতর বমি বমি ভার। শিউরে উঠল সে। কর্নিয়নি পরিবারের সেরা সৈনিক ছিল টেসিও। লুকা ব্রানির পর

ওর ওপরই সবচেয়ে বেশি ভরসা রাখতেন ডন কর্লিয়নি। খুবই দুঃখজনক, এত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির লোক হয়েও এই বয়সে এমন জঘন্য একটা ভুল করে বসল টেনিসে।

তেরো

লং বীচ উঠান। কার্লোর বাড়ি

মাইকেলের সাথে দেখা করার জন্যে এখনও অপেক্ষা করছে কার্লো। ফটক দিয়ে অসংখ্য লোক আসা-যাওয়া করছে, চারদিকে কেমন যেন একটা চাপা ব্যস্ততার ভাব, গা ছমছম করছে তার। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ভয়ঙ্কর কিছু একটা পাকাচ্ছে মাইকেল, কিন্তু তা থেকে সম্ভবত বাদ রাখা হয়েছে তাকে। একটু রাগ হলো তার। তারপর বিরক্তি বোধ করল। অপেক্ষারও তো একটা সীমা আছে, আর কতক্ষণ ধৈর্য ধরবে সে? অবশেষে ফোন করল মাইকেলকে।

অপরপ্রান্তে রিসিভার তুলল একজন বডিগার্ড। কার্লোকে লাইনে থাকতে বলে মাইকেলকে ডাকতে গেল সে। একটু পরেই লাইনে ফিরে এসে জানাল বডিগার্ড, 'বস আপনাকে চুপচাপ বসে থাকতে বলেছেন। একটু পরই হাতের কাজ শেষ হবে তার।'

রিসিভার রেখে দিল কার্লো। তারপর আবার সেটা তুলে নিল। ফোন করল তার রক্ষিতা মেয়েটাকে। নোভ দেখিয়ে বলল, রাত আজ যতই হোক, তার সাথে দেখা করবেই কার্লো, ভাল কোন রেস্টোরাঁয় সাপার খেতে নিয়ে যাবে তাকে। তারপর বাকি রাতটা একসাথেই কাটাবে দু'জনে। মনে মনে সময়ের একটা হিসাব করে নিল কার্লো। একটু আগে জানা গেছে, মাইকেলের ডাক আসতে দেরি নেই। বলার কথা যাই থাকুক, আর যে কাজই করতে দিক, দু'ঘণ্টার বেশি সময় লাগবে না। এরপর ওয়েন্টবারি পৌঁছুতে খুব জোর চল্লিশ মিনিট। সুতরাং এই প্ল্যানটা টিকে যেতে পারে। মেয়েটাকে আবার কথা দিল কার্লো, আজ রাতে যাবেই সে। মান ভাঙার জন্যে কিছুক্ষণ রসিকতাও করল তার সাথে। রিসিভার রেখে দিয়ে ঠিক করল, কাপড়চোপড় পরে তৈরি হয়ে থাকাই ভাল, তাহলে আর সময়টা নষ্ট করতে হবে না পরে।

নতুন একটা শার্ট গায়ে চড়িয়েছে মাত্র, এই সময় টোকা পড়ল দরজায়। ভুরু কুঁচকে মুখ তুলে তাকাল কার্লো। ভাবল, নিশ্চয়ই তাকে ফোন করেছিল মাইকেল, কিন্তু লাইন এনগেজড দেখে ডাকতে লোক পাঠিয়েছে। তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগোল সে।

দরজা খুলেই স্তম্ভিত হয়ে গেল কার্লো। এক নিমেষে রক্তশূন্য হয়ে গেল মুখটা। আতঙ্কে আওয়াজ বেরচ্ছে না গলার ভেতর থেকে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাইকেল কর্লিয়নি। তার চেহারায় মৃত্যুর হিম ছায়া। এই মৃত্যুর ছায়া অনেকদিন অনেকবার স্বপ্নের মধ্যে দেখেছে কার্লো।

মাইকেলের পিছনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে টম হেগেন। তার পাশে অবচল মূর্তির মত বসে কো ল্যাম্পনি। প্রত্যেকের চেহারায় বিষণ্ণতার ঘন ছাপ, যেন

ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও কোন দুঃসংবাদ দিতে এসেছে ওরা।

ঘুরে দাঁড়ান কার্লো। কাঁধ দুটো ঝুলে পড়েছে তার। ধীর পায়ে ফিরে এল সিটিংরুমে। তার পিছু পিছু এল ওরা তিন জন। এরই মধ্যে প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়েছে কার্লো। তার স্নায়ু দুর্বল হয়ে গেছে, তাই ভয় পেয়েছে সে, আসলে হয়তো কিছুই নয় ব্যাপারটা। নিজেকে আশ্বস্ত করার জন্যে এই সব ভাবছে সে।

কিন্তু মাইকেল তার সমস্ত ভুল ধারণা ভেঙে দিল।

‘সবির মৃত্যুর জন্যে জবাব দিতে হবে তোমাকে আজ,’ শান্ত, দৃঢ় কণ্ঠে বলল মাইকেল।

জবাব দিল না কার্লো, ভান করল মাইকেলের কথা যেন বুঝতেই পারেনি। সরে গিয়ে কামরার দু’দিকের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছে হেগেন আর রকো কামরার মাঝখানে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে মাইকেল আর কার্লো।

‘সবিকে তুমি বার্জিনিদের হাতে তুলে দিয়েছিলে,’ মৃদু গলায় বলল মাইকেল। ‘সে-রাতে আমার বোনের সাথে ছোট্ট একটা প্রহসন করেছিলে তুমি! বুদ্ধিটা তোমার নয়, বার্জিনির। কিন্তু বার্জিনির কথায় তুমি বিশ্বাস করলে কিভাবে যে একজন কর্লিয়নির চোখে ধুলো দিতে পারবে তুমি?’

আত্মবিশ্বাস, মর্যাদা, ব্যক্তিত্ব সব হারিয়ে ফেলল কার্লো। মৃত্যু ভয়ে কাঁপছে সে। পাগলের মত চেষ্টা করে বলাতে শুরু করল, ‘কসম খেয়ে বলছি, বিশ্বাস করো, আমি নির্দোষ। মিথ্যে কথা বললে আমি আমার ছেলের মাথা খাব। আমি নির্দোষ, আমি নির্দোষ! মাইক, আমাকে বাঁচতে দাও। আমাকে মেরো না। দোহাই তোমার, আমাকে রেহাই দাও।’

‘বার্জিনি মারা গেছে,’ শান্তভাবে বলল মাইকেল। ‘টাটোগ্লিয়াও নেই আজ রাতেই পরিবারের সব দেনা-পাওনার হিসাব চুকিয়ে ফেলতে চাই আমি। তাই, তুমি নির্দোষ এ-কথা শুনিয়ো না আমাকে। যা করেছ তা স্বীকার করাই তোমার জন্যে ভাল হবে।’

অবাক হয়ে মাইকেলের দিকে তাকিয়ে আছে টম হেগেন আর রকো ল্যাম্পনি। ওরা ভাবছে, এখনও বাপের মত হয়ে উঠতে পারল না মাইকেল। এই বিশ্বাসঘাতকটাকে দিয়ে অপরাধ স্বীকার করাবার দয়াকারটা কি? এ-ধরনের একটা ব্যাপার যতটুকু প্রমাণ করা যায় ততটুকু প্রমাণ তো পাওয়াই গেছে। উত্তরটা দুয়ে দুয়ে চারের মত সহজ। কিন্তু নিজের অধিকার সম্পর্কে এখনও ততটা নিশ্চিত হতে পারছে না মাইকেল। এখনও তার মনে অন্যায্য করে ফেলার ভয়। স্বীণ একটু সন্দেহে এখনও ভুগছে সে। কার্লোর স্বীকারোক্তিই শুধু তা দূর করতে পারে।

কিন্তু কার্লো এখনও চুপ করে আছে।

‘তোমার এত ভয় পাবার কিছু নেই।’ প্রায় সদয় কণ্ঠে বলল মাইকেল। ‘তুমি আমার বোনের স্বামী, ওখানেই আমার হাত-পা বাঁধা। তাকে তো আর বিধবা করতে পারি না আমি। তাছাড়া ভাগ্নেদের মুখও চাইতে হবে আমাকে। ওদেরকে বাপ-হারা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুলে যাচ্ছি কেন, তোমার একটা ছেলের গড ফাদার আমি। না, তুমি যা ধরে নিয়েছ তা আমি করতে যাচ্ছি না। তোমাকে দুনিয়া

থেকে সরিয়ে দেয়া মানে, যাদেরকে আমি আমার শরীরের অংশ বলে মনে করি, তাদের ক্ষতি করা—তা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমার শাস্তি হবে, কর্নিয়নি পরিবার তোমাকে বিশ্বাস করে আর কোন কাজ করতে দেবে না কখনও। কর্নিয়নি পরিবারের কাজ করে খুব ভাল রোজগার করতে তুমি, সেই সুযোগটা হারাতে যাচ্ছ। লাস ভেগাসে স্ত্রী আর ছেলেদের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে তোমাকে, ওখানেই থাকবে তুমি। আমরা শুধু একটা মাসোহারা দেব কনিকে। ওই পর্যন্তই, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু ওই কথাটা যেন তোমার মুখে আবার আমাকে শুনতে না হয়—আমি নির্দোষ। কথাটা বলে তুমি আমার বুদ্ধিকে অপমান করছ। আমাকে খেপিয়ে দিলে তার ফল ভাল হবে না। প্রস্তাবটা কে নিয়ে এসেছিল তোমার কাছে, বার্জিনি? নাকি টাটাগ্লিয়া?’

বাঁচার ভীষ আকৃতি ফুটে উঠল কার্লোর চেহারায়ে। ওকে মেরে ফেলা হবে না শুনে মুক্তির ঝিরঝিরে একটা শান্তির পরশ অনুভব করছে সারা শরীরে। ‘বার্জিনি,’ ফিসফিস করে বলল সে।

‘বেশ, বেশ,’ নরম গলায় বলল মাইকেল। ডান হাত তুলে দরজাটা দেখিয়ে দিল ও। ‘বেরোও। বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে। সোজা এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবে।’

চঞ্চল পায়ে সবার আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল কার্লো। ওকে অনুসরণ করছে মাইকেল। পিছনে হেগেন আর রকো ল্যাম্পনি।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা উতরে গেছে। তবে রোজকার মত আজও ফ্লাড লাইটের আলোয় ঝলমল করছে প্রকাণ্ড উঠানটা। প্রায় নিঃশব্দে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল কার্লোর সামনে। আগেই দেখতে পেয়েছে ও গাড়িটাকে, কিন্তু চিনতে পারেনি। এখন দাঁড়িয়ে পড়ার পর দেখল ওটা তারই গাড়ি। ড্রাইভিং সীটে বসা লোকটাকে চিনতে পারছে না ও। পিছনের সীটে আরও একজন বসে রয়েছে, তাকে ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। গাড়ির দরজা খুলে দিল রকো ল্যাম্পনি, ইশারায় উঠতে বলল কার্লোকে।

ঘাড় ফিরিয়ে মাইকেলের দিকে তাকাল কার্লো।

‘কনিকে ফোন করে জানিয়ে দিচ্ছি তুমি রওনা হয়ে গেছ,’ বলল মাইকেল।

মাথা নিচু করে গাড়িতে উঠল কার্লো। সিন্কে’র শার্টটা ভিজ়ে গেছে ঘামে।

কার্লোকে নিয়ে উঠান পেরোচ্ছে গাড়ি। স্পীড বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে। সাং করে বেরিয়ে গেল ফটক দিয়ে। পিছনের সীটে বসা লোকটা পরিচিত কেউ কিনা দেখার জন্যে ঘাড় ফেরাতে যাচ্ছে কার্লো।

ছোট মেয়েরা যেভাবে অনায়াস দক্ষতার সাথে বিড়াল ছানার গলায় সিন্কে’র ফিতে পরিয়ে দেয়, পীট ক্রেমেঞ্জাও তেমনি চট করে ফাঁসটা পরিয়ে দিল কার্লোর গলায়। রশির দুই প্রান্ত ধরে হ্যাঁচকা টান দিতেই সেটা কার্লোর গলার চারদিকে ঐটে গেল। বড়শিতে আটকানো মাছের মত শূন্যে লাফিয়ে উঠল কার্লোর শরীর। তৈরি ছিল ক্রেমেঞ্জা, রশিটা ছাড়ল না সে। গায়ের জোরে আরও টান করল সেটা, যথাসম্ভব কষে দিল ফাঁসটাকে। কয়েক সেকেন্ডেই নেতিয়ে পড়ল কার্লো। শেষ হয়ে

গেছে ক্লেমেঞ্জার কাজ, কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিত হবার জন্যে টান করে ধরে রাখল রশিটা আরও কিছুক্ষণ।

তারপর ফাঁস খুলে রশিটা গুছিয়ে নিয়ে পকেটে ভরল সে কার্নোর নিষ্প্রাণ শরীর পড়ে গেল সীট থেকে দরজার গায়ে কাত হয়ে রয়েছে সীটের পিছনে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে ক্লেমেঞ্জা।

পরবর্তী চত্বিশ ঘণ্টায় রক্তগঙ্গা বয়ে গেল নিউ ইয়র্কে ছাশ্বিশ ঘণ্টা পেরোবার আগেই সম্পূর্ণ হলো কর্নিয়নি পরিবারের বিজয় একের পর এক সুখবর আসছে চারদিক থেকে। কিন্তু কর্নিয়নীদের কেউ বিজয়ের উল্লাসে ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিল না। প্রত্যেকের চেহারায় পরম তৃপ্তি এবং দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠল বটে, কিন্তু সবার চালচলনে আশ্চর্য একটা সমাহিত ভাব দৃষ্টি এড়াল না কারও। প্রতিটি সুসংবাদ প্রশান্ত গাভীর্যের সাথে গ্রহণ করছে মাইকেল কর্নিয়নি। তার সামনে একটা অতিরিক্ত শব্দ উচ্চারণ করার দুঃসাহস দেখান না কেউ, উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা তো দূরের কথা। অনেক চমকপ্রদ সুখবর, এল, অপ্রত্যাশিত অনেক সাফল্য ধরা দিল পরিবারের হাতে, কিন্তু খবরগুলো গ্রহণ করার সময় মাইকেল কর্নিয়নির চোখের পাতা নড়তে দেখল না কেউ, গর্বে তার বুক ফুলে উঠতে দেখল না কেউ, আনন্দে তার চোখ চিকচিক করে উঠতে দেখল না কেউ। বিশ্বয়কর সংঘম আর ইম্পাক্টের মত কঠিন ব্যক্তিত্বের চরম দৃষ্টান্ত দেখান মাইকেল। শুধু অদ্ভুত একটা গভীরতা ফুটে উঠল তার দৃষ্টিতে।

তোষক নেবার দরকার পড়েনি। কেননা কর্নিয়নি পরিবারের প্রথম আক্রমণের ধাক্কাটাই শত্রুদের মেরুদণ্ড ভেঙে একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়েছে বিষম আতঙ্কে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ল সবাই। ঠিক এই সময় দ্বিতীয় পর্যায়ে আক্রমণ শুরু করল কর্নিয়নিরা। ক্লেমেঞ্জা আর রকো ল্যাম্পনি তাদের সৈনিকদেরকে ছেড়ে দিল শহরে।

কর্নিয়নি সাম্রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল যারা, তাদেরকে যেখানে পাওয়া গেল সেখানেই ধরে ধরে মেরে ফেলা হলো। ছোটখাটো প্রতিরোধের সম্মুখীন হলো বটে সৈনিকরা, কিন্তু সে-সব অগ্রাহ্য করে দুর্বার গতিতে একের পর এক সাফল্য অর্জন করে গেল তারা।

টেলিওর দলের ভার নেবার জন্যে পাঠানো হলো নেরিকে। বার্জিনিদের গোটা বুকমেকিং ব্যবসাটাকে দখল করতে সময় লাগল মাত্র কয়েক ঘণ্টা। চুনোপুঁটিগুলোকে পাইকারীভাবে মেরে ফেলা হলো। ভাগ্যগুণে যারা ওদের হামলা এড়িয়ে যেতে পারল, শহর ছেড়ে চিরকালের জন্যে পালিয়ে বাঁচল তারা। বার্জিনিদের সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দু'জন উচ্চপদস্থ পারিবারিক নেতা মানবেরি স্ট্রাটের একটা ইতালীয় রেস্টোরাঁয় ডিনার খেয়ে কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে বেরিয়ে আসতেই কে বা কারা গুলি করে মেরে ফেলল তাদেরকে। ঘোড়দৌড়ের মাঠ থেকে বিস্তর টাকা জিতে বাড়ি ফিরছিল যারা, তাদের মধ্যে থেকে বার্জিনি আর ট্যাগ্লিয়াদের লোকগুলোকে বেছে বেছে মেরে ফেলা হলো। তাছাড়া গায়েব হয়ে গেল অসংখ্য লোকজন। এদের সন্ধান কেউ কোনদিন পাবে না।

ওই একরাতেই একটা হিংস্র হামলা পরিচালনা করে শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিল মাইকেল কর্নিয়নি। কর্নিয়নি পরিবার আবার তার আগের মর্যাদা ফিরে পেয়েছে। নিউ ইয়র্কের পাঁচ পরিবারের মধ্যে তারাই এখন শ্রেষ্ঠ, অপরাজেয়। এর সবটুকু কৃতিত্ব মাইকেল কর্নিয়নির। তবে ওধু তার অত্যাশ্চর্য কর্ম-কুশলতার জন্যে তাকে শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসনে বসানো হলো, ব্যাপারটা ঐ নয়। বার্জিনি আর টাটাগ্লিয়া পরিবারের প্রথম সারির সেরা ক্যাপোরেজিনিদের সবাই কর্নিয়নি পরিবারে চলে এল, সেটাও একটা বড় কারণ। নিউ ইয়র্কের দুটো পরিবার সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করল কর্নিয়নিদের কাছে। বার্জিনি আর টাটাগ্লিয়াদের তো আত্মসমর্পণ করার প্রশ্নই উঠল না। তাদের অস্তিত্বের আর অবশিষ্টই বা আছে কি?

কিন্তু এত বড় বিজয় সামান্য একটা কারণে বিলম্বিত হয়ে উঠল মাইকেলের জন্যে। সাফল্য চূড়ান্ত এবং সার্বিক হয়েছে, কিন্তু তবু এক জায়গায় একটু খুঁত থেকে গেল।

ছেলেদেরকে ভেগাসে রেখে একাই ফিরে এল কনি কর্নিয়নি। এসেই খাদিনীর মত আচরণ শুরু করে দিল সে।

কনিকে নিয়ে উঠানে এসে থামল গাড়িটা। এখন পর্যন্ত বৈধব্যের শোক কোনরকমে দমন করে রেখেছে সে। গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির দিকে মেয়েকে এগোতে দেখে মা বুড়ি কর্নিয়নি ছুটে এলেন। কিন্তু তিনি বাধা দেবার আগেই মাইকেলের বাড়িতে ঢুকে পড়ল কনি। সিটিংরুমে ঢুকেই দেখল সোফায় বসে রয়েছে মাইকেল আর কে।

কনিকে দেখেই সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মাইকেল, তার সাপে কে-ও। ননদকে বুকে জড়িয়ে ধরে সাহুনা দেবে বলে তাড়াতাড়ি তার দিকে এগোল কে। কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। শোকে নয়, প্রচণ্ড ঘৃণায় বিকৃত হয়ে উঠেছে কনির চেহারা।

ছুটে ঘরের ভেতর ঢুকে মাইকেলকে দেখতে পেয়েই দাঁড়িয়ে পড়েছে কনি। মাথা ঝাকিয়ে দাঁতে দাঁত চাপল সে, চোখ দুটো কুঁচকে ছোট হয়ে গেল। খাদিনীর মত হাত ছুঁড়ে শুরু করে দিল চিৎকার। বয়সে মাইকেলের চেয়ে ছোট, কিন্তু বড় ভাইকে সম্মান দেখাবার মত মানসিক অবস্থা এখন নেই তার।

‘বেজগ্মা, শুয়োর! আমার স্বামীকে খুন করেছিস তুই। বাবা বেঁচে ছিল, তাই নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলি। যেই বাবা মরেছে, অমনি তোর পাখা গজিয়েছে, ভেবেছিস আর তোকে পায় কে! খুনী, পাষণ্ড, বদমাশ! চিরকাল আমার স্বামীকে ঘৃণা করতিস তুই। দু’চোখে দেখতে পারতিস না...তুই, তোরা সবাই সনির জন্যে দায়ী করতিস ওকে। সবই বুঝতে পারতাম আমি, কিন্তু তুই পাষণ্ড আমার এতবড় সর্বনাশ করবি তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। তোর কথা ভাবতেও ঘৃণা হয় আমার, তুই আমার শত্রু। এই পরিবারে একমাত্র তুই কক্ষনও আমার ভাল চাসনি। কি করব এখন আমি, এই শুয়োর, কি হবে এখন আমার! এক মায়ের পেটের ভাই না তুই, আমার মুখ চেয়েও তোর মনে দয়া হলো না একটু? ওগা...’

কখন যেন নিঃশব্দে ঘরে এসে ঢুকেছে মাইকেলের দু’জন বডিগার্ড। কনির

দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে তারা, মাইকেলের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছে।

কিন্তু ভাবলেশহীন মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে মাইকেল।

হতভম্ব হয়ে গেছে কে। কথা বলার সময় গলাটা কেঁপে গেল তার। 'শান্ত হও, কনি। মাথা ঠাণ্ডা করো। কি বলছি তা তুমি নিজেও জানো না।'

হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিল কনি, নিজেকে সামলে নিয়েছে এরই মধ্যে। ঝুট করে ফিরল সে কে-র দিকে। বিষাক্ত তীরের মত বেরিয়ে আসছে প্রতিটি শব্দ। 'তোমার স্বামী তোমাকে বোকা বানাতে পেরেছে, কিন্তু আমাকে পারেনি ওর স্ত্রী হয়ে ওকে তুমি চিনতে পারোনি, সেটা তোমার জন্যে লজ্জার কথা জানো, আমার সাথে কেন ও অমন নীরস ব্যবহার করত? কেন উঠানে নিয়ে এসে রেখেছিল কার্লোকে? তাকে খুন করবে বলে। ইচ্ছেটাকে এতদিন পুষে রেখেছিল মনে। বাবা জানতে পারলে বাধা দেবে, তাই অপেক্ষা করে ছিল। আমাদেরকে বোকা বানাবার জন্যে আমাদের ছেলের গড ফাদার হয়েছিল। জানো, পিশাচটা আরও কত লোককে খুন করেছে? যাও না, খবরের কাগজগুলোয় একটু চোখ বুলিয়ে এসো, নিজেই দেখতে পাবে। বার্জিনি, টাটাগ্লিয়া, এই রকম আরও কত নাম জানতে চাও? তোমার স্বামী খুন করেছে ওদের সবাইকে।'

আবার হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হতে যাচ্ছে কনি। মাইকেলের মুখে থুতু ছিটাবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু এত কথা বলে মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে, থুতু বের হলো না।

'ওকে বাড়ি নিয়ে যাও,' এতক্ষণে কথা বলল মাইকেল। সম্পূর্ণ শান্ত দেখাচ্ছে ওকে। 'একজন ডাক্তারকে ডেকে পাঠাও, পরীক্ষা করে যাক।'

কনির হাত চেপে ধরল মাইকেলের বডিগার্ডরা, টানাটানি করে বাড়ির বাইরে নিয়ে চলে গেল তাকে।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখনও কে। দু'চোখ ভরা আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে আছে স্বামীর মুখের দিকে। 'মাইক, এসব কথা কেন বলল কনি? এসব কথা বিশ্বাস করতে পারল কিভাবে ও?'

শ্রাগ করল মাইকেল। 'ও অসুস্থ। হিস্টিরিয়া হয়েছে ওর।'

স্বামীর চোখে চোখ রেখে কি যেন খুঁজছে কে। আতঙ্কে সবুজ হয়ে গেছে তার চেহারা, 'মাইক, বলো ওসব সত্যি নয়?' দুই হাত দিয়ে মাইকেলের শার্টের কলার চেপে ধরল সে। 'বলো, কনি যা বলে গেল সব মিথ্যে!'

হঠাৎ ক্রান্ত দেখাল মাইকেলকে। ধীরে ধীরে উপর-নিচে মাথা নাড়ল ও। শান্তভাবে বলল, 'মিথ্যেই তো। ওর কথায় কান দেবার দরকার নেই তোমার, আমি যা বলছি সেটাই সত্যি। কিন্তু মনে রেখো, এই শেষবারের মত আমার কাজের ব্যাপারে প্রশ্ন করতে দিচ্ছি তোমাকে, তার উত্তরও দিচ্ছি। কনির মাথার ঠিক নেই, ও যা বলে গেল তা সত্যি নয়।' বলার ভঙ্গি আর সুরে এর চেয়ে বেশি আশ্বাস প্রকাশ করা সম্ভব নয়। স্ত্রীর চোখে চোখ রেখে দৃঢ় কণ্ঠে কথাটা বলল মাইকেল। বিবাহিত জীবনে পরস্পরের মধ্যে যে গভীর আন্তরিকতাময় বিশ্বাসের শক্ত বাঁধন রচনা করেছে ওরা, তার সবটুকু প্রয়োগ করে কে-কে কথাটা বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করল

মাইকেল। সমস্ত সন্দেহ, সমস্ত ভয় এক নিমেষে দূর হয়ে গেল কে-র মন থেকে। পরম স্বস্তির হাসিতে মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার, দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করল স্বামীকে।

‘গলা শুকিয়ে গেছে, আমাদের দু’জনেরই খানিকটা করে মন্দ দরকার,’ স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে বরফ আনার জন্যে কিচেনে গিয়ে ঢুকল কে। হঠাৎ সদর দরজা খোলার আওয়াজ গেল কানে। তাড়াতাড়ি কিচেন থেকে আবার বেরিয়ে এল সে।

ক্রেমেঞ্জা, নেরি আর রকো ল্যাম্পনি ঢুকল ঘরে। উল্টোদিকের দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে কে, ওর দিকে পিছন ফিরে রয়েছে মাইকেল। মাইকেলকে পাশ থেকে দেখার জন্যে ঘরের ভেতর ঢুকে একটু সরে দাঁড়াল কে।

ঠিক এই সময় ওর স্বামীকে সম্বোধন করল ক্রেমেঞ্জা, আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনা জানান।

‘ভন মাইকেল,’ মুগ্ধ কণ্ঠে বলল ক্রেমেঞ্জা।

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কে। দেখতে পাচ্ছে কিভাবে মাইকেল ওদের সবিনয় ভক্তি, শ্রদ্ধা আর স্বীকৃতি গ্রহণ করছে। রোমের প্রাচীন মূর্তির কথা মনে পড়ে গেল তার। তাদেরই মত মাইকেল যেন একজন রোমক সম্রাট, যারা দেবতাদের আনুকূল্য পেয়ে মানুষদের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা হতেন।

একটা হাত কোমরে রেখে দাঁড়িয়ে আছে মাইকেল কর্লিয়নি। পাশ থেকে তার মুখটা দেখতে পাচ্ছে কে। সেই মুখে ঠাণ্ডা, প্রশান্ত গর্বের উদ্ভাস। দাঁড়াবার ভঙ্গিটা সহজ, কিন্তু আশ্চর্য একটা দীপ্ত দার্শনিক ভাব ফুটে রয়েছে তাতে। একটা পা অপরটার চেয়ে সামান্য একটু পিছিয়ে রয়েছে, শরীরের ভার চাপানো রয়েছে সেই পিছনের পায়ে ওপরই। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যাপোরেজিমিরা।

মুহূর্তে সব পরিষ্কার হয়ে গেল কে-র কাছে। বুঝতে পারল, কনির সমস্ত অভিযোগ সত্য। ঘুরে দাঁড়াল কে, দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কিচেনে ঢুকে ভেঙে পড়ল কান্নায়।

চোদ্দ

রক্তাক্ত জয়লাভ সম্পূর্ণতা পেতে পুরো একটা বছর লেগে গেল। সূক্ষ্ম রাজনৈতিক কৌশলের সফল প্রয়োগ ঘটিয়ে ইতিমধ্যে গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে শক্তিশালী ইতালীয় পরিবারের নেতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে মাইকেল কর্লিয়নি। বছরটা সমান দু’ভাগে ভাগ করে লং বীচের হেডকোয়ার্টার আর লাস ভেগাসের বসতবাড়িতে কাটাল ও। বছরের শেষদিকে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, নিউ ইয়র্কের ব্যবসা বন্ধ করে দিয়ে, উঠান তার সমস্ত সয়-সম্পত্তি বিক্রি করে দেয়া হবে। তাই শেষবারের মত পরিবারের সবাইকে নিয়ে লাস ভেগাস থেকে নিউ ইয়র্কে এসেছে ও। ঠিক হয়েছে পুরো একটা মাস এখানে থাকবে ওরা। মাইকেল তার ব্যবসা বন্ধ আর সম্পত্তি বেচার ব্যাপারে ব্যস্ত থাকবে, আর ওদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র গুছিয়ে বাক্স বন্দী করবে কে। গৃহস্থালির যাবতীয় মালামাল পাঠানো হবে

জাহাজযোগে।

গোটা আমেরিকায় কর্নিয়নি পরিবার এখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ক্রুমেজা এখন তার নিজের একটা আলাদা পরিবারের কর্তা। নিউ ইয়র্কে তার পরিবারটাই সবচেয়ে শক্তিশালী। কর্নিয়নিদের ক্যাপোরেজিমি এখন রকো ল্যাম্পনি। বিরাট একটা পদ দেয়া হয়েছে অ্যানবার্ট নেরিকেও। নেভাডায় কর্নিয়নিদের যত হোটেল রয়েছে সবগুলোর সিকিউরিটি ব্যবস্থার ডিরেকটর সে। ডন মাইকেল তার পরিবারের একজন প্রবীণ সদস্য হিসেবে টম হেগেনকেও গ্রহণ করেছে।

সময়ের কোমল হাতের ছোঁয়ায় পুরানো সমস্ত ব্যথা সেরে যায়। ডন মাইকেলের ওপর এখন আর কোন রাগ বা অভিমান নেই কনি কর্নিয়নির। ভাইয়ের বিরুদ্ধে অতগুলো গুরুতর অভিযোগ আনার মাত্র এক হুতা পরই নিজে যেচে পড়ে মাফ চেয়েছে সে। ডন মাইকেলের স্ত্রী কে-কে বলেছে, সেদিন যাই বলে থাকুক সে, তার কথায় কোন সত্যতা ছিল না, হিন্টরিয়ায় আক্রান্ত সদ্য বিধবার প্রলাপ ছিল ওসব।

অনায়াসে আবার স্বামী পেয়ে গেছে কনি কর্নিয়নি। প্রথম স্বামীর জন্যে শোক প্রকাশ করতে পুরো একটা বছর অপেক্ষাও করেনি সে, যদিও সেটাই নিয়ম। তার দ্বিতীয় স্বামীর বয়স খুবই কম, কনির চেয়ে ছোট হলে হবে তো বড় হবে না। চমৎকার, খাসা ছেলে। বিছানায় প্রথম রাতেই তার প্রেমে পড়ে গেল কনি। ছেলেটা সেক্রেটারির কাজ নিয়ে কর্নিয়নি পরিবারে ঢুকেছিল, এবং দক্ষতা দেখিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল অল্প সময়েই। ভাল ইতালীয় পরিবারের ছেলে, তার ওপর আমেরিকার শ্রেষ্ঠ বিজনেস কলেজ থেকে পাস করেছে। ডনের বোনের সাথে বিয়ে হওয়ায় ভবিষ্যতের জন্যে তাকে আর চিন্তা করতে হবে না।

ইতিমধ্যে পরিবারের সবাইকে খুশি করার জন্যে ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে কে কর্নিয়নি। ওর ছেলে দুটোও ওই ধর্মীয় নিয়মে মানুষ হচ্ছে। তবে এতে করে একটু অসন্তুষ্টই হয়েছে মাইকেল। ছেলেরা প্রটেন্টান্ট হলেই বেশি খুশি হত সে। তার ধারণা, তাতে নাকি আরও বেশি করে মার্কিনী হওয়া যায়।

নেভাডা শুধু ভাল লাগেনি কে-র, জায়গাটার প্রেমে পড়ে গেছে সে। ওখানের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী জাদু করেছে তাকে। আকাশ ছোঁয়া পাহাড়, লাল পাথরের গিরিখাদ, উত্তপ্ত মরুভূমি, প্রাণ ঠাণ্ডা করা নীল হ্রদ, এমন কি গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড গরমটাও ভাল লাগে তার। ছেলেরা ঘোড়ায় চড়ে খেলে। বাড়িতে বডিগার্ড নয়, চাকরবাকর আছে। আর নেভাডায় আরও অনেক স্বাভাবিক জীবনযাপন করে মাইকেল। একটা গৃহ নির্মাণ সংস্থার মালিক সে। বিজনেস ক্লাবের সদস্য হয়েছে। সদস্য হয়েছে পৌর সংস্থার। আজকাল লোকজনের সাথে মেলামেশা করে। সবাই ভারি পছন্দও করে ওকে। রাজনীতি সম্পর্কে চিরকালই উৎসাহী ও, ইদানীং সেটা আরও বেড়েছে। সব মিলিয়ে কে-র কাছে জীবন বড় আনন্দময় বলে মনে হয়। নিউ ইয়র্কের আবাস তুলে দেয়া হচ্ছে, সেজন্যে খুব খুশি কে। এখন থেকে ভেগাসই ওদের স্থায়ী নিবাস হবে। ভেগাস থেকে নিউ ইয়র্কে আসতে একটুও ভাল লাগেনি তার।

নিউ ইয়র্কে আজ ওদের শেষ দিন।

ভোর অন্ধকার থাকতে ঘুম ভেঙে গেল কে-র। উঠান থেকে ট্রাকের ঘরঘর আওয়াজ ভেসে আসছে। বাড়ি খালি করে সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া হবে ট্রাকে করে। দুপুরের পর কর্লিয়নিদের মাকে নিয়ে প্লেনে করে রওনা হবে সবাই। ফিরে যাবে লাস ভেগাসে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে কে দেখল বালিশে হেলান দিয়ে বিছানায় বসে সিগারেট ফুঁকছে মাইকেল।

স্ত্রীকে দেখেই জানতে চাইল মাইকেল, 'আচ্ছা, রোজ ভোরে গির্জায় না ছুটলেই কি নয়? রোববারে যাও, বাধা নেই, কিন্তু রোজ...এ কেমন কথা? তুমিও তো দেখছি মায়ের মতই খারাপ হয়ে যাচ্ছ।' হাত বাড়িয়ে টেবিলের আলোটা জ্বলে ঘরের অন্ধকার তাড়াল মাইকেল।

খাটের কিনারায় বসল কে। মোজা পরছে। 'ক্যাথলিকরা কেমন হয় জানোই তো,' বলল সে। 'তার ওপর আমি আবার দীক্ষা নিয়েছি। এরা সাধারণত আর সবার চেয়ে ধর্মের ওপর গুরুত্ব দেয়।'

হাত বাড়িয়ে দিল মাইকেল। কে-র উরু স্পর্শ করল ও। চামড়াটা কোমল আর উষ্ণ।

'না, হাত সরেও,' মৃদু তিরস্কারের সুরে বলল কে। 'তোমার চাল আমি বুঝতে পারছি। লাভ নেই, সাহেব। আজ সুবিধে হবে না।'

'কেন? কেন?'

'আজ আমি "কমিউনিয়ন" নিচ্ছি,' বলল কে। মাইকেলের হাত সরিয়ে দিয়ে খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে।

মৃদু একটু হাসল মাইকেল। 'বুঝলাম। নিজেকে তুমি গৌড়া ক্যাথলিক বলে স্বীকার করছ,' বলল ও। 'কিন্তু কই, ছেলেদেরকে তো কিছু বলো না, ওরা যে এত গির্জা ফাঁকি দেয়?'

'ওরা ছেলেমানুষ, গির্জায় যাবার সময় পড়ে রয়েছে ওদের,' বলল কে। 'বাড়ি ফিরে নিয়মিত পাঠাব ওদেরকে।'

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে স্বামীকে চুমো খেলো কে। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে একটু দাঁড়াল সে। এরই মধ্যে গরম হয়ে উঠেছে বাতাস। গ্রীষ্মের সূর্য উঠছে পূর্বদিকে, আকাশটা টকটকে জাল। উঠানের ফটকের কাছে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেদিকে এগোল কে।

গাড়িতে ওর জন্যে অপেক্ষা করছেন শাওড়ী। বিধবার কালো পোশাক পরেছেন তিনি। বউমাকে নিয়ে ভোরের 'মাস' অনুষ্ঠানে যাওয়া রোজকার একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে তাঁর।

বুড়ি শাওড়ীর তোবড়ানো মুখে চুমো খেলো কে। তারপর ড্রাইভিং সীটে বসল।

সন্দেশ হওয়াতে বউমাকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'নাস্তা খেয়ে এলে নাকি?'

'না,' মৃদু গলায় বলল কে।

সমুপ্তচিত্তে মাথা দোলালেন বৃদ্ধা। পবিত্র কমিউনিয়ন নিতে হলে রাত বারোটোর পর মুখে কিছু দিতে নেই। নিয়মটা একবার ভুলে গিয়েছিল কে। সে অনেকদিন আগের কথা, কিন্তু শাওড়ী তা আজও ভোলেননি। রোজই তিনি কথাটা জেনে নেন।

তারপর আবার জানতে চাইলেন, ‘শরীর ভাল তো?’

‘জী।’

ভোরের কচি রোদে ছোট গির্জাটাকে কেমন যেন মিয়মান আর বিষণ্ণ লাগে। ভেতরটা খুব ঠাণ্ডা। মনে হয়, এখানে বসে সারাটা দিন বিশ্রাম নিতে পারলে মনটা ভাল হয়ে যাবে। সাদা পাথরের সিঁড়ি বেয়ে শাওড়ীকে উঠতে সাহায্য করছে কে। তাঁকেই যেতে দিল আগে। বেদীর একেবারে সামনে বসতে ভালবাসেন তিনি। সিঁড়ির মাথায় কয়েকটা মুহূর্ত নষ্ট করল কে। এতটা কাছাকাছি পৌঁছে সব সময় কেমন যেন ভয় ভয় করে ওর। কেমন যেন একটা অনীহা জাগে মনে।

তারপর শীতল অন্ধকারের ভেতর প্রবেশ করল কে। আঁধার থেকে পবিত্র জর্দানের পানি নিল আঙুলের ডগায়, ত্রুশচিহ্ন আঁকল শূন্যে, ভিজ়ে আঙুলটা ছোঁয়াল শুকনো ঠোটে। যীশু আর সন্তদের মূর্তির সামনে লাল শিখা কাঁপছে মোমবাতির। নিজের সারিতে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসল কে, অপেক্ষা করছে কখন কমিউনিয়ন নিতে ডাক পড়বে। মাথাটা নিচু করে রয়েছে সে, দেখে মনে হয় প্রার্থনা করছে, কিন্তু এখনও মনটাকে তৈরি করতে পারেনি ও।

শুধু এইখানে, এই খিলান দেয়া গির্জার ছায়াছায়া অন্ধকারে কে তার স্বামীর জীবনের আরেকটা দিকের কথা ভাবতে অনুমতি দেয় নিজের মনকে। এখানে বসে, এই সময় এক বছর আগে সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা স্মরণ করে সে। পরস্পরের প্রতি ওদের যে প্রেম আর ভালবাসা রয়েছে তার সুযোগ নিয়ে একটা মিথ্যে কথা তাকে বিশ্বাস করাধার চেষ্টা করেছিল মাইকেল। বলেছিল, সে তার নিজের ভয়ীপতিকে খুন করেনি।

অপরাধটার জন্যে নয়, মিথ্যেটার জন্যে স্বামীকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল কে।

এক বছর আগের ঘটনা।

দুই ছেলেকে নিয়ে সোজা বাপের বাড়ি নিউ হ্যাম্পশায়ারে চলে এল কে। লং বীচের কাউকে কিছু বলে আসেনি, কি করবে তাও ভাল করে ভেবে দেখেনি এখনও।

পরিস্থিতিটা সাথে সাথে বুঝে নিয়েছে মাইকেল। প্রথম দিন একটা ফোন করল কে-কে, তারপর তাকে আর বিরক্ত করেনি।

একটা হুগা কেটে গেল। তারপর একদিন একটা লিমুসিন গাড়ি এসে দাঁড়াল কে-র বাপের বাড়ির সামনে। গাড়িটা নিউ ইয়র্ক থেকে এসেছে। সেটা থেকে নামল টম হেগেন।

এই একটা দুপুরের কথা জীবনে কখনও ভুলবে না কে। ওর জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দুপুর।

বেড়াতে বেরিয়ে শহর ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে গেল ওরা, সেই বনভূমি পর্যন্ত। টম হেগেনকে ছেড়ে কথা বলল না সে।

নির্দয়ভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রোপ করার চেষ্টা করল কে। উচিত হয়নি, কেননা ও যে রকম মেয়ে, এত বেশি সরল, তাতে খোঁচা মারার কায়দা-কৌশল রপ্ত করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। চেষ্টা করল, কিন্তু সুবিধে করতে পারল না। 'সে বুঝি আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে পাঠিয়েছে তোমাকে?' হেগেনকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার গাড়ি থামতে দেখে আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম হাতে পিস্তল-রিভলভার নিয়ে তোমাদের গুণাপাণ্ডারা লাফ দিয়ে নামতে যাচ্ছে। ভাবছিলাম, এই রে, এবার আমাকে টেনে-হিঁচড়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।'

এর আগে হেগেনকে কখনও রাগতে দেখেনি কে, এখন দেখছে। চোখমুখ টকটকে লাল হয়ে উঠল তার, গলার স্বর বদলে গিয়ে এমন কর্কশ হয়ে গেল যে চেনাই যায় না। 'তুমি কচি খুকীটি নও, কে। এই রকম একটা ছেলেমানুষি ঠাট্টা কিভাবে করো? তোমার মত মেয়ের কাছ থেকে আরও গাভীর্য, আরও বুদ্ধি আশা করি আমি। মাটিতে পা দাও, কে।'

'বেশ,' বলল কে।

পায়ের নিচে কচি সবুজ ঘাস। মফঃস্বলের কাঁচা রাস্তা দিয়ে হাঁটছে ওরা। 'চলে এলে কেন?' শান্তভাবে জানতে চাইল হেগেন।

মুহূর্তে উত্তেজিত হয়ে উঠল কে। বলল, 'একজন'মিথ্যাবাদীর সাথে ঘর করতে পারব না, তাই। আমাকে সে মিথ্যে কথা বলল কেন? চলে এসেছি, কারণ কনির ছেলের গড ফাদার হয়ে অনেক আগেই বোকা বানিয়েছিল আমাকে সে, তাই সে তার স্ত্রীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাই এই রকম একজন লোককে ভালবাসতে পারব না আমি। স্বামীর চরিত্রে যদি এমন সামাজ্যিক ধরনের স্থলন থাকে, তাকে আমি সহ্য করতে পারব না—জানি বলেই চলে এসেছি। ওকে আমি আমার ছেলেদের বাপের দায়িত্ব পালন করার অধিকার দিতে রাজি নই।'

'প্রলাপ বকছ নাকি?' বলল হেগেন। 'তোমার একটা কথাও তো বুঝতে পারলাম না আমি।'

এতক্ষণে রাগ দেখাবার সঙ্গত একটা কারণ ঘটল, এবং দুয়োগটা হাতছাড়া করল না কে, বলল, 'আমার কথা বুঝতে পারছ না? মাইকেল কর্লিয়নি তার ভগ্নীপতিকে খুন করেছে, আমি সেই কথা বলছি। এবার বুঝতে পারছ কি বলতে চাইছি?' একটু বিরতি নিল কে, তারপর আবার বলল, 'মাইকেল কর্লিয়নি আমার স্বামী হয়ে আমাকে মিথ্যে কথা বলেছে, আমি সেই কথা বলছি। বুঝতে পারছ এবার?'

দু'জনের কেউই অনেকক্ষণ কথা বলল না। চুপচাপ হাঁটছে।

তারপর হেগেনই প্রথমে মুখ খুলল, 'এসব অভিযোগ যে সত্যি তা জানার কোন উপায় নেই। তবু না হয় তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া গেল কথাটা সত্যি। আসলেই সত্যি, তা কিন্তু বলছি না—সেটা ভুলে ভেবে বোসো না। কিন্তু যদি বলি, মাইকেল যা করেছে তার পিছনে ন্যায্য যুক্তি ছিল? অস্তুত যদি বলি যে ন্যায্য কারণ থাকা

সম্ভব, তাহলে?’

হেগেনের দিকে তাকান কে, তার দৃষ্টিতে রাজ্যের তাচ্ছিল্য ফুটে উঠল। বলল, ‘তোমার ওকালতির দিকটা এই প্রথম দেখতে পাচ্ছি আমি। ওটা তোমার শ্রেষ্ঠ দিক নয়, টম।’

নিঃশব্দে হাসল টম হেগেন। ‘অচ্ছা, বুঝলাম। কিন্তু আমার সবটা কথা আগে শোনোই তো। যদি বলি, কার্লোই বার্জিনিদের হাতে তুলে দিয়েছিল সনিকে? সেরাতে কনিকে অস্বাভাবিক রকম মারধর করেছিল। যদি বলি, ওটা একটা ষড়যন্ত্র ছিল? ওই ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল সনিকে বাড়ির বাইরে বের করে আনা? যদি বলি, বার্জিনিরা জানত জোনস বীচ রিজের ওপর দিয়ে যাবে সনি? তারপর, আরও যদি বলি, সনিকে শত্রুদের হাতে তুলে দেবার বিনিময়ে প্রচুর টাকা খেয়েছে কার্লো, তাহলে? তাহলে কি বলবে তুমি?’

চুপ করে আছে কে।

‘বলার কথা আরও আছে,’ থামছে না হেগেন, ‘ধরো, এমন ঘটে থাকে, যে ডন ভিটো কর্নিয়নি একজন মহাপুরুষ ছিলেন বলেই ছেলের খুনের বদলা নেবার জন্যে জামাইকে হত্যা করতে নিজের বিবেককে রাজি করাতে পারেননি, সেটাই তাঁর একমাত্র কর্তব্য জানার পরও? যদি বলি এই অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব তিনি পালন করতে পারবেন না বুঝতে পেরেই তাঁর ছোট ছেলে মাইকেলকে উত্তরাধিকারী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন, কেননা তিনি ভালভাবেই জানতেন একমাত্র মাইকেলই তাঁর কাঁধ থেকে সে দায়িত্বের বোঝা, স্নে-পাপের বোঝা নামিয়ে নিতে পারবে?’

পানিতে দু’চোখ ভরে গেছে কে-র। ধরা গলায় বলল, ‘কিন্তু যা হবার তা তো হয়েই গিয়েছিল। সবাই সুখে ছিলাম আমরা। ক্ষমা করা যেত না কার্লোকে? কেন যেত না? অতীত তো ভুলেও যাওয়া যায়, কার্লোর ব্যাপারটা যদি সবাই ভুলে যেত, কি এমন ক্ষতি হত তাতে? তাকে মেরে ফেলে লাভটা কি হলো?’

মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটছে ওরা। নদীর ধারে এসে গাছের ছোট একটা ছায়ার নিচে ঘাসের ওপর বসল দু’জন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল হেগেন। চারদিকের শান্ত, সুন্দর শান্তিময় প্রাকৃতিক দৃশ্যের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। তারপর বলল, ‘ক্ষমা? হ্যাঁ, তোমাদের এই জগতে তা করা যায়।’

‘ওকে আমি বিয়ে করিনি,’ বলল কে। ‘যাকে বিয়ে করেছিলাম তাকে খুঁজে পাচ্ছি না ওর মধ্যে।’

‘তা যদি পেতে,’ কোমল কণ্ঠে হাসল হেগেন, ‘এতদিনে মরে ভূত হয়ে যেত ও। অবশ্য বিধবা হলে কোন সমস্যা থাকত না তোমার।’

দপ করে জুলে উঠল কে। ‘এ কি ধরনের জঘন্য রসিকতা!’ একটু থেমে আবার বলল সে, ‘তুমি তো সিসিলিয়ান নও, একজন মেয়েকে সত্যি কথা বলতে পারো তুমি। একজন মানুষকে মানুষ বলে মনে করা তোমার পক্ষে সম্ভব। জীবনে এই একবার সত্যি কথাটা আমাকে বলো তুমি, টম।’

সাথে সাথে কোন জবাব দিল না হেগেন। ঝানিক পর এদিক ওদিক-মাথা নেড়ে

বলল, 'ওকে তুমি ভুল বুঝেছ। তোমার রাগের কারণ ও তোমাকে মিথ্যে কথা বলেছে, কিন্তু ও তো তোমাকে ওর কাজকর্মের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করতে নিষেধ করেছিল, সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন? কনির ছেলের গড ফাদার হয়েছিল ও, সেজন্যে ভাবছ ও তোমাকে বোকা বানিয়েছে—কিন্তু তুমিই না বিশেষভাবে অনুরোধ করে রাজি করিয়েছিলে ওকে? তবে কৌশলের দিক থেকে বিচার করলে কাজটা করে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিল ও, কার্লোর মন থেকে সংশয় দূর করার জন্যে বেশ ফল দিয়েছিল ওটা। অতি প্রাচীন একটা নিয়ম, শত্রুকে আশ্বস্ত করা।' হেগেনের হাসিটা দেখে ওকে হৃদয়হীন মনে হলো কে-র। 'সত্যি কথাগুলো বলছি তোমাকে, বিশ্বাস করছ কি?'

মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে আছে কে।

'আরও কিছু সত্যি কথা বলি, কেমন?' আবার শুরু করল হেগেন। 'ডন কর্লিয়নি মারা যাবার পর মাইকেলকে খুন করার ষড়যন্ত্র পাকানো হয়। জানো, কার হাত ছিল এতে? টেসিওর। তাই মরতে হলো তাকে। বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষমা নেই, তাই কার্লোকেও মরতে হলো। ওদেরকে মাইকেল যদিও বা ক্ষমা করতে পারত, নিজেদেরকে ওরা কখনোই ক্ষমা করতে পারত না। তাই চিরকালের জন্যে বিপদের একটা কারণ হয়ে থাকত ওরা। তুমি হয়তো জানো না, কিন্তু আমি তো জানি, টেসিওকে খুবই পছন্দ করত মাইকেল। কনিকে ও সত্যি সত্যিই ভালবাসে। কিন্তু টেসিও আর কার্লোকে ক্ষমা করলে মাইকেল তোমার আর তোমার ছেলেদের, নিজের গোটা পরিবার, আমার আর আমার পরিবারের ওপর অন্যায় করত। কর্তব্যে অবহেলা করা ওর মত একজন পরিবার প্রধানের সাজে না। ওরা বেঁচে থাকলে আমাদের সম্মার বিপদের কারণ হয়ে থাকত। চিরকাল।'

চোখ থেকে মিঃশব্দে পানি ঝরছে কে-র। জানতে চাইল, 'মাইকেল কি এসব কথা বলার জন্যে তোমাকে পাঠিয়েছে?'

আশ্চর্য হয়ে গেল হেগেন। কিছুক্ষণ অবাক চোখে কে-র দিকে তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'না। সে তোমাকে বলতে বলেছে, তুমি যা চাইবে তাই হবে, তোমার কোন ইচ্ছায় বাদ সাধবে না সে। যতদিন ছেলেদের যত্ন নিচ্ছ, ততদিন যা চাইবে তাই পাবে তুমি।' হঠাৎ হাসল হেগেন। 'বলেছে, তুমিই তার ডন। এটা কিন্তু ঠাট্টা।'

হেগেনের একটা কনুই চেপে ধরল কে। 'আর সব কথা যে বললে ওগুলো আমাকে শোনাতে বলে দেয়নি?'

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করতে দেখা গেল টম হেগেনকে, যেন ভাবছে চরম সত্যি কথাটা প্রকাশ করবে কিনা। অবশেষে বলল, 'শোনো তাহলে। তোমাকে আজ যা বলেছি, মাইকেল যদি কোনদিন জানতে পারে, আমাকে আর বেঁচে থাকতে হবে না।' একটু থেমে আবার বলল, 'দুনিয়ায় শুধু তোমার আর তোমার ছেলেদের কোন ক্ষতি করতে পারে না ও।'

পাঁচটা মিনিট চুপচাপ গাছের ছায়ায় বসে থাকল ওরা। তারপর উঠে দাঁড়াল কে। দেখাদেখি হেগেনও উঠল। বাড়ির দিকে হাঁটছে ওরা।

বাড়ির একেবারে কাছাকাছি পৌছে হেগেনকে বলল কে, 'ডিনারের পর আমাকে তুমি নিউ ইয়র্কে নিয়ে যেতে পারবে?'

'সেজন্যেই তো এখানে আসা আমার,' বলল হেগেন।

স্বামীর কাছে ফিরে এল কে। ফিরে আসার এক হুণ্ডা পর ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা নিল ও।

ঢং! ঢং!

গির্জার গহীন কোথাও করুণ অনুতাপের সুরে ঘণ্টা বাজছে ঠিক যেভাবে শেখানো হয়েছে, মুঠো পাকানো হাত দিয়ে নিজের বুকে হালকাভাবে আঘাত করল কে। অনুতাপ প্রকাশের এই হলো ভাষা।

আবার ঘণ্টা বাজার সাথে সাথেই নরম আওয়াজ পাওয়া গেল পায়ের। বেদীর পাদদেশে, রেইলিং-এর ধারে গিয়ে দাঁড়াল প্রার্থীরা নিজের বুকে আবার আঘাত করল কে।

ওর সামনে এসে দাঁড়ালেন ধর্মযাজক। মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে, মুখ হাঁ করল কে, গ্রহণ করল 'ওয়েফার' প্রসাদ।

পাপ মুক্ত হয়েছে কে, দক্ষিণা পেয়েছে দেবতার, মাথা নিচু করে বেদীমূলে কপাল ঠেকাল সে, হাত দুটো জোড় করে রাখল। একটু নড়েচড়ে বসল, ব্যথা যাতে একটু কম লাগে হাঁটুতে।

তারপর মন থেকে সমস্ত চিন্তা দূর করে দেবার চেষ্টা করল কে। নিজের কথা ভুলে গেল, ভুলে গেল নিজের সন্তানদের কথা। সব রাগ, সব ঘৃণা, সমস্ত দুঃখ আর সব বিদ্রোহ ঝেড়ে ফেলল মন থেকে। তারপর বিশ্বাস করার প্রবল, সুগভীর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, সৃষ্টিকর্তা যেন তার আকৃতি বুঝতে পারেন এই ভিক্ষা চেয়ে, মাইকেল কর্লিয়নির আত্মার মুক্তির জন্যে বাছাই করা প্রার্থনা আবৃত্তি করতে শুরু করল সে।

Pathfinder

গডফাদার

মারিয়ো পুজো

[তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব একত্রে]

রূপান্তর: শেখ আবদুল হাকিম

আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে আমেরিকায় বসবাসকারী
এই ইটালিয়ান পরিবারগুলো বুঝি নির্দোষ হোটেল-রেস্তোরাঁ,
জলপাই-তেলের ব্যবসা ইত্যাদি করেই শিরীহ
নাগরিক জীবন যাপন করছে।

একটু ভেতরে ঢুকুন।

ওরেস্বাপ! এ কী! কি চলছে ডন পরিবারগুলোর
অভ্যন্তরে? বিনা বাক্য ব্যয়ে হাজার হাজার মানুষ
কেন পালন করছে এদের যে-কোন নির্দেশ?

প্রয়োজনে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে। কেন?

এ যেন আরেক জগৎ!

মাফিয়া!

বিশ্বের ভয়ঙ্করতম দুর্ধর্ষ সংগঠন--মাফিয়া!



সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০